শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

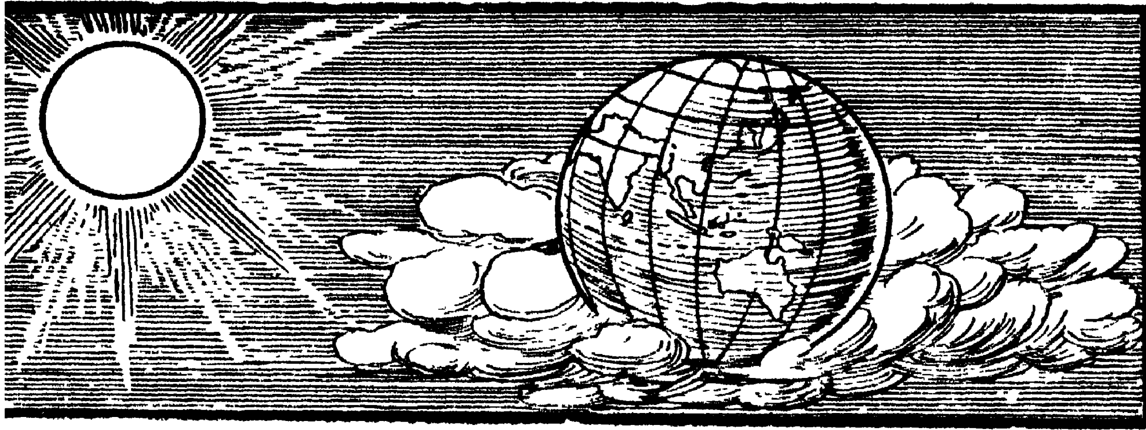
সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—:০:—

বিষয়-বিভাগ

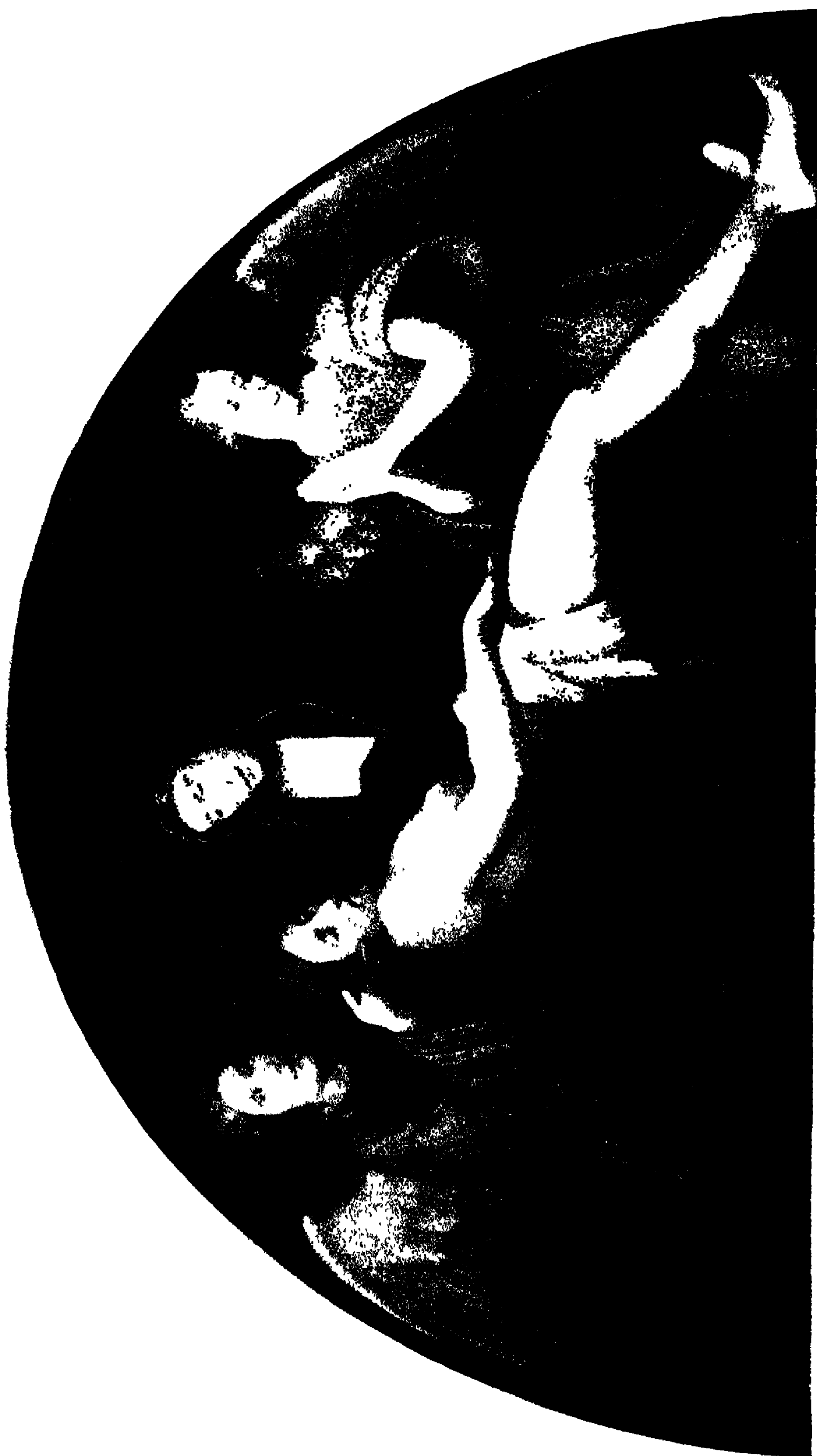
অমর জীবন
আকাশের কথা
আদি মানব
আমাদের দেশ
—ভারতবর্ষ
আলো
আলোক চিত্র
ইতিহাস
উদ্ভিদ্ জীবন
কবিতা চয়ন
কল-কারখানা
কি ও কেন ?
খাদ্য-শস্য
গল্প ও কাহিনী
জাতীয় সঙ্গীত
জীব-জগৎ
দর্শন
দেশ-বিদেশের কথা
ধাঁধা-হেঁয়ালি
নারী-জগৎ
বাঙ্গলার ইতিহাস
বায়ু
বিশ্ব-সাহিত্য
বৃহত্তর ভারত
ব্যায়াম-বিধি
যন্ত্র বিজ্ঞান
রসায়ন-বিজ্ঞান
শব্দ
শিল্প-কথা
সঙ্গীত ও শিল্প
সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ হইতে ১০ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০১ হইতে ৮০০



এখানে সংক্ষিপ্তরূপে দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র





বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী

[বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গলার ইতিহাসের যে যোগসূত্র আছে তাহা বুঝিতে হইলে সকলের আগে এইটুকু বোঝা দরকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আচার-বিচার রীতি-নীতি ও শিক্ষা সভ্যতার সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এবং ঐক্যই বা কোথায়? এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইয়াছে। ক্রমশঃ সেই অতি প্রাচীন অজানা যুগের (তমসাচ্ছন্ন যুগ) ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান নূতন আবিষ্কারের আলোকে আলোকিত বাঙ্গলার নানা যুগের ইতিহাসের কথা বলা যাইবে। এই প্রবন্ধ তাহার সূচনা মাত্র।]

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র, পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব সমুদ্র, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাঙ্গলা দেশ আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্গত। ভূসংস্থানে যেমন বাঙ্গলা আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত, রাষ্ট্রসংস্থানেও বাঙ্গলা মগধের (পাটনা, গয়া প্রভৃতি জেলার) এবং অঙ্গের (ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলার) সহিত বহুকাল, অন্ততঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অল্লাধিক পরিমাণে, প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ ছিল। এইরূপ ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ সত্ত্বেও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের সহিত বাঙ্গলার আচার-বিচারে অনেক তফাৎ। সমুদয় ভারতবর্ষেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ভাগের বৈষ্ণবগণের ইষ্টদেবতা রাম-সীতা এবং দক্ষিণাপথের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণের ইষ্টদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ; কিন্তু বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবগণের আরাধ্য, রাধাকৃষ্ণ। উড়িষ্যায়, গুজরাতে এবং রাজপুতনায়ও রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রবল। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তাঁহারা শৈব বা শিবোপাসক। বাঙ্গলায় শৈবগণের স্থানে দেখা যায় শাক্ত। দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি দেবী শাক্তগণের ইষ্টদেবী। বাঙ্গলার বাহিরে অনেক শাক্ত আছে—মিথিলায়।

অনেক সভ্যজাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কালে ঈশ্বরকে দেবীরূপে আরাধনার প্রচলন দেখা যায়। ঈশ্বরকে দেবী বা শক্তিরূপে ধারণা বাঙ্গালীর মধ্যেও সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন।

বাঙ্গালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা দায়ভাগের নিয়ম। সারা ভারতবর্ষে, এমন কি, মিথিলায়, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি

উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হয় এক নিয়মে, মিতাক্ষরা নামক যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি টীকারূপ নিবন্ধ অনুসারে। একমাত্র বাঙ্গলায় মৃতব্যক্তির সম্পত্তি বিভক্ত হয় জীমূত-বাহনের দায়ভাগ নামক নিবন্ধ অনুসারে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত "মিতাক্ষরা" নামক নিবন্ধ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তি কোন একজনের নহে, পিতা, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি একযোগে পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির ভাগ পায়। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রচলিত "দায়ভাগ" অনুসারে পিতাই পূর্ব্ব-পুরুষের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী এবং তিনি যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন পুত্রের ঐ সম্পত্তিতে কোন অধিকার জন্মায় না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা সম্পত্তি পায়। বাঙ্গলা দেশে পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যত্র ইহা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া, পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের মধ্যে সম্পত্তির কে কতটা পাইবে "মিতাক্ষরা" তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় না, সকলের একযোগে অধিকার থাকে, কিন্তু, "দায়ভাগ" অনুসারে ভ্রাতাদের মধ্যে ভাগের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। অন্য বিষয়েও ভেদ আছে। বাঙ্গলার বাহিরে অন্যত্র যদি একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এক ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার কোন পুত্র না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী সম্পত্তির কোন অংশ পান না, মৃত স্বামীর ভ্রাতাদের নিকট হইতে কেবল ভরণ-পোষণ পাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে কিন্তু মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নীও সেই ভ্রাতার ভাগ পূর্ণমাত্রায় পান। মিতাক্ষরা নামক স্মৃতি গ্রন্থে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির বিভাগের যে ব্যবস্থা আছে তাহা শাস্ত্র-বচনের সহজ অর্থ-অনুগত। "দায়ভাগে" জীমূতবাহন শাস্ত্রবচনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীমূত-বাহনের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার ফলে যে বাঙ্গলার দায়ভাগ রীতি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করা যায় না; বরং মনে করা উচিত যে, মৃতব্যক্তির সম্পত্তি-বিভাগ-রীতি বরাবরই বাঙ্গলায় এইরূপ স্বতন্ত্রই ছিল, এবং জীমূতবাহন শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন মাত্র।



দুর্গা-মহিষমর্দ্দিনী

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মামল্লপুরম নামক স্থানের গুহা-গাত্রে খোদিত। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্ম্মিত

বাঙ্গালীর ধর্ম্মের, দায়ভাগের এবং আরও

অনেক ছোট ছোট বিষয়ের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকের ধর্ম্মের দায়ভাগের এবং অন্যান্য বিষয়ের ভেদ আছে। তাহা বিচার করিলে মনে হয়, বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ গোড়ায় বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তিনটি প্রাচীন জনপদ লইয়া বাঙ্গলাদেশ গঠিত। সুহ্ম বা রাঢ় ভাগীরথীর (গঙ্গার) পশ্চিম দিকে অবস্থিত; মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতীর হইতে করতোয়ার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পুণ্ড্রদেশ (বরেন্দ্র) ভাগীরথীর পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গদেশ। এক সময় করতোয়া খুব বড় নদী ছিল, এবং করতোয়ার পূর্ব্বদিকের ভূভাগ কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। এখন করতোয়া শুষ্কপ্রায়, এবং করতোয়ার পূর্ব্বদিকের রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার রাজ্য বাঙ্গলার অন্তর্গত, এবং কামরূপের উত্তর ভাগ আসাম নামে পরিচিত।

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চার বেদের প্রত্যেক বেদের দুইটি প্রধান ভাগ, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। বেদের মন্ত্র ভাগ সংহিতা নামে কথিত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার একটি মন্ত্রে বোধ হয় মগধের উল্লেখ আছে; অথর্ব্ব বেদের একটি মন্ত্রে মগধের এবং অঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। এই সকল মন্ত্রেই মগধ এবং অঙ্গবাসীদিগের নিন্দা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র এবং অন্ধ্রগণকে শবর এবং পুলিন্দগণের সঙ্গে দস্যু জাতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতিনিচয়কে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই সকল জাতি সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে পরিচিত। শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত একত্র দস্যুর সামিল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে পুণ্ড্রগণ অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ শবর পুলিন্দের মত বর্ব্বর ছিলেন এরূপ মনে



দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী

বৈতাল দেউলপুরী—আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ

করা যায় না। বেদের ব্রাহ্মণ খণ্ডের শেষ ভাগের নাম আরণ্যক। উপনিষৎ এই আরণ্যক ভাগেরই অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গগণের অর্থাৎ বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের নিন্দা দেখা যায়।



দুর্গা-মহিষমর্দ্দিনী—বাঙ্গলাদেশ
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয়ের সৌজন্যে

বয়স হিসাবে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের পরে সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তের অন্তর্গত কল্পসূত্র। বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্ম্মসূত্রে ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কলিঙ্গগণের দেশে গমন করে, তবে তাহাকে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলা এবং পুরীর দক্ষিণে অবস্থিত গাঞ্জাম জেলা প্রাচীনকালে কলিঙ্গনামে পরিচিত ছিল। পুণ্ড্র-বঙ্গ-যাত্রীর জন্য বৌধায়নের এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। সুতরাং শ্রুতির বা বেদের এবং স্মৃতির বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন বিচার করিলে দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক সময় আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের লোকেরা বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে বর্ব্বর মনে করিত এবং বাঙ্গলায় যাওয়া-আসা পাপজনক মনে করিত।

শ্রুতি-স্মৃতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতির অনুসরণ করে না তাহাদের) শাস্ত্রেও দেখা যায়, প্রাচীন-কালে একদিকে বিহার (মিথিলা, মগধ, অঙ্গ) এবং আর এক দিকে বাঙ্গলা (পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ) এই দুই দেশের লোকের মধ্যেও বিশেষ পরিচয় বা আসা-যাওয়া ছিল না।

অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কালে খুব প্রভাবশালী ছিল বৌদ্ধগণ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ আনুমানিক ৫৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আনুমানিক ৪৮০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ গৌতম বুদ্ধের উক্তিগুলিকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করে। পরিভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় গৌতম বুদ্ধের উক্তিপূর্ণ অনেক পুস্তক পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে সংগৃহীত বুদ্ধের উক্তির মধ্যে মতের অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। আধুনিক কালের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন, দীর্ঘনিকায় (দীর্ঘ আগম,) মজ্ঝিমনিকায় (মধ্যম আগম), অঙ্গুত্তর নিকায় (একোত্তর আগম,) সংযুক্ত নিকায় (সংযুত আগম), বিনয়পিটক প্রভৃতি পালিভাষায় লিখিত বুদ্ধের বচন সংগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এই সকল পুস্তকে বুদ্ধের সমসময়ের, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর আর্য্যাবর্ত্তের লোকের আচার-বিচারের কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

মগধের অন্তর্গত গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবেলা গ্রামে গৌতম বুদ্ধত্ব বা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; এবং তারপর তিনি অনেক সময় মিথিলার প্রধান নগরী বৈশালীতে, মগধের রাজধানী রাজগৃহে এবং অঙ্গদেশের রাজধানী (ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী) চম্পা নগরীতে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। মজ্ঝিম নিকায়ের একটি সূত্রে (১৫২ নং) আছে গৌতমবুদ্ধ একবার কজঙ্গলা নগরের অন্তর্গত মুখেলু উদ্যানে উপদেশ দিয়াছিলেন। কজঙ্গল নগর বোধ হয় সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত রাজমহলের নিকটে কোথাও ছিল। বর্ত্তমান কাঁকজোল পরগণা অপভ্রংশ আকারে কজঙ্গলের নাম বহন করিতেছে। কজঙ্গল হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বদিক গেলেই পুণ্ড্রদেশ এবং গঙ্গার পশ্চিম কূল ধরিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে সুহ্ম বা রাঢ়দেশ। গৌতম বুদ্ধ পুণ্ড্রের বা রাঢ়ের বা অঙ্গের কোন নগরে কখনও পদার্পণ করিয়াছিলেন, প্রাচীন পালি গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পালি নিকায় গ্রন্থে বা আগমে এবং বিনয়-পিটকে পুণ্ড্র-বঙ্গের নাম আছে কি না সন্দেহ; কিন্তু উৎকল (উক্কল), কলিঙ্গ এবং গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অসসক (অশ্মক) দেশের নাম আছে। পালি বিনয়পিটকের একস্থানে বলা হইয়াছে, মজ্ঝিমদেশের পূর্ব্ব-সীমা কজঙ্গল নামক নিগম বা নগর, তারপর মহাশাল; তারপর প্রত্যন্ত বা সীমান্ত দেশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গৌতম বুদ্ধের বা বুদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির সমসময়ে পুণ্ড্র-রাঢ় বঙ্গ বা বাঙ্গলা মধ্যপ্রদেশের বহির্ভূত প্রত্যন্ত বাহ্য দেশ বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ গণ্য হইবার কারণ বোধ হয়, সেকালের বা পূর্ব্বে কোনও কালে মিথিলা, মগধ, অঙ্গের (বিহারের) সহিত বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় সম্বন্ধ ছিল না, এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের সভ্যতার বা আচার-ব্যবহারের এত তফাৎ ছিল যে, ঐ সকল দেশের লোক বাঙ্গলায় যাতায়াত করিত না। আগেই স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলার সভ্যতার উৎপত্তি এবং পরিণতি হইয়াছিল বলিয়াই এখনও বাঙ্গলার এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের লোকের মধ্যে আচার-ব্যবহারের এত তফাৎ। বাঙ্গলার এবং বিহারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বোধ হয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দে মৌর্য্যরাজগণের আমলে। তদবধি বাঙ্গলায় এবং হিন্দুস্থানে অবাধে লোক সমাগম চলিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর সভ্যতার বিশেষ লক্ষণগুলি কখনও লোপ পায় নাই।



অমর জীবন

যীশুখৃষ্ট

২১৩ পৃষ্ঠার পর

শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও—তাহারাই পৃথিবীতে স্বর্গের রাজ্য রচনা করিয়াছে। একথাটি কি মধুর! এমন করিয়া শিশুদিগকে যিনি ভালবাসিতেন শিশুদিগকে নিকটে আহ্বান করিতেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেন, আমরা খৃষ্টধর্ম্মের জন্মদাতা সেই মহাপুরুষ যীশুখৃষ্টের জীবনকথা এখানে তোমাদিগকে বলিতেছি।

আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচলিত। এই ধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম যীশু। যীশু শব্দের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা। গৌতম, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। 'বুদ্ধত্ব' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর হইতে তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত। যীশুও তেমনি তাঁহার অসামান্য ত্যাগ ও ধর্ম্মের জন্য অভিষিক্ত প্রভু বা খৃষ্ট নামে আখ্যাত। গৌতম বুদ্ধের নাম করিলেই আমাদের কাছে বুদ্ধগয়ার কথা মনে পড়ে, মহাপুরুষ হজরৎ মুহম্মদের নামের সহিত মক্কার কথা মনে জাগে, তেমনি যীশুখৃষ্টের নামের সহিত প্যালেষ্টাইন ও নাজারেথের ও তাঁহার জন্মস্থান বেথ্লেহেমের কথা মনে হয়। আবার নাজারেথ্ নগরে থাকিতেন বলিয়া লোকে তাই তাঁহাকে নাজারেথের যীশু কহে।



শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও

১৯৪৮ বৎসর আগে প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত বেথ্লহেম নগরে যীশু-খৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। যীশুর সেই জন্ম বৎসর হইতেই আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশে বৎসর গণনা হয়। এজন্য আমরা খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বের কোনও সন তারিখের কথা বলিতে হইলে বলি খৃষ্টপূর্ব্ব, ইংরাজীতে B. C. অর্থাৎ কিনা Before Christ আর তাঁহার মৃত্যুর পরের সময়কে আমরা বলি A.D. অর্থাৎ Anno Domini অর্থাৎ তাঁহার জন্মের

বৎসর। অনেকের মতে এই যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের দিন হইতে খৃষ্টাব্দ গণনা করা হয় তাহা ঠিক নহে। যীশুর জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দের আরম্ভ, অনেক পণ্ডিত আজকাল এইরূপ বলেন।

যীশুর জন্মকালে তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কোন উচ্চ ধারণা করে নাই। ঈশ্বর ভক্ত এক দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যীশুর জন্ম সম্বন্ধে কতক গুলি অলৌকিক ঘটনার কথা বাইবেলে আছে। গল্প আছে যে, যীশুর জন্ম হইলে পর পূর্ব্বদেশ অর্থাৎ পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন জ্ঞানী লোক নানা প্রকার উপহার লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন জ্যোতির্ব্বিদ্, কাজেই আকাশের তারা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, বেথ্‌লেহেম গ্রামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্যই তাঁহারা পথক্লেশ সহ্য করিয়া এতদূর আসিয়া ছিলেন।



পিতামাতা যীশুকে লইয়া মিশরে চলিলেন

কথাটা সে দেশের রাজা হেরডের কাণে গেল। তিনি ইহা শুনিয়া শিশু যীশুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন, তখন নিরুপায় পিতামাতা তাহার জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে লইয়া মিশরে চলিয়া গেলেন। রাজা হেরডের মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার পিতামাতা যীশুকে লইয়া আবার প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া আসিলেন এবং নাজারেথ সহরে বাস করিতে লাগিলেন।

প্যালেষ্টাইনের লোকেরা বেশীর ভাগই ছিলেন য়ীহুদী (Jew)। যীশুর বাবা মাও ছিলেন য়ীহুদী। তাঁহার বাবার নাম ছিল যোসেফ আর মাতার নাম ছিল মেরী। সেকালে য়ীহুদীরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ছিল। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মশিক্ষার খুব প্রচলন ছিল। গরীবের ঘরের এই ছোট ছেলেটি অতি শৈশবেই পাঠশালায় যাইয়া লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। য়ীহুদীদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সুন্দর সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিতেন। য়ীহুদীরা ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিতেন, তাহারই ফল স্বরূপ আমরা বাইবেলের প্রথম ভাগ Old Testament বা পুরাতন নিয়ম নামক পুস্তক পাইয়াছি। বালক যীশু, সেই অতি শৈশবেই বাইবেল কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং সারা



যীশুর বাবা ছুতারের কাজ করিতেন

জীবন বাইবেলের শিক্ষা দীক্ষা ও রীতির অনুসরণ করিতেন। বাইবেল ছিল তাঁহার জীবনে অতি প্রিয় গ্রন্থ। যীশুর বাবা যোশেফ ছুতারের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।

যীশুর যখন একটু বয়স হইয়াছে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। বিধবা মা ও ছোট ছোট ভাই বোন্‌দের লালনপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। যীশু তাঁহার পিতার কাছে ছুতারের কাজ শিখিয়াছিলেন, এখন সূত্রধরের কাজ করিয়া



পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নাজারেথ সহরের লোকেরা তাঁহাকে যীশুসূত্রধর (Jesus the Carpenter) বলিয়াই জানিত।

এসময়ে দেশে ভীষণ অশান্তি দেখা দিল। য়ীহুদীরা স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদের রাজাও য়ীহুদীই ছিলেন কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের মত রোমানরা আসিয়া প্যালেষ্টাইন অধিকার করিল—কাজেই য়ীহুদীদের দেশ রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। স্বাধীন য়ীহুদী জাতির কাছে পরাধীনতা ভাল লাগিতেছিল না, তাহারা দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবার কবে তাঁহাদের স্বাধীন দেশে তাঁহাদেরই রাজা সিংহাসন আলো করিয়া বসিবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের চিন্তা। য়ীহুদীরা বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের দেশে এমন এক জন নেতার আবির্ভাব হইবে যিনি এই পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিতে পারিবেন। এইরূপ নেতার আবির্ভাবকে য়ীহুদীরা বলিলেন মেশিয়া Messiah বা প্রেরিত পুরুষ। য়ীহুদীদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে 'মেশিয়া' বলিয়া পরিচয় দিয়া রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

একদিন য়ীহুদীদের দেশে একজন ভবিষ্যৎদর্শী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তিনি য়ীহুদীদিগকে বলিলেন—তোমরা তোমাদের কৃত পাপের জন্য দুর্ভোগ ভুগিতেছ, কিন্তু ভয় নাই, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে প্রেরিত মহাপুরুষ আসিতেছেন, তিনি তোমাদের কাছে স্বর্গরাজ্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন। দলে দলে লোক এই মহাপুরুষের কাছে আসিতে লাগিল। কত পাপী নিজ নিজ জীবন পুণ্যময় ও পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুল হইল কতজনের অনুতাপের অশ্রুধারায় ভূমি সিক্ত হইল। সকলের শেষে আসিলেন যীশু, তিনি সেই মহাপুরুষের উপদেশ শুনিলেন, শুনিতে শুনিতে মনে হইল যেন ঈশ্বর তাঁহাকেই পৃথিবীর বুকে স্বর্গের রাজ্য সৃষ্টি করিবার জন্য ডাকিতেছেন। যীশুর প্রাণে সেই বাণী নূতন জীবনের সৃষ্টি করিল। ঘর বাড়ী ব্যবসা সব পড়িয়া রহিল, সব ত্যাগ করিয়া যীশু পথে বাহির হইলেন। প্যালেষ্টাইনের গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে প্রান্তরে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন ঈশ্বরের মধুময় বাণী। লোককে বুঝাইতে লাগিলেন—শিক্ষা দিতে লাগিলেন ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি?

লোকে যীশুর সুন্দর আকৃতি, মধুর প্রকৃতি এবং সুমিষ্ট উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল, তাঁহার সদয় ব্যবহারে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। যীশু ভাবে গদগদ চিত্তে সকলকে বলিতে লাগিলেন—আমরা ঈশ্বরের সন্তান, শোন তোমরা সকলে—ঈশ্বরই আমাদের পিতা। আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ, তিনি সকলকেই সমানভাবে ভালবাসেন। ছোট বড় বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। জগতের নরনারী সকলে আমরা ভাই বোন। আচার অনুষ্ঠান, ব্রত-পার্ব্বণ এসব কিছু নয়, দেহ পবিত্র এবং মন নির্ম্মল হইলেই ঈশ্বরের ভালবাসা পাওয়া যায়।



যীশু ছোট ছোট শিশুদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন

কতজনের রোগ আরোগ্য করিয়া, কতজনের হৃদয় ও মন পবিত্র করিয়া এবং কত পাপীকে যে তিনি মুক্তির পথে টানিয়া আনিয়া জগতের উপকার করিতে লাগিলেন তাহার সংখ্যা নাই। যীশু যখন যে পথে চলিতেন, দলে দলে লোক তাঁহার অনুসরণ করিত। ছোট ছোট শিশুদিগকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে আদর করিতেন আর তাহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দল বাঁধিয়া পথে চলিত।

সকলের মন সমান নয়। একদল লোক যেমন তাঁহাকে ভালবাসিত, তেমনি আর এক দল হইল তাঁহার বিদ্রোহী। কোথায়? যীশু ত মেশিয়া নহেন। রোমকদের যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিবার কোথায় তাঁহার রণ-সজ্জা? এই বিদ্রোহীদলের লোকদিগকে যীশু বলিলেন—ঈশ্বরের রাজ্য,

রণ-কোলাহল ও বিদ্রোহের রাজ্য নয়। অর্থ ও সাম্রাজ্য লইয়া যে দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে তাহার ঠাঁই নাই। তাঁহার রাজ্য মানুষের মনোভূমিতে—সে রাজ্য স্নেহের ও প্রেমের—সে ভালবাসার শান্তিময় সাম্রাজ্য। মানুষমাত্রই যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, ভক্তি করে, সে ঈশ্বরের শান্তিময় রাজ্যে স্থান পায়। বিশ্বপ্রেমিক যীশুর কাছে তাঁহার দেশের লোকেরাও যেমন ব্যবহার পাইত, বিদেশী রোমীয় সৈন্যেরাও তেমনি মিষ্ট ব্যবহার পাইত। য়ীহুদীদের দলপতি আসিয়া যখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কি রোম সম্রাট্‌কে রাজস্ব দিব?



অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ

যীশু হাসিয়া বলিলেন—সীজারের (রোম সম্রাট্) প্রাপ্য তাঁহাকে দেও, আর যাহা ঈশ্বরের প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দেও। একথা শুনিয়া দলপতি রাগিয়া আগুন হইল—কেমন করিয়া যীশুর প্রাণনাশ করিতে পারিবে, একমনে সে তাঁহারই চিন্তা করিয়া উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে দেশের যাঁহারা ধর্ম্মের নেতা, তাঁহারাও যীশুর প্রতি চটিয়া গেলেন। এ লোকটা যে ধর্ম্ম-দ্রোহী নীচ ও পতিত জাতির লোকের সঙ্গে এক-সাথে বসিয়া খায়! যীশু এই সকল ধর্ম্মান্ধ নেতা দিগকে বলিতেন—ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের কল্যাণ চাহেন, মানুষের গড়া ধর্ম্মের প্রচলিত রীতিনীতি তাঁহার কাছে কিছুই নয়! ঈশ্বর তাঁহাকে পাপীদের ত্রাণকর্ত্তারূপে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

আর একদল যীশুর অলৌকিক প্রভাবের জন্য তাঁহার উপর ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। যীশুর



কুষ্ঠ রোগীর রোগ আরোগ্য

সুকোমল করস্পর্শে রোগী রোগমুক্ত হয়, বিধবার মৃতপুত্র জীবন লাভ করে, সমুদ্রের ঝড় থামিয়া যায়, পাঁচখানা রুটিতে পাঁচ হাজার লোক খায়, মৃত ব্যক্তি কবর হইতে উঠিয়া আসে,—এই মহামানবের কাছে সাধারণ পুরোহিতের প্রভাব যে আর কিছুতেই টিকে না। দলে দলে লোক তাঁহারই

অনুসরণ করিতেছে। জনগণ যে আর তাঁহাদিগকে মানিবে না, তাঁহাদের প্রতিপত্তি যে লোপ পায়!

এই শ্রেণীর লোকেরা সকলে মিলিয়া যীশুর প্রাণনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ভীক যীশু—ঈশ্বরভক্ত যীশু, এ সকল জানিয়াও শুনিতেন না—দেখিয়াও দেখিতেন না। তিনি আপনার মনে তাঁহার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি যে সকল গল্প বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন, যে সব অলৌকিক কাজ করিতেন, তাহার বিস্তৃত পরিচয় তোমরা বাইবেল পড়িলে জানিতে পারিবে।



শেষ ভোজ

একদিন রাত্রিকালে তাঁহার এক প্রধান শিষ্য জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতায় যীশু শত্রুদের হাতে ধরা পড়িলেন। একস্থানে প্রথম ভোজের পর যীশু প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় জুডাস্ অস্ত্র শস্ত্র-সমেত একদল লোক লইয়া আসিয়া যীশুকে ধরাইয়া দিল। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, মাত্র ত্রিশটি টাকা পাইয়া সে এমন বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করিয়াছিল। শত্রুদল তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া য়ীহুদীদের ধর্ম্মসম্পর্কিত বিচরালয়ে উপস্থিত করিল। বিচারে যীশুর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। পরের দিন ভোরের বেলা তাহারা যীশুকে রোমীয় শাসনকর্ত্তা পিলেটের নিকট উপস্থিত করিল। রোমের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার আদেশ-ব্যতীত যীশুর শত্রুপক্ষীয় পুরোহিতদের কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিবার অধিকার ছিল না। রোমের শাসনকর্ত্তা যীশুকে জানিতেন। জানিতেন যীশু ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। এমন ধার্ম্মিক মহাপুরুষকে কেমন করিয়া সাজা দিবেন। সে কি বিচার হইবে? কিন্তু উত্তেজিত বিদ্রোহীদল বলিল, তুমি যদি এই ধর্ম্মদ্রোহীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না কর, তাহা হইলে আমরা সম্রাট্ সিজারের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। কাজেই প্রসন্ন মনে —নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোমীয়-শাসনকর্ত্তা পিলেট্ যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মান্ধ হত-ভাগাগণ মহাপ্রাণ যীশুর প্রতি এ সময়ে যে



মৃত ব্যক্তির জীবন দান

অত্যাচার করিল সে-কথা স্মরণ করিলে চোখে জল আসে। তাহারা তাঁহার মাথায় পরাইল কাঁটার মুকুট, গায়ে পরাইয়া দিল কয়েদীর পোষাক আর চাবুক মারিতে মারিতে তাহার সারাদেহ রক্তে রাঙ্গা করিয়া দিল আর বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল —এই যে য়ীহুদীদের রাজা যাইতেছেন।

নিষ্ঠুর ধর্ম্মান্ধগণ এই ভাবে তাঁহাকে এক পাহাড়ের উপর লইয়া গেল এবং সেখানে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। মহাত্মা যীশু নিদারুণ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়াও মৃত্যুকালে ঐ সব হতভাগাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর, ইহারা জানে না কি অপরাধ করিল! প্রভু! তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিও। বল দেখি, এমন মহত্ত্ব কয়জন দেখাইতে পারে?

যীশুর প্রিয় ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার প্রতি এই অন্যায় অবিচারে একান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমীয় শাসনকর্ত্তার নিকট তাঁহার মৃতদেহ

সমাধি দেওয়ার জন্য অনুমতি চাহিল। শাসনকর্তা অনুমতি দিলে তাঁহার প্রিয় সঙ্গিগণ সেই পবিত্রদেহ এক উত্থানমধ্যে সমাধিস্থ করিয়া, কবরের মুখে পাথর চাপা দিল। তারপর তাহারা সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল। পুরোহিতদের কথায় পিলেট সেখানে পাহারা বসাইয়াছিলেন।

তিন দিন পরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। সেদিন প্রভাতে যীশু কবর হইতে পুনরুত্থান করিলেন। তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল।



ক্রুশবিদ্ধ যীশু

সন্ধ্যার সময় যীশুর প্রধান ভক্তগণ ও শিষ্যগণ জেরুজেলেমের একটি গৃহে বসিয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধ য়ীহুদীদের ভয়ে তাঁহারা সকলে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এমন সময় দিব্য জ্যোতিঃতে চারিদিক আলোকিত করিয়া দেহধারী যীশু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —তোমাদের শান্তি হউক, ভয় করিও না, আমি আবার ফিরিয়া আসিয়াছি।

ভক্তবৃন্দ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন—আমার পিতা, আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে যে বাণী দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতে আসিয়াছি। শিষ্যেরা নির্ভয়ে যীশুর সে সমুদয় উপদেশ শুনিয়া পরে তাহাদের স্মৃতি হইতে তাহা লিখিয়া লইয়াছিল।

যীশুর এই আবির্ভাবকে খৃষ্টানরা পুনরুত্থান বলেন। তারপর দলে দলে লোক দেশে দেশে যীশুর সেই পুণ্য বাণী প্রচার করিতে লাগিল।



পুনরুত্থান

অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও মৃত্যুকে তাহাদের পলে পলে বরণ করিতে হইয়াছিল, তবু তাহারা সত্যপথ হইতে বিচলিত হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে এমন শত শত ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত রহিয়া গিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে এতটুকু বিচলিত হয় নাই। এইরূপ অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া দেশে দেশে এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। যীশু পৃথিবীতে এক নবযুগ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক খৃষ্টান একথা বিশ্বাস করেন। যীশু প্রত্যেকটি কার্য্যে, প্রত্যেকটি আচরণে তাঁহাদের অন্তরে থাকিয়া সৎপথে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।



মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র তেত্রিশ বৎসর। যীশু গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেন। আমরা এখানে তাঁহার কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মহাত্মা যীশুর বাণী

শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও, বারণ করিও না, কেন না, ঈশ্বরের রাজ্য শিশুদের কাছেই আছে। যে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় সরল ও কোমল না হয়, সে কোনরূপেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

* * *

চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রবঞ্চনা করার চেয়ে বড় পাপ আর নাই।

পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।

* * *

প্রাণ না দিলে প্রেম মিলে না। তোমার সমস্ত মন, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিবে।

তোমার প্রতিবেশীকে আপনার নিজের মত ভালবাসিতে শিক্ষা কর।

* * *

শোকের ভিতরেই সান্ত্বনা আছে।

* * *

যাহাদের প্রাণে ধর্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা আছে, তাহারা নিশ্চই ধর্মলাভে পরিতৃপ্ত হইবে।

* * *

যে ব্যক্তি দানশীল, দয়া তাহার গৃহেই বাস করে।

* * *

দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না, বরং কেহ যদি তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, তাহাকে বাম গাল ফিরাইয়া দিও।

* * *

মিথ্যা দিব্য করিও না। এক গাছি চুল সাদা কি কাল করিয়া দিবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে মিথ্যা দিব্য করিতে যায় কোন্ সাহসে?

* * *

প্রার্থী জনের প্রার্থনা পূর্ণ করিও। যে তোমার নিকট বিপদে পড়িয়া ধার চায়, তাহা হইতে তাহাকে বিমুখ করিও না।

তোমরা শত্রু, মিত্র সকলকেই ভালবাসিবে। মনে রাখিও, তোমরা স্বর্গস্থ পিতার সন্তান; তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরেও আপনার সূর্য্যকে কিরণ দিতে বাধা দেন না, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলের উপরই তাঁহার মেঘ, শীতল ধারা ঢালিয়া দেয়।

লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিও না। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তুরী বাজাইও না। তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। যিনি গোপনে দেখেন, তিনি এইরূপ দানেরই ফল দেন

লোকের অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাদের অপরাধও ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন।

* * *

চক্ষু শরীরের প্রদীপ। তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকার হইবে।

* * *

দুই জনের দাসত্ব করাও যায় না, দুইজনকে ভালবাসাও যায় না। কেননা, সে হয়ত এক জনকে ভালবাসিবে এবং এক জনকে দ্বেষ করিবে, নয়ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে।

* * *

তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।

* * *

বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না। কেননা, কল্য আপনার কথা আপনি ভাবিবে।

* * *

প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও,— আত্মার কল্যাণ হইবে।



ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ, আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের মাতৃস্বরূপিণী। এই দেশে আমাদের পিতৃপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সব বড় বড় কাজ এই দেশে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে আমাদের এই বিরাট্ ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য বিজ্ঞান এ সমস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে গৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরাও সেই গৌরবের অংশীদার।



সেকালের জাহাজ

খালি ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহারা যাইতেন এবং ভারতের বাহিরের নানা দেশেও তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ আমরা এখনও দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এই সকল দেশে যাইতেন। তাহার পরে, এদেশের ঋষিরা, এদেশের যোগীরা এদেশের ব্রাহ্মণ ও আচার্য্যেরা, এদেশের বুদ্ধদেব, মানুষের কল্যাণের জন্য যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সব উপদেশও ইঁহারা ভারতের বাহিরের নানা দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাহিরের দেশের লোকেরা তাঁহাদের কথা শুনিল। তাহারা আদরের সঙ্গে আমাদের ঋষিদের ও ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম ও উপদেশ এবং বুদ্ধদেবের উপদেশ গ্রহণ করিল। আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরাণকথা ও কাহিনী, আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, আমাদের মন্দির-গঠন-প্রণালী, আমাদের শিল্প, আমাদের সঙ্গীত ও নৃত্য, এ সমস্তও গ্রহণ করিল; এবং এগুলিকে নিজেদের দেশের ও রুচির অনুরূপ করিয়া একটু-আধটু অদল-বদল

ভারতবর্ষের বাহিরে নানাদেশে এইরূপে যে সকল নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমরা সেগুলিকে এক সঙ্গে "বৃহত্তর ভারত" বলি।

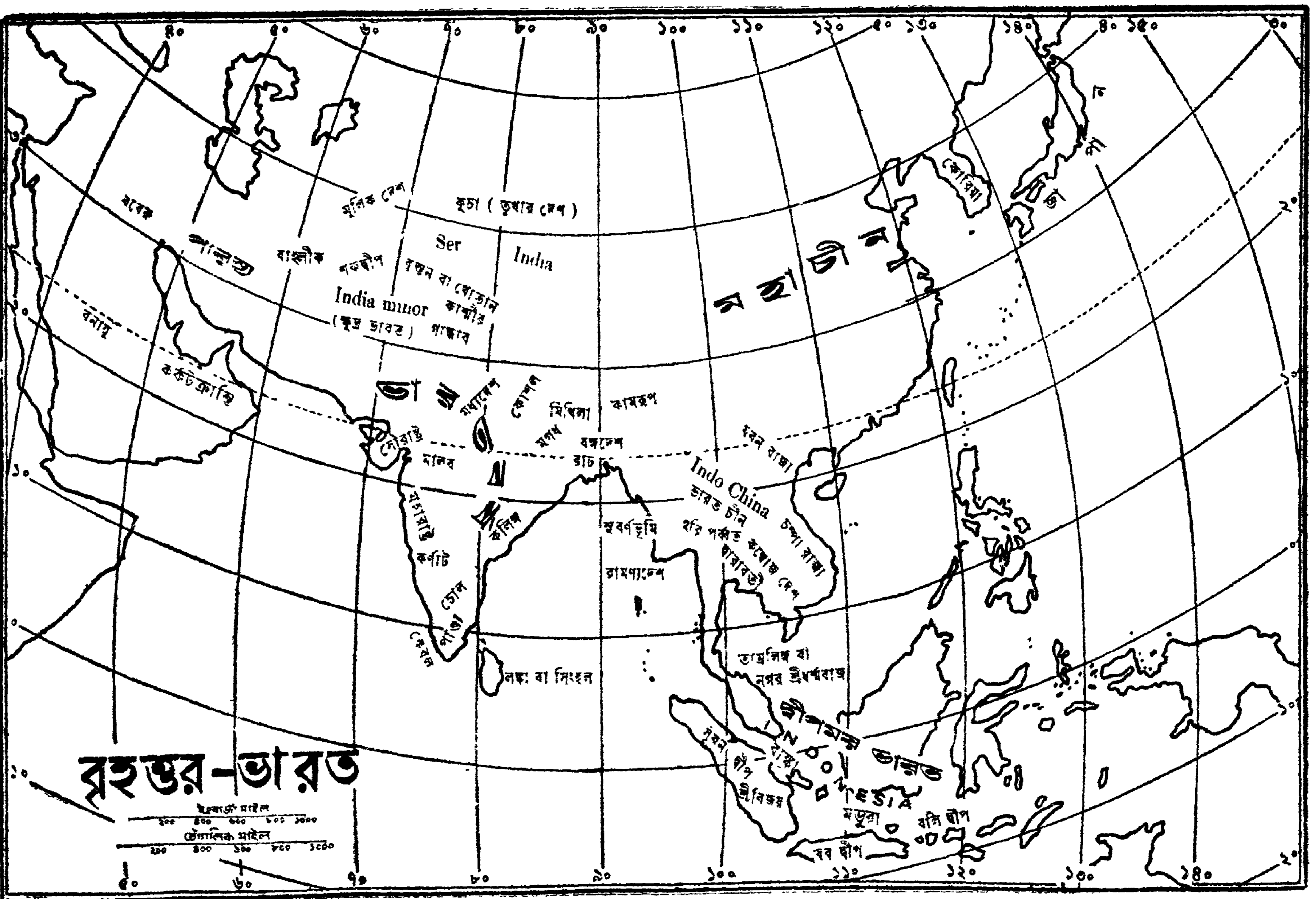
দুই হাজার বছরের আগে থেকেই এই "বৃহত্তর ভারত"—গড়িতে আরম্ভ করে। কোন্ কোন্ দেশে এই "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিয়াছিল, পর পৃষ্ঠার মানচিত্রখানি দেখিলে বুঝা যাইবে।

করিয়া, নিজেদেরও অনেক জিনিষ মিশাইয়া একবারে নিজস্ব করিয়া লইল। এইরূপে আমাদের দেশের লোকদের সঙ্গে মিলিয়া, ভারতবর্ষের বাহিরের বহু দেশ নিজ নিজ জাতীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিল, অথবা ভারতের সভ্যতা, ধর্ম্ম-রীতি-নীতি দ্বারা নিজেদের পূর্ব্বেকার সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। এই সকল দেশের কতকগুলি আবার ভারতবর্ষের সভ্যতা, ধর্ম্ম, পুরাণ-কথা, শিল্প প্রভৃতিকে এতটা আপনার করিয়া লইল যে, নিজেদের দেশকে ভারতবর্ষের যেন একটা অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ করিয়া ফেলিল।



বরবুদরে প্রাপ্ত সাতটি বিভিন্ন বুদ্ধমূর্ত্তি

আমাদের দেশের চারিদিকে পর্ব্বতমালা ও সমুদ্র আছে। দেখিয়া মনে হয়, ভগবান বুঝি আমাদের দেশকে অন্য দেশ হইতে আলাদা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আগে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, বুঝি ভারতবর্ষের লোকেরা দেশ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতই না। ভারতবর্ষে আগে অন্নবস্ত্রের অভাব তেমন ছিল না, লোকে বাহিরে যাইবে কেন? মাঝে মাঝে বাহির হইতে শক্তিশালী বিদেশী জাতি জয়ের জন্য বা লুঠের জন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত এবং তাহারা আসিয়া এদেশের কোন কোন অংশে রাজা হইয়া বসিত। ভারতবাসীরা তাহাদের ততটা গ্রাহ্য করিত না। তার পরে তাহারাও ক্রমে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া ভারতবাসীই হইয়া যাইত। এই সব বিদেশী জাতি বাহির হইতে নূতন নূতন মনোভাব ও চিন্তাপ্রণালী এবং নানা নূতন



বৃহত্তর-ভারত
ইংরাজী মাইল
ভৌগোলিক মাইল
মুরিক দেশ
কুচা (তুখার দেশ)
Ser
India
বাহ্লীক
শকদ্বীপ
কুস্তন বা খোতান
India minor
(ক্ষুদ্র ভারত)
কাশ্মীর
গান্ধার
বনায়ু
কর্কট ক্রান্তি
ভারত
মধ্যদেশ
কোশল
মিথিলা
কামরূপ
সৌরাষ্ট্র
মালব
মগধ
বঙ্গদেশ
রাঢ়
মহারাষ্ট্র
কলিঙ্গ
কর্ণাট
চোল
পাণ্ড্য
কেরল
লঙ্কা বা সিংহল
সুবর্ণভূমি
রামণ্যদেশ
মহাচীন
কোরিয়া
যবন রাজ্য
Indo China
ভারত চীন
চম্পা রাজ্য
হরি পর্ব্বত
কম্বোজ দেশ
দ্বারাবতী
তাম্রলিঙ্গ বা
নগর শ্রীধর্ম্মরাজ
দ্বীপময় ভারত
INDONESIA
সুবর্ণ দ্বীপ
শ্রীবিজয়
মদুরা
বলি দ্বীপ
যব দ্বীপ

জিনিষ, নানা নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানও ভারতবর্ষে আনিত এবং ভারতবাসীদের দিত ও শিখাইত। ভারতবাসীরা এই ভাবে নূতন ভাব ও কথা এবং নূতন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিত। বিদেশী জাতির লোকেরা আবার ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি কিছু কিছু নিজেরা শিখিয়া লইয়া নিজেদের দেশেও তাহার প্রচার করিত। এই ভাবেই যা অল্পস্বল্প ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের দেওয়া-নেওয়া ঘটিত।



বৌদ্ধ দেবীমূর্ত্তি—তারা



অবলোকিতেশ্বর—যবদ্বীপ

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ভারতের বাহিরের নানা দেশের যোগের সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা যে সব খবর পাইতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের সম্বন্ধে যে ধারণা বা মতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে, তাহা একেবারে ভুল। ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর ভারত"-এর দেশগুলি, সেই সব দেশের ইতিহাস, প্রাচীন কীর্ত্তি, আধুনিক সভ্যতা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি—এ সমস্ত হইতেই আমরা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাচীনকালে ভারত তাহার জ্ঞান ও শিল্প, তাহার আধ্যাত্মিক দর্শন, ধর্ম্ম ও পার্থিব সভ্যতা এই দুইটি জিনিষ লইয়া নিজের ভৌগোলিক গণ্ডীর বাহিরে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারতের লোকেরা বেশ সচেতনভাবে এবং একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের সহিত নিজেদের আদর্শকে লইয়া বাহিরের দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত হইয়াইছিল।

এশিয়া মহাদেশের প্রধানতঃ তিনটি স্থানে "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিয়াছিল—সেই তিনটি স্থানের নামকরণ হইয়াছে [১] Indonesia 'ইন্দোনেসিয়া' বা Insul-india 'ইন্সুলিন্দিয়া' অর্থাৎ 'দ্বীপময় ভারত,' [২] Indo-China 'ইন্দোচীন'

অথবা 'ভারত চীন' এবং [৩] Serindia 'সেরিন্দিয়া' অথবা 'চীন ভারত'। এতদ্ভিন্ন India Minor বা আধুনিক আফগানিস্থান ও তিব্বতকেও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ধরিতে হয় এবং সিংহলদ্বীপকে বৃহত্তর ভারতের অংশ অপেক্ষা মূল ভারতবর্ষেরই প্রদেশ বলিয়া ধরা উচিত।

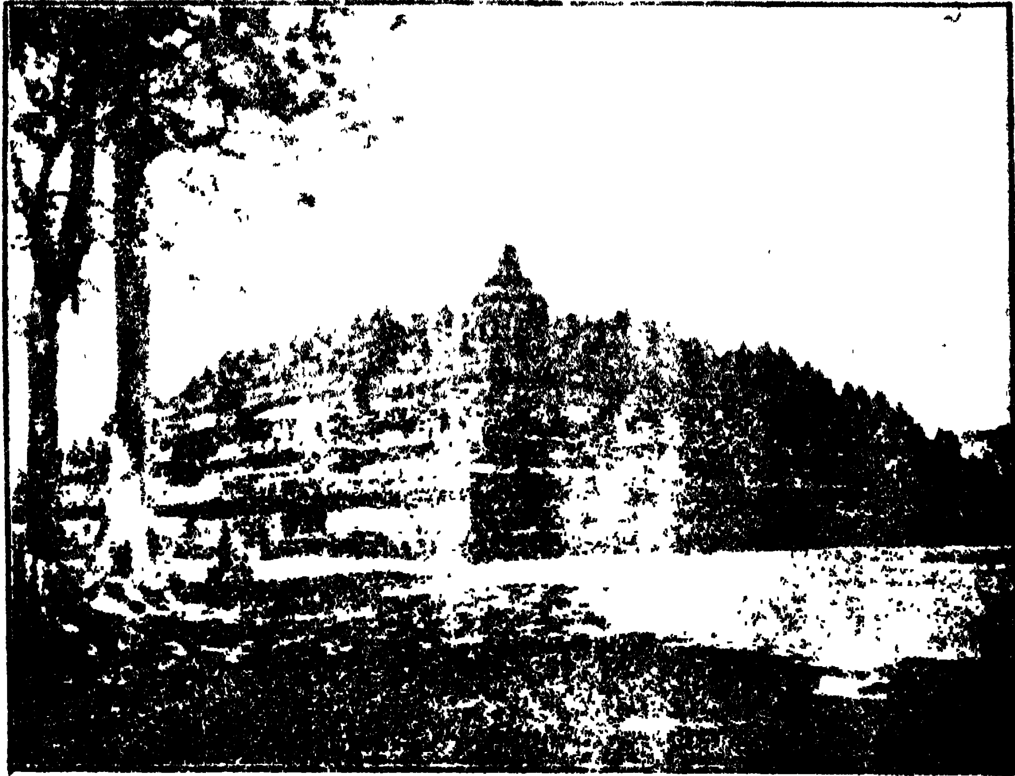
চীন, কোরিয়া ও জাপানকে এবং কতকটা টংকিং ও আনামকে বৃহত্তর ভারতের অংশ বলা যায় না। কারণ এই দেশগুলি বিশেষতঃ চীন, অতি প্রাচীন কাল হইতেই সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত—পার্থিব সভ্যতায় চীন ভারতের সমকক্ষ; ভগিনী স্থানীয়; কিন্তু বৃহত্তর ভারতের দেশগুলিকে ভারতবর্ষের কন্যাস্থানীয় বলিতে পারা যায়। কোরিয়া, জাপান এবং টংকিং ও আনাম চীনেরই মানস-কন্যা।

'ইন্দোনেসিয়া' অথবা 'ইনসুলিন্দিয়া', 'ইন্দোচীন' ও 'সেরিন্দিয়া'—এই তিনটি নামের মধ্যে প্রথমটি ও তৃতীয়টি আজকালকার এশিয়া মহাদেশের কোনও মানচিত্রে মিলিবে না, কেবল ইন্দোচীন মিলিবে এই নামগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতেদের দেওয়া। এই তিন স্থানের সভ্যতায় ও প্রাচীন অথবা আধুনিক অধিবাসীদের জীবনে ভারতবর্ষের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ভারতের নাম India বা এই নামের সংক্ষিপ্তরূপ Indo এই সকল স্থানের নামে রাখিয়া তাহাদের নূতন নামকরণ করা হইয়াছে। 'ইন্দোনেসিয়া' শব্দটি ভারত অর্থে Indo ও গ্রীক nesos শব্দ যাহার অর্থ 'দ্বীপ', এই দুইটি শব্দ মিলাইয়া তৈয়ারী; 'ইনসুলিন্দিয়া' তদ্রূপ দ্বীপ-অর্থে লাটিন Insula শব্দের সঙ্গে India যোগ করিয়া সৃষ্ট। মালয় উপদ্বীপ এবং ভারত-মহাসাগরের ঈশান-কোণে বা উত্তর-পূর্ব্ব-ভাগে, এশিয়া মহাদেশের অগ্নি-কোণে বা দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে.



আঙ্কোরভট্‌- মন্দিরের গায়ে খোদিত রাজকুমারীগণের মূর্ত্তি

সেগুলিকে লইয়া এই 'ইন্দোনেসিয়া' বা 'দ্বীপময়-ভারত'। এই সমস্ত দ্বীপের মধ্যে মাত্র মালয় উপদ্বীপ ইংরেজদের অধীনে আর দ্বীপগুলির প্রায় সবগুলিই ওলন্দাজের অধীনে। যথা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, সুম্বাওয়া, ফ্লোরেস, তিমোর প্রভৃতি দ্বীপ। এগুলি যেন শিকলের মত পর-পর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে। Dutch East Indies বা ডচের অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দেশসমূহ; Netherlands India বা নেদারল্যাণ্ডের অধিকৃত ভারতখণ্ড। ডচ বা ওলন্দাজদের ভাষায় দেশের নাম Nederlandsche Indie বা 'ডচ ভারত'। এই সমস্ত দ্বীপে ও মালয়-উপদ্বীপে একটি জাতির নানা শাখার লোক বাস করে; এই জাতিটির নাম



বরবুদুরের [illegible]

ইহাদের উত্তরে মলক্কাস দ্বীপপুঞ্জ, সেলেবেস ও বোর্ণিও (বোর্ণিওর একটুখানি ইংরেজদের অধীনে) এবং এই তিন দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জ। এইটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। মানচিত্রে আজকাল এই দ্বীপপুঞ্জের নানা ইংরেজী নাম দেখা যায়—The East Indies অর্থাৎ 'পূর্ব-ভারতীয় দেশসমূহ' Indian Archipelago অর্থাৎ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। হইতেছে Malay মালয় জাতি। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমগ্র দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসী তাঁহারা এক জাতিরই লোক, দেশেরও একটি জাতীয় নাম হওয়া উচিত, তাই তাঁহারা আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দেওয়া এই Indonesia নামটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সগর্ব্বে নিজেদের Indonesian বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় ... অর্থাৎ সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার ... এখন সাড়ে পাঁচ কোটির বেশী ... ইহাদের মধ্যে এখন বেশীর ভাগ ... কোটি হইবে মুসলমান ধর্ম্ম ... বাকী লোকেদের মধ্যে ... দশ লাখ আন্দাজ এখন ... এছাড়া কিছু লোক এখনও ...

... এই দুইটি দ্বীপ সব চাইতে বড়। ... এই দুইটি দ্বীপে লোকসংখ্যা খুবই ..., দ্বীপ দুইটির বেশীর ভাগ জঙ্গলে ঢাকা। ...দ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক—এই গুলিতেই





যবদ্বীপের বিষ্ণু

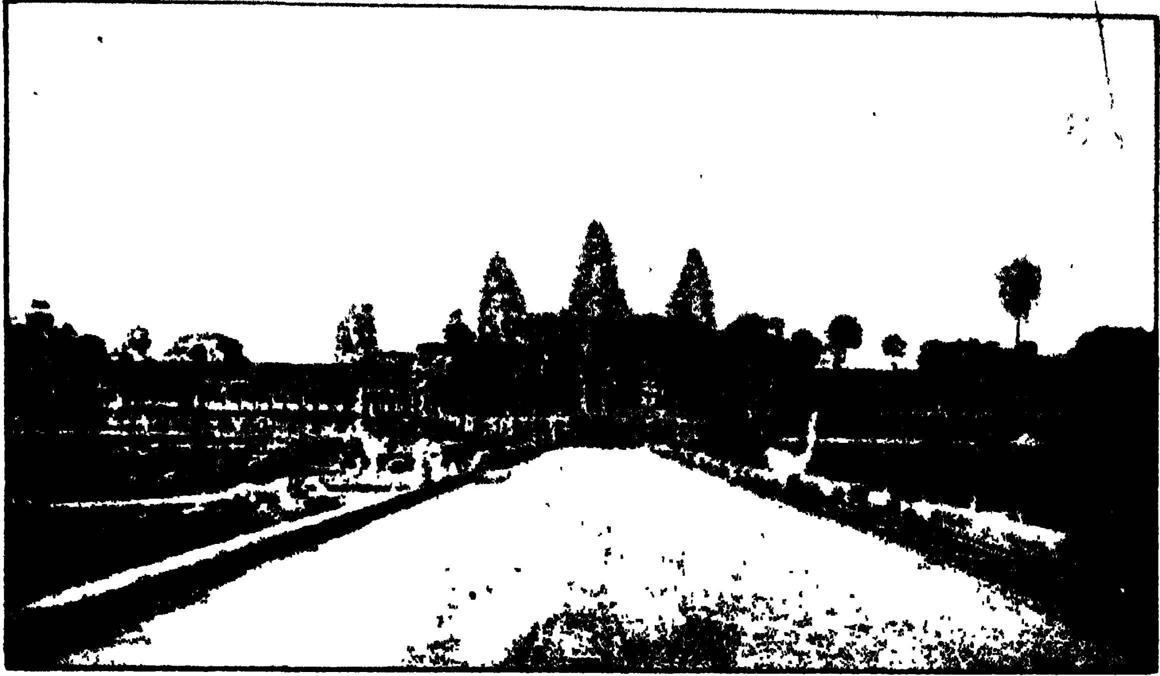


বরবুদুরের প্রবেশ...

ধর্ম্ম লইয়া আছে, কিছু ... খৃষ্টানদের সংখ্যা ফিলিপিন ... সেলেবেসেই বেশী। বাহিরের জাতি ... কিছু কিছু বাস করিতেছে, ... চীনারা সংখ্যায় খুব বেশী, তারপরে ... ভারতবাসী আছে (তামিল, শিখ, হিন্দু ... গুজরাটী, পাঠান, দুই চারিজন বাঙ্গালা)। ... কিছু আরবও বাস করিতেছে। বোর্ণিও ও ...

...লোকের বসতি খুব অধিক। প্রাচীনকালে সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপ এই তিনটি স্থানই ছিল হিন্দু-সভ্যতার কেন্দ্র। এ সম্বন্ধে

পরে আলোচনা করিব। এক যবদ্বীপেই চার-কোটী লোকের বাস। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের ভারতীয় হিন্দুদের মত হিন্দু ছিল। প্রায় চারিশত বৎসর হইতে একটু একটু করিয়া ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহারা নামে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, নিজেদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও মনোভাব ত্যাগ করে নাই; এখনও তাহারা তাহাদের হিন্দু পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তির কথা লইয়া থাকে। ফরাসীদের অধিকৃত ইন্দোচীনে এই কয়টি দেশ আছে—টংকিং, আনাম, কোচিন-চীন, কাম্বোডিয়া বা কম্বোজ এবং লাওস্। এই দেশ কয়টির মধ্যে টংকিং ও আনামের লোকেরা একটু পৃথক্—ইহারা চীনেরই অংশ, যেন ইহাদের লইয়া একটি 'বৃহত্তর চীন' ইহাদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ততটা কার্য্যকর হয় নাই, যেটুকু হইয়াছে সেটুকু চীন হইয়া ঘুরিয়া। কোচিন-চীনের প্রাচীন নাম ছিল চম্পা; এই চম্পা রাজ্য



অঙ্কোরভট্-এর সাধারণ দৃশ্য—কম্বোজ

গর্ব্ব করে, সারারাত্রি রামায়ণ মহাভারতের নাটক ও পুতুলনাচ করে এবং সংস্কৃত ভাষার নাম ব্যবহার করে। আগে দেশের লোকেরা ও রাজারা আমাদের মতন হিন্দু নাম লইত, রাজারা সংস্কৃত ভাষায় অনুশাসন প্রচার করিতেন।

'ইন্দোচীন' শব্দ দ্বারা আজকাল মুখ্যতঃ ফরাসীদের অধীন French Indo China-কেই বুঝায়, কিন্তু ব্যাপকভাবে এই নাম দ্বারা অধিকন্তু বর্ম্মা ও শ্যামকে বুঝাইয়া ও কম্বোজ রাজ্য বৃহত্তর ভারতের দুইটি বিশিষ্ট অংশ। শ্যাম ও বর্ম্মা—এই দুই দেশে ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতাই প্রবল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম।

বর্ম্মা, শ্যাম ও কম্বোজের লোকেরা এখনও ধর্ম্মে বৌদ্ধ, এবং তাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা, পালির ও কিছু কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা এখনও সে দেশে আছে। বর্ম্মা ইংরেজদের অধীন ও আমাদের





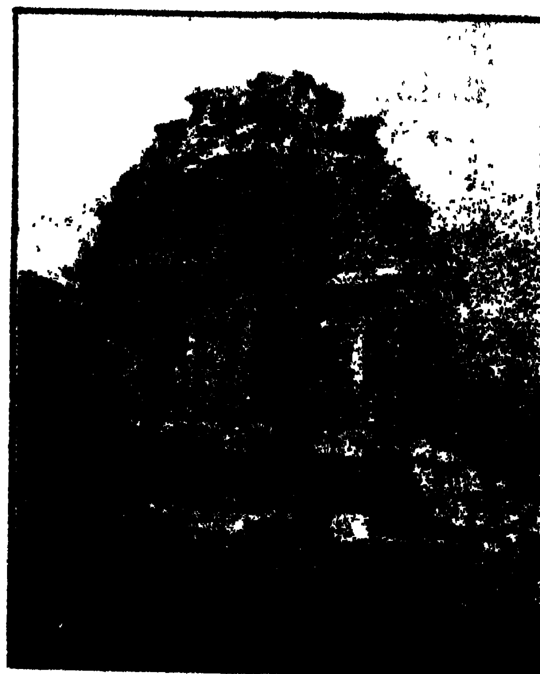
গরুড়োপরি বিষ্ণুদেবতা—যবদ্বীপ



যবদ্বীপের একটি প্রাচীন মন্দিরের তোরণ-পথ



বরবুদুরের একটি তোরণের গায়ে খোদিত মকরমূর্তি



চণ্ডী অর্জ্জুন—মধ্য যবদ্বীপের একটি প্রাচীন মন্দির

ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত। একমাত্র শ্যামদেশ স্বাধীন দেশ। এই দেশের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে, দেশের বহু স্থানের নাম, মানুষের নাম সর্ব্বত্রই সংস্কৃতের ছড়াছড়ি। তবে ইহাদের উচ্চারণে সংস্কৃত শব্দগুলি অন্য ধরণের শুনায়। শ্যামের রাজার নাম 'প্রজাধিপক, সপ্তম রাম,' রাজবংশের নাম 'মহা-চক্রী' বংশ; ইহার পূর্ব্বে এই রাজার দাদা ছিলেন রাজা; তাঁহার নাম ছিল 'বজ্রায়ুধ, ষষ্ঠ রাম; তাঁহার পূর্ব্বে ছিলেন রাজা—ইঁহাদের পিতা, 'চূড়ালঙ্করণ' পঞ্চম রাম।' রাজ্যের নগরের নাম—'অযোধ্যা' (উচ্চারণে 'আইউথিয়া' নগর। সুধর্ম্মরাজ (উচ্চারণে 'নাখন্ সুথরম্মরাৎ'), 'রাজপুরী' (রাৎবুরী) 'বজ্রপুরী' ('পেচাবুরী'), 'স্বর্গ লোক' ('সাওয়াঙ্খ লোক'), 'অরণ্য প্রদেশ' ('আরান্ পাথেৎ') ইত্যাদি। শ্যামের ভাষায় টেলিফোনকে বলে 'দূর-শব্দ' (উচ্চারণে 'থোরো সাপ', কিন্তু বানানে লেখে ঠিক), উড়ো জাহাজকে বলে 'আকায়-যান' (উচ্চারণে 'আগাৎ ছান্')। বর্ম্মা ও কম্বোজের ভাষায়ও তদ্রূপ সংস্কৃত শব্দ অনেক আছে। কম্বোজের লোকেদের বলে Khmer খ্মের; দক্ষিণ বর্ম্মায় Mon মোন বা Talaing তালৈঙ্ বলিয়া একটি জাতি আছে, ইহারা ও খ্মেরেরা নিকটসম্বন্ধযুক্ত। এই



ব্রহ্মামূর্ত্তি—যবদ্বীপ



ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র, পশ্চাতে লক্ষ্মণ—প্রম্বানান





লঙ্কাদহন—প্রম্বানান্

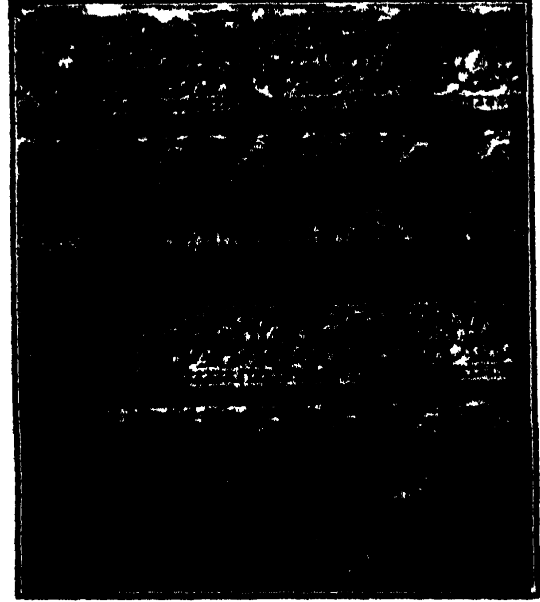
ক্মের এবং মোন-জাতির লোকেরা, এবং চম্পার চাম্-জাতীয় লোকেরা প্রথমে হিন্দু-সভ্যতা গ্রহণ করে এবং তাহাদের হাত দিয়া বর্ম্মার বর্ম্মীরা ও শ্যামের শ্যাম-জাতি এই সভ্যতা পায়। যবদ্বীপের বলিদ্বীপের মতন



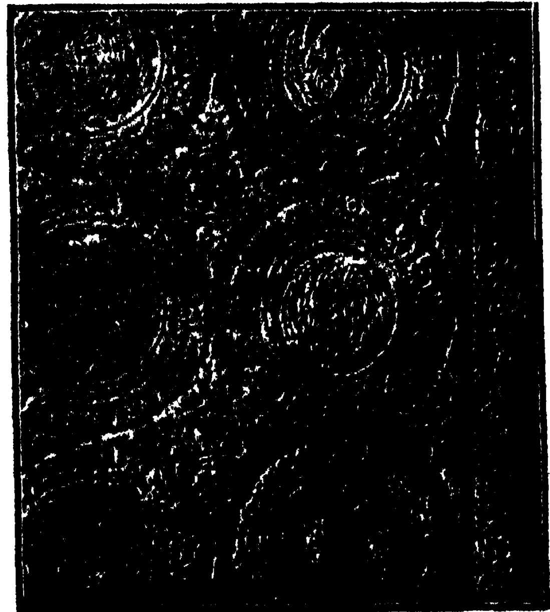
চণ্ডীপ্রাওসানের বোধিসত্ত্ব মূর্তি

এ দেশেও আমাদের রামায়ণ মহাভারতের ও পুরাণের প্রচলন খুব বেশী, বিশেষ করিয়া রামায়ণের।

ইন্দোনেসিয়া ও ইন্দোচীন—এই দুই স্থানে ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী করিয়া হইয়াছিল, —এই দুই স্থানের লোকেদের উপর প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনও দেশের প্রভাব পড়ে নাই বলিলেই চলে। শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ—প্রাচীন-কালে এগুলি যেন মহারাষ্ট্র, বঙ্গদেশ, দ্রাবিড়



মন্দিরের স্তম্ভগাত্রের কারুকার্য্য



অঙ্কোরভট্ মন্দির-গাত্রের কারুকার্য্য

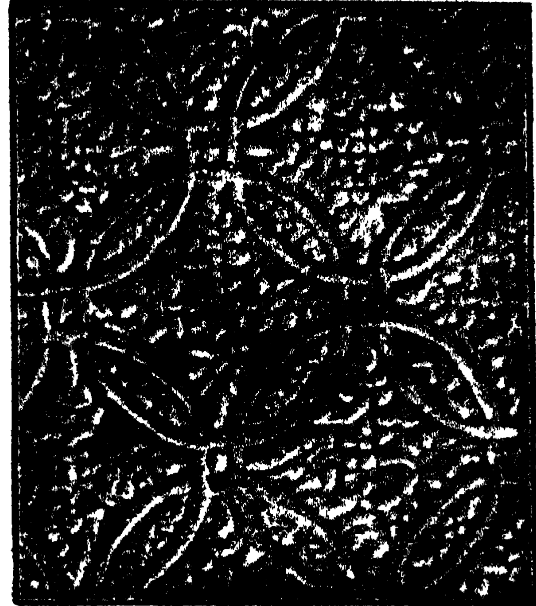
দেশ প্রভৃতির মত ভারতবর্ষেরই অংশ স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু 'সেরিন্দিয়া'য় ভারতীয় প্রভাব ছাড়া, চীন, পারস্য ও গ্রীসের প্রভাবও খুব পড়িয়াছিল। Serindia নামটি আধুনিক এশিয়ার মানচিত্রে নাই। দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে করিয়া যে দেশকে আমরা এখন সেরিন্দিয়া বলিতেছি, সেই দেশ এখন মুখ্যতঃ রুষ-তুর্কীস্থান ও চীনা তুর্কীস্থান এই দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। Serindia নামটি গ্রীক Seres ও India এই দুইটি



অঙ্কোরভট্ মন্দিরের কারুকার্য্য

শব্দ মিলাইয়া গঠিত। Seres গ্রীক ভাষায় চীনা জাতির নাম। চীন ও ভারত, উভয় দেশের প্রভাব আসিয়া এই দেশে মিশিয়াছিল বলিয়া এই নাম। এখন এই দেশে তুর্কী ভাষা বলে ও ধর্ম্মে মুসলমান, এমন একটি জাতি বাস করে। দেশটির অনেক অংশ মরুভূমিতে পূর্ণ। বিশেষতঃ চীনা তুর্কীস্থানে মাঝে একটি বিরাট্ মরুভূমি, তার উত্তরে আর দক্ষিণে খানিকটা করিয়া উর্ব্বর ভূমি—মরুভূমির উত্তরে তারিম নামে এক নদী, এই নদীর ধারে কুচা ও কারা-শহর বলিয়া দুইটি বিখ্যাত শহর ও মরুভূমির নৈঋত-কোণে বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'খোতান' নামে আর একটি শহর। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেশের চেহারাই অন্য রূপ ছিল। দেশে জলসেচনের ভাল ব্যবস্থা থাকায় গাছপালা উর্ব্বর ভূমি অনেকটা ছিল, এখন সে সব ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মরুভূমি আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে, লোকের বসতি অনেক গ্রাম ও নগরকে বালিতে ঢাকিয়া দিয়াছে।



অঙ্কোরভট্ মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য

আর এদেশে তখন তুর্কীভাষী লোক খুব কমই ছিল, ছিল আর্য্যজাতীয় লোক; (১) সুলিক বা সগড়ীয় লোক এবং (২) খোতানীয় বা শক জাতীয় লোক, ইহারা ইরাণীয় আর্য্য ভাষা বলিত; আর ছিল কুচা ও কারা শহরে তুখার জাতীয় লোক, ইহারা পৃথক্ একটি আর্য্য ভাষা বলিত। এই সুলিক, শক ও তুখার জাতীয় লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ভারতীয় বর্ণমালা ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া মধ্য এশিয়ায় উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিয়া একটি ছোটখাট বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল।



বায়ু

৪০০ পাতার পর

পিচকারী দিয়া যখন আমরা জল টানিয়া তুলি, তাহাও এই বায়ুর চাপের জন্য হয়। পিচকারীর ডাঁটি উপরে উঠিতে থাকিলে, ভিতরে বাতাসশূন্য স্থান জন্মিতে থাকে কাজেই, বাহিরের জলের উপর বায়ুর চাপ বিদ্যমান থাকায়, অথচ সেই জলের যে অংশ পিচকারীর মুখের নীচে

পিচকারী



পিচকারী দিয়া জল উপরে টানা হইতেছে।

রহিয়াছে, তাহার উপর বায়ুর কোন চাপ না থাকায়, বাহিরের চাপে জল ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়।

যদি কোনও একমুখ বন্ধ কুড়ি পঁচিশ ফুট দীর্ঘ নলে জল ভরিয়া, তাহার অন্য মুখটি অঙ্গুলি দিয়া বন্ধ করিয়া, নলটি উল্টাইয়া, তাহার সেই অন্য মুখটি জলের নীচে ধরিয়া, নলটি দাঁড় করাইয়া, জলের নীচে তাহার মুখটি খুলিয়া দি, তোমরা দেখিতে পাইবে, ভিতরের জল কিছুমাত্র পড়িয়া যাইবে না। তাহার কারণ, কুড়ি পঁচিশ ফুট উচ্চ জলের চাপ আমাদের সাধারণ বাতাসের চাপ হইতে কম। চৌত্রিশ ফুট উচ্চ জলের চাপ, বাতাসের চাপের সমান। তবে, সে জলের উপর যেন বাতাস না থাকে, বা নলের অন্য মুখ দিয়া যেন বাতাস না প্রবেশ করিতে পারে। তাহা হইলে সে বাতাসের চাপে, জল আর ওরকম ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে না।

বায়ুচাপমাপক যন্ত্র

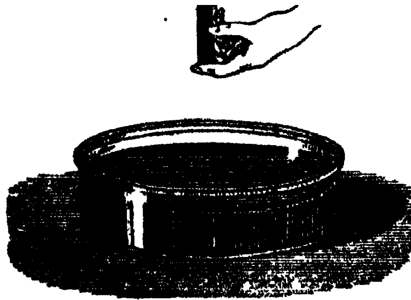
যদি নলটির দৈর্ঘ্য চৌত্রিশ ফুটের বেশী হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ জল বাহির হইয়া সেই চৌত্রিশ ফুট মাত্র থাকিয়া যাইবে। অবশ্য, বায়ুর চাপের কম বেশী হইতে থাকিলে, সেই দৈর্ঘ্যেরও কম বেশী হইবে। চৌত্রিশ ফুটের উপর যে শূন্যস্থান দেখিতে পাইবে, তাহা কাজে কাজেই সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য স্থান। গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলির নামানুসারে ইহাকে টরিসেলিয়েন শূন্যস্থান বলে।

যদি নলটি পারদপূর্ণ করিয়া উপরি উক্ত ভাবে পারদপূর্ণ পাত্রে দণ্ডায়মান করাই, তাহা হইলে,

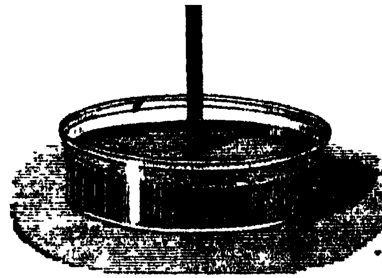
পারদ জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ গুণ ভারী বলিয়া, বাহিরের বায়ু ইহার মাত্র ত্রিশ ইঞ্চির ভার ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। এই উচ্চতার পরিবর্ত্তনে, বাহিরের বায়ুর চাপের পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হইবে। সাধারণ বায়ুর চাপ মোটামুটি ভাবে ত্রিশ ইঞ্চি লওয়া হয়। মেঘ বাতাস হইতে হাল্কা হওয়ায়, বায়ুতে মেঘের প্রবেশ হইলে স্থানীয় বায়ুর চাপ কম হইয়া যায়। কাজেই, এই যন্ত্রে কম চাপ নির্দ্দিষ্ট হইলে বৃষ্টির সম্ভাবনা ধরা হয়। এইরূপ যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (barometer) বা বায়ুচাপ পরিমাপক যন্ত্র।



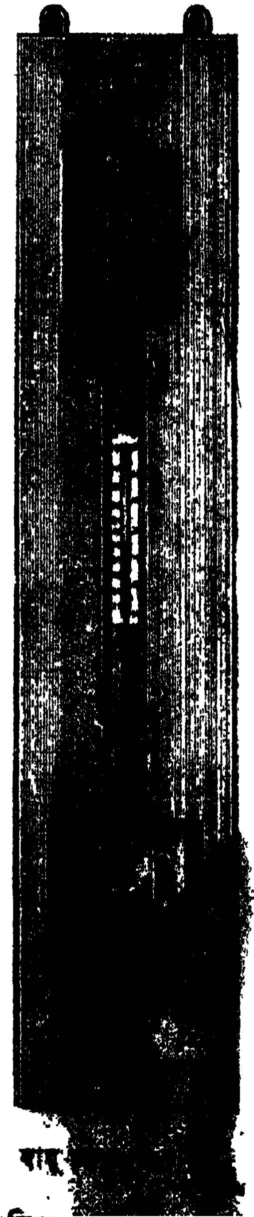




নলটি পারদপূর্ণ করা হইয়াছে



পারদপূর্ণ নলের একমুখ পারদে ডুবাইলে খানিকটা পারদ পড়িয়া গিয়াছে

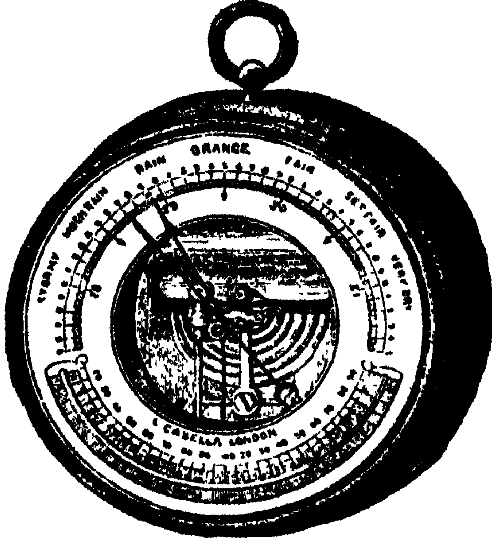


বায়ু

আরও একপ্রকার যন্ত্রে বায়ুর চাপ মাপা যায়। একটি কৌটার ঢাকনী অতি পাতলা ধাতুপত্রে নির্ম্মিত করিয়া ঢাকনীটি কৌটায় আঁটিয়া দেওয়া হয়। ভিতরের বাতাস বাহির করিয়া লইলে, সেই ঢাকনীটির টোল খাওয়া অবস্থা হইয়া পড়ে। বাহিরের বাতাসের চাপের তারতম্য অনুসারে এই টোল খাওয়া কম বেশী হইতে থাকে।

এখন যদি ঢাকনীটির উপর ঘড়ির মত একটি কাঁটা বসাইয়া তাহা কৌটার ভিতরে কলকজা দিয়া এমন ভাবে ঢাকনীটির সহিত ... যে, টোল খাওয়ার ... ঘুরিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, ... যে কোন সময়ে বায়ুর কত ... পড়া যাইতে পারে। যন্ত্রটি ... হইতে ... চাপে কাঁটা কোন্ ঘরে যায়, ... পরীক্ষায় দেখিয়া লইয়া ... দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর যন্ত্রের নাম ... ব্যারোমিটার।

তোমাদের ভিতর অনেকেই চাবী মুখে লইয়া তাহার ভিতরকার বাতাস চুষিয়া ফেলিয়া, সেই



বায়ু-চাপমাপক ঘড়ি

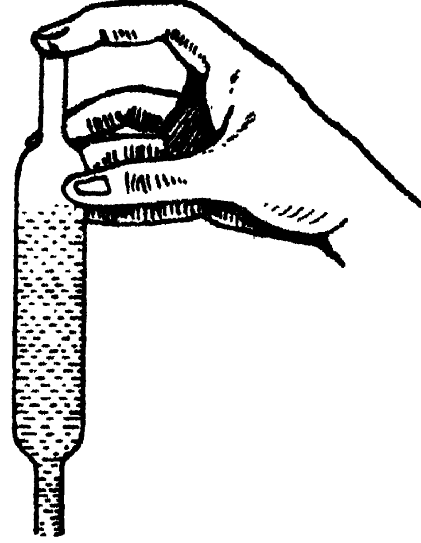


চাবি গালে ঝুলিয়া রহিয়াছে

অবস্থায় তাহাকে টানিতে টানিতে জিহ্বায়, ওষ্ঠে, গণ্ডে বা কপালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ভেল্কী দেখাইতেছ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক। এরূপ কেন হয়, এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ। এবংবিধ আরও অনেক ম্যাজিক দেখাইতে পারা যায়। একটি নল জলে ডুবাইয়া তাহার উপরকার মুখ বন্ধ করিয়া তুলিয়া লইলে জল পড়িয়া যাইবে না। শোরাই বা সরু গেলাস জলপূর্ণ করিয়া, হাত দিয়া তাহার মুখ

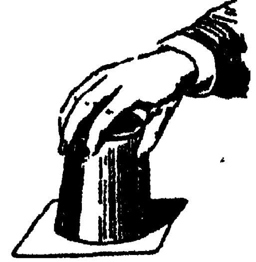
চাপের ম্যাজিক

চাপিয়া, উল্টাইয়া নিম্নমুখী করিয়া হাত সরাইয়া লইলেও দেখিতে পাইবে, জল নির্গত হইয়া যাইবে



জল পড়িয়া যাইতেছে না

না। ইহাও এই বায়ুর চাপের জন্য বুঝিবে। সাইফনের ক্রিয়াও বায়ুর চাপের জন্য হয়।



গ্লাসের জল পড়িতেছে না

উচ্চ হইতে উচ্চে বায়ুর চাপ কম হইয়া যায়। সাত মাইলে প্রায় সিকি চাপ ও ৩০ মাইল উচ্চে এখানকার চাপের প্রায় দুই হাজার ভাগের এক ভাগ চাপ। ব্যোমযান কত উচ্চে উঠিয়াছে বা পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির কোন্ স্থান কত উচ্চে অবস্থিত, বায়ু-চাপমাপক যন্ত্রে তৎস্থানীয় চাপ অবগত হইয়া,

কোন প্রদেশের উচ্চতা



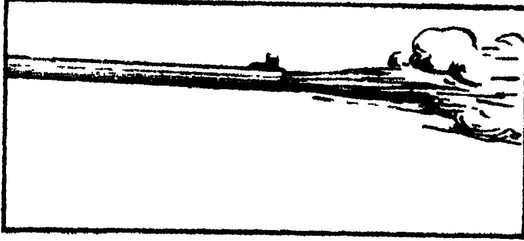
পাহাড়ের উচ্চতা অনুসারে বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়

সেই উচ্চতা কষিয়া বাহির করা হয়। জল তাপমান যন্ত্রের কোন্ অঙ্কে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাও বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে। নিম্নাঙ্কে ফোটে

বলিয়া, পাহাড়ের উপর খোলা হাঁড়িতে মাংস বা ডাল সিদ্ধ হইতে চাহে না।

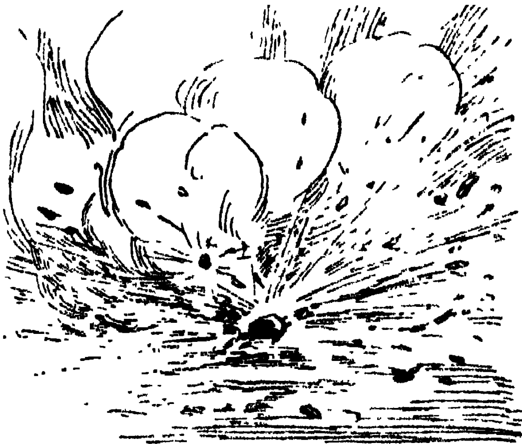
বন্দুকের গুলি কেন এত বেগে বাহির হয়, জান? বন্দুকের ভিতর যে বারুদ ঠাসা হয়, তাহা জ্বলিয়া উঠিলে, তাহা হইতে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহসা এত অধিক পরিমাণে বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় যে, ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতর

বন্দুক



বন্দুকের ভিতর হইতে গুলি বাহির হইয়া যাইতেছে

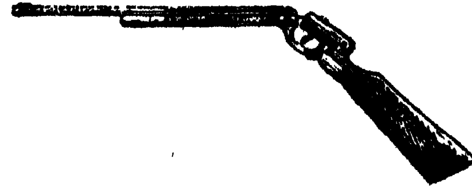
উৎপন্ন হওয়াতে তাহার চাপ ভীষণ হইয়া উঠে। এমন কি, সেই চাপে অনেক সময়ে নিকৃষ্ট বন্দুকের চোঙ ফাটিয়া যায়। কাজেই চাপপীড়িত বায়বীয় পদার্থ বন্দুকের নল দিয়া নির্গত হইবার সময়



বিস্ফোটক ফাটিতেছে

গুলিটিকেও সেই বেগে বাহির করিয়া দেয়। বিস্ফোটকে আগুন লাগিলে ঠিক এইরূপই হয়। সমস্ত যেন সন্তাড়নে চুরমার হইয়া যায়।

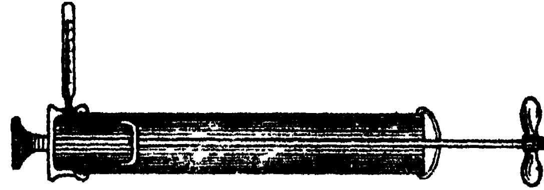
বায়ু-বন্দুকে প্রায়ই স্প্রীংয়ের সাহায্যে ভিতরের বায়ু চাপিয়া ধরা হয়। ঘোড়া টিপিয়া স্প্রীংটি খালাস করিলে, চাপ-প্রপীড়িত বায়ু উপরি উক্ত ভাবে বন্দুকের নল দিয়া নির্গত হইবার সময় গুলিটিকেও সেই বেগে বাহির করিয়া দেয়।



বায়ু-বন্দুক মুড়িলে ভিতরের স্প্রীং দৃষ্ট হয়

কোন পাত্রে পিচকারী দিয়া বায়ু চাপে চাপে ভরিবার সময়, পিচকারী ও বায়ু সমস্তটা গরম হইয়া উঠে। বাইসিকেলে বাতাস ভরিবার সময় ইহা আমরা

চাপে উষ্ণতার সৃষ্টি



বাইসিকেলের পাম্পে তাপমান যন্ত্র লাগাইয়া, পাম্পটি চালাইলে, তাপমান-যন্ত্রে তাপবৃদ্ধি জানা যায়

প্রত্যহই টের পাই। আবার চাপা বায়ু বাহির হইবার সময় ঠিক সেই পরিমাণে শীতল হইয়া পড়ে। ইহাও বায়বীয় পদার্থের সাধারণ গুণ। হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধিতে খানিকটা খালি স্থান পাওয়ায়, বায়ুকণাগুলির বেগ স্খলিত হইয়া পড়ে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গতি মন্দীভূত হওয়া এবং শীতল হইয়া পড়া, একই কথা।

জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর আয়তন যদি সহসা বৃদ্ধি করা হয়, দেখিতে পাইবে, শীতল হওয়ায় তাহার জলীয় বাষ্প কুয়াসা ও বৃষ্টিকণায় পরিণত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভাসিতে ভাসিতে যদি কোন মৃদু চাপবিশিষ্ট স্তরে প্রবেশ করে, তাহার জলীয়াংশ উপরি উক্ত কারণে মেঘ বা বৃষ্টিকণায় পরিণত হয়। এই রকমে আমরা বৃষ্টি পাই।

বৃষ্টি ও কুয়াসা

বায়ুর চাপ কত না কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে! রেলগাড়ীর ভিতরে দরজার উপর ছাদের নীচে, ছোট ছোট শিকল ঝুলিয়া থাকে, ইহা তোমরা

নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। এগুলির নীচে "গাড়ী থামাইতে হইলে শিকল টান।" লেখা থাকে। একটি নলের ভিতর হইতে এই শিকলটি বাহির হয়। গাড়ীতে গাড়ীতে যোগ দিবার সময় রবারের নল দিয়া এই নলগুলি সংযুক্ত করা হয় এবং এইরূপে সবগুলি মিলিয়া একটি সুদীর্ঘ নলের মত হইয়া এঞ্জিন ঘর হইতে গার্ডের গাড়ী পর্য্যন্ত যায়। প্রত্যেক গাড়ীর চাকাগুলির উপর চাকার গতি বন্ধ করিবার যে খিলের মত যন্ত্রটি আছে—তাহাকে ব্রেক (brake) কহে, তাহার ওঠানামা একটি পিচকারীর মত যন্ত্রের দ্বারা সংসাধিত হয়। পিচকারীগুলি উপরি উক্ত নলের সহিত সংলগ্ন থাকে। এঞ্জিনের দ্বারা নলের ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া লইলে

রেলগাড়ীর ব্রেক



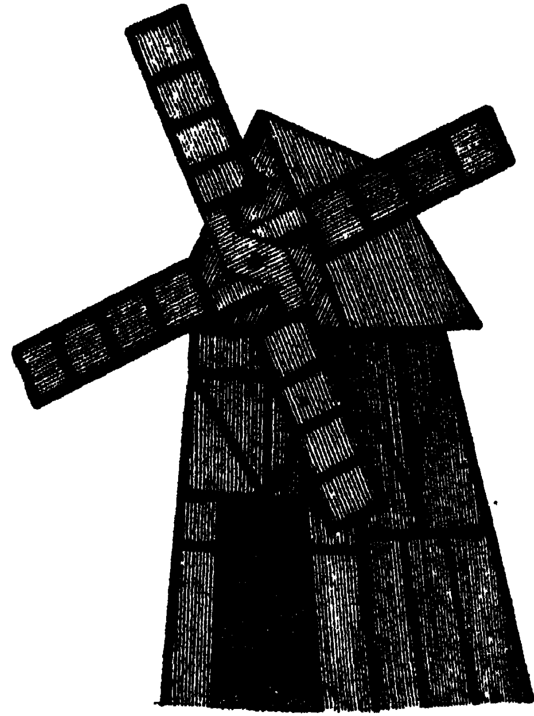
পালের নৌকা

পিচকারীর ডাঁটি উপরে উঠিয়া যায় এবং ডাঁটিগুলির সহিত খিল বা ব্রেকগুলিও চাকা হইতে দূরে সরিয়া যায়। প্রতি গাড়ীতে নলের এক একটি ছিপিবদ্ধ মুখ থাকে এবং সেই ছিপিগুলিতে উপরি উক্ত শিকলগুলি আঁটা থাকে। শিকল টানিলে সেই ঘরের ছিপি খুলিয়া যাওয়ায়, বাতাস নলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পিচকারীর ডাঁটি নীচে নামাইয়া আনে ও সঙ্গে সঙ্গে চাকাগুলির উপর তাহাদের গতিনিবারক খিল বা ব্রেকগুলি আসিয়া পড়ে।

ফলে, গাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া যায়। কি সহজে অমন ভীষণ গাড়ীখানার গতি স্থগিত করা যাইতে পারে ও বৈজ্ঞানিকেরা কোন্ তথ্যের সাহায্যে তাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা বুঝিতে পারিলে কি ?

হাতুড়ি, নৌকা ও পালে ঘোরা জাঁতা

বড় বড় কারখানায় বাতাসের চাপে বড় বড় মুদ্গর ও নানাবিধ যন্ত্রাদি অনবরত চালিত হইতেছে। নানাবিধ আশ্চর্য্য ও দুরূহ কার্য্য আজকাল অবলীলাক্রমে বাতাসের চাপে অনবরত সম্পাদন করা হইতেছে। পাল টাঙ্গাইয়া নৌকা চালান হয় ও পূর্ব্বকালে বড় বড় জাহাজ চালান হইত। বড় বড় পালের মত হাতা থাকায় উইণ্ডমিল নামক যন্ত্র



উইণ্ড মিল

বাতাসের প্রভাবে ঘুরিতে থাকে। উইণ্ডমিল বা পালে ঘোরা জাঁতা দিয়া গম পেষা হয়।

শব্দ সৃষ্টি ও প্রসার

সকল বাদ্যযন্ত্রের মূলে বাতাসের কম্পন। ইহা যেন বায়ু-সমুদ্রে বীচিমালা। যখন আমরা ঢাকে কাটি দি বা কাঁসরে ঘা মারি, তখন ঢাকের চামড়া বা কাঁসরের ধাতুর পাত থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। সেই কম্পনে তৎসংলগ্ন বায়ুকণাসমূহ সেইরূপভাবে কাঁপিয়া ওঠে। কণাগুলি সেই স্পন্দনে তাহাদের চতুর্দ্দিকে

অবস্থিত পরের স্তরের কণাগুলিকে ঠেলা দেয় এবং ঘড়ির দোলকের মত তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া ঠিক সেইরূপভাবে অন্যদিকের বায়ুকণাগুলিকে আসিয়া ঠেলা দেয়। যতক্ষণ না তাহাদিগের কম্পন স্থগিত হয়, অনবরত ফিরিয়া ফিরিয়া এইরূপ করিতে থাকে। এইরূপ দ্রুতবেগে চলাফেরাই তাহাদের কম্পন। দ্বিতীয় স্তরের কণাগুলি, ও তাহা হইতে তৃতীয় স্তরের এবং এই রকম ভাবে পরবর্তী স্তরের কণাগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করে। এইরূপে এই কম্পন চারিপাশে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই বিস্তারটিকে আমরা বীচিমালা বলিয়াছি। তবে এ বীচিমালা জলের তরঙ্গের ন্যায় নহে, কণাগুলি উঁচু-নীচু হইতে থাকে না, তাহারা পাশাপাশি ঠেলা দিতে থাকে।

ক খ গ ঘ চ ছ
ক খ গ ঘ চ ছ
ক খ গ ঘ চ ছ
ক খ গ ঘ চ ছ
ক খ গ ঘ চ ছ
ক খ গ ঘ চ ছ

ক খ গ ঘ চ ছ—বায়ুকণার পর-পরবর্তী স্তর। শব্দকারী পদার্থের কম্পনে তাহাতে আগেকার স্তরে স্তরে ভিড় ও সেই কারণে পরের স্তরে স্তরে বিরলতা জমে ও সেই ভিড় ও বিরলতা ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হইতে থাকে। ইহাই শব্দের গতি। চিত্রে লাইনের পর লাইনে স্তরগুলির পরিবর্তনশীল অবস্থা দেখানো হইয়াছে।

সুর ও শব্দের গতি

বাঁশীর বা হারমোনিয়মের বিভিন্ন রন্ধ্রের উন্মোচনে তাহাদের ভিতরকার বাতাস নির্গত হইবার সময় নিজের ভিতর বিভিন্ন বেগের স্পন্দন-গতি সৃষ্টি করে। সেই বিভিন্ন বেগের স্পন্দন-গতিকেই আমরা বিভিন্ন স্বর বলিয়া উপলব্ধি করি। তারের যন্ত্রে তার ছোট-বড় করিয়া তাহাতে, ও তাহা হইতে বাতাসে বিভিন্ন বেগের স্পন্দন-গতি সৃষ্টি করি। কম্পন বা স্পন্দন-গতি ও বিস্তার বা শব্দের গতির ভিতর গোলমাল বাধাইয়া দিও না। বায়ুকণাগুলি প্রতি সেকেণ্ডে কয়বার সম্মুখে ও পিছনে যাওয়া আসা করে, সেই সংখ্যাকে কম্পনগতি বলা হয়। সেই ঠেলাঠেলি কার্যটি প্রতি সেকেণ্ডে কতদূর বিস্তার লাভ করে, সেই পরিমাণকে আমরা শব্দের প্রসারণ-গতি বা শব্দ-গতি বলি। বাজন কাঁটা বাজাইয়া তাহা হইতে উত্থিত স্বরের কম্পন বেগ জানা যায়। "সা" "রে" "গা" ইত্যাদি স্বরগুলি বাজন কাঁটা, ও তাহা হইতে বায়ুকণার, প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৬, ২৮৮, ৩২০ বার কম্পনে সৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল স্বরেরই সমান বিস্তার গতি। সাধারণ বাতাসে ইহা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১৫০ ফুট। ভারি বাতাস অপেক্ষা হাল্কা বাতাসে শব্দের দ্রুততর বিস্তার গতি হয়।

গ্রামোফোন

গ্রামোফোনে ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডের সূক্ষ্ম লাইনগুলির উপর পিন যখন উঠিতে পড়িতে থাকে, সেই গতিতে পিনসংলগ্ন যে পাতলা ঝিল্লিটি আছে, সেইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। কম্পনের বেগ অনুসারে বিভিন্ন স্বরোৎপত্তি হয়। রেকর্ডের প্রস্তুতকরণ ঠিক উল্টাভাবে হয়। শব্দতরঙ্গে ঝিল্লি-কম্পন ও ঝিল্লি-কম্পনে তৎসংলগ্ন পিনের কম্পনে ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডে সূক্ষ্ম লাইন ক্ষোদিত হয়। ইহা একটি বৃহৎ লাইন, চক্রের মত সমস্ত রেকর্ডখানির উপর, বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যস্থল পর্যন্ত একটানা ভাবে চলিয়া যায়। প্রথমে কাঁচা রেকর্ড করা হয়, পরে তাহা হইতে পাকা রেকর্ড প্রস্তুত হয়।

বিস্ফোটকের শব্দ

একস্থানে সহসা বহুপরিমাণে বায়বীয় পদার্থের উদ্ভব হওয়ায়, বাতাসে ভীষণ সন্তাড়ন সৃষ্টি হয়, এই জন্যই বিস্ফোটকের বিস্ফোটনে ভীষণ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রতিধ্বনি

সন্তাড়িত বায়ুতরঙ্গ বিস্তারিত হইতে হইতে কোথাও কোন উচ্চ দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া, যদি আমাদের কানে আবার ফিরিয়া আসে, সেই ফিরিয়া আসাকে আমরা প্রতিধ্বনি বলি। যাহাকে আমরা মেঘের গর্জন বলি, তাহা অশনি স্ফোটনের পৌনঃপুনিক প্রতিধ্বনির জন্য হয়।

খাদ্য-শস্য

মাটী

আমাদের খাদ্য-দ্রব্যগুলি আমরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ্ হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকি। যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে আমরা সাক্ষাৎভাবে আমাদের আহার্য্য পাই, তাহাদিগকে "খাদ্যশস্য" নামে অভিহিত করা হয়। সেইজন্য খাদ্য-শস্যগুলির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের জন্মস্থান মাটীসম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিতে চাই।

এই মাটী কি কি উপাদান লইয়া গঠিত, তাহা শুনিলে তোমরা হয় ত খুব আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। তোমরা ত প্রস্তর খণ্ড দেখিয়াছ—ঐ প্রস্তরখণ্ড হইতেই আমাদের এই মাটীর জন্ম। পাহাড়-পর্ব্বতের প্রস্তর ও শিলাগুলি প্রধানতঃ জলবায়ু, তাপ ও তুষারের আক্রমণে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া খুব ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এই কণাগুলি পাথরে থাকিবার সময় যেমন কঠিন ও দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে, পাথর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেইরূপ কঠিন ও দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না। কিন্তু সংলগ্ন না থাকিলেও পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ থাকে। ক্রমে রাশি রাশি কণা ছড়াইয়া পড়ে ও একটি স্তর নির্ম্মাণ করে। এইরূপে স্তরের উপর স্তর প্রস্তুত হয়। এক একটি স্তর যখন গড়িয়া উঠে তখন তাহার উপর নানাবিধ জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ্ জন্মগ্রহণ করে। পরে যখন উহারা বিনষ্ট হয়, তখন জীবাবশেষগুলি এক একটি স্তরের প্রস্তরকণার সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। এইরূপ প্রত্যেক স্তরের সহিত জীবাবশেষ ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ মিশিয়া যায়। প্রস্তরকণা, জীবাবশেষ ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষগুলির সংমিশ্রণে মাটীর উৎপত্তি। তাহা হইলে তোমরা দেখিতেছ যে, মাটীর উপাদান (১) প্রস্তর ও শিলাখণ্ডের কণাসমষ্টি, (২) জীবাবশেষ ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ। প্রথম উপাদানটিকে খনিজ ও দ্বিতীয় উপাদানটিকে জৈবিক পদার্থ বলা হয়। মাটীর মধ্যে খনিজ পদার্থের অংশই অধিক। তোমরা মনে রাখিও যে, পাহাড়-পর্ব্বতের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-কণার সহিতও জৈবিক পদার্থ মিশ্রিত আছে।

তাহা হইলে পাহাড়-পর্ব্বতকেই আমাদের মাটীর পিতামাতা বলিতে পারি। কোন কোন স্থানে পাহাড়-পর্ব্বত হইতে মাটী উৎপন্ন হইয়া, সেই পাহাড়-পর্ব্বতের উপরে কিম্বা তাহাদের কাছাকাছি স্থানেই থাকে। যেমন কোন কোন ছেলে-মেয়ে তাহাদের বাপ-মায়ের কাছাকাছি থাকিতে ভাল বাসে, সেইরূপ। আবার কোন কোন স্থানের মাটী তাহাদের জন্মদাতা পাহাড়-পর্ব্বতের কাছাকাছি থাকিতে বেশী পছন্দ করে না। পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের মাটীর কণার আকার, রঙ, প্রকৃতি ও গুণ সমতল প্রদেশের মাটী হইতে বিভিন্ন। আমরা সাধারণতঃ উহাকে পাহাড়ে মাটী বলিয়া থাকি। এই প্রকার মাটীর নাম স্থিতিশীল (Indigenous of Sedentary Soil) মাটী।

আবার কোন কোন স্থানে মাটী পাহাড়-পর্ব্বত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাস ও জলের সহিত বহু

দূরে চলিয়া যায়। এই প্রকার মাটীকে গতিশীল (মাটী Transported Soil) বলে। এই মাটী তাহার জন্মস্থান পাহাড়-পর্ব্বত হইতে জলস্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইবার সময় কণাগুলি পরস্পরের সংঘর্ষণে অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় এবং স্রোতের তারতম্য অনুসারে জলের নীচে পড়িয়া নানাস্থানে নানা রকমের স্তরের সৃষ্টি করে। ইহাকে পলিমাটী বলে। এই মাটীই আমাদের চাষবাসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বন্যার সময় নদীর জল যখন দুই কূল ছাপাইয়া বহিয়া যায়, তখন জলের সহিত মিশ্রিত পলিমাটী ক্ষেতগুলির উপরে পড়িয়া উহাদের উর্ব্বরতা শক্তি অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। এই জন্যই নদী-তীরবর্ত্তী দেশগুলিতে অধিক পরিমাণে ও বিস্তৃতভাবে পলিমাটী দেখিতে পাওয়া যায়। পলিমাটীর গভীরতা খুব বেশী। কারণ, প্রত্যেক বৎসরই স্তরের উপর আর একটি স্তর পড়িতেছে।

বাতাস ও ঝড়ের দ্বারাও মৃত্তিকা ও প্রস্তরকণা সকল নানা স্থানে পতিত হয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেই এই সকল মাটী সাধারণতঃ দেখা যায়। এই মাটীতে জৈবিক পদার্থের অংশ খুবই কম থাকে ইহাতে প্রস্তরকণার ভাগই বেশী। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণার নাম বালি। তোমাদের মধ্যে যাহারা পুরীতে গিয়াছ, তাহারা পুরীর সমুদ্রের ধারে এইরূপ মাটী দেখিয়াছ। চীন দেশের লোয়েস (Loess) মাটীও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, জল, বায়ু, তাপ ও শীতের দ্বারাই মাটী গঠিত হয় এবং ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোন কোন স্থানে কোন কোন সময়ে জীবাণু দ্বারাও মৃত্তিকার নানা প্রকারের স্তরের সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, পাটল মাটী (Laterite Soil) এইরূপ জীবাণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রবাল কীট নামক এক প্রকার জলজ কীট আছে, উহারা সমুদ্রের নীচে জন্মায়। এই জাতীয় কীটের কঙ্কালের দ্বারা পাটল মাটীর সৃষ্টি হয়। ভারত মহাসাগরের লাক্ষা ও মালদ্বীপপুঞ্জ প্রবালকীট দ্বারা গঠিত হইয়াছে।

আমরা উপরের স্তরে যে মাটী দেখিতে পাই, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও গুণ অল্প নীচের স্তরের মাটী হইতে বিভিন্ন। এই নিম্নের মাটীকে আমরা "নিম্নস্তর" মাটী (Sub Soil) বলিব। "নিম্নস্তর" মাটী সাধারণতঃ উপরের স্তরের মাটীর আট দশ ইঞ্চি নিম্ন হইতে আরম্ভ হয়। উপরের মাটী নিয়ত সূর্য্য, বাতাস ও বৃষ্টির কার্য্যকারিতা শক্তি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। সেই জন্য উপরের স্তরের মাটীর কণাগুলি নিম্নস্তরের মাটীর কণাগুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আবার অনবরত চাষবাসের জন্যও উপরকার মাটীর কণাগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যাইতেছে। উপরের মাটীতে জীবজন্তু ও গাছ-পালার ধ্বংসাবশেষ মিশিয়া উহার রঙ্‌কে নিম্নস্তরের মাটীর রঙ্ অপেক্ষা কালো করিয়া দেয়। আমরা যদি উপরের মাটী উঠাইয়া দিয়া নিম্নস্তরের মাটী অনাবৃত করিয়া রাখি, তাহা হইলে উহা সূর্য্য, বায়ু ও বৃষ্টির সাহায্যে ক্রমশঃ উপরের মাটীর প্রকৃতি ও গুণাবলী প্রাপ্ত হইবে।

আমরা সাধারণতঃ মাটীতে বালি, পলিমাটী, কাদা, চূণ ও জৈবিক পদার্থ দেখিতে পাই। বালি, পলিমাটী ও জৈবিক পদার্থ কিরূপে মাটীতে মিশিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাদা ও প্রস্তর-কণার সমষ্টি। ইহা বালির অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কণাদ্বারা গঠিত। কাদার অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি পরস্পরের সহিত অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে। বালির শুষ্ক পরিষ্কার ঝকঝকে কণাগুলি পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকে না। তোমরা যদি এক মুঠা বালি লইয়া তোমাদের মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখ, উহা ডেলা পাকাইয়া যাইবে, কিন্তু মুঠা খুলিয়া দিবার পর মুঠার চাপ চলিয়া গেলেই বালির কণাগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়িবে। মুঠার ভিতর কিছু কাদা লইয়া এইরূপ করিলে উহার কণাগুলি বালির মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে না। দেখা গিয়াছে যে, বালির কণা একটির পর একটি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিলে ৫০০ হইতে ১০০০ কণা সাজাইতে এক ইঞ্চি লম্বা স্থান লাগে। কিন্তু এই পরিমাণ স্থানে ২৫০০০ হাজার কাদার কণা সাজান যাইতে পারে। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, বালির কণা হইতে কাদার কণা কত ক্ষুদ্রতর। মনে রাখিও, যদিও বালি, চূণ, পলিমাটী ও কাদাকে আমরা চারিটি বিভিন্ন জিনিষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি, কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই প্রস্তরকণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চূণ, মাটীতে অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রধানতঃ প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থকে পচাইয়া দিয়া জৈবিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই পদার্থগুলির

মধ্যে জৈবিক পদার্থ ও পলিমাটীতে উদ্ভিদের খাদ্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকে।

মাটীতে জল, বায়ু ও তাপ বর্ত্তমান আছে। ঐ গুলি উদ্ভিদের উৎপত্তি ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। মাটীর প্রকৃতি ও বুনটের (Texture) উপর শস্য উৎপাদনের গুণাগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এখন সংক্ষেপে সেই কথাই বলিতেছি। তোমরা জানিয়াছ যে, মাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। বিভিন্ন প্রকার মাটীতে বিভিন্ন আয়তনের ছোট-বড় কণা আছে—যেমন, বালির কণা, কাদার কণা অপেক্ষা বৃহৎ। মাটীর জল শোষণ ও ধারণ করিবার ক্ষমতা এই কণার আয়তনের উপর নির্ভর করে। তোমরা যদি দুইটি পাত্রে একটিতে বালি ও অপরটিতে কাদা রাখিয়া তাহাদের উপর জল ঢালিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে যে, বালিপূর্ণ পাত্রে জল ঢালিবামাত্র উহা অনায়াসে ও শীঘ্রই বালির মধ্যে নীচে চলিয়া যাইবে, কিন্তু কাদার পাত্রের জল তত শীঘ্র ও সহজে কাদার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার কারণ, বালির কণাগুলি কাদার কণা অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং সেই জন্যই বালির কণাগুলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁকও বেশী। কাজে কাজেই, জল বালির কণাগুলির মধ্যের ফাঁক দিয়া অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে নীচে চলিয়া যায়। কাদার কণাগুলি বালির কণা অপেক্ষা আয়তনে ছোট এবং সেই কারণে কণাগুলির মধ্যের ফাঁকও কম। সেই জন্য কাদার কণাগুলির মধ্যের ফাঁক দিয়া জল তত শীঘ্র ও সহজে নীচে চলিয়া যায় না। তোমরা দেখিয়াছ, বৃষ্টি পড়িলে কাদা-মাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজা ও স্যাঁৎসেঁতে থাকে, এমন কি, অনেক সময় তাহার উপর জল দাঁড়াইয়া থাকে ও সেই জল অন্য স্থানে গড়াইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বালি মাটী বেশীক্ষণ ভিজা ত থাকেই না, তাহার উপর জলও দাঁড়ায় না। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বালি মাটীর জল শোষণ করিবার ক্ষমতা অধিক। কিন্তু বালি মাটী অপেক্ষা কাদা মাটীর জল ধারণ করিবার শক্তি অনেক অধিক।

সকল প্রকার মাটীর কণার মধ্যে যে ফাঁক আছে সেই ফাঁকগুলি সর্ব্বদাই বায়ুতে পূর্ণ থাকে। জল যখন এই ফাঁকগুলির ভিতর দিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন জলের চাপে বাতাসকে সরিয়া যাইতে হয়। জল চলিয়া গেলেই আবার উপরের বায়ু আসিয়া পুনরায় ঐ স্থানগুলি দখল করে। যে মাটীর কণাগুলি যত বড়, সেই মাটীর ভিতর জলের ন্যায় বায়ু প্রবেশের পথও বড়। সেই কারণেই কাদা মাটী অপেক্ষা বালি মাটীতে বায়ু চলাচল বেশী হইয়া থাকে। এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, বালি মাটী কেন হাল্কা ও শুক্না, আর কাদা মাটী কেন ভারী ও ভিজা থাকে। সেই কারণে যে মাটীতে বালির পরিমাণ যত বেশী, সেই মাটী তত শুক্না ও তাহার জল ধারণের শক্তি তত কম। যে সকল উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য বেশী জলের প্রয়োজন, তাহারা বালি মাটীতে তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে জল পায় না। কাজে কাজেই সেইরূপ মাটীতে জলের অভাবে তাহারা ভালরূপে বাড়িতে পারে না।

মাটিতে অবাধে বায়ু চলাচলের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ মাটীতে অনেক প্রকারের ছোট ছোট জীবাণু থাকে। ঐ সকল জীবাণু বাতাস ও মাটী হইতে উদ্ভিদের খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করে। ইহাদের জীবনধারণের জন্য বাতাসের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া উদ্ভিদের নিজের জন্যও বাতাসের প্রয়োজন আছে।

মাটীর মধ্যে নিহিত জল একটি অদ্ভুত আকর্ষণের দ্বারা উদ্ভিদের শিকড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উদ্ভিদ্ তাহা নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। এই আকর্ষণের নাম কৈশিক আকর্ষণ। এই আকর্ষণের জন্যই প্রদীপের সলিতা তৈল এবং স্পঞ্জ জল শোষণ করিতে পারে। মাটীর কণার সূক্ষ্মতার উপর মাটীর কৈশিক আকর্ষণ শক্তি নির্ভর করে। যে মাটীর কণা যত ছোট, সেই মাটীর কৈশিক আকর্ষণ শক্তি তত বেশী ও প্রবল। সেই জন্য বালি মাটী অপেক্ষা কাদা মাটীর কৈশিক আকর্ষণ শক্তি অধিক। যে মাটীতে জৈবিক পদার্থের ভাগ বেশী আছে, সেই মাটীতেও এই শক্তি খুব বেশী।

মাটীর কৈশিক আকর্ষণের কথা উপরে বলিলাম। এখন আর একটি আকর্ষণ শক্তির কথা বলিতেছি। ইহার নাম আর্দ্রতা-গ্রাহী ক্ষমতা। তোমরা জান, মাটীতে যে জল আছে, তাহা সূর্য্যের তাপে বাষ্প হইয়া উপরে চলিয়া যায়। কিন্তু মাটী তাহার

আর্দ্রতা-গ্রাহী শক্তি দ্বারা মাটীর সংলগ্ন জলীয় বাষ্প হইতে কতকটা জলীয় ভাগ টানিয়া লয়। তোমরা জানিয়া রাখ যে, মাটীর প্রত্যেকটি কণার গায়ে, একটি করিয়া পাতলা জলের আবরণ আছে।

এখন মাটীর তাপের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। সকল স্থানের মাটীর তাপের পরিমাণ সমান নহে। মাটীর উপরের তাপ প্রধানতঃ তিনটি কারণে উৎপন্ন হয়। (১) সূর্য্যের তাপ, (২) ভূগর্ভের ভিতরের উত্তাপ ও (৩) রাসায়নিক তাপ। মাটীর মধ্যে যে জৈবিক পদার্থ থাকে, তাহা হইতে অতি ধীরে ধীরে শেষের তাপটি উৎপন্ন হয়। ইহার তীব্রতা অধিক। মাটী দিনের বেলায় সূর্য্যের তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রিতে তাহা বাহির করিয়া দেয়। এই জন্য দিবা ও রাত্রিতে মাটীর উষ্ণতায় বিশেষ পার্থক্য হইবার কথা। কিন্তু ভূগর্ভের মধ্যস্থিত উত্তাপ আসিয়া ঐ নষ্ট উত্তাপের অভাব আংশিক ভাবে পূরণ করিয়া দেয়। এই কারণেই বায়ুর তাপ অপেক্ষা মাটীর তাপ অধিক। যে মাটীর তাপ যত কম, সূর্য্যের উত্তাপে সেই মাটী তত বেশী গরম হয়। যে মাটীর জল ধারণ করিবার শক্তি অধিক, সেই মাটীর তাপ ধারণ করিবার ক্ষমতাও অধিক।

মাটীকে অনেক রকমে ভাগ করিয়া বিভিন্ন প্রকার মাটীর বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত নামগুলি তোমরা জানিয়া রাখ।

(১) **বেলে মাটী**—এই মাটীতে শতকরা ১০ ভাগের বেশী কাদা থাকে না। ইহাকে হাল্‌কা মাটীও বলে। কারণ, ইহাতে চাষবাসের জন্য কৃষি-যন্ত্রাদির দ্বারা কাজ করা সহজ। এই মাটীতে বালির ভাগ বেশী থাকার জন্য মাটীর কণাগুলির মধ্যে জল বা বাতাস চলাচলের যথেষ্ট জায়গা আছে। এই মাটী জল ধারণ করিতে পারে না। কাজে কাজেই, শীঘ্রই নীরস হইয়া পড়ে। ইহার জন্য ইহার ভিতরকার তাপও অধিক হয়। যদিও এই প্রকারের মাটী কৃষিকার্য্যের পক্ষে নিকৃষ্ট, তথাপি প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া এই মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি বাড়াইতে পারা যায়। কারণ, এই প্রকার হাল্‌কা মাটীতে অনেক প্রকারের জীবাণু জন্মায় এবং উহারা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারে। সাধারণতঃ সমুদ্র ও নদীর তীরবর্তী স্থানেই এইরূপ মাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) **এঁটেল মাটী**—এই মাটীতে কাদার অংশ শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক। এই মাটীতে কৃষি-যন্ত্রাদি চালাইতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এই মাটীর কণাগুলি খুবই সূক্ষ্ম এবং পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে বলিয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্য দিয়া জল ও বাতাস অতি কষ্টে চলাচল করিতে পারে। এই জন্যই এই মাটীর জল ধারণের ক্ষমতা অতি অধিক এবং এইরূপ মাটীর উপর বর্ষার সময় জল দাঁড়াইয়া থাকে। এই মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি বালি মাটী অপেক্ষা অধিক। এই মাটীর উষ্ণতা অল্প; ইহাকে ভিজা বা ঠাণ্ডা মাটী বলে।

(৩) **দো-আঁশ মাটী**—এই মাটীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে মাটীতে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কাদা থাকে, তাহাকে দো-আঁশ বলে। যাহাতে শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ কাদা থাকে, তাহাকে বেলে দো-আঁশ এবং যাহাতে কাদার অংশ শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ, তাহাকে দো-আঁশ বেলে মাটী বলে। দো-আঁশ মাটীর উৎপাদিকা শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা সহজে কর্ষণ করা যায়।

(৪) **চুণা মাটী**—এই মাটীতে চূণের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ চূণ আছে তাহার নাম Marley soil বা কঙ্করময় মাটী। এই মাটীও খুব হাল্‌কা। এই মাটীর রঙ্‌ কখন কখন শাদা হইয়া থাকে।

(৫) **উদ্ভিজ্জাত মাটী**—নানা রকমের উদ্ভিদ্‌ পচিয়া মাটীতে পরিণত হয়। এইরূপ উদ্ভিজ্জাত মাটী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ মাটীতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক উদ্ভিজ্জাত পদার্থ থাকে।

বাংলার মাটীর গুণেই আমাদের দেশের শ্রী এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর। তোমরা বাংলার মাটীকে ভালবাসিতে শিখিও। আমাদের বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান্‌!



ইতরা

বৈদিক আখ্যান

(১)

ভারতীয় ইতিহাসের যখন উষাকাল, তখন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহিদাস। তাঁহার নাম কেন মহিদাস হইয়াছিল, তাহা পরে বলিব। এই মহিদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহিদাসের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন একমাত্র বেদের কথাই সকলে জানেন কিন্তু এই বেদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের লেখা নহে—তাহা একমাত্র ঈশ্বরের বাণী বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ মনে করেন। সে-কালের ঋষিরা ভূত ভবিষ্যৎ সবই দেখিতে পাইতেন, একটু চিন্তা করিবামাত্র তাঁহাদের মুখ হইতে বাণী বাহির হইত। এই বাণী তাঁহারা লিখিয়া রাখিতেন না। তাহার সমস্ত তাঁহাদের মনে থাকিত। শিষ্যের পর শিষ্য ক্রমে সেই সব বাণী মুখে মুখে চলিয়া আসিত। এইজন্য বেদের আর এক নাম শ্রুতি।

এই বৈদিক যুগে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম আমরা জানি না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ঋষি বলিতে আমরা যেরূপ বুঝি, তিনি সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার অনেকগুলি স্ত্রী ছিল এবং তিনি ছিলেন রীতিমত সংসারী। সংসারের নানারূপ আমোদ-আহ্লাদে কাল কাটাইতেন। ঐ মুনির স্ত্রীগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইতরা। আমরা এখানে এই ইতরা মাতার কথাই তোমাদিগকে বলিব।

স্বামীর প্রকৃতি অন্যরূপ হইলেও ইতরা সকল রকমে স্বামীর মন জোগাইয়া চলিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বামীর ভালবাসা পান নাই। অন্যান্য ঋষিপত্নীর মত তাঁহার প্রাণ পৃথিবীর সুখে তৃপ্ত হইত না। তিনি সর্ব্বদাই স্বামীকে ঠিক পথে আনিবার চেষ্টা করিতেন ; কত মধুর কথায় স্বামীর ভুল বুঝাইয়া দিতেন ; কিন্তু তাঁহার স্বামীর প্রকৃতি একে উগ্র, তার উপর তিনি তাঁর পার্থিব সুখের বাধা মনে হওয়ায় তিনি স্বামীর বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। ক্রমে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। বড়ই দুঃখে ইতরার দিন কাটিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে ইতরার একটি ছেলে হইয়াছিল। ভূমিদেবীর পূজা করিয়া তিনি সেই পুত্ররত্নটি পাইয়াছিলেন, এইজন্য ইতরা সেই ছেলেটির নাম রাখিয়াছিলেন, মহিদাস। ইতরা পুত্রটিকে আশ্রয় করিয়া স্বামীর আশ্রমের নিকটেই, একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সতী স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারেন না। দিনান্তেও একবার স্বামীকে দেখিতে পাইবেন, এই কামনা করিয়াই তিনি স্বামীর তপোবনের নিকটে পুত্রটিকে লইয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইতরা স্বামীর শুভবুদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, দিনান্তে একবারের জন্যও স্বামীর চরণ দর্শন করিয়া তবে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন এবং সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া ভূমিদেবীর পূজা করিতেন। এত কষ্টেও ইতরা সন্তানের ফুলের মত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া

পাইতেন। ছেলেটির মুখে চোখে অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া ইতরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

ক্রমে মহিদাস বড় হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, যাহা শোনেন তাহা তৎক্ষণাৎ শিখিয়া ফেলেন। দুখিনীর সন্তান বলিয়া অপরাপর মুনিগণ বিশেষ যত্ন করিয়া মহিদাসকে নানারকম শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের শিক্ষার গুণে অল্পদিনেই মহিদাস অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিলেন। একদিন মহিদাস মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমার বাবা কোথায়? আমার বাবাকে এখানে দেখিতে পাই



মা, আমার বাবা কোথায়?

না কেন? ইতরা কাঁদিয়া বলিলেন, বাছা! তোমার পিতা এখানে থাকেন না। তবে তিনি নিকটেই থাকেন। এই আশ্রমের অপর পার্শ্বে ঐ যে একটি মনোহর আশ্রম দেখিতেছ, ঐ আশ্রমেই তিনি তাঁহার অপরাপর স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করেন।

মা'র এই বিষাদ-কাতর কথা মহিদাসের প্রাণে বাজিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, মা! আমি আজই বাবার পায়ের ধূলা লইয়া আসিব। মাতা ইতরা কাঁদিয়া বলিলেন, বাবা মহিদাস! তোমার সেখানে যাইয়া কাজ নাই, তুমি তোমার বাবার পরিত্যক্তা স্ত্রীর পুত্র; কি জানি, যদি তিনি অভাগিনীর কপাল দোষে তোমাকে আদর না করেন, তবে এই বেদনা যে আমার প্রাণে শেলের মত বাজিবে! বাবা! আমি এ আঘাত সহ্য করিতে পারিব না। তাই বলি যাদু, তোমার পিতাকে প্রণাম করিতে যাওয়ায় কাজ নাই! মহিদাস কিন্তু মার এই কথা শুনিলেন না। তিনি পিতাকে প্রণাম করিবার জন্য সেই আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন।

মহিদাস সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই এক যজ্ঞশালা দেখিতে পাইলেন। সেই যজ্ঞশালায় যে সকল মুনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে আহুতি মন্ত্র শুনিতে শুনিতে তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যজ্ঞীয় ঘৃতের মধুর গন্ধে তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞভূমি হইতে যে ধূম উঠিতেছে—মহিদাস দেখিলেন, স্বর্গের দেবতাগণ সেই ধূমের পথ ধরিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছেন। মহিদাস পুলকিতচিত্তে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, সেই যজ্ঞশালার দ্বারদেশে এক ঋষি কতকগুলি শিশুপুত্র লইয়া বসিয়া আছেন। ঐ ছেলেগুলির মধ্যে কেহ তাঁহার কোলে বসিয়া আছে, কেহ তাঁহার পিঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা তাঁহার কাঁধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া মহিদাসের মনে হইল, ইনিই তাঁহার পিতা। এইরূপ মনে হইবামাত্র মহিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন ও অন্যান্য বালকগণের ন্যায় পিতার কোলে বসিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঋষি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ওরে পরিত্যক্তার পুত্র! তুই এই বালকদের ন্যায় আমার কোলে বসিবার উপযুক্ত নহিস্; তুই এখান হইতে দূর হ।

পিতার এইরূপ তিরস্কার ও অনাদর পাইয়া মহিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিনয় বচনে বলিলেন, বাবা! আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে—আমি আপনার পায়ের ধূলা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আমি আর আপনার কোলে বসিতে চাহি না—আমি মার নিকট চলিলাম। এই বলিয়া মহিদাস

মুখখানি শুষ্ক করিয়া মাতার নিকট চলিয়া আসিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালায় আরো অনেক মুনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মহিদাসের শুষ্ক মুখ দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তখন ত আর কেহ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। সন্তানের পিতা যাঁহারা—তাঁহারাই সেই সরলপ্রাণ বালকের মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিলেন। মহিদাস কয়েক



মহিদাস মুখখানি শুষ্ক করিয়া মার নিকট আসিলেন

পদ অগ্রসর হইয়া রাগে দুঃখে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বাবা! আপনি মোহে অন্ধ হইয়া আমার দুঃখিনী মাকে ত্যাগ করিয়াছেন—আমার প্রাণে বেদনা দিলেন; তাই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এমন কাজ করিব—যাহাতে লোকে আপনার কথা ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু আমার মায়ের নাম লোকের মনে চিরকাল জাগিয়া থাকিবে।

এই বলিয়া মহিদাস সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন এবং মার কোলে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন। মা ইতরা পুত্রকে বুকে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং আদর করিয়া বলিলেন বাবা মহিদাস! তুমি সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যাও। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, তোমার পিতা তোমার সমাদর করিবেন না। সুতরাং যাহা পূর্ব্বেই অনুমান করা হইয়াছিল, তাহার জন্য কাঁদিয়া ফল কি, বাবা! তোমার পিতা ত মিথ্যা কথা বলেন নাই—তুমি ত পরিত্যক্তার পুত্রই মহি! তবে তুমি তাহার জন্য দুঃখিত হইতেছ কেন?

মায়ের এইরূপ স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া মহিদাস চোখের জল মুছিলেন। পরে অভিমানের সহিত মাকে বলিলেন, মা! বাবা যখন আমাকে কোলে বসিতে দিলেন না, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি,—বাবা! আপনি অন্যায় করিয়া আমার মাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সন্তানের অবশ্যপ্রাপ্য যে পিতৃক্রোড়, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলেন, এইজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এমন কাজ করিব—যাহাতে লোকে শেষে আপনাকে চিনিবে না, কিন্তু যতদিন বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা থাকিবে, ততদিন আমার মাতার কথা কেহ ভুলিবে না।

সৌভাগ্য-গর্ব্বে মাতার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সত্য মহি! তুই কি এমন কাজ করিতে পারিবি? মহিদাস বলিলেন, পারিব না কেন মা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি আমার সেই কথা পূর্ণ করিতে পারি। মা! এখন বল ত, কি করিলে আমি পৃথিবীর সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব?

মা বলিলেন, বাবা! ভূমিদেবীর বরে আমি তোমাকে পাইয়াছি। তিনি সর্ব্ববিদ্যার সর্ব্ব ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কিছুরই অভাব হইবে না—তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া মাতা ইতরা পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(২)

নির্জ্জন বনভূমির এক প্রান্তে বসিয়া মহিদাস একমনে ভূমিদেবীর পূজা করিতেছেন। তাঁহার চোখে পলক পড়ে না—ভক্তির অশ্রু তাঁহার কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে—ওষ্ঠাধরে ভূমিদেবীর বন্দনা ফুটিয়া উঠিতেছে। মহিদাসের বাহ্যজ্ঞান

নাই। দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মাথার উপর তীক্ষ্ণ কিরণ বর্ষণ করিতেছে—সেদিকেও মহিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই। এরূপে চল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। সূর্য্যাস্তের সামান্য সময় মাত্র বাকী! এমন সময় গোধূলির সোণার আলোয় চারিদিক আলোকিত করিয়া ভূমিদেবী মহিদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। মহিদাস সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্ভূজা এক দেবী দক্ষিণের দুই হস্তে বরাভয় ও বাম দিকের দুই হস্তে শস্যগুচ্ছ লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেবীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন স্নেহের ঝরণা ছুটিতেছে; দেহের অপরূপ সৌগন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। অপরূপ সুর-গুঞ্জনে সেখানকার আকাশ বাতাস যেন মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, মাথার সোণার মুকুটে যেন কোটী সূর্য্য ঠিকরিয়া পড়িতেছে। মহিদাস চোখ খুলিয়াই জানিতে পারিলেন, ইনিই তাঁহার আরাধ্যা ভূমিদেবী! মহিদাসের সেই বিহ্বল ভাব দেখিয়া ভূমিদেবী মধুর হাসির আলোকে চারিদিক আলোকিত করিয়া বলিলেন, মহিদাস! তোমার আরাধনায় আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। তুমি কি বর চাও বল? মহিদাস বিনয়ের সহিত বলিলেন, মা! তুমি ত সবই জান, আমার মর্ম্মবেদনা বুঝিয়া আমাকে তার মত বর দাও। ভূমিদেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, বাছা আমার বরে তুমি সর্ব্ববিদ্যার অধিকারী হইবে। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে,—যত দিন পৃথিবীতে বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা থাকিবে, ততদিন তোমাদের মাতাপুত্রের নাম জগতের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে জলজল্ করিবে। এই জগতে সকলের চেয়ে বড় সত্য আর জ্ঞান; এই কথাটি মনে রাখিয়া তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ আরম্ভ করিবে। বাছা, তুমি বাক্‌সিদ্ধ হইবে—এখন হইতে তোমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে, তাহাই বেদমন্ত্র হইবে। এই বলিয়া ভূমিদেবী অন্তর্হিত হইলেন।

সহসা মহিদাসের মুখ হইতে 'অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ' —অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে (অর্থাৎ ভূমিতে) আছেন—এই বাণী বাহির হইল। মহাত্মা মহিদাস এই বাণী লইয়াই ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত তাঁহার ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থেরই নাম তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রাখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঐতরেয় আরণ্যক নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐতরেয় উপনিষদ্ এই ঐতরেয় আরণ্যকেরই অন্তর্গত। বাস্তবিকই লোকে মহিদাসের পিতাকে ভুলিয়াছে, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক **ইতরার পুত্রে** ও **ইতরাকে** অমর করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ শুভক্ষণে মর্ম্মপীড়িত সরল বালকের সেই অভিমানপূর্ণ কথা উচ্চারিত হইয়া পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃত্বের সেই মধুর অবদানকে ধন্য করিয়াছে—সার্থক করিয়াছে, তাহা বিধাতাই জানেন।

মহিদাসের লেখা অমূল্য গ্রন্থ দুই খানিতে ঐতরেয় শব্দ লিখিত দেখিয়া মাতা ইতরা একদিন বিস্ময়ের সহিত মহিদাসকে বলিয়াছিলেন, বাবা মহিদাস! শাস্ত্রে বলে—পিতা স্বর্গ; কিন্তু বাবা! তোমার এই গ্রন্থের কোথাও তোমার পিতার উল্লেখ না করিয়া তাহাতে তোমার এই অভাগিনী মাতার নাম সংযোগ করিলে কেন? মহিদাস হাসিতে হাসিতে সরল শিশুর মত বলিয়াছিলেন, মা! আমি যে 'পরিত্যক্তা' ইতরা-মাতার পুত্র। এই সৌভাগ্য লইয়াই আমি বাঁচিতে চাই। মা, সত্য বটে শাস্ত্র বলিয়াছেন, পিতা স্বর্গ, কিন্তু মা শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন—জননী যে "স্বর্গাদপী গরীয়সী।"

রাজার মেয়ের ভালবাসা

(পঞ্জাব দেশের রূপকথা)

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল চার মেয়ে। রাজা একদিন তাঁর বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আমায় কেমন ভালবাস মা? বড় মেয়ে বল্লেন বাবা, আমি তোমায় ভালবাসি মিষ্টি যেমন চিনি। মেজ মেয়ে বল্লেন, বাবা, আমি তোমায় ভালবাসি মধুর মত মিষ্টি। সেজ মেয়ে বল্লেন—আমি তোমায় সরবতের মত ভালবাসি, বাবা! আর সকলের ছোট্ট মেয়েটি দুষ্টু হাসি হেসে বল্লেন—সত্যি

কথা বল্‌ছি বাবা, আমি তোমায় নুণের মত ভালবাসি।

ছোট মেয়ের কথা শুনে রাজা ত চটেমটে বল্লেন—আবার ভেবে চিন্তে বলো, তুমি আমায় কেমন ভালবাস! ছোট মেয়ের সেই এক কথা, না বাবা, আমি ভেবে চিন্তেই বল্‌ছি—তোমাকে ঠিক নুণের মতই ভালবাসি!

রাজার হলো ভয়ানক রাগ! চিনির মত মধুর নয়, মধুর মত মিষ্টি নয়, সরবতের মত সুস্বাদু নয়, একেবারে নুণ! এমন দুষ্টু বেয়াদব মেয়েকে কখ্‌খনো রাজপুরীতে রাখতে নেই! রাজা দিলেন ছোট রাজকুমারীকে তাড়িয়ে একেবারে রাজধানীর বাইরের এক নিবিড় বনে।

ছোট রাজকুমারী এতে একটুকু বিচলিত হলেন না; তাঁর অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল যে, সে ত আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেনি—অন্তরে যা সত্য বলে মনে হয়েছে, সেকথাই ত বলেছে।

নিবিড় বন-পথ দিয়ে নির্ভীকভাবে ছোট রাজকন্যা যেতে লাগ্‌লেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, বেলা পড়ে এসেছে। ঘন বনের আড়াল দিয়ে সূর্য্যের শেষ



রাজা দেখ্‌লেন অপ্সরার মত অপূর্ব্ব সুন্দরী এক মেয়ে

আলো অতি ক্ষীণ রেখায় এসে বনের ভিতর পড়েছে! এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। রাজকন্যা ভয় পেলেন, কি জানি কোন্ দস্যু-ডাকাতের সাথে দেখা হয়! না জানি হঠাৎ কোন্ বিপদ ঘটে! তাই ভয়ে ভয়ে একটা বড় গাছের কোটরের ভিতর রাজকন্যা লুকিয়ে রইলেন! আঁচল কিন্তু দুল্‌তে লাগলো বাইরে!

দস্যু নয়, ডাকাত নয়, সে পথ দিয়ে তখন শিকার করে ফিরে যাচ্ছিলেন সে দেশের তরুণ রাজা। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, মস্ত বড় একটা গাছের কোটরের বাইরে সোণা মাণিকে ঝলমল—একখানি ময়ূর-পঙ্খী আঁচল! রাজা ভাবলেন—



বাবা! আমি তোমার ছোট মেয়ে

এই গভীর বনের ভিতরে কার এ আঁচল দুল্‌ছে? দেখ্‌তে হল! ঘোড়া থেকে নেমে সেই গাছের কাছে এসে রাজা দেখ্‌লেন অপ্সরার মত অপূর্ব্ব সুন্দরী এক মেয়ে! সারা বন, তার রূপে আলো হয়ে গেছে! রাজা রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে গেলেন, তার-পর খুব ধুমধাম করে তাঁকে বিয়ে করলেন।

কতদিন পরে রাজকন্যার বাবা এলেন, এই রাজার দেশে বেড়াতে। এই দেশের রাজার বাবার সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব! তিনি জানতেন না যে, তাঁরই ছোট মেয়ে এ রাজ্যের রাণী।

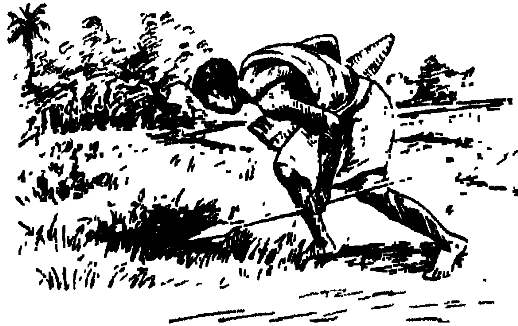
রাজা খেতে বসেছেন। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! সব ব্যঞ্জনই রান্না হয়েছে চিনি মিশিয়ে আর মধু দিয়ে। রাজা এক একটি ব্যঞ্জনে মুখ দিচ্ছেন, আর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, খেতে পাচ্ছেন না। মিষ্টি দিয়ে ব্যঞ্জন রাঁধে এ কি আজগুবি দেশ গো! মুখে কিছু বলতেও পার্চ্ছেন না লজ্জায়!—অথচ তাঁর কিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে! কি জানি, যদি এ রাজ্যের এমন নিয়ম থাকে, তবে ত ভয়ানক অপমান হবে। কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময় এল একথালা ভাত—আর ব্যঞ্জন,—ব্যঞ্জন সবই নুণ দিয়ে রান্না। রাজা এইবার মনের সুখে পেট ভরে খেলেন—আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন!

এইবার রাজকুমারী এসে দেখা দিলেন এবং পরিচয় দিয়ে বললেন,—বাবা আমি তোমার ছোট মেয়ে, আমি বলেছিলাম—তোমায় আমি ভালবাসি নুণের মত! বাবা! খাঁটি স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে বাইরের জাঁকজমক বা মিথ্যার ঠাঁই নেই—যা সত্য তা সহজ ভাবেই বেঁচে থাকে, মিথ্যা আসে অর্থহীন কথা নিয়ে! বাবা, পূর্ব্বেও যেমন বলেছি, এখনও তেমনি বলছি—আমি তোমাকে নুণেরই মত ভালবাসি! চিনির মতও নয়, মধুর মতও নয়—সরবতের মতও নয়!

রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। মুখে তার কথা নেই! বহুকাল পরে রাজা ও রাজকন্যার এই আশ্চর্য্য স্নেহময় মিলনে রাজবাড়ী উৎসব ও আনন্দে মেতে উঠলো!—বল দেখি, তোমরা তোমাদের বাবা ও মাকে কেমন ভালবাস? মধু, চিনি, সরবতের মত, না নুণের মত?

কাফ্রি দেশের রূপকথা

উন্‌কামার বাড়ী দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট একটি গ্রামে। সে জাতিতে কাফ্রি। কাফ্রি যুবক উন্‌কামা ছিল ভয়ানক সাহসী, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে সে শিকার করে বেড়াত। ভয় কাকে বলে, সে ত জানতো না। কয়েকদিন সে ভোরে উঠে দেখতে পেত যে, তার সাজানো ফুল-ফলের বাগানের গাছ-পালা কোন্ জন্তু-জানোয়ার এসে যেন একেবারে



উনকামাও সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকলো।

তছনছ করে গেছে। উন্‌কামার হ'ল ভয়ানক রাগ। সে পণ করলো, যেমন করেই হোক ঐ জানোয়ারকে সাজা দিতে হবে। রাত্রি জেগে সে তার বাগান পাহারা দিতে লাগলো।

একদিন রাত্রি ভোর হয়-হয়। এমন সময় দেখতে পেল যে, একটা অদ্ভুত আকৃতির জানোয়ার বাগানের ফুল-ফল সব নষ্ট কচ্ছে। সে অমনি ছুটলো তার পিছনে। নদীর পারে গর্ত্তের ভিতর যেমন সেই অদ্ভুত জানোয়ারটা ঢুকলো, উন্‌কামাও অমনি সেই গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করলো। যেতে যেতে সে এলো পাতালপুরীর এক অদ্ভুত দেশে। অদ্ভুত সেই জানোয়ারের আর পাত্তা মিললো না। কোথায় যে সেটা লুকোলো, পাতি পাতি করে খুঁজেও উন্‌কামা তার সন্ধান পেলে না।

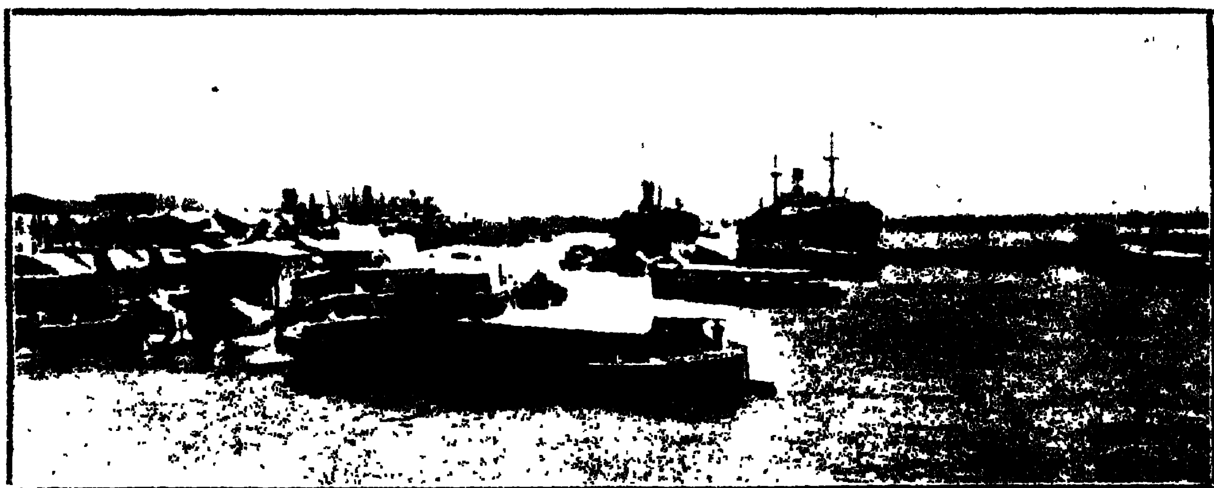
সেই পাতালপুরীতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে উন্‌কামার সঙ্গে দেখা হ'ল একদল বামনের সঙ্গে। সেই সব বেঁটে বেঁটে জোয়ান জোয়ান বামন বীরেরা ঝুঁকে পড়লো উন্‌কামার উপর। বামনেরা সব হৈ চৈ চীৎকার করে উন্‌কামাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে লাগলো। বেচারা দেখলে মহা বিপদ! প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আবার সে ফিরে এলো সেই যে গর্ত্ত, সেই গর্ত্তের পথ দিয়ে তার দেশের বাড়ীতে।

উন্‌কামাকে তার গাঁয়ের লোক কেউ চিনতে পারলো না। গ্রামের বুড়ো বুড়ো

পৃথিবীর ছয়টি বড় বাণিজ্য-বন্দর



হংকং বন্দর



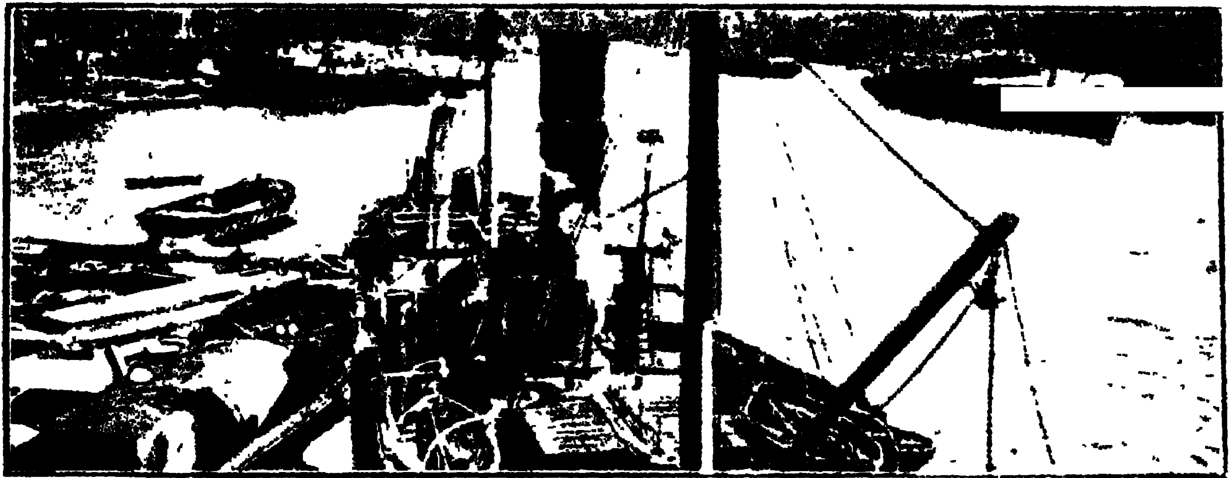
কলিকাতা বন্দর



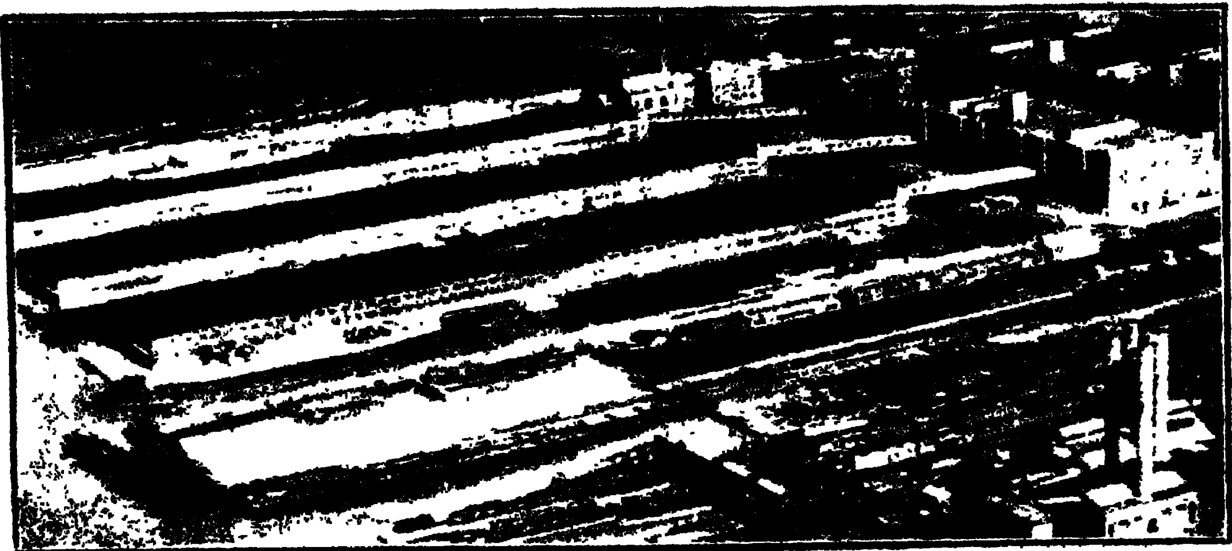
এপোলো বন্দর—বম্বে



হ্যামবার্গ বন্দর



লণ্ডন বন্দর



নিউইয়র্ক বন্দর

লোকেরা তার নাম শুনে বল্‌লে—হ্যাঁ, ছেলেবেলা অমন ধারা একটা নাম শুনেছিলুম মনে পড়ে বটে।



তুমি যে সেই লোক, তা কেমন করে বল্‌বো?

তা আমরা ত তাকে কখনো দেখিনি; শুনেছি যে নদীর ধারের একটা গর্তের ভিতর দিয়ে সে কোথায় চলে গিয়েছিল। তুমি যে সেই লোক, তা কেমন করে বল্‌বো? উন্‌কামা বল্‌লে, আমার স্ত্রী কি বেঁচে আছে?

গ্রামের লোকেরা বল্‌লে—হাঁ, সে বুড়ী বেঁচে আছে, তার বয়স একশো বছরের কম হবে না।

উন্‌কামার সাথে শেষে তার স্ত্রীর দেখা হ'ল। বেচারী হয়ে গিয়েছিল বাস্তবিকই ভয়ানক থুব্‌থুরে বুড়ী। অনেক কথার পর বুড়ী তাকে চিন্‌তে পারলো। দু'জনে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হ'ল। উন্‌কামার ছোট শিশুটি এখন জোয়ান হয়েছে কিন্তু উন্‌কামার কাছে তাকেও মনে হয় যেন সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। উন্‌কামা সেই যৌবনে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি আছে।

বাণিজ্যের পুঁজি

অনেক দিন আগের কথা। একজন শ্রেষ্ঠী বণিক ছিল। ধনে মানে কুলে শীলে সে শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া তাহার পরিচয় ছিল শ্রেষ্ঠী। সেই শ্রেষ্ঠীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তার স্ত্রীকে তাড়াইতে পারিলে শ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তি তাহার জ্ঞাতিদের হইতে পারে, এই লোভের বশবর্তী হইয়া উহার জ্ঞাতিরা সেই শ্রেষ্ঠীর বিধবা স্ত্রীকে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। অবলা নিঃসহায়া স্ত্রীলোকটি ধূর্ত কুটিল জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না।

কোথায় যাইবে, কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া সে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। বিপদে পড়িয়া ভয়ে দুঃখে বিহ্বল হইয়া সে পথ চলিতে লাগিল। পথের মধ্যে তাহার এক পুত্র জন্মিল। পথে জন্ম হইল বলিয়া সেই রমণী তাহার পুত্রের নাম রাখিল পন্থক। সে শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া তাহার স্বামীর এক বন্ধু কুমারদত্তের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিজের পরিচয় না দিয়া তাহার স্বামীর বন্ধুর গৃহে দাসীর কাজ গ্রহণ করিল।

দাসীর কাজের কঠিন পরিশ্রম করিয়া সে আপনার পুত্রকে লালনপালন করিতে লাগিল। পন্থক একটু বড় হইলে তাহার মাতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য চিন্তিত হইল। পন্থক ভদ্রলোকের সন্তান। অবস্থার ফেরে পড়িয়া তাহার মাতাকে দাসীবৃত্তি করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু সে তো তাহার পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখিতে পারে না। সে কষ্টকর দাসীকর্মের সামান্য উপার্জন হইতে অর্থ-সঞ্চয় করিতে লাগিল—পুত্র বড় হইলে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।

লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইলে পন্থকের মাতা এক গুরুমহাশয়ের কাছে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিল। পন্থক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীকুলের সন্তান, তাহার বুদ্ধি মেধা তীক্ষ্ণ ছিল, সে অল্প-দিনের মধ্যেই লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিয়া হিসাব রাখিতে শিখিয়া ফেলিল।

একদিন পন্থকের মা তাহার পুত্রকে বলিল—তুমি বণিকের ছেলে। ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারার মতন বিদ্যা তুমি অর্জন করিয়াছ। এখন তোমার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই নগরে বিশাখিল নামে একজন মহাশ্রেষ্ঠী আছেন, তিনি মহাধনশালী এবং দয়ালু। তিনি সংকুলজাত অথচ দরিদ্র বণিক-দিগকে মূলধন সাহায্য করিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা করিয়া দেন। তুমি তাঁহার কাছে

F. 6

গিয়া কিছু মূলধন প্রার্থনা কর, এবং তাহা লইয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ কর। কোথাও কাহারও কাছে চাকরী করিও না; চাকর হওয়ার যে কত কষ্ট ও কত লাঞ্ছনা, তাহা তো আমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ।

পন্থক মাতার আদেশে বিশাখিলের নিকট বাণিজ্যের পুঁজি কিছু টাকা প্রার্থনা করিবার জন্য যাত্রা করিল।



এমন সময়ে সে দেখিল, পন্থক একটা মরা ইঁদুর হাতে করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছে

পন্থক যখন বিশাখিলের বাড়ীতে তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন শুনিল বিশাখিল ক্রুদ্ধ-স্বরে কোনও বণিক্ যুবককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—তোমাকে আমি কত বার কত টাকা দিলাম, কিন্তু তুমি এমনই অপদার্থ যে, সেই মূলধন বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বারম্বার একেবারে নিঃস্ব হইয়া আসিয়া পুনরায় আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ। এত টাকা জলে দিয়া তুমি আবার আমার নিকটে অর্থ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ। তোমার মুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না। এত টাকা বারম্বার লইয়াও তুমি কিছু করিতে পারিলে না। কিন্তু যে লোক বুদ্ধিমান্ হিসাবী হয় সে এই যে ইঁদুরটা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে উহাকেই মূলধন করিয়া মহাধনবান্ হইয়া উঠিতে পারে।

ক্রুদ্ধ বিশাখিলের এই কথা শুনিবা মাত্র পন্থক তাড়াতাড়ি সেই মরা ইঁদুরটাকে হাতে তুলিয়া লইয়া বিশাখিলকে প্রণাম করিল এবং বলিল—আমি আপনার নিকট হইতে বাণিজ্যের মূলধন স্বরূপ এই মরা ইঁদুরটি ঋণ গ্রহণ করিতেছি। আপনি ইহা আমাকে ঋণ স্বরূপ দান করুন।

যুবক পন্থকের বাক্য শুনিয়া বিশাখিল হাস্য করিলেন, এবং তাহার প্রস্তাবে কোনও আপত্তি না করিয়া তাহাকে সেই মরা ইঁদুরটি ঋণ দিলেন। পন্থক ঋণের দলিল তমসুক লিখিয়া দিয়া ইঁদুরটিকে লইয়া চলিয়া আসিল।

এক দোকানদার তাহার দোকানে ইঁদুরের উৎপাতে জ্বালাতন হইয়া এক বিড়াল পুষিয়াছিল। সেই বিড়াল দোকানের সব ইঁদুর বধ করিয়া দোকানটিকে রক্ষা করিয়াছিল। এখন আর দোকানে একটিও ইঁদুর নাই; বিড়াল এখন খায় কি? দোকানদার বিড়ালের খাইবার জন্য কোথাও একটা ইঁদুর খুঁজিতেছিল। এমন সময়ে সে দেখিল, পন্থক একটা মরা ইঁদুর হাতে করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছে। সে পন্থককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওহে ছোকরা, তোমার হাতের মরা ইঁদুরটা আমাকে দাও না, আমি তোমাকে গুড়-ছোলা জল খাইতে দিব।

পন্থক গুড়-ছোলার বদলে সেই মরা ইঁদুরটা দোকানদারকে দিল।

তাহার পরে পন্থক সেই গুড়-ছোলা নিজে খাইয়া ফেলিল না। সে তাহা লইয়া নগরের বাহিরে যে পথ বনের দিকে গিয়াছে সেই পথের ধারে এক গাছের ছায়ায় গিয়া বসিল। সেই পথে অনেক কাঠুরিয়া প্রত্যহ বনে কাঠ কাটিতে যায় অনেক ঘেসেড়া ঘাস কাটিতে যায়, অনেক মালী বনে ফুল তুলিতে যায়। পন্থক গুড়-ছোলা আর জল লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত কাঠুরিয়া, ঘেসেড়া আর মালীরা তাহার কাছে আসিয়া গুড় ছোলা খাইয়া জলপান করিল, এবং তাহাদের নিজেদের বোঝা হইতে প্রত্যেক কাঠুরিয়া দুখানি করিয়া কাঠের চেলা, প্রত্যেক ঘেসেড়া এক এক আঁটি ঘাস আর প্রত্যেক মালী কতকগুলি করিয়া ফুল পন্থককে মূল্যস্বরূপ উপহার দিয়া গেল।

পন্থক সেই কাঠ, ঘাস আর ফুল আনিয়া নগরে বিক্রয় করিল, এবং তাহাতে যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া সেই দোকানদারের দোকান হইতে গুড়-ছোলা ক্রয় করিল, এবং তাহার পরদিনও আবার পূর্ব্বের মতন পথপার্শ্বে জলসত্র খুলিয়া বসিল।

একদিন কাঠুরিয়া, ঘেসেড়া ও মালীরা অধিক পরিমাণে গুড়-ছোলা খাইতে পাইল বলিয়া পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মককে অধিক কাঠ, ঘাস ও ফুল দিল এবং মালীরা অধিকন্তু কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছও উপহার দিল।

এই কাঠ, ঘাস, ফুল আর ফুল-গাছ বেচিয়া সেদিন পদ্মক এক টাকা পুঁজি করিল।

এর পরের দিন নগরে অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হইল। রাজার বাগানে অনেক গাছের শুক্‌না ও কাঁচা ডাল ভাঙিয়া পড়িল। মালী বেচারা কেমন করিয়া এত আবর্জনা একাকী সরাইবে ইহা চিন্তা করিতেছিল। পদ্মক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে বলিল—যদি তুমি আমাকে এই সমস্ত বিনামূল্যে লইয়া যাইতে দাও, তাহা হইলে আমি তোমার বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।

মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

তখন পদ্মক যেখানে ছেলেরা খেলা করিতেছিল সেখানে গেল, এবং ছেলেদের বলিল -তোমরা এখানে এ কি বাজে পচা খেলা করিতেছ? আমার সঙ্গে তোমরা এসো, আজ রাজার বাগান সাফ করার খেলা করা যাক। আর সেই খেলার পরে আমি তোমাদের গুড়-ছোলা দিয়া জল খাওয়াইব।

ছেলেদের কাছে তিনটি প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইল--নূতন খেলা। রাজার বাগানে তাহারা কখনো প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে প্রবেশের সুযোগ; তাহার উপর আবার গুড়-ছোলা খাওয়া! তাহারা মহা-উল্লাসে কলরব করিয়া তখনই পদ্মকের অনুসরণ করিল।

অনেক ছেলের সাহায্যে রাজার বাগান সত্বর পরিষ্কার হইয়া গেল, এবং অল্প খরচে পদ্মকের অনেক কাঠ লাভ হইল।

সেদিন তো কোনও কাঠুরিয়া বনে যাইতে পারে নাই। নগরে কাঠের অনটন হইল। এক কুম্ভকার ষোল টাকা আর কয়েকটা হাঁড়ির বিনিময়ে পদ্মকের সব কাঠ কিনিয়া লইল।

পদ্মক প্রত্যহ গুড়-ছোলা ও জল লইয়া নগরের বাহিরে পথিকদের পিপাসা ও ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিল। সকলে তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা পদ্মকের মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রত্যহ বলিতে লাগিল—আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন, বলুন, আপনাকে কি করিয়া সাহায্য করিতে পারি?

পদ্মক বলিল—ইহার জন্য তোমরা এত ব্যস্ত হইতেছ কেন। আমি আর তোমাদের কি উপকার করিতেছি? তোমরা তো মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিতেছ।

কিন্তু ঘেসেড়ারা পদ্মককে সাহায্য করিতে নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন পদ্মক বলিল—আচ্ছা, যদি তোমরা আমাকে সাহায্য করিবেই, তবে আমি আবশ্যক হইলে জানাইব।

এই সময়ে পদ্মকের সহিত দুইজন বণিকের বন্ধুত্ব হইল, তাহাদের একজন স্থলপথে ও অপরজন জলপথে বাণিজ্য করিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে।

একদিন স্থলপথ-বণিক পদ্মককে সংবাদ দিল—ভাই পদ্মক, কাল একজন অশ্ববিক্রেতা পাঁচ শত অশ্ব লইয়া এই নগরে আসিবে।

এই সংবাদ পাইয়া পদ্মক সেই ঘেসেড়াদের বলিল—ভাই, কাল তোমরা প্রত্যেকে আমাকে এক এক আঁটি করিয়া ঘাস উপহার দিবে, আর আমার সেই ঘাস সব বিক্রয় হইয়া না গেলে তোমরা তোমাদের ঘাস বিক্রয় করিবে না।

ঘেসেড়ারা তাহাতেই সম্মত হইল;

অশ্ব-বণিক তাহার ঘোড়া লইয়া নগরে আসিল। সে আর কোথাও ঘাস না পাইয়া অধিক মূল্য দিয়া পদ্মকের সব ঘাস কিনিয়া লইল। ইহাতে পদ্মকের হাজার টাকা লাভ হইল।

ইহার কয়েকদিন পরে পদ্মক তাহার বন্ধু জলপথ-বণিকের কাছে শুনিল যে, বন্দরে একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিতেছে। তখন সে একটুও বিলম্ব না করিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিল এবং সেই বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইল। সে এতদিনে যে পুঁজি জমা করিয়াছিল, তাহা দিয়া সে একটা বড় তাঁবু আর অনেক চাকর ভাড়া করিল। চাকরদের জন্ত খুব ভালো ভালো দামী ও জমকালো উর্দি ভাড়া করিয়া আনিয়া উহাদের পরিতে দিল। সেই-সব চাকর সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সে জাহাজের বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সেই বণিক পদ্মকের ভৃত্যদের জমকালো দামী পোষাক দেখিয়া অনুমান করিল পদ্মক নিশ্চয় মহাধনী মহাশ্রেষ্ঠী হইবে। পদ্মক জাহাজের

বণিকের সমস্ত পণ্য একা ক্রয় করিবে শুনিয়া বণিকের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। পন্থক তাহার পুঁজির হাজার টাকা বায়না দিয়া সব পণ্যদ্রব্যে নিজের নামাঙ্কিত সীল-মোহর করিয়া দিল, যাহাতে অপর কোনও বণিক্ আসিয়া সেই মালের কোনও অংশ ক্রয় করিতে না পারে।

পন্থক নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ভৃত্যদের বলিয়া রাখিল যে, কোনও লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সেই ব্যক্তি তাঁবুর এক এক ঘর পার হইয়া শেষের ঘরে তাহার কাছে যখন আসিবে, তখন এক এক ঘরে এক একজন ভৃত্য যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসে, এবং একে একে তিন জন আরদালি একত্র হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার কাছে লইয়া আসিবে।

বন্দরে বড় জাহাজ আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া নগরের যত বণিক্ যখন পণ্য কিনিবে বলিয়া বন্দরে আসিল, তখন তাহারা শুনিল যে, একজন কোন্ মহাশ্রেষ্ঠী সমস্ত পণ্য বায়না করিয়া নিজের নামাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাহারা অনুসন্ধান করিয়া পন্থকের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পন্থকের শিবিরের ঘটা, সাজ-সজ্জা ঐশ্বর্য্য এবং আরদালি, চোপদার, ভৃত্য প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহারা মনে করিল এই মহাশ্রেষ্ঠী নিশ্চয়ই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তাহারা একে একে সকলে পন্থকের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং পণ্যের এক এক অংশের জন্য এক এক হাজার টাকা লাভ দিতে স্বীকার করিল।

এইরূপে পন্থক সমস্ত পণ্য ঐ-সকল বণিক্কে বিক্রয় করিয়া বিনাব্যয়ে বা অতি অল্পব্যয়ে দুই লক্ষ টাকা লাভ করিল এবং সেই টাকা নগদ লইয়া সে নগরে আপন মাতার নিকটে ফিরিয়া গেল।

পন্থক ধনবান হইয়া প্রথমেই মাতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সসম্মানে ও সমাদরে আপন নূতন ভবনে আনয়ন করিল। কিন্তু সে তাহার শিক্ষা-দাতা ও বাণিজ্যের মূলধন-দাতা মহাজন বিশাখিলকে ভুলে নাই। সে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি সোনার ইঁদুর গঠন করাইল এবং সেইটিকে হাতে করিয়া পূর্ব্বের মতন অতি দীন ও বিনীতভাবে বিশাখিলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

বিশাখিল তাহার হাতে সোনার ইঁদুর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন



সোনার ইঁদুর হাতে করিয়া অতি দীন ও বিনীত ভাবে বিশাখিলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল

পন্থক তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিয়া বিশাখিলকে তাঁহার উপদেশ ও সাহায্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

বিশাখিল পন্থকের বাণিজ্য-কৌশল, ব্যবসায়ে পটুতা ও তাহার ঋণ-স্বীকারের সততা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পন্থকের সেই সুবর্ণ ইঁদুরটি পন্থকের কৃতিত্বের পরিচায়ক-চিহ্ন বলিয়া সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে ঋণমুক্ত করিয়া তাহার দলিল তমসুক তাহাকে ফেরত দিলেন এবং তাহার পরে নিজের কন্যার সহিত পন্থকের বিবাহ দিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

অর্থের দ্বারা সঞ্চয়শীল ব্যক্তি অর্থশালী হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই; কিন্তু অর্থ বিনা, কেবল কৌশল, উদ্যম ও বুদ্ধির বলে পন্থক যে ধন অর্জ্জন করিয়াছিল, ইহার জন্য সে বিশাখিলের পরম প্রীতিভাজন হইয়া পরম সুখে জীবন-যাপন করিতে লাগিল। আর সকলের অপেক্ষা সুখী হইলেন পন্থকের মাতা পুত্রকে সুখী দেখিয়া।

এই গল্পটি সংস্কৃত 'কথা-সরিৎসাগর' নামক গ্রন্থে ও পালি 'জাতকে' ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে।



স্বাস্থ্যের মূল কথা

তোমরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়া থাক এবং নিজেরাও বিশ্বাস কর যে, স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য ব্যায়াম করা উচিত। তোমাদের মনের কথা আমি এই জানি যে, সার্কাস বা অন্য কোন শক্তির খেলা দেখিলে সেই সব খেলোয়াড়ের মত শক্তিমান্ হইবার ইচ্ছা তোমাদেরও হয় এবং সেজন্য তোমরা অনেকেই নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাক; সেই সম্বন্ধে গোটাকতক মূল কথা তোমাদিগকে বলিব।

নিজের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে একটা সোজা কথা এই চোখে পড়িবে যে, দেহ গতির জন্য তৈয়ারী হইয়াছে, অস্থি ও পেশীর চমৎকার সমাবেশ গতির কথাটাই সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। জীববিজ্ঞানের দিক দিয়া গতিটা খুব বড় কথা। গতি জীবনের ভিত্তি, গতি না থাকিলে জীবজগতের কোন প্রাণীরই দেহে ক্ষয়পূরণের কাজ চলিতে পারে না। গতির অভাবে দেহ জড় হইয়া যায়, জড়তা ও মৃত্যু একই জিনিষ।

শরীর-বিজ্ঞানের কথা তোমরা মোটামুটি জান। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতির জন্য মস্তিষ্কে স্নায়ুর নিয়ামক কেন্দ্র আছে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি আমাদের দেহের সকল ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। সব কেন্দ্রগুলি সজাগ হয় দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইলে। আমরা যাহা আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে, আমরা দেহের ক্রিয়া ও স্নায়ুকেন্দ্রের সম্বন্ধ কি করিয়া ক্রমশঃ স্থাপন করি। এই ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কেবল খেলা ও ব্যায়ামের নয়- মানসিক ক্রিয়াগুলিরও মূল কথা।

জন্ম-মুহূর্ত হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৈহিক ক্রিয়ার সহিত মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের সম্বন্ধ স্থাপন অতি দ্রুত চলিতে থাকে। এই বয়সের মত মানুষের আর কোন সময়েই উদ্ভাবনা শক্তি এত প্রখর থাকে না। শিশুমনের কৌতূহলের অন্ত নাই এবং সেই কৌতূহলেই শিশুর নূতন নূতন উদ্ভাবনায়, নব নব আবিষ্কারের মূলে আছে। অতি শৈশবে শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছু থাকে না। সেই সময়ে পেশীর প্রকর্ষ ও অস্থির পুষ্টির জন্য জাগ্রত মুহূর্তগুলিতে হাত পা অবিরত নাড়ার দরকার হয়, স্নায়ুকেন্দ্র তখন শুধু উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়—যেমন শিশুর অসুবিধা বা অসুস্থ বোধ করিলে কাঁদা। শিশু যখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে শেখে তখন দাঁড়াইবার বা হাঁটিবার জন্য স্নায়ুকেন্দ্র অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠে। ঐ প্রক্রিয়াগুলিতে যে প্রথম চঞ্চলতা বা টলমলে ভাব থাকে তার কারণ আর কিছু নয়, স্নায়ুকেন্দ্র ও প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতার অভাব। বার বার চেষ্টায় বিশিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্রটি সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে ও দাঁড়ান বা হাঁটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া যায়। এই রকম করিয়া প্রত্যেকটি শারীরিক ক্রিয়া ও শিশুর নব নব আবিষ্কার নূতন নূতন স্নায়ুকেন্দ্রকে জাগাইয়া তোলে এবং ক্রিয়াগুলির অভ্যাসের সঙ্গে কেন্দ্রগুলিরও

পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশ হয়। নূতন কোন ক্রিয়ার সঙ্গে নূতন কেন্দ্রের উন্মেষ স্বতঃসিদ্ধ কথা।

কঙ্কালের অস্থিসমূহ প্রথমে অপরিপুষ্ট থাকে এবং শারীরিক নানা ক্রিয়ার দ্বারা সেগুলি ক্রমশঃ কঠিনতা পায়। অস্থি, পেশী ও স্নায়বিক কেন্দ্রের পরিণতি হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সময় লাগে পাঁচ বৎসর ও শীতপ্রধান দেশগুলিতে সাত বৎসর। সেই জন্য আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ



ব্যায়াম দ্বারা শরীরের গঠন

করিবার বয়স পাঁচ বৎসর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, শরীর ও মনের পরিণতির এই সময়টায়, অর্থাৎ তিন চার বৎসর বয়সে শিশুর মনে যে দাগ পড়ে সেটা ভবিষ্যতে কোন উপায়েই মুছিয়া ফেলা যায় না, সেই দাগ বা দাগগুলিকে ভিত্তি করিয়াই সে গড়িয়া উঠে।

এক বিখ্যাত আমেরিকান্ শিশুমনস্তত্ত্ববিদ্ (Hetherington) শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার অভিব্যক্তির চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি চক্ষুর সম্মুখে রাখিলে শিশু ও কিশোর-বয়স্ক বালকের সম্বন্ধে শিক্ষক বা পিতামাতা অনেক ভুলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। এই পণ্ডিতটি শিশুর • বয়স হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একটি শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার চার্ট তৈয়ারী করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথম তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর সব কাজে শারীরিক বৃত্তি পরিস্ফুট ও প্রধান। মানসিক বৃত্তির গোড়াপত্তন হয় পাঁচ হইতে সাত বৎসর বয়সে; বয়স যত বাড়িতে থাকে শারীরিক বৃত্তি অনুপাতে তত কম হইতে থাকে এবং মানসিক বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯ বৎসর বয়সে মানসিক প্রক্রিয়াই প্রধান হইয়া উঠে এবং দৈহিক বৃত্তি গৌণ হইয়া যায়। সব সুস্থ শিশু, বালক ও যুবক এই ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়া যাইতে বাধ্য। এটা তোমাদের বলা দরকার যে, আমরা সাধারণ সুস্থ মানুষের কথাই আলোচনা করিতেছি, তার সম্বন্ধেই এই সব কথা খাটে। কোন কারণে দেহ দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকিলে এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। সে ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক প্রকর্ষে বাধা পড়াই সম্ভব।

এ ত গেল ছেলেদের কথা। মেয়েদের বেলায় একটু ব্যতিক্রম ঘটে। মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি ছেলেদের তুলনায় অধিকতর দ্রুতগতিতে উৎকর্ষ লাভ করে। সেই কারণে খেলা বা লেখাপড়ায় তারা কতকটা বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের চেয়েও আগাইয়া চলে। আনুমানিক ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক ও বালিকা দৈহিক আকার, সংস্কার প্রভৃতিতে একেবারেই ভিন্ন থাকে না, ইহার পরে বিভিন্নতাটা প্রথম আসে।

• হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের রোগ-প্রবণতার যুগ। অবশ্য, সব সময়টাতেই রোগপ্রবণতা প্রখর থাকে না। সাধারণতঃ দেখা যায়, ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগপ্রবণতা খুব বেশী থাকে, এই বয়স

পর্য্যন্ত মৃত্যুর হারটাও অত্যন্ত বেশী। ৯ বৎসর বয়স পার হইলে রোগপ্রবণতা কম হইতে থাকে এবং অপরদিকে রোগকে বাধা দিবার শক্তিটাও ক্রমশঃ বাড়ে। সাধারণ নিয়ম এই বটে কিন্তু নানা স্বাস্থ্যকর উপায়ে, বিশেষ করিয়া চিকিৎসা ও শরীর-চর্চ্চার দ্বারা আমরা এই রোগপ্রবণতাকে যথেষ্ট বাধা দিতে পারি, কেননা এই বয়সের অধিকাংশ ব্যাধি একান্ত নিবার্য্য।

দেহের উৎকর্ষ নানা জিনিষের উপর নির্ভর করে। মূলতঃ ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, দেশের উচ্চতা (Sea-level), পরিবেষ্টন, খাদ্য প্রকৃতি এবং সামাজিক স্তর এই উৎকর্ষের নিয়ামক। দেহের কঙ্কাল মোটা ও দৃঢ় বা পাতলা ও দুর্ব্বল হওয়ার বিশেষ কারণ ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। এই কারণে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীর কঙ্কাল এক প্রকারের নয়। **সামাজিক স্তরও একটা খুব বড় জিনিস।** স্বচ্ছল ও শিক্ষিত ঘরের বালক-বালিকা খুব তাড়াতাড়ি দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করে, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েদের উৎকর্ষ আবার যথানিয়মে না হইয়া বিলম্বে হয়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এই যে, প্রায় তের বৎসর বয়সে এই দ্রুত বা গৌণ উৎকর্ষ এক মাপকাঠিতে আসিয়া দাঁড়ায়। শরীরচর্চ্চার দ্বারা আমরা এইগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি।

তের বৎসর বয়সের পরও পুরুষদেহ প্রায় পুরানো নিয়মেই চলে কিন্তু মেয়েদের বেলায় অদ্ভুত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হয়, সে-কথা অন্য প্রবন্ধে বলিব।

আমাদের দেহে অনেকগুলি প্রণালীযুক্ত ও প্রণালী-বিহীন গ্রন্থি আছে। প্রণালীযুক্ত গ্রন্থিগুলি আপনাদের বিশেষ বিশেষ রস মোক্ষণ করিয়া সোজাসুজি দেহের রক্তপ্রবাহে ঢালিয়া দেয়, প্রণালীবিহীন গ্রন্থিগুলি আপনার অন্তরে রসমোক্ষণ করে। এই গ্রন্থিগুলির শোষিত রসের উপর দেহের উৎকর্ষ অনেকটা নির্ভর করে।

এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ আমাদের কায়িক বা মানসিক উৎকর্ষের পথ শরীর দিয়া; শরীর সুস্থ থাকিলে প্রক্রিয়াগুলি শুধু অবিকৃত থাকে না, পরিপূর্ণ বেগে চলে। সেই কারণে দেহ সঞ্চালন জীব-বিজ্ঞানের মূল কথা। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা একথা জানিতেন বলিয়াই শরীর-সাধনাকে ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন।

উৎকর্ষের আর একটি মূল কথা—আমাদের দৈহিক উত্তরাধিকার। আমাদের জন্ম-সময়ে পিতা-মাতার মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে। সেই কারণে এক পিতামাতার দুটি সন্তান যে একই ভাবে গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই।



শরীর-চর্চ্চার দ্বারা দেহের উন্নতি

বিভিন্ন দেশে চিন্তা ও গবেষণার ফলে এবং কতকটা স্থান-কালের প্রয়োজন হিসাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নানা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন পদ্ধতির লক্ষ্য সম্পূর্ণ দৈহিক উৎকর্ষ ও অপরিমিত শক্তি লাভ করা, কোন পদ্ধতি বা দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, এবং কোন পদ্ধতি বা দেহটিকে সাধারণ নিয়মে সুস্থ রাখার জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে। এই বিভিন্ন লক্ষ্যের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ভালমন্দের বিচার শুধু আমরা বিশ্লেষণ দ্বারা করিতে পারি।

সব জিনিষই পরীক্ষা করিয়া লইবার উপায়ের প্রচলন আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নীতিতে কি থাকা উচিত এবং কি কি প্রক্রিয়ার সমন্বয় হওয়া উচিত, নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া নির্ণয় করিতে পারি। এই কয়েকটি প্রকরণ বা অংশ-বিভাগের উপর উপায়টি নির্ভর করে।

১। কঙ্কাল
২। পেশী
৩। রক্তপ্রবাহ
৪। পচন
৫। বহির্নিকাশ
৬। শ্বাস
৭। স্নায়ু
৮। অস্থির জোড়গুলির বিনা বাধায় কাজ করা।

ব্যায়ামের ফল

দেহের গঠনের উপর (গঠনশীল)

১—অস্থি, পেশী, রক্তপ্রবাহ ও স্নায়ু প্রকরণের উন্নতি করা ও সেগুলি পূর্ণ কার্যক্ষম করা।

২—দৈহিক দোষ সংশোধন করা।

৩—অস্থির জোড়গুলির উন্নতি করা।

৪—দেহ-ভঙ্গিমা (Posture) সংশোধন করা।

প্রক্রিয়ার উপর (ক্রিয়াশীল)

নিম্নলিখিত প্রকরণগুলির ঠিক কাজ করানো।
১—অস্থি
২—পেশী
৩—রক্তপ্রবাহ
৪—পচন
৫—বহির্নিকাশ
৬—শ্বাস
৭—স্নায়ু
৮—অস্থির জোড়ের বিনা বাধায় কাজ করা।
এই প্রক্রিয়ার গুণে সহ্য করিবার শক্তি ও গতি (agility) বৃদ্ধি পায়।

মানসিক

মনঃসংযোগ
সহযোগ
চরিত্র
সাহস
আত্মসংযম
আত্মনির্ভরতা
ক্ষিপ্রতা
নিয়মানুবর্ত্তিতা
বিচার
স্মরণশক্তি
মানসিক শক্তিসমূহের জন্য ভাবিতে শেখা (group sense)
বিশ্রাম ইত্যাদি

স্বাস্থ্য

প্রত্যেক সুকল্পিত খেলা ও ব্যায়াম পদ্ধতির মধ্যে এই সব গুণ থাকা উচিত। এ বিষয়ে অন্য প্রবন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব।





কবিতা চয়ন

ছেলে ভুলানো ছড়া

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥

কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান দে, বকুলতলা দে॥





দু-পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে





ও-পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥

বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা॥



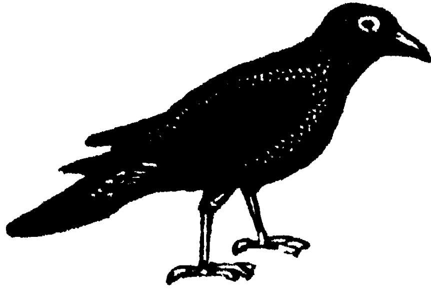
সীতেনাথ বলে রে ভাই চাল কড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥

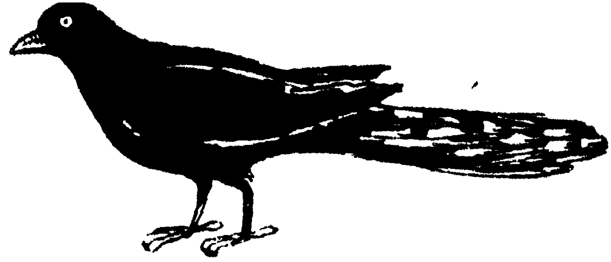
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে।
সোনা মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

* * *

* * * *

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"

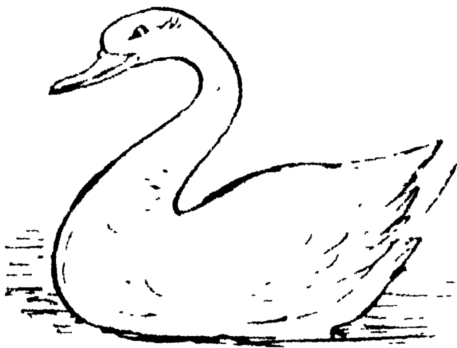


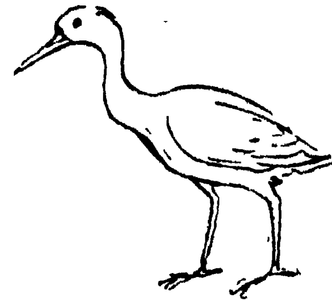


"কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙ্গের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে,
তোমার মাথার কেশ॥"



"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"









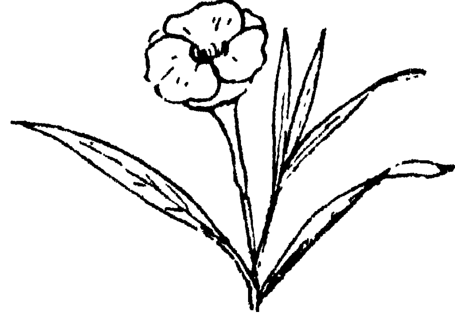
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো,
ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে,
তোমার হাতের শঙ্খ॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥'







"জবা রাঙা, করবী রাঙা
রাঙা কুসুম ফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে,
তোমার মাথার সিঁদুর॥"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"

নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো,
তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে,
বোন-সতীনের ঘর।"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, যাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ॥"

"হিম জল, হিম স্থল,
হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে,
তোমার বুকের ছাতি॥"



উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কত দূর॥
বর আসছে বাগনাপাড়া
বড় বৌ গো রান্না চড়া॥

ছোট বৌ লো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরণ কড়ি।
নটে শাকের বড়ি॥





মিশ্র ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

দেশ দেশ দেশ—ভাই, আমাদের দেশ।
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ?
—ভাই আমাদের দেশ॥

উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগব,
পূবে পশ্চিমে, ভাই, পাহাড় মনোহর,
—ভাই পাহাড় মনোহব;

তার মধ্যে মায়েব আঁচল সোনা-ঢালা বেশ,
গাছ-গাছালি ক্ষীরের নদী, সোনা ধানেব ক্ষেত,
—ভাই আমাদেব দেশ॥

ঝিকিমিকি সূর্য্য উঠে, বাতে ফোটে তাবা,
চাঁদেব জ্যোচ্ছনা, ভাই, যেন ফটিক্-ধারা,
—ভাই যেন ফটিক্-ধাবা;

এমন্—দেশের জল-মাটি, এমন্ সোনার দেশ,
আমরা এমন্ দেশের ছেলে সুখের নাহি শেষ।
—ভাই আমাদের দেশ॥

II	১´		০			১´		০			১´		০			
	স	-া ।	বা	-া	I	রা	পা ।	মা	রা	I	রা	-মা ।	পা	-ণা		I
	দে	শ্	দে	শ্		দে	শ	ভা	ই		আ	মা	দে	র		
I	১´		০			১´		০			১´		০			
	ধা	-া ।	-া	-া	I	মা	ণা ।	-া	ণা	I	ণা	-া ।	মা	ণা		I
	দে	০	০	শ		স	ক	ল্	দে		শে	র	আ	গে		

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
ধা -পা। মা -পা ধা -া সা—া I মা সা। রা -মা I
সে • কো ন্ দে শ্ ভা ই আ মা দে র

I ১´
মা -া। -া -া II
দে • • শ

II ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
পা ধা। মা পা I ধা ধা ধা -া I ণা ধা ণা র্সা I
(১) উ ত্ত রে তে হি ম্যা ল য় দ ক্ষি ণে সা
(২) ঝি কি মি কি ঢু য্য উ ঠে বা তে ফো টে

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
নর্সণা -া। -ধা -া I পা পা। -া পা I ধা পা। মা -া I
(১) গ • • • • র পূ বে • প • শ্চি মে ভা ই
(২) তা • • • বা • চাঁ দে র জ্যো ছ্না ভা ই

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
গা গা। গা মা I মা -া। মা -া I মা মা মা র্সা I
(১) পা হাড় ম নো হ র ভা ই পা হাড় ম নো
(২) যে ন ফ টিক্ ধা রা ভা ই যে ন ফ টিক্

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
র্সা -া। -া -া I র্সা -া। র্সা র্সা I ধা মা। ণা ণা I
(১) হ • • র জা ব দ ধো মা সুর শা চা
(২) ধা • রা • এ মন দে শের জ ল্ মা টি

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
সা ণা। ধা ধা I ণা -া -া -া I ধা ধা ধা ধা I
(১) সো না ঢা লা বে • • শ গাছ গা ছা লি
(২) এ মন্ সো নার দে • • শ আম্ রা এ মন

I ১´ 0 ১´ 0 ১´ 0
ণা ধা। পা পা I ধা পা। মা গা মা -া। সা -া I
(১) ক্ষী রের ন দী সো না ধা নের শে ত ভা ই
(২) দে শের ছে লে সু খের না হি শে ষ ভা ই

I ১´ 0 ১´ 0
সা সা। রা -মা I মা -া। -া -া II II
(১) আ মা দে র দে • • শ্
(২) আ মা দে র দে • • শ্



পৃথিবীর ইতিহাস—মিশর

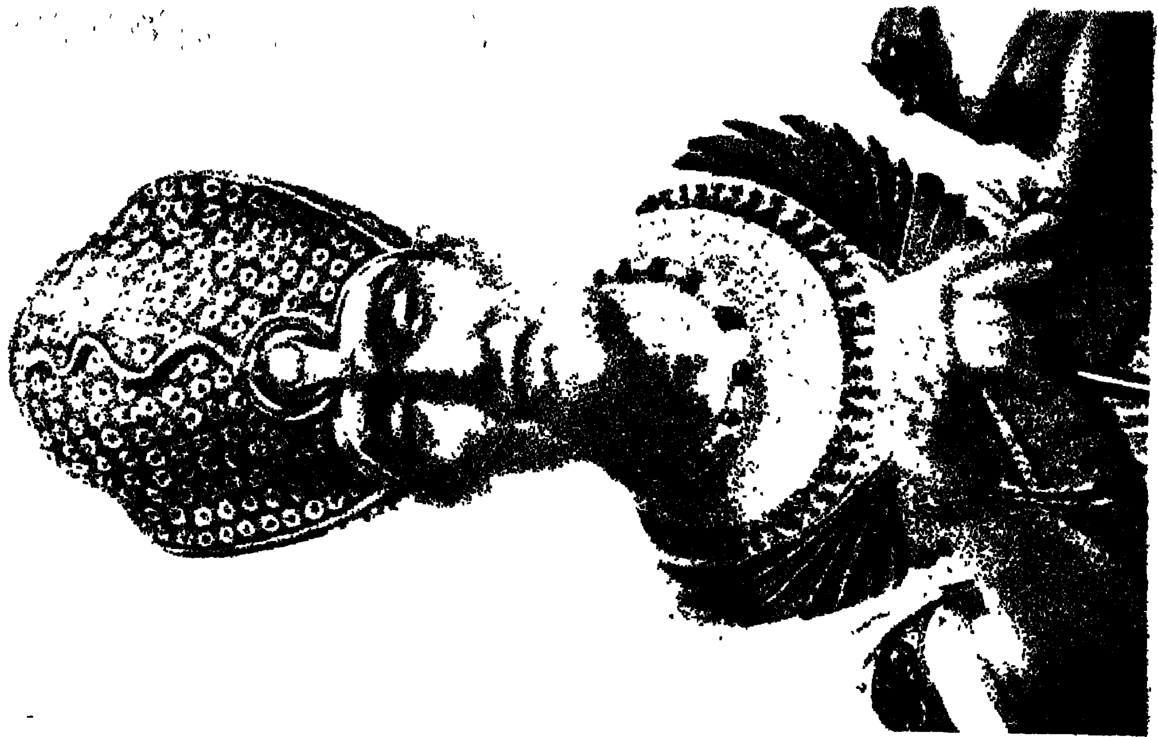
৩৬০ পৃষ্ঠার পর

মিশরের সঙ্কটকালে অ্যামেন-হোটেপের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চতুর্থ অ্যামেনহোটেপ রাজা হন। কিন্তু তিনি এই বিপৎসঙ্কুল সময়ে রাজ্যের কর্ণধার হইবার মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। এই সময়ে দরকার ছিল তৃতীয় থথ্‌মিসের মত জবরদস্ত রাজার। আর এই নবীন ফ্যারাও ছিলেন কবি, ভাববিলাসী ও ধর্ম্মপ্রবণ। রাজনীতির ধার তিনি বড একটা ধারিতেন না। তাঁহার মাতা তিয়ি, স্ত্রী নেফেরতেত ও বন্ধু আই (Eye) ছিলেন তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা। সুতরাং ফল হইয়াছিল এই: যে, যখন ফ্যারাওয়ের উচিত ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া নাহরিণ রক্ষা করা, তিনি তখন সমুদয় রাজকার্য্য ভুলিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মবিপ্লবে নিজের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা নিয়োগ করিলেন। এই ধর্ম্মবিপ্লবের বিষয় পরে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিশরে চতুর্থ অ্যামেনহোটেপই প্রথম একেশ্বরবাদ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঈশ্বরের নাম ছিল অ্যাটন্ (Aton) আর তাঁহার প্রকাশিত রূপ ছিল সূর্য্যগোলক (Solar Disk)। চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যগোলক হইতে অসংখ্য আলোকরেখা পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি রেখা শেষ হইয়াছে একটি হাতে—আর সেই হাতে রহিয়াছে জীবনী শক্তি।



মিসরের কয়েকটি প্রাচীন দেবতা

অ্যামেনহোটেপ কর্ণাক ও লাক্সারের মধ্যস্থিত উদ্যানে এই নূতন দেবতার মন্দির তৈয়ারী করেন। মিশরের সমস্ত দেবদেবীর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন এবং তাঁহাদের পূজা বন্ধ করিয়া দেন। যেখানে যেখানে তাঁহাদের নাম ছিল, তিনি তাহা তুলিয়া ফেলেন। অ্যামনদেবের উপরই তাঁহার







ক্রোধ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সমাধি ও কীর্ত্তিস্তম্ভ হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু মুস্কিল হইল তাঁহার নিজের নাম লইয়া। যাহা হউক, তাহাতে দমিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। নিজের পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাম রাখিলেন 'ইখ্ন্যাটন' (Ikhnaton) অর্থাৎ কি না 'অ্যাটনের স্বরূপ'।

থিব্‌সে ছিল 'আমন'দেবের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং ইখ্ন্যাটন্ সেখান হইতে রাজধানী বর্ত্তমান 'তেল-এল-আমার্ণাতে' (Tel-el-Amarna) তুলিয়া লইয়া গেলেন। এই নূতন রাজধানীর নাম হইল 'অ্যাখেট্যাটন্' (Akhetaton)। এখানে



মিশরের প্রাচীন দেবতা

অ্যাটন্‌দেবের তিনটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল। রাজপ্রাসাদ ও আমীর ওমরাহদের বাড়ীও তৈয়ারী হইল। দিনরাত অ্যাটনের মহিমাকীর্ত্তনই হইল এখানকার বিশেষত্ব। যদিও রাজাদের বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ এই নূতন ধর্ম্মের উচ্চ ভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, অধিকাংশ লোক কিন্তু কিছুই বুঝিত না; কেবল রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য বাঁধা বুলি আওড়াইত।

ইখ্ন্যাটন্ যে শুধু ধর্ম্মবিষয়েই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জীবনযাত্রাও পূর্ব্বের রাজাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত মিশরের রাজারা ছিলেন দেবতা, সকল বিষয়েই তাঁহারা বাঁধা-ধরা নিয়মানুযায়ী চলিতেন। ইখ্ন্যাটন্ কিন্তু দেবতা হইতে রাজী হইলেন না। তাঁহার আদর্শ ছিল সত্য। তিনি রাজা হইলেও মানুষ, রক্তমাংসের মানুষই তিনি থাকিতে চাহিলেন। কৃত্রিমতা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। কাজেই তাঁহার সময়ের ছবিগুলিতে একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—একটা সবল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য। আগেকার রাজাদের চিত্রের মত কৃত্রিমতা কোথাও নাই। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি প্রকাশ্যে ভালবাসা দেখাইতে যেমন তাঁহার কোনই কুণ্ঠা ছিল না, চিত্রেও তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মত দেখা দিতেও তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। কবিও তিনি খুব বড় দরেরই ছিলেন। অ্যাটনের বিষয়ে তিনি যে সব স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, সত্যই তাহা খুবই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী।

ইখ্ন্যাটন ত ধর্ম্মবিপ্লবে সম্পূর্ণরূপে মাতিয়া রহিলেন, এদিকে কিন্তু উত্তর সিরিয়ায় হিটাইট্‌রা এবং দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে খাবিরি (Khabiri) নামে সেমেটিক জাতীয় লোকেরা বিশ্বাসঘাতক সামন্তরাজাদের সঙ্গে যোগ দিয়া এশিয়ার মিশর-সাম্রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। বন্ধু-রাজারা ইখ্ন্যাটন্‌কে সমস্ত খবর জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেও ফ্যারাও তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত করিলেন না। ধীরে ধীরে সমস্ত এশিয়াই মিশরের হাত হইতে বাহির হইয়া গেল। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই—ভাবুক রাজা অ্যাটনের মহিমা-কীর্ত্তনেই মগ্ন রহিলেন। দেশের সর্ব্বত্র অ্যাটনের মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল, আর অ্যাটনের জয়জয়কার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে সর্ব্বত্র অশান্তি উপস্থিত হইল। প্রজারা অ্যাটন্‌কে মানে না—তারা চায় তাদের পুরানো দেবদেবী। অ্যামনের শক্তিশালী পুরোহিতেরা তাঁহাদের দেবতার অপমানে ও নিজেদের উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হইয়া এই অসন্তোষের বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। রাজ্যের বীর সৈনিকেরা সাম্রাজ্য নাশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতীকারের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এই সময়ে ১৭ বৎসর রাজত্বের পর ইখ্ন্যাটনের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মিশর এক অনন্যসাধারণ সত্যাশ্রয়ী ও ভাবুক রাজা হারায়। হইতে পারে কবি, ভাবুক ও স্বপ্ন-

বিলাসী ইখ্‌ন্যাটন রাজা হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমগ্র মিশরের রাজাদের মধ্যে শুধু তাঁহার কাছেই আমাদের মাথা আপনা হইতে শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। সত্য বটে, তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল আরাধনা ব্যর্থ [illegible] কিন্তু সে বিফলতার মধ্যে যে মহ[illegible] নিহিত ছিল, তাহার মূল্য শত শ[illegible] সব সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক বেশী।

হন। অ্যামনের শক্তিশালী পুরোহিতেরা তাঁহাকে অ্যামেটাটন ছাড়িয়া পুনরায় থিবসে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করেন। তিনি নিজে যদিও অ্যাটন্‌দেবের পূজা করিতেন তবু পুরানো দেবদেবীর—বিশেষতঃ অ্যামনের পূজা আবার পুনরায় প্রচলন করেন এবং তাঁহার মন্দিরগুলি সংস্কার করেন। ইহাতেই সব গোল মিটিয়া যায় না। নিজের নাম ছাড়িয়া নূতন নাম 'টুটেনখ্যামন' (Tutenkhamon) রাখিতে বাধ্য হন।



খ্যামনের কবরে আবিষ্কৃত কয়েকটি মূল্যবান্‌ জিনিষ

ইখ্‌ন্যাটনের পুত্রসন্তান ছিল না। কাজেই তাঁহার জামাতা স্যাকেরে (Sakere) তাঁহার পর রাজা হন। কিন্তু দুদিনে রাজা হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার মোটেই ছিল না। অল্পদিন পরেই ইখ্‌ন্যাটনের আর এক জামাতা 'টুটেনখ্যাটন' (Tutenkhaton) রাজা

টুটেনখ্যাটন

কিছুদিন পূর্ব্বে টুটেন্‌খ্যামনের কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে যে সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সত্যই তাহা বিস্ময়কর।

টুটেন্‌খ্যামনের মৃত্যুর পর কয়েকজন অপদার্থ রাজা কিছুকাল নামে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময় দেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই

অরাজকতা দূর করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন অক্লান্তকর্ম্মী রাজা হারমহাব্ (harmhab)। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোক। নিজ বুদ্ধিবলে তিনি ইখ্‌ন্যাটনের পরবর্ত্তী রাজাদের সময় সবিশেষ শক্তি সংগ্রহ করেন। অবশেষে তিনি হন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও প্রধান অমাত্য। এক কথায়, তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত কর্ণধার। সুযোগ বুঝিয়া অ্যামানের পুরোহিতদের সাহায্যে তিনি রাজা হন (পূঃ খৃঃ ১৩৫০) এবং ইখ্‌ন্যাটনের শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহার অধিকার পাকা করেন।

হারমহাব্

রাজা হইয়াই হারমহাব অ্যামনের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং পুরাতন দেবমন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করেন। অ্যাটনের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া নব ধর্ম্মের উচ্ছেদ করেন। ইখ্‌ন্যাটন যেখানে যেখানে অ্যামনের নামগুলি তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা আবার নূতন করিয়া বসান হইল। আর ইখ্‌ন্যাটনের উপর প্রতিশোধ লওয়া হইল সর্ব্বত্র তাঁহার নাম চাঁছিয়া ফেলিয়া—এমন কি, অ্যামেট্যাটিনে তাঁহার যে কবর ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল।

তারপর হারমহাব্ শাসনসংস্কারে মন দিলেন। যত রকম পাপ ও অনাচার রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহা তিনি কঠোর হস্তে দূর করেন। প্রজাদের উপর অত্যাচার নিবারণ করেন। নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া সুবিচারের বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপে তিনি দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

শাসন-সংস্কার

তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম র‍্যামসেস্ (Ramsas I) রাজা হন। কিন্তু বৃদ্ধ র‍্যামসেস্ অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার পুত্র সেটি (Seti I) রাজা হন। সেটি খুব বিচক্ষণ ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। সৈন্যসামন্ত লইয়া বার বার এশিয়ায় গমন করিয়া প্যালেষ্টাইনে মিশরের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সমর্থ হন। হিটাইট্‌দের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তবে তাহাদের সঙ্গে বোধ হয় বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

প্রথম সেটি

দেশে ফিরিয়া তিনি শান্তিকার্য্যে মন দেন। পুরাতন দেবালয়গুলির সংস্কার করেন। নূতন নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রথম র‍্যামসেস কর্ণাকের মন্দিরে সম্মুখে যে বিশাল হলঘর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেটি তাহা অনেকটা শেষ করেন। ইহার দেওয়ালে নিজের বিজয় কাহিনীর রিলিফ্ চিত্র অঙ্কিত করেন। এমন সুন্দর চিত্র খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। থিব্‌সের পশ্চিম দিকে তিনি নিজের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অ্যাবাইডসে (Abydos) তিনি একটি অপূর্ব্ব সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—প্রধান দেবতা ও ভূতপূর্ব্ব রাজাদের পূজার জন্য। আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির তিনি স্থাপনা করিয়াছিলেন।

সেটীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় র‍্যামসেস্ রাজা হন। র‍্যামসেস্ খুব উৎসাহী ও কর্ম্মঠ ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি তাঁহার পিতার মন্দিরগুলি সংস্কার ও সমাপ্ত করেন। তাহার পর তিনি এশিয়ার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমে তিনি ফিলিসিয়ার উপকূলে ঘাঁটি স্থাপন করেন, তারপর ভিতরের দিকে অগ্রসর হন। এদিকে হিটাইট্‌দের রাজা মেটেল্লাও প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন। খাদেশের নিকটে দুই দলই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। অতর্কিত আক্রমণে র‍্যামসেসের অধিকাংশ সৈন্য পলায়ন করে অথবা নিহত হয়। তাঁহার উদ্ধারের আর কোন আশাই থাকে না। র‍্যামসেস্ কিন্তু হাল ছাড়িয়া না দিয়া অসীম বিক্রমের সঙ্গে সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া বার বার আক্রমণ করিতে থাকেন। এদিকে হঠাৎ একদল নূতন সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আসে। ইহাতে হিটাইট্‌রা দমিয়া যায়। দুই পক্ষেই অনেক হতাহত হয়। অবশেষে র‍্যামসেস্ সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করেন। হিটাইট্‌দের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হয় এবং তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। র‍্যামসেস্ কিন্তু তাঁহার বীরত্বের খুব গর্ব্ব করিতে লাগিলেন, যেন তিনি মস্ত বড় বিজয়ী বীর। দেশের অনেক মন্দিরের দেওয়ালে খাদেশের যুদ্ধের চিত্র তিনি অঙ্কিত করান।

দ্বিতীয় র‍্যামসেস্

খাদেশের যুদ্ধ

F. 8

ইহার পর আবার তিনি এশিয়া বিজয়ে বাহির হন। এবার তিনি প্রথমে প্যালেষ্টাইন উদ্ধার করেন। তারপর তিনি সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং নাহরিন পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। আবার হিটাইট্‌-দের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হয়। দুইদেশের রাজা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হন।

এশিয়া বিজয়

এশিয়া বিজয় ও শাসনের সুবিধার জন্ম র‍্যাম-সেস্‌ থিব্‌স্‌ হইতে রাজধানী তুলিয়া আনিয়া উত্তর মিশরে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাহা হইলেও তিনি দক্ষিণ মিশরের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। এমন কি, নিউবিয়াতেও তিনি মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। হিলিওপলিস্‌, মেম্‌ফিস্‌, থিব্‌স্‌, অ্যাবাইডস্‌ প্রভৃতি বড় বড় সহরে তিনি অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার পিতার অসমাপ্ত মন্দিরগুলিও সমাপ্ত করেন। প্রথম র‍্যামসেস্‌ কর্ণাকে যে প্রকাণ্ড থামওয়ালা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন তাহাও তিনি শেষ করেন। ইহাতেই কিন্তু তাঁহার আশ মেটে নাই। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের মন্দিরগুলির গায়েও নিজের নাম খোদাই করিয়াছিলেন, যেন সেগুলিও তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার অনেক সময়ে তাঁহাদের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া সেখান হইতে মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া নিজে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্দির স্থাপন

এই সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি, ফিনিশিয়ান প্রভৃতি বিদেশীরা মিশরে রীতিমত বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক বিদেশী আবার রাজসরকারে বড় বড় চাকুরী ও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিত। সৈন্যদলেও অনেক বিদেশী উচ্চপদ পাইত—তবে সাধারণ সৈনিক লাইবীয়ান্‌ ও নিউবিয়ানদের মধ্য হইতেই লওয়া হইত।

দ্বিতীয় র‍্যামসেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মিশরের দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। বৃদ্ধ মার্ণেপ্টা (Mernep-tah) রাজা হইয়াই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। সমগ্র সিরিয়া প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ ফ্যারাও নিজে যাইয়া সেই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেন। এদিকে সিসিলি, সার্ডিনিয়া, ইটালী গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী সামুদ্রিক জাতিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া লাই-বীয়ানরা পশ্চিমদিক হইতে উত্তর মিশর আক্রমণ করে। মার্ণেপ্টা তাহাদেরও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। নিউবিয়াতেও তিনি বিদ্রোহ করেন। তারপর তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় পূর্ব্ব-রাজাদের মন্দির ভাঙ্গিয়া নিজের কীর্ত্তি স্থাপনা করেন।

মার্ণেপ্টা

মার্ণেপ্টার মৃত্যুর পর কয়েকজন অপদার্থ ফ্যারাও মিশরের সিংহাসনে বসেন। তাঁহাদের সময় দেশের অতীব শোচনীয় অবস্থা হয়। অবশেষে তৃতীয় র‍্যামসেস্‌ রাজা হইয়া দেশে শান্তি স্থাপনা করেন। আবার সামুদ্রিক জাতীয় লোকেরা লাইবীয়ান্‌দের সঙ্গে যোগ দিয়া উত্তর মিশর আক্রমণ করে। তৃতীয় র‍্যামসেস্‌ তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। আর একদল সিরিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। র‍্যামসেস্‌ তাহা-দিগকেও পরাস্ত করেন। মেশবেশ (Meshwesh) বলিয়া একদল লোক লাইবীয়া আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মিশর আক্রমণ করে। র‍্যামসেস্‌ তাহাদেরও তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন।

তৃতীয় র‍্যামসেস্‌

মন্দির নির্ম্মাণেও তৃতীয় র‍্যামসেসের খুবই আগ্রহ ছিল। থিব্‌সের অপর পারে তিনি অ্যামন্‌দেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রাচীরে তাঁহার যুদ্ধের ঘটনাসমূহ অঙ্কিত করেন।

এখানে একটি জিনিষ জানিয়া রাখা দরকার। অনেকদিন হইতেই মন্দিরের পুরোহিতদের ক্ষমতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফ্যারাওরা মন্দিরগুলিতে অনেক ধনসম্পত্তি দান করিতেন। জমি-দারীও তাহাদের বিস্তর ছিল। আস্তে আস্তে পুরোহিতেরা ফ্যারাওর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে-ছিলেন। তৃতীয় র‍্যামসেস্‌ তাহার ত কোনই প্রতীকার করিলেন না, বরং আরও প্রচুর উপ-ঢৌকন দিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন অ্যামন্‌-দেবের পুরোহিতেরা। তাঁহার প্রধান্‌ পুরোহিত এই পদটিকে নিজের বংশে স্থায়ী করিয়াছিলেন।

আমন্‌দেবের অভ্যুত্থান

তাহাছাড়া অন্যান্য মন্দিরের পুরোহিতেরাও তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন ফ্যারাওই বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিতেন না।

তৃতীয় র্যামসেসের মৃত্যুর পর র্যামসেস্ নামধারী নয়জন রাজা মিশরের সিংহাসনে বসেন। তাঁহারা সবাই ছিলেন একেবারে অপদার্থ। তাহাদের সময় অ্যামন্‌দেবের প্রধান পুরোহিত প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতির ন্যায় তাঁহার বিশাল জমিদারী শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি, তাঁহার নিজের সৈন্যসামন্ত পর্য্যন্ত ছিল।

দ্বাদশ র্যামসেসের রাজত্বের সময় ট্যানিসের (Tanis) একজন জমিদার সমগ্র উত্তর মিশর জয় করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। হতভাগ্য ফ্যারাও থিব্‌সে পলাইয়া গিয়া অ্যামনের প্রধান পুরোহিত হৃহরের (Hiriher) হাতের পুতুল হন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে সরাইয়া পুরোহিত মহাশয় নামেও ফ্যারাও হইয়া বসেন। কিছুদিন মিশর দুইটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত থাকে। অবশেষে হৃহরের পৌত্র ট্যানিসের রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া দুইটি রাজ্যের মিলন করেন।

সূর্য্যগোলক হইতে অসংখ্য আলোক রেখা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক রেখা শেষ হইয়াছে একটি হাতে—আর সেই হাতে রহিয়াছে জীবনী-শক্তি

এদিকে মিশরের সৈন্যদলে বিদেশীরা, বিশেষতঃ লাইবীয়ানরা, অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। শেশঙ্ক (Sheshonk) নামে একজন লাইবীয়ান্ সৈন্যাধ্যক্ষ (৯৪৫ খৃঃ পূঃ) ফ্যারাও সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। শেশঙ্কের সময় মিশরের সাময়িক শক্তিবৃদ্ধি হয়। তাঁহার পর কিছু কাল লাইবীয়ান্ সৈন্যাধ্যক্ষগণ মিশরে রাজত্ব করেন।

অনেকদিন হইতে নিউবিয়া মিশর রাজ্যের অংশ ছিল। ফ্যারাওর একজন প্রতিনিধি ইহা শাসন করিতেন। অনেকদিন মিশরের অধীনে থাকিবার ফলে নিউবিয়া মিশরের ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে একটি স্বাধীন নিউবিয়া রাজ্য গড়িয়া উঠে। রাজা নিজেকে ফ্যারাও বলিতেন। পিয়াঙ্খি (Piankhi) নিউবিয়ার রাজা হইয়া মিশরের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সুযোগ বুঝিয়া তিনি দক্ষিণ মিশর জয় করেন। তখন উত্তর মিশরের ক্ষুদ্র রাজারাও ফ্যারাও পিয়াঙ্খির অধীনতা স্বীকার করেন। পিয়াঙ্খি মিশর পরিত্যাগ করিলেই আবার দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তারা

ইথিওপিয়ান্ ফ্যারাও

স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে অ্যাসিরিয়ার রাজা সার্গন মিশরের এশিয়ার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। (৭১৪ খৃঃ পূঃ)।

এদিকে পিয়াঙ্খির পরে তাঁহার ভ্রাতা শাবক নিউবিয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। শাবক অনতিবিলম্বে সমগ্র মিশর অধিকার করেন এবং ফ্যারাওর সিংহাসনে বসেন। অ্যাসিরিয়াকে বাধা দিবার জন্য তিনি সিরিয়া প্যালেষ্টাইনের রাজাদের বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করেন। সার্গন অবশ্য তাহাদের বশে রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু সার্গনের মৃত্যুর পর সেন্নাকেরিব (Sennacherib) যখন রাজা হন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মিশর হইতে শাবক সৈন্যসামন্ত পাঠান তাহাদের সাহায্যের জন্য। সেন্নাকেরিব কিন্তু বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। ব্যাবিলনে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি মিশর আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

শাবকের পর আরও দুইজন ইথিওপিয়ন (Ethiopion) ফ্যারাও হন। যখন শাবকের ভ্রাতুষ্পুত্র তাহর্ক (Taharka) মিশরের রাজা, তখন সেনাকেরিবের পুত্র এসারহাড্ডন্ (Esarhaddon) মিশর আক্রমণ করিয়া ফ্যারাওকে পরাস্ত করেন এবং উত্তর মিশর অধিকার করেন। তাহর্ক দক্ষিণ মিশরে রাজত্ব করিতে থাকেন। এসারহাড্ডনের পুত্র অসুরবালিপাল (Ashurballipal) আবার তাহর্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, কিন্তু দক্ষিণ মিশরে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই।

আসিরিয়ার উত্তর মিশর জয়

শাবকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তনুতমন্ (Tanutamon) দক্ষিণমিশরের রাজা হন এবং উত্তর মিশরে তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। মেম্‌ফিস্ তাঁহার রাজধানী হয়। অসুরবালিপাল তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া মিশর হইতে তাড়াইয়া দেন এবং থিব্‌স্ সহর লুটপাট করেন। তনুতমন ন্যাপাটায় রাজত্ব করিতে থাকেন।

ইহার পর উত্তর মিশরে স্যাম্‌টিক (Samtik) নামে একজন সামন্ত রাজা এসিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন ফ্যারাও হন। তিনি গ্রীক্ সৈন্যদের সাহায্যে সমগ্র মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ক্ষুদ্র রাজাদের দমন করিয়া তিনি মিশরে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তবে তাঁহার সৈন্যদলে বিদেশী গ্রীক, সিরিয়া ও লাইবীয়ার অধিবাসীরাই ছিল প্রধান। দেশে আবার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি দেখা যায়। গ্রীক ব্যবসায়ীরা মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর্থিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল হয়। শিল্পেও একটা সজীব-ভাব সারা পাওয়া যায়। মিশরে আবার যেন আশার আলোক দেখা দেয়। কিন্তু এ জাগরণ স্থায়ী হয় নাই। পূর্ব্বের সেই অদম্য উৎসাহ ও শক্তি ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। শুধু বাহিরের একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তবে প্রাচীনকালের গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবার বৃথা চেষ্টায় মিশরবাসীরা নূতনকে পরিত্যাগ করিল। মৃত প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে। ধর্ম্ম সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, সমস্ত ব্যাপারেই প্রাচীনের প্রভাব লক্ষিত হয়।

মিশরের নব অভ্যুত্থান, স্যামটিক ফ্যারাও

স্যাম্‌টিকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নেকো (Neco) রাজা হন। ইতিমধ্যে অ্যাসিরিয়ার পতন আরম্ভ হইয়াছে। নেকো ফিলিষ্টিয়া (Philistia) আক্রমণ করিবার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ তৈয়ারী করেন। বিনা আয়াসে সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জয় করিয়া এশিয়ায় পুনরায় মিশরের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। নবীন ব্যাবিলনিয়ার সম্রাট্ ন্যাবোপোলাস্সার পুত্র (Nabopolassar) নেবুচাদ্রেজ্জারকে (Nebuchadrezzar) নেকোর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠান। কার্কেমিসের যুদ্ধে নেকো সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হন এবং মিশরে পলায়ন করেন (৬০৫)। এক আঘাতেই এশিয়ার সাম্রাজ্য খসিয়া পড়িল।

নেকোর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্যাম্‌টিক্ রাজা হন্। স্যাম্‌টিকের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র অ্যাপ্রিস (Apries)। অ্যাপ্রিস্ গ্রীক্ সৈন্যদের বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। ইহাতে মিশরীয়দের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহীদের নেতা অ্যামেসিস (Amasis) অ্যাপ্রিসকে পরাজিত করিয়া নিজে ফ্যারাও হন। রাজা হইয়া অ্যামেসিস্‌ও কিন্তু গ্রীকসৈন্যদের উপর নির্ভর করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় স্যাম্‌টিক্ রাজা হন। এক বৎসর রাজত্বের পর পারস্যরাজ ক্যাম্বিসেস মিশর জয় করেন (খৃঃ পূঃ ৫২৫) এইবার চিরদিনের মত মিশরের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

পারস্যরাজের মিশর অধিকার



বাঙ্গলা লিপির উৎপত্তি

বাঙ্গলা লিপি তোমরা সকলেই ব্যবহার কর। ছাপার অক্ষরে বাঙ্গলা লিপিতে লেখা কত স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় মনষিগণের রচনা পাঠ করিয়া আনন্দিত হও। আবার বন্ধু-বান্ধবগণকে পত্র লিখিতে হইলে কিম্বা প্রবন্ধাদি রচনা করিতে হইলে মুক্তার পাঁতির মত বাঙ্গলা অক্ষরে যত্ন করিয়া লিখিয়া থাক। আচ্ছা, কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, এই বাঙ্গলা লিপির উৎপত্তি কি করিয়া হইল? আজ তোমাদিগকে সংক্ষেপে বাঙ্গলা লিপির জন্মের কথা বলিব।

অধুনা আমাদের দেশে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত আছে। যথা, কাশ্মীর প্রদেশের শারদা লিপি, পঞ্জাবের গুরুমুখী, গুজরাত প্রদেশের গুজরাতী লিপি, মহারাষ্ট্র দেশের ও মধ্যপ্রদেশের নাগরী লিপি, অন্ধ্র প্রদেশের তেলেগু লিপি, কেরল দেশের মলয়ালম লিপি ও দ্রাবিড় দেশের তামিল লিপি। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্ত লিপিগুলি মূলতঃ একটি মাত্র আর্য্য লিপি হইতে উৎপন্ন। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের ভাষাগুলির লিপি মূল আর্য্যলিপি হইতেই সংগৃহীত।

এই মূল লিপির নাম **ব্রাহ্মী লিপি**। ইহা ভারতের প্রাচীন লিপি। এই লিপির প্রত্যেকটি অক্ষর একটি মাত্র ধ্বনি বা উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে, স্বয়ং ব্রহ্মা এই ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টিকর্ত্তা।

প্রাচীন ভারতে আরও এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল ইহার নাম ছিল খরোষ্ঠী। এই লিপির প্রচার কেবল পঞ্জাবেই ছিল; এবং তাহাও কতিপয় বিদেশী রাজার মুদ্রা ও তাম্রলিপিতে পাই। পঞ্জাবেও বেশীর ভাগ গান্ধার প্রদেশেই (পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডী জেলায়) এই লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পঞ্জাবের বাহিরে মথুরা ও আফগানিস্থানেও এই লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

আসলে ব্রাহ্মী লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি। পাষাণ খণ্ডে, তাম্রাদি ধাতু-পাত্রে অথবা স্তম্ভগাত্রে খোদিত ব্রাহ্মী লিপির শত শত লেখা পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বহু যত্নে ও বহু কৌশলে এবং অশেষ অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সমস্ত লেখা পড়িয়াই পণ্ডিতেরা ভারতের লুপ্ত ইতিহাস কতক কতক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন সম্রাট অশোকের সময়ে ও তাঁহার কিছু পূর্ব্বেই দেখিতে পাই। তোমরা সম্রাট অশোকের নাম হয়ত কেন, নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক এইচ্, জি, ওয়েলস্ (H. G. Wells) তাঁহাকে সর্ব্ব দেশের ও সর্ব্বকালের মহামানবের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এই মহামনা মহিমময় মহারাজ কতকগুলি ধর্ম্মলিপি প্রস্তরগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত লিপিই ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি লিপি আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলি অশোকেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। নেপালের তরাই-এ পিপ্রাওয়া নামক স্থানে একটি স্তূপের ভিতর হইতে বুদ্ধদেবের অস্থি সহিত একটি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই পাত্রের উপর খোদিত

লিপি হইতে জানা যায় যে, শাক্যজাতির লোকেরা সম্মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের অস্থি ঐ স্তূপের ভিতর রক্ষা করিয়াছিল। বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেই এই সংরক্ষণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল ও স্মারক লিপিটি খোদিত হইয়াছিল।

তোমরা যদি আধুনিক বাঙলা লিপির সহিত অশোকের লিপির তুলনা কর, তবে বিশ্বাস করিতে পারিবে না যে, একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আসলে হইয়াছে তাহাই। হস্তলিখিত লিপির সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, লেখকদের রুচি অনুসারে ও কালের প্রভাবে ধীরে ধীরে লিখিবার ধরণ বদলাইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ব্রাহ্মী লিপি ধীরে ধীরে আমাদের বর্ত্তমান বাঙলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তালিকা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, কি ভাবে আমাদের বাঙলা লিপি সেই মূল ব্রাহ্মী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মী লিপির পরিবর্ত্তনের ধারা অনুসারে ইহাকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—

১। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ হইতে খৃষ্টীয় ৩৫০ (ন্যূনাধিক) পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের লিপিকে মূল **ব্রাহ্মী** বলা হয়। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে উহার লেখন-রীতির দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। একটি উত্তর ভারতীয় ও অপরটি দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয়। উত্তরীয়-রীতির প্রচার বিন্ধ্যগিরির উত্তরে ও দাক্ষিণাত্য রীতির প্রচার উক্ত গিরির দক্ষিণে ছিল।

বাঙলা লিপির উৎপত্তির বিচার করিতে হইলে উত্তরীয় লিপির ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দাক্ষিণাত্য লিপির সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। উত্তরীয় লিপিগুলির এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে।

২। **গুপ্তলিপি**—গুপ্তবংশীয় রাজাদের সময় নিখিল উত্তর ভারতে এই লিপির প্রচার হইয়াছিল। এইজন্য ইহার নাম গুপ্তলিপি। ইহার প্রচার খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হইয়াছিল। উত্তর ভারতীয় গুপ্তলিপির মধ্যে আবার দুইটি মুখ্য ভেদ পাওয়া যায় একটি প্রাচ্য ও আর একটি পাশ্চাত্য। অর্থাৎ এক প্রকারের লেখা ভারতের পূর্ব্বাংশে প্রচলিত ছিল ও আর এক প্রকারের ছিল পশ্চিমাংশে। এই দুই প্রকার লেখার মধ্যে 'ল', 'ষ', 'হ' ও 'ম' এই অক্ষরগুলিতে ভেদ পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই পশ্চিমে প্রচলিত লেখাই বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও ভেদ দুইটি লোপ পাইয়া যায়।

৩। **কুটিল লিপি**—এই অক্ষরগুলির ও বিশেষতঃ স্বরের মাত্রার আকৃতি কুটিল হওয়ায় ইহাকে কুটিল লিপি বলা হয়। এই সময় হইতে অক্ষরের উপর মাত্রা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইল। এই লিপির প্রচার ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। এই লিপি হইতেই নাগরী ও শারদা লিপির উৎপত্তি হইয়াছে। নাগরী লিপি তাহাকেই বলে যাহাকে তোমরা সাধারণতঃ সংস্কৃত লিপি বলিয়া থাক। বাস্তবিক কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কোনও নিজস্ব লিপি নাই। কিছু পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লিপিতেই লেখা হইত। এখনও অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। দেব নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক লেখা বা ছাপার প্রথা আজকালকার ব্যাপার।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি আসিয়া উত্তর ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশের লেখায় আবার ভেদ দেখা যায়। এই সময় হইতে পূর্ব্ব বিভাগের লিপির ক্রমবিকাশের একটা বিশিষ্ট ধারা পাওয়া যায় এবং এই ধারার আর বিলোপ হয় নাই। এই পূর্ব্বের লেখাই ধীরে ধীরে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙলা লিপিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অতএব বাঙলা লিপি নাগরী লিপি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—ইহা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ পাইয়াছে।

বাঙলা দেশের পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে যে লেখা পাই, তাহার কতকগুলি অক্ষরের আধুনিক বাঙলা অক্ষরের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। এই লিপির অক্ষরগুলিকে মূল বাঙলা অক্ষর বলা যাইতে পারে। রাজা নারায়ণ পাল প্রায় ৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর একাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের দেবপাড়ার লেখায় আধুনিক বাঙলা অক্ষরের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। যদিও এই লেখাতে ও অনেকগুলি অক্ষর বাঙলা অক্ষর হইতে ভিন্ন, তথাপি 'এ থ ঞ ত ম র ল য' প্রভৃতি অক্ষর আজকালকার বাঙলা অক্ষরের মত। তাহার পর রাজা লক্ষ্মণ সেনের





তর্পণদীঘির লেখায় ও বৈদ্যদেবের কমৌলি নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখায় (দ্বাদশ শতাব্দী) আরও অনেক অক্ষর আধুনিক বাঙ্গলা লেখার রূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার লিখিবার রীতিতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন

অশোক	কুষাণ	গুপ্ত	হরিযুক্তি	সপ্তম শতাব্দী	দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী	বর্ত্তমান বাঙ্গলা	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	অ	১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	আ	২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ই	৩
			[illegible]		[illegible]	ঈ	৪
L	L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	উ	৫
			[illegible]		[illegible]	ঊ	৬
			[illegible]		[illegible]	ঋ	৭
			[illegible]		[illegible]	ঌ	৮
△	[illegible]	△	△	[illegible]	[illegible]	এ	৯
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঐ	১০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ও	১১
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঔ	১২
+	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ক	১৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	খ	১৪
Λ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	গ	১৫



হইতে হইতে বাঙ্গলা লিপির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল।

এইবার তোমরা তুলনা-মূলক লিপি-পত্র হইতে প্রত্যেক অক্ষরের ক্রমবিকাশ বুঝিতে চেষ্টা কর।

অশোক	কুষাণ	গুপ্ত	হরিষজি	সপ্তম শতাব্দী	দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী	বর্ত্তমান বাঙ্‌লা	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ঘ	১৬
			[illegible]		[illegible]	ঙ	১৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	চ	১৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			ছ	১৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	জ	২০
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঝ	২১
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঞ	২২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ট	২৩
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঠ	২৪
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ড	২৫
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ঢ	২৬
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ণ	২৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ত	২৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	থ	২৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	দ	৩০





প্রথম পংক্তিতে অশোকের সময়ের অক্ষর দেখিতে পাইতেছ। দ্বিতীয় পংক্তিতে কুষাণ বংশীয় রাজাদের সময়ের প্রচলিত বর্ণমালা পাইতেছ। তৃতীয় শ্রেণীতে রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়ের এলাহাবাদ

অশোক	কুষাণ	গুপ্ত	হরিযুজি	সপ্তম শতাব্দী	দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী	বর্ত্তমান বাঙ্গলা	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধ	৩১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ন	৩২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	প	৩৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ফ	৩৪
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ব	৩৫
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ভ	৩৬
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ম	৩৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	য	৩৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	র	৩৯
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ল	৪০
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ব	৪১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শ	৪২
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ষ	৪৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	স	৪৪
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	হ	৪৫



স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি হইতে সংগৃহীত বর্ণমালা দেখিতে পাইতেছ।

চতুর্থ শ্রেণীতে যে বর্ণমালা দেখিতে পাইতেছ তাহার বিষয়ে একটু বিশেষ পরিচয় তোমাদিগকে দেওয়া দরকার। জাপানে হরিয়ুজি নামক বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মঠে একটি হাতে-লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। পুঁথি-খানিতে 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র' ও উষ্ণীষবিজয়-ধারিণী নামক দুই খানি বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ আছে। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Muller) এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। এক রকম ধরিতে গেলে এই পুঁথিখানি সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীনতম পুঁথি। যদিও ভূর্জ্জপত্রের উপর লেখা আরও প্রাচীন পুঁথি মধ্যএশিয়ার খাসগর নামক প্রদেশে ও অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। হরিয়ুজিতে প্রাপ্ত পুঁথিখানি ৬০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে মঠে রক্ষিত আছে। তাহার পূর্ব্বে পুঁথিখানি চীন দেশে ছিল এবং তাহারও পূর্ব্বে বোধিধর্ম্ম নামে এক ভারতীয় ভিক্ষু ৫২০ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে লইয়া আসে।

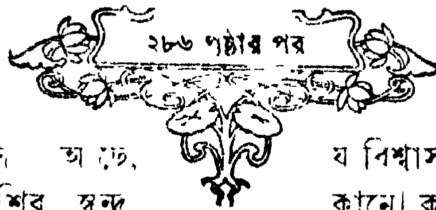
পঞ্চম পংক্তিতে আদিত্যসেন নামক মগধ দেশের রাজার অফসড় নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখা হইতে সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত বর্ণমালা দেওয়া হইয়াছে। দেখিতে পাইবে, তাহা হরিয়ুজির বর্ণমালারই অনুরূপ। ষষ্ঠ শ্রেণীতে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটি লেখা হইতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়া আধুনিক বাঙ্গলা লিপির বিকাশ দেখান হইয়াছে।

আশা করি, তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, কি করিয়া অশোকের সময়কার মূল ব্রাহ্মী লিপি ধীরে ধীরে বাঙ্গলা লিপিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।



ভারতবর্ষ

পৌরাণিক রাজগণ


২৮৬ পৃষ্ঠার পর

তোমরা বোধ হয় জান যে, হিন্দুদের একশ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহার নাম পুরাণ। আঠারটি পুরাণ আছে, তাহাদের নাম অগ্নি, কূর্ম্ম, শিব, স্কন্দ বরাহ, গরুড়, নারদ, পদ্ম, বামন, বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্ম বা আদি, মৎস্য, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয় ও ভবিষ্য। এই সকল পুরাণে কি করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইল, ভারতবর্ষে কোন সময় কে রাজা ছিলেন, দেবতাদের ভাবে

বলা হইয়াছে। পুরাণগুলি প্রাচীন হইলেও পরবর্ত্তিকালে ইহাদের মধ্যে অনেক কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য কোন অংশ নূতন, কোনটি বা পুরাতন, ইহা নির্ণয় করা বড় শক্ত। এখানে পুরাণে যে সকল রাজ-বংশের বর্ণনা আছে, সেগুলির কথা বলিব। সকল পুরাণেই রাজাদের একরকম বর্ণনা পাওয়া যায় না। সময় সময় আবার রাজাদের জীবনে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, সে সকল বিশ্বাস করা শক্ত। এই সকল কারণে অনেক ঐতিহাসিক পুরাণের রাজাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। অন্য পণ্ডিতদের মতে পুরাণের সকল কথা সত্য না হইলেও কোনো কথাই যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, এরূপ ভাবিবার কোনো কারণ নাই। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত পুরাণ পাঠ করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে, চারটি বেদ পড়িয়া শেষ করিলেও পুরাণ পড়া না থাকিলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

পুরাণের মতে ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, পৃথিবীর সকল বস্তুই ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন হইতে কয়েকজন মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম দক্ষ। দক্ষের কন্যা ছিলেন অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য্য), বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু।

এই মনুই পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য। আমরা সকলেই মনুর বংশধর বলিয়া আমাদের নাম মনুষ্য বা মানব। মনুর অনেক পুত্র-কন্যা ছিল, তাহাদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ও ইলা প্রধান।

ইক্ষ্বাকুবংশ—মনু সূর্য্যের পুত্র ছিলেন বলিয়া এই বংশের অন্য নাম সূর্য্য-বংশ। কোসল (বর্ত্তমান অযোধ) দেশে

ইক্ষ্বাকুর রাজত্ব ছিল এবং রাজধানী ছিল অযোধ্যা। তাঁহার বংশে অনেক বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর সাত-আট পুরুষ পরে শ্রাবস্ত নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি শ্রাবস্তী নামে এক মহানগরী স্থাপিত করেন। ধীরে ধীরে শ্রাবস্তী খুব উন্নতিলাভ করিল, এমন কি, অনেক সময় কোসলের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইত। শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ আজকাল অযোধ্যা গোঁড়া জেলায় সাহেত-মাহেত নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।



কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

শ্রাবস্তের বহুদিন পরে ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, সগরের পুত্রগণ এক ঋষির শাপে ভস্ম হইলে ভগীরথ নামে সগরের এক বংশধর তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য স্বর্গ হইতে গঙ্গানদীকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ভগীরথের কয়েক পুরুষ পরে দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রাম ও কুশ-লব ক্রমে ক্রমে রাজা হন। রামায়ণে এই সকল রাজার কথা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। রামায়ণের ঘটনার বহুদিন পরে মহাভারতের কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ হয়। এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ছিলেন বৃহদ্বল। তিনি যুদ্ধে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু দ্বারা নিহত হন।

ভগবান্ বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে-ছিলেন, তখন কোসলের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। শ্রাবস্তীনগর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার কথা পরে আরও বলিব।

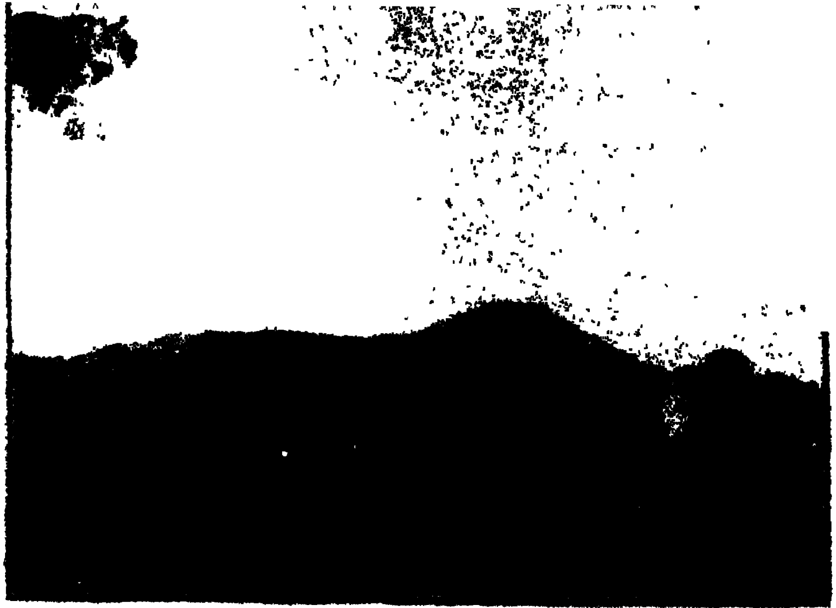
পৌরববংশ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুর এক কন্যা ছিলেন, ইলা। ব্রহ্মার পৌত্র সোমের (চন্দ্র) সহিত ইঁহার বিবাহ হয় এবং পুরূরবা নামে এক পুত্র হয়। চন্দ্র এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ইঁহার নাম চন্দ্রবংশ। পুরূরবার রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। গঙ্গার তীরে এলাহাবাদের অপর পারে ঝুসি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চন্দ্রবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং ইহার শাখা উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

পুরূরবার পাঁচ পুত্র, তাহার মধ্যে প্রধান ছিলেন আয়ুঃ। আয়ুর পাঁচটি প্রপৌত্র ছিলেন, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। এই পাঁচজনই প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ রাজবংশ স্থাপন করেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পুরু। পুরুর বংশে বহু রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে একজনের নাম কুরু। কুরুর বংশধরগণ কৌরব নামে খ্যাত, ইহা-দের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। এই

বংশে শান্তনু নামে এক রাজা হন। ইঁহার দুই রাণী, গঙ্গা ও সত্যবতী গঙ্গার পুত্রের নাম ভীষ্ম, ইনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সেইজন্য ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসন লাভ করেন। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ বলিয়া পাণ্ডু রাজা পাইলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। ছোটবেলা হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে দুই দলের মধ্যে রাজ্য লইয়া ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, যুদ্ধ ব্যতীত বিবাদের সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠে। পঞ্জাবে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাহার ফলে দুর্য্যোধনের দল ধ্বংস হইয়া যায়। মহাভারত নামক মহাকাব্যে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের পৌত্র পরিক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দিয়া ভাইদের সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে প্রস্থান করেন। পুরাণের মতে এই সময় পৃথিবীতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। পরিক্ষিতের চার-পাঁচ পুরুষ পরে নিমিচক্র বা নিচক্ষু নামে একজন রাজা হন, ইহার সময় রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গায় ভাসিয়া যায়। সেইজন্য তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা যমুনার তীরে কৌশাম্বী নামক নগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কোসাম, ইহা এলাহাবাদ হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার অনেক দিন পরে এই বংশে উদয়ন নামে এক রাজা হন, ইনি বুদ্ধের সময়কার লোক।

অন্যান্য রাজবংশ—মনুর পুত্র ইক্ষাকু অযোধ্যায় সূর্য্যবংশ স্থাপিত করেন। তাঁহার নিমি-বিদেহ নামে এক পুত্র হন, ইনি মিথিলার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজগণ সকলেই 'জনক' নামে খ্যাত। ইঁহারা ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজধানীতে প্রায়ই বড় বড় সভা হইত। সেখানে নানা দেশ হইতে বিদ্বান্‌গণ আসিয়া দর্শন-সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতেন। রামায়ণের সময় এই বংশের রাজা ছিলেন, সীরধ্বজ। তাঁহার কন্যা সীতার সহিত রামের বিবাহ হয়। যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়, তখন মিথিলায় কৃতি বা কৃতক্ষণ রাজা ছিলেন। ইহার পর লিচ্ছবি নামে এক জাতি মিথিলা জয়



কৌশাম্বীর বর্ত্তমান দৃশ্য

করিয়া লয়। মিথিলায় লিচ্ছবিদের রাজত্ব বহুশত বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল।

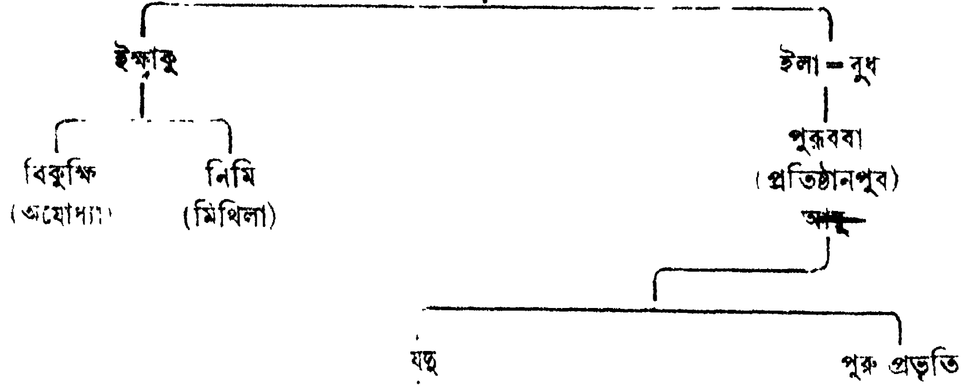
চন্দ্রবংশের অনেকগুলি শাখা ছিল, তাহার মধ্যে একটি যাদব নামে খ্যাত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পুরুর ভাই যদু। যদুর বহু পুরুষ পরে এই বংশে সাত্বত নামে এক রাজা হন। সাত্বতের কয়েকটি পুত্র ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান অন্ধক ও বৃষ্ণি। অন্ধকের বংশধর ছিলেন কংস, মথুরায় ইঁহার রাজধানী ছিল। বৃষ্ণির বংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। কংস কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর সহিত অশেষ শত্রুতা করেন ও কৃষ্ণকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে কৃষ্ণ বড় হইয়া কংসকে মারিয়া ফেলেন। গুজরাতে দ্বারকা বা কুশস্থলী কৃষ্ণের রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ লইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করেন। তাঁহারই উপদেশ ও পরামর্শের ফলে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধের কিছুদিন পরে এক ঋষির প্রতি অবিনয়ের ফলে যাদবগণের ধ্বংস হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। কোনো কোনো পুরাণের মতে এই দিন হইতে পৃথিবীতে কলিযুগের আবির্ভাব হয়।

পৌরব বংশের রাজা কুরুর নাম আগেই করিয়াছি। ইঁহার বংশের জরাসন্ধ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। মগধদেশে (বর্ত্তমান বিহার), পাটনা হইতে ষাট মাইল দূরে রাজগির নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। রাজগিরের প্রাচীন নাম রাজগৃহ বা গিরিব্রজ। ইনি চারিদিকের রাজগণকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম কৌশলে ইঁহাকে নিহত করেন ও বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেন। এই ঘটনার বহুশত বৎসর পরে বুদ্ধের জীবিত কালে জরাসন্ধ-বংশের শেষ রাজা নিহত হন এবং বিম্বিসার মগধের রাজা হন। ইনি এবং ইঁহার পুত্র অজাতশত্রু দুইজনেই খুব ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন।

পুরাণে আরও অনেক রাজা ও রাজবংশের বিবরণ আছে। এই সকল বিবরণ হইতে সত্য ইতিহাস তৈয়ারী করা সহজ ব্যাপার নয়। যে সময় উত্তর-ভারতে বুদ্ধ ও মহাবীর ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের সুসংশ্লিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় উত্তর-ভারতে ষোলটি জনপদ বা দেশ ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধান ছিল চারটি—মগধ (রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ), কোসল (রাজধানী শ্রাবস্তী ও অযোধ্যা), বৎস (রাজধানী কৌশাম্বী), ও অবন্তি (রাজধানী উজ্জয়িনী)। চারটি দেশে চারিজন মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। মগধে বিম্বিসার, কোসলে ইক্ষ্বাকুবংশের প্রসেনজিৎ, বৎসে পাণ্ডবদের বংশধর উদয়ন ও অবন্তিতে মহাসেন। মহাসেন ছাড়া সকলেরই বুদ্ধের জীবনের সহিত সংস্রব ছিল। ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ পরে বলিব।

ব্রহ্মা

মনু



দশরথ — রাম

সীরধ্বজ — সীতা

সাত্বত — অন্ধক, বৃষ্ণি

কুরু — সুধন্বা, প্রথম পরিক্ষিত

প্রথম পরিক্ষিত — শান্তনু

শান্তনু — ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য

বিচিত্রবীর্য্য — ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু

মহাভারতের কাল | বৃহদ্বল | কৃতক্ষণ | কংস (মথুরা) | কৃষ্ণ (দ্বারকা) | জরাসন্ধ (গিরিব্রজ) | দুর্য্যোধন (হস্তিনাপুর) | যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি (ইন্দ্রপ্রস্থ)

দ্বিতীয় পরীক্ষিৎ

নিমিচক্র
(কৌশাম্বী)

বুদ্ধের কাল | প্রসেনজিৎ | লিচ্ছবিগণ | বিম্বিসার | উদয়ন



ধ্যানে ও ধর্ম্মে

গার্গী

[মানব সৃষ্টির সেই আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এখানে একে একে যুগে যুগে যে সব কৃতিমহিলাদের জন্যে জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা নানা বিষয়ে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের কথা বলা হইবে।]

সে অনেককাল আগেকার কথা। কিন্তু সেই বহু পুরাতন দিনেও আমাদের ভারতবর্ষে এমন অনেক মহিলা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ও ধর্ম্মে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নাম আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। এইরূপ একজন বিদুষী মহিলার নাম ছিল গার্গী।

মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। তিনি একবার একটি বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে যত বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মুনি-ঋষি সেখানে উপস্থিত। জনকরাজা এক সহস্র গরুর মাথায় সোনার ভার চাপাইয়া রাখিয়া ঘোষণা করিলেন, "সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত, এই স্বর্ণভার ও হাজার গাভী তাঁহাকেই দান করা হইবে। যিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি এই দান গ্রহণ করুন।"

সভায় যত জ্ঞানী, গুণী সকলে ইতস্ততঃই করিতে লাগিলেন, নিজেকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিবার মত সাহস কাহারও হইল না। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এ দান আমিই লইব।"

অন্যান্য পণ্ডিতগণ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে রাজি হইলেন না। তাঁহার যথার্থ যোগ্যতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে সকলে উদ্যত হইলেন। তর্ক ও বিচার আরম্ভ হইল।

বচক্রু মুনির এক কন্যা ছিলেন, তাঁর নাম গার্গী। স্ত্রীলোক বলিয়া তিনি অশিক্ষিত, অজ্ঞানান্ধ হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতেন না। তখনকার যুগে পুরুষেরা যে শ্রেষ্ঠবিদ্যা অর্জ্জন করিতেন, সেই বিদ্যাকে চরমভাবে আয়ত্ত করিবার যত্ন তিনি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী দার্শনিকদের মত তিনিও ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। জনকের এই যজ্ঞসভায় তিনি আজ অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় সমবেত হইয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিলে গার্গী এবার তর্কযুদ্ধে নামিলেন। তিনি নিজের বিচারশক্তি দিয়া ভাল করিয়া মহর্ষিকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন—তাঁহার জ্ঞান কতখানি। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন। কিন্তু তাহাতে মীমাংসা হইল না; সেই উত্তরটুকু আশ্রয় করিয়া আবার

প্রশ্ন করিলেন, আবার যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আর উত্তরের পর উত্তর চলিয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে বলিলেন, "গার্গী। তুমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করিও না।" গার্গী থামিলেন।

সভাস্থ মুনিগণ একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কিছুতেই হার মানেন না।

গার্গী তখন আবার উঠিলেন। বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য! বীরপুত্রেরা ধনুতে শরযোজনা করিয়া শত্রুকে নিপাত করেন, আমি দুইটি প্রশ্ন বাণে তোমাকে আক্রমণ করিলাম। যদি পার, উত্তর দাও। সভায় সমবেত ব্রাহ্মণগণ! যদি যাজ্ঞবল্ক্য আমার এই প্রশ্ন দুইটির উপযুক্ত উত্তর আমাকে দিতে পারেন, তবেই আপনারা জানিবেন, ইঁহাকে কেহ বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।"

যাজ্ঞবল্ক্য মহাপণ্ডিত, তিনি উত্তর আরম্ভ করিলেন। সভার লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন।

নিঃসংশয়ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন থামিলেন, গার্গী মনে ভাবিলেন, 'যোগ্য বটে।' নিজের অসামান্য জ্ঞান ও বিচার-প্রতিভার প্রতি গার্গীর বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই বিচারশক্তির সম্মুখে যিনি পরাস্ত না হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন, তিনি বাস্তবিক প্রশংসারই উপযুক্ত। গার্গী এবার সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "পণ্ডিতগণ! ইনি সত্য সত্যই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, আপনারা মহর্ষিকে নমস্কার করুন।"

সংঘমিত্রা

সম্রাট্ অশোকের জগৎজোড়া খ্যাতি। খৃষ্টের জন্মেরও প্রায় তিন শত বৎসর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্মে ও প্রজাপালনে তাঁহার মত রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মিয়াছেন। অশোক যৌবনে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অশোক যখন উজ্জয়িনীতে, তখন এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তাঁহার নাম দেবী। এই দেবীর গর্ভে উজ্জয়িনীতে অশোকের একটি পুত্র হইল, নাম রাখিলেন মহেন্দ্র। তারপরে জন্মিল একটি কন্যা, নাম সংঘমিত্রা।

মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা দুই ভাইবোনে বড় ভাব। দিনে দিনে তাঁহাদের স্বভাব যেন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে অশোক যখন রাজধানীতে সম্রাট্ হইয়া বসিলেন, তাহার কিছুদিন পরেই হঠাৎ তাঁহার জীবনের ধারার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, অশোকের মন সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অবশেষে একদিন বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন।

অশোক সম্রাট্ হইলেও ধর্ম্মকার্য্যের জন্যই নিজের সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিলেন। এমন কি, তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, তাঁহার পুত্রকন্যাদের মধ্যে যদি কেহ বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, তবে তাঁহার কুল ধন্য হইবে।

একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র, সংঘমিত্রা, তোমরা কি ভগবান্ বুদ্ধের এই পবিত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা কর?"

তখন সমস্ত উত্তর ভারত বুদ্ধের "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" মন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার তরুণ প্রাণেও যেন নূতন প্রেরণা নাচিতেছে। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ উন্মুখ, ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে তাঁহারা কৃতার্থ। ভগবান বুদ্ধের চরণে শরণ লইবার জন্য তাঁহাদের ভারত-সম্রাট্ পিতা আজ আহ্বান করিতেছেন, তাঁহারা কি অসম্মত হইতে পারেন? ইহার চেয়ে বড় সুখ, বড় সৌভাগ্য আর কিছুই নাই।

দুই ভাইবোন তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করিলেন। মহেন্দ্র হইলেন ভিক্ষু, সংঘমিত্রা ভিক্ষুণী।

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর জীবনপথ বড় কঠোর। সারা-জীবন মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষার ভাবনায় এবং সমস্ত জীবের কল্যাণকার্য্যে নিরত থাকিতে হয়।

মৈত্রীর অর্থ—দেবতা, মানুষ ও পশু, শত্রু ও মিত্র, সকল জীবের কল্যাণ কামনা করা।

করুণার অর্থ—দুঃখীর দুঃখে ব্যথা পাওয়া।

মুদিত অর্থ—সুখী জনের সুখে নিজে আনন্দিত হওয়া।

অশুভ অর্থ—এই পৃথিবী ও মানুষের জীবনকে তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে করা।

উপেক্ষার অর্থ—সমস্ত জীবকে ও সকল অবস্থাকেই সমান জ্ঞান করা।

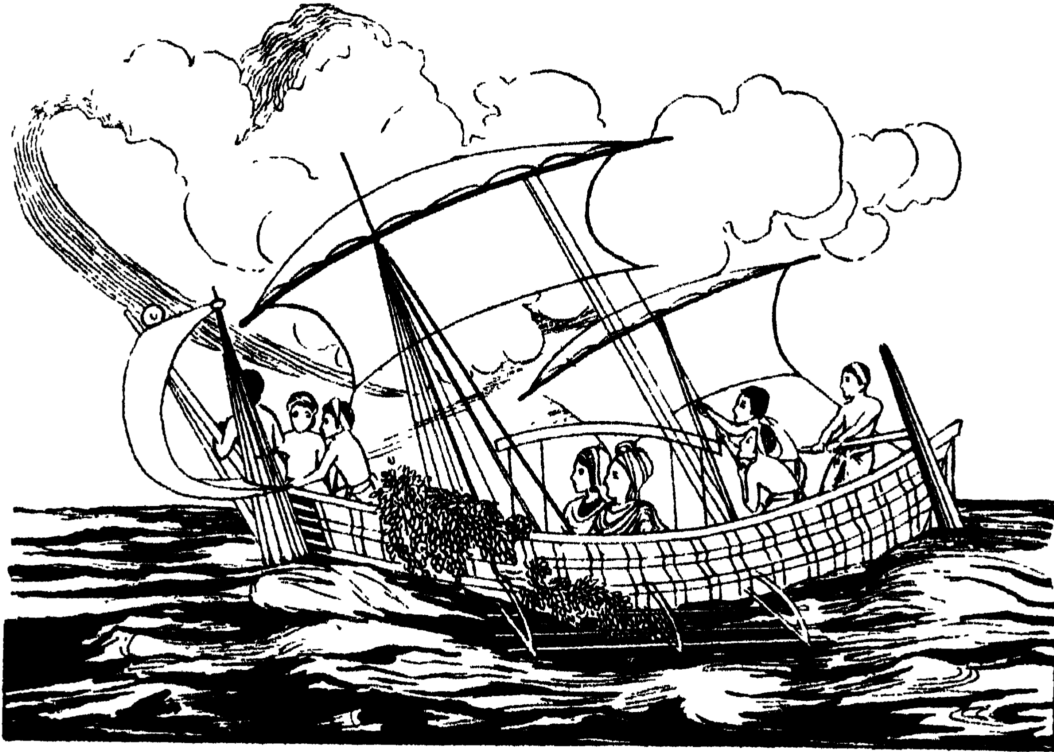
সংঘমিত্রা সম্রাট্-কন্যা হইয়াও এক মুহূর্তে সমস্ত সম্পদ্ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই কঠোর ধর্মসাধনার পথ বাছিয়া লইলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র আঠারো, মহেন্দ্রের বিশ।

কয়েক বৎসর পরে মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য সিংহল দ্বীপে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে নূতন ধর্মের অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া সিংহলরাজ তিষ্য মুগ্ধ হইলেন। বৌদ্ধধর্মের নূতন প্রেরণায় দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে নরনারী মহেন্দ্রের নিকট হইতে দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ লইতে আসিল। সিংহলের রাণী অনুলাও পাচশত সখী লইয়া মহেন্দ্রের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে আসিলেন। মহেন্দ্র রাজাকে বলিলেন, "মহিলাদের প্রব্রজ্যা দিবার অধিকার তো ভিক্ষুর নাই, সেজন্য ভিক্ষুণীর প্রয়োজন। সুতরাং আমি ভারতবর্ষ হইতে উপযুক্ত কোনও ভিক্ষুণীকে সিংহলে আসিবার জন্য সংবাদ দিতেছি। তিনিই আসিয়া রাণী ও সখীদের প্রব্রজ্যা দিবেন।"

মহেন্দ্র অশোকের কাছে পত্র লিখিলেন, "সংঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করুন।"

পত্র পাইয়া অশোকের মনে এক সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদ আসিয়া দেখা দিল। কন্যা ধর্মকার্যে যাইতেছে, ইহা তো সুখের কথাই; কিন্তু তাঁহাকে যে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহাতে মনে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি সংঘমিত্রাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসে, তোমাকে না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব? মহেন্দ্রকে তো বিদায় দিয়াছি, এখন তোমাকেও বিদায় দিতে হইলে সে দুঃখ আমি কি করিয়া সহ্য করি, বল?"

সংঘমিত্রা বলিলেন, "মহারাজ, ভ্রাতা মহেন্দ্রের আজ্ঞা কি আমি অমান্য করিতে পারি? ধর্মলাভ করিবার জন্য যে, শত শত নারী আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমাকে তো যাইতেই হইবে!"



মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া সিংহলে যাইতেছেন




সংঘমিত্রা প্রস্তুত হইলেন। জগতের বুকে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত এবার তাঁহার ডাক আসিয়াছে। এই ব্রতে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দিয়া তাঁহার জীবন ধন্ত হউক। সিংহল-বাসীকে নূতন ধর্ম বিলাইবার জন্ত ত্রিশ বৎসরের রাজকন্যা এগারজন ভিক্ষুণী সঙ্গে লইয়া বোধি-দ্রুমের একটি শাখা সঙ্গে করিয়া মাঘমাসের শুক্লা প্রতিপদে ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়া সমুদ্রে তরী ভাসাইলেন। পিতা, মাতা, পরিবার, স্বজন, স্বদেশ, ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার বুকে বাজিল না। ধর্মই যে, জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ। ধর্ম প্রচারের জন্ত বিদেশ-যাত্রায় ভারত-বর্ষের পক্ষে শুধু কেন, পৃথিবীর পক্ষেও বোধ হয় এই প্রথম মহিলা।

সংঘমিত্রা সিংহলে পৌছিলে রাজা, রাণী ও সমস্ত সিংহলবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করিলেন। রাণী অনুলা ও সখীগণ তাঁহার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া ধন্ত হইলেন।

ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। তাঁহাদের আশ্রম "উপাসিকাবিহারে" সংঘমিত্রা বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেখানে বারোটি মঠগৃহ নির্মাণ করাইলেন। "উপাসিকাবিহারে" লোক আর ধরে না। তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইবার জন্ত অবিশ্রাম নরনারীর যাতায়াত! সংঘমিত্রা দেখিলেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ইহা যেন ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। একটি নিরালা ভজনাশ্রমের প্রয়োজন।

রাজা তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া দূরে এক কদম্ব বনের মধ্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। তাহার নাম "হত্থলহক-বিহার।"

সংঘমিত্রা আর দেশে ফিরিলেন না। তাঁহার জীবনের বাকী দিনগুলি ধর্মসাধনা করিয়া ও অন্তকে ধর্মসাধনের পথ দেখাইয়া অতিবাহিত হইল। এইরূপে উনষাট বৎসর বয়সে সিংহলের ভূমিতে হত্থলহক-বিহারে তাঁহার পুণ্যময় জীবনখানি নির্বাণ লাভ করিল। অনেকের মতে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা একসঙ্গেই সিংহল গমন করেন।

উভয়-ভারতী

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া চলিয়াছে, বেদ ও উপনিষদের মর্ম মানুষ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে, এমনই সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তিনি এক অদ্ভুত শক্তি লইয়া জন্মিয়া-ছিলেন; তরুণবয়সেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখা দিল। প্রচলিত ধর্মমতের উপর তিনি আপনার নূতন মতবাদকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। ভারতবর্ষের যেখানে যত মহাপণ্ডিত ছিলেন, সকলকে একে একে পরাজিত করিয়া তিনি অদ্বৈত-বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসীর কাছে সমস্ত ভারতের সুধীজন মাথা নোয়াইলেন।

কুমারিল ভট্ট নামে আর এক পণ্ডিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শঙ্করকে বলিয়া গেলেন, "আপনি যদি মাহিষ্মতীপুরীর মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সমস্ত ভারতে আপনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন, আপনার অদ্বৈতমতকে সকলে মানিয়া লইবে।"

দাক্ষিণাত্যে নর্মদানদী কুলুকুলু বহিয়া যাইতেছে—তাহারই তীরে মাহিষ্মতীনগরী। এখন তাহার নাম হইয়াছে মহেশ্বর। সেইখানে পণ্ডিত গৃহস্থ মণ্ডনমিশ্র বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে সেই বাসস্থান আজও মণ্ডলেশ্বর বলিয়া পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত—মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিবেন।

মণ্ডনমিশ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। কথা হইল, এই বিচারে যিনি পরাস্ত হইবেন তিনি জয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। শঙ্করাচার্য্য জয়লাভ করিলে মণ্ডনমিশ্র তাঁহার শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন, আর মণ্ডন জয়ী হইলে শঙ্কর হইবেন গৃহী।

কথা ঠিক হইল। কিন্তু জয়পরাজয় বিচার করিবেন কে, কাহার এমন দুর্জয় পাণ্ডিত্য, যিনি শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রের মত জগদ্বিখ্যাত দুই মনীষীর তর্কের গুণদোষ বিচার করিতে সাহস করেন?

মণ্ডনমিশ্রের যে পত্নী, তাঁহার নাম উভয়-ভারতী। গৃহস্থের বধূ হইয়া সমস্ত সংসারের কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি অসামান্ত বিদুষী ছিলেন। বেদ,



ইতিহাস, দর্শন, পুরাণ, সমস্ত বিদ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য এত অধিক যে, লোকের ধারণা ছিল, তিনি স্বয়ং দেবী সরস্বতী। নহিলে এত জ্ঞান কি মানুষে সম্ভব? শঙ্কর-মণ্ডনমিশ্রের বিচারের সংবাদ প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ বলিলেন, "উভয়-ভারতীই এই বিচারে মধ্যস্থ হইবার উপযুক্ত।"

উভয়-ভারতী সভায় উপস্থিত হইলেন। বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমণ্ডলী সভায় আসীন হইয়া একাগ্রমনে শুনিতেছেন।

অনেক দিন ধরিয়া তর্ক চলিল। দুই পক্ষই সমান তেজের সঙ্গে বিচার চালাইতেছেন—হার মানিবার পাত্র কেহই নন্। কিন্তু অবশেষে একদিন তর্ক সাঙ্গ হইল। উভয়-ভারতী বুঝিলেন, মণ্ডনমিশ্রই পরাস্ত হইয়াছেন। স্বামীর পরাজয়ে ভারতী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যখন নিরপেক্ষ বিচারপতির আসনে স্থান লইয়াছেন, তখন ন্যায়ের অমর্য্যাদা করিতে তো পারেন না। সুতরাং ঘোষণা করিলেন, "তর্কে মণ্ডনমিশ্রেরই পরাজয় হইয়াছে।" সভামধ্যে শঙ্করাচার্য্যের জয়ধ্বনি উঠিল।

উভয়-ভারতী তখন অগ্রসর হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, "আপনি আমার স্বামীকে পরাস্ত করিয়াছেন সত্য। কিন্তু এখনই তিনি আপনার শিষ্যত্ব লইয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন না, কারণ, আমি এখনও এখানে বর্ত্তমান। শাস্ত্রে বলে, স্বামীর অর্দ্ধেক তাহার স্ত্রী। সুতরাং আমাকে তর্কে পরাস্ত না করিতে পারিলে তো তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা হয় না।"

শঙ্কর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সসম্ভ্রমে আপত্তি জানাইয়া উত্তর করিলেন "কিন্তু স্ত্রীলোকের সঙ্গে তর্কবিচার করা যে পণ্ডিতগণের নিয়মের বাহিরে।" উভয়-ভারতী বলিলেন, "একথা আপনাকে কে বলিল? আপনি যদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে যে কেহ আপনাকে তর্কে আহ্বান করিবেন, তিনি পুরুষই হউন অথবা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহাকে জয় না করিয়া আপনার উপায় নাই। আপনি জানেন, পুরাকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজর্ষি জনক সুলভার সঙ্গে বিচার করিয়াছিলেন। সুতরাং আমিও আজ আপনার সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা করি।"

অগত্যা শঙ্করাচার্য্য সম্মত হইলেন। সভার সকল লোক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সেই যে বিচার আরম্ভ হইল, তাহা শুধু স্নানাহার ও সন্ধ্যাহ্নিকের কালটুকু ব্যতীত দিনে ও রাত্রিতে আর থামে না। সতেরো দিন ব্যাপিয়া এই বাদানুবাদ সমানভাবে চলিতেছে। উভয়-ভারতী সমস্ত বেদ-বেদান্ত হইতে প্রশ্ন তুলিয়া শঙ্করকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, শঙ্করও সামান্য পণ্ডিত নন্, তিনি কোনমতেই কাতর হইতেছেন না। অবশেষে উভয়-ভারতী চতুরতা করিয়া তাঁহাকে গৃহধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ঠিক বুঝিলেন, সন্ন্যাসী মানুষ এ প্রশ্নের কোনও উত্তরই দিতে পারিবেন না।

বাস্তবিক তাহাই হইল। শঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তিনি তো গৃহস্থ নহেন, সংসারে অনভিজ্ঞ, ইহার কিছুই জানেন না। উপায় না দেখিয়া শঙ্কর বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একমাস সময় দিন্। তারপর ফিরিয়া আসিয়া আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিব।"

ভারতী স্বীকার করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য বিদায় লইয়া এক মাসকাল বসিয়া গৃহধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিলেন। তারপর আবার আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

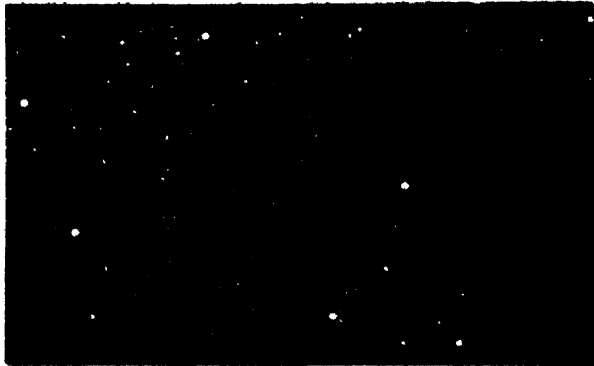
এবারে উভয়-ভারতী আর তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া রাখিতে পারিলেন না। শঙ্কর প্রত্যেকটি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন।

উভয়-ভারতী তখন সন্তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন, "আপনি সত্য-সত্যই জয়লাভ করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র আজ হইতে আপনার শিষ্য হইলেন।"

কি ও কেন

আকাশে কত নক্ষত্র আছে?

এই প্রশ্নটা তোমরা সকলেই নিজেদের মধ্যে ক'রে থাক এবং এর উত্তরে তোমরা যে কোনও একটা বৃহৎ সংখ্যা বলে তোমাদের প্রশ্নকর্ত্তাকে চুপ করিয়ে দাও। তোমাদের প্রশ্নকর্ত্তা ঐ সংখ্যাটিকে নক্ষত্রের প্রকৃত সংখ্যা বলে স্বীকার ক'রে নিতে রাজী না হ'লে উত্তর ত তোমাদের মুখে লেগেই আছে—'গুণে লও'। এর পর কোনও কথা বলবার সাহস কি আর থাকে? প্রশ্ন করা ও তার উত্তর দেওয়া এই দুইটি কাজই যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তোমরা সকলেই জান যে, নক্ষত্রের যে সংখ্যা উত্তরে বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ



নক্ষত্র-ভরা আকাশ

কাল্পনিক। আর সঙ্গে সঙ্গে এও তোমরা নিশ্চয়রূপে জান যে, এরূপ প্রশ্নের সত্যকার উত্তর অসম্ভব।

অসম্ভব ত এক হিসাবে বটেই! ধর, যদি ১ সেকেণ্ডে তোমরা ৫টা নক্ষত্র গুণতে পার, তবে এক ঘণ্টার অনবরত চেষ্টার ফলে, আর একটুও ভুল না করলে তোমরা মাত্র ১৮ হাজার গুণতে পারবে। সারা আকাশময় নক্ষত্র চিক্ চিক্ করছে, এমন কত ১৮ হাজার যে গুণতে হবে, তার কি আর শেষ আছে। কিন্তু এই যে অসম্ভব কাজ, তাও মানুষ সম্ভব ক'রে তুলেছে। তোমরা শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে যে, এই প্রশ্নটির সত্যকার একটি উত্তর আছে—অর্থাৎ আকাশে কত নক্ষত্র আছে তার সংখ্যা মানুষের অজ্ঞাত নয়। আর এই সংখ্যাটি পাওয়া গিয়াছে ঐ একটি একটি ক'রে সব নক্ষত্রগুলিকে গুণে। তবে এ গোণা শুধু-চোখে হয়নি, তা বুঝতেই পারছ। দূরবীণ দিয়ে সমস্ত আকাশের নানান রকমের ছবি তুলে তারপর অনেক হিসাব-নিকাশ ক'রে এই সংখ্যাটিকে পাওয়া গেছে।

আকাশের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে যে, সব নক্ষত্র সমান উজ্জ্বল নয়। কোনোটা খুব জলজল করে, কোনোটা আবার অতি কষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়। নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে শিশু-ভারতীতে অনেক কথা থাকবে। উজ্জ্বলতা এক পক্ষে যেমন আলোর নিজস্ব তেজের উপর নির্ভর করে, তেমনি অপর পক্ষে আমাদের থেকে তার দূরত্বের উপরও নির্ভর করে। আলোটা যত দূরে সরে যায় ততই তা ছোট হয়ে যায়, এমন দেখায়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যতদূরে যায় আমাদের চোখে তত কম আলো পৌঁছায়—আর কাজে কাজেই উজ্জ্বলতাও কম হ'য়ে যেতে দেখা যায়। এমন যদি হয় যে, আমাদের চোখকে কোনও উপায়ে দূরত্বের

অনুপাতে বড় করতে পারা যায় তবে আর হ্রাস হতে পারবে না। আমাদের চোখকে বড় করবার উপায় হচ্ছে দূরবীণ ব্যবহার করা। একটা ১ ইঞ্চি লেন্সযুক্ত দূরবীণের মুখ আমাদের চোখের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বড়, কাজে কাজেই আয়তন হিসাবে প্রায় ২৫ গুণ বড় হয়। ২৫ গুণ বেশী আয়তনের বড় হবার ফলে দূরবীণটি ২৫ গুণ বেশী আলো সংগ্রহ ক'রে থাকে। অতএব শুধু-চোখে যে তারাটি সবে মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় সেটি যদি কোনও উপায়ে আরও ৫ গুণ দূরে সরে যায় তবে ১ ইঞ্চি দূরবীণ দিয়ে তাকে ঠিক চোখে-দেখার মত অতি কষ্টে দেখতে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দাঁড়াল এই যে, ঐ দূরবীণটির দৃষ্টিক্ষেত্র চোখের তুলনায় ৫ গুণ বেশী। যদি দুটো দূরবীণ নিয়ে পরস্পরের দৃষ্টিক্ষেত্র তুলনা করা যায়, তবে তোমরা দেখতে পাবে যে, এই দৃষ্টিক্ষেত্র দূরবীণের মুখের ব্যাসের (diameter) উপর নির্ভর করে। যার মুখ যত বড় তার দৃষ্টিক্ষেত্রও তত প্রসর।

যদি আকাশের মধ্যে নক্ষত্র সব স্থানে সমান ভাবেই পাওয়া যেত অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্রের ঘনত্ব যদি সব স্থানে সমান হ'ত, তবে যেমন যেমন বড় দূরবীণ দিয়ে আমরা আকাশ নিরীক্ষণ করতুম আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি ক্রমিকভাবে বেড়েই যেত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তা পাওয়া যায় না। ১ ইঞ্চি দূরবীণ দিয়ে যত নক্ষত্র দেখতে পাই, ২ ইঞ্চি দিয়ে অবশ্য সে সংখ্যা থেকে বেশী দেখতে পাই, সন্দেহ নাই কিন্তু আকাশে নক্ষত্র সব স্থানে সমান ঘনত্বে থাকলে যতটা পাওয়া উচিত, তাথেকে অনেক কম পাই। শেষ পর্য্যন্ত দূরবীণের মুখ যত চওড়া করি না কেন, বেশী তারা আর পাওয়া যায় না। তবে সে নক্ষত্রগুলি গেল কোথায়? বৈজ্ঞানিকরা বলেন, তারা নেই। তাঁরা বলেন যে, সূর্য্যের চারিদিকে অনেক নক্ষত্র আছে—তার পর তাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, আকাশের সব দিকে সমান ভাবে নক্ষত্র কমে আসে নি - কোনও কোনও দিকে তাড়াতাড়ি কমে গিয়েছে—আবার অন্য দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নক্ষত্রের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু এর সব ত আর চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকরা নক্ষত্রের উজ্জ্বলতাকে নিয়ে তার শ্রেণীবিভাগ ক'রে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে সব থেকে বড় যে দূরবীণ—যার মুখই শুধু ১০০ ইঞ্চি চওড়া—তাতে ২১ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। শুধু-চোখে কষ্টেসৃষ্টে আর বেশ পরিষ্কার আকাশ থাকলে ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখা যেতে পারে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির সংখ্যা প্রায় ৬০০০; অতএব শুধু-চোখে আমরা মাত্র ছয় হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই।

জ্যোৎস্না নীলাভ কেন হয়?

প্রকৃতপক্ষে চাঁদের আলোতে সব রংই প্রায় সমান-ভাবেই আছে। আমাদের চোখ সব রং সমান-ভাবে দেখতে পায় না। খুব উজ্জ্বল আলো হ'লে, যেমন মনে কর সূর্য্যের আলো—হলুদ আর সবুজ এই দুইটি রংএর মাঝামাঝি একটা রং আমাদের চোখে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি আলো খুব 'মৃদু' হয়, তবে সব রংএর চেয়ে নীল রংটাতেই আমাদের চোখ বেশী সাড়া দেয়। সূর্য্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হ'য়ে যখন পৃথিবীতে আসে তখন তাকে বলা হয় জ্যোৎস্না। এত ঘুরে যখন আলো-কে আসতে হয় তখন নানান্ কারণে তা অতিশয় মৃদু হ'য়ে পড়ে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, মৃদু অবস্থায় নীল রংটাই আমাদের চোখ বেশী দেখতে পায়—তাই চাঁদের আলোর মধ্যে নীল রংটারই প্রাধান্য আমরা পাই।

পৃথিবীর প্রথম জীবের কি আহার ছিল?

পৃথিবীতে সমস্ত জীবের আহারের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলেই নিজেদের আহারের জন্য অপর জীবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই উদ্ভিদ, বা উদ্ভিদ্‌ভোজী অপর প্রাণীদের আহার ক'রে জীবনধারণ ক'রে থাকে। এইজন্য পৃথিবীর প্রথম প্রাণী যে, কোনও জীব বা জন্তু ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহ। অন্য কোনও গ্রহ থেকে দৈবাৎ যদি কোনও প্রাণী পৃথিবীতে এসেও থাকত, তবে আহারের অভাবে নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছিল। দ্বিতীয় জীবন্ত জিনিষ উদ্ভিদ্। উদ্ভিদের বিষয় আলোচনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। এরা কোনও জীবন্ত বস্তুর উপর নির্ভর

না ক'রেও শুধু বাতাস আর মাটীর সাহায্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, উদ্ভিদের জন্ম পৃথিবীতে প্রাণীদের পূর্ব্বে হয়েছিল। আর যখন প্রথম প্রাণী সৃষ্টি হ'ল তখন তা নিশ্চয়ই উদ্ভিদসুলভ প্রাণীই ছিল।

তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন হ'তে পারে যে, উদ্ভিদসুলভ প্রাণী আবার কি? উদ্ভিদের সব থেকে বড় লক্ষণ এই যে তারা মাটী আর বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে, আর তাদের সঞ্চরণ করার কোনও শক্তি থাকে না। উদ্ভিদসুলভ প্রাণী সেই প্রাণী, যারা সঞ্চরণ করতে পারে, অথচ তাদের আহারের জন্য বাতাস ও মাটী ছাড়া আর অন্য কিছুর আবশ্যক হয় না। তাদের জীবন ধারণ করা সরল হবে বলে তারা জলেই জন্মাত আর গাছের মত জল, বাতাসের অঙ্গারজান (carbon dioxide) গ্যাস ও নানান রকমের লবণ নিজেদের শরীর দিয়ে শুষে নিয়ে পরিপাক ক'রে নিত। এই যে প্রথম প্রাণী এদের আর একটা গুণ ছিল —যা উদ্ভিদের মধ্যে নেই। এদের মধ্যে নিজেদের ফুটিয়ে তোলবার প্রবৃত্তিও সুপ্তভাবে বর্ত্তমান ছিল—তা নইলে মানুষের মত এমন একটা অতিশয় জটিল জীব তৈরী হওয়া সম্ভব হত না। যবক্ষারজান যে সব লবণের উপাদান সেই সেই লবণই এই প্রাণীদের বোধ হয় বেশী প্রিয় খাদ্য ছিল। যখন মেঘ ক'রে খুব বিদ্যুৎ চমকাত আর তার ফলে বাতাসের যবক্ষারজান (introgen) আর অম্লজান (oxygen) মিলে নতুন লবণ (salt) তৈরী হয়ে বৃষ্টির জলের সহিত পৃথিবীতে আসত, তখন বোধ হয় এদের আনন্দের দিন ছিল। তখন এরা বোধ হয়, নিজেদের পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে মহা ধুমধামে ভোজে লেগে যেত। আর সে আমলে ত পৃথিবী আজকালকার মত শান্ত ছিল না—তখন পৃথিবীর বয়স ছিল কম—ছোট ছেলেমেয়েদের মত তার হৈচৈ ত সব সময়েই লেগেই ছিল।

মেঘের পাড় রূপালী কেন হয়?

এজন্য তোমাদের মেঘ কি, তা একটু জানাতে হয়। তোমরা খুব ঘন কোয়াসা দেখেছ। মেঘ এই রকম একটা কোয়াসা বই আর কিছু নয়। আকাশে যখন আমরা মেঘ দেখি তখন এই কোয়াসার তলাটা মাত্র দেখিতে পাই। বাস্তবিক পক্ষে ঐ তলাটা থেকে আরম্ভ ক'রে মেঘ অনেক উঁচু পর্য্যন্ত উপরে উঠে গিয়েছে। এখন তোমরা বলতে পার যে, মেঘ ত কালো, কোয়াসা ত অত কালো নয়।

তার উত্তর এই। কোনও পুকুর থেকে একটা কাচের গ্লাসে ক'রে জল লও। দেখবে, তা কেমন পরিষ্কার—যেন স্ফটিকের মত টল টল করছে। কিন্তু পুকুরের তলার দিকে চাও,দেখবে অন্ধকারময়। এর কারণ কি? জল বর্ণহীন হলেও একেবারে বর্ণহীন নয়। যখন কম বা অল্প পরিমাণে থাকে, তখন বর্ণহীন দেখায় আর যখন পরিমাণে



মেঘের রূপালী পাড়

বেশী হয় তখন তার নিজের বর্ণটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। তাই জলের মধ্যে আলো যাবার সময় অল্পপরিমাণ জল থাকলে ভেদ ক'রে চলে যায় আর জলের পরিমাণ বেশী থাকলে কিছু দূর গিয়ে আর যেতে পারে না, নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

মেঘের বেলাতেও তাই। মেঘ যে কোয়াসার মত একটা জিনিস আর তারই মত অনেকটা স্থান যোপে ছড়িয়ে থাকে, তা তোমাদিগকে বলেছি। এর মধ্য দিয়ে আলো চলবার সময় জলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যেমন হয়, কিছুদূর গিয়ে আর চলতে পারে না, নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ফলে হয় কি, মেঘের নীচের তল—অর্থাৎ যে তল আমরা দেখতে পাই—সে তল পর্য্যন্ত আলো ভেদ করে আসতে পারে না—আর সবটা অন্ধকারময় অর্থাৎ কালো দেখায়। কিন্তু পাড়টা ত অত স্থূল হয় না। তাই

এইখান থেকে কিছু আলো বেরিয়ে আমাদের কাছে পৌছয়। তাই যে জায়গা দিয়ে আলো বেরিয়ে আসে তা স্বভাবতঃই খুব উজ্জ্বল দেখায়। এই উজ্জ্বলতা একেবারে মেঘের ধার দিয়ে হয় বলে কালো কাপড়ের ঠিক যেন রূপালী পাড়ের মত দেখায়।

ফুঁ দিলে প্রদীপের শিখা নিবে যায় কেন ?

দীপশিখা জ্বলে থাকবার তত্ত্বটি কি, জানলে



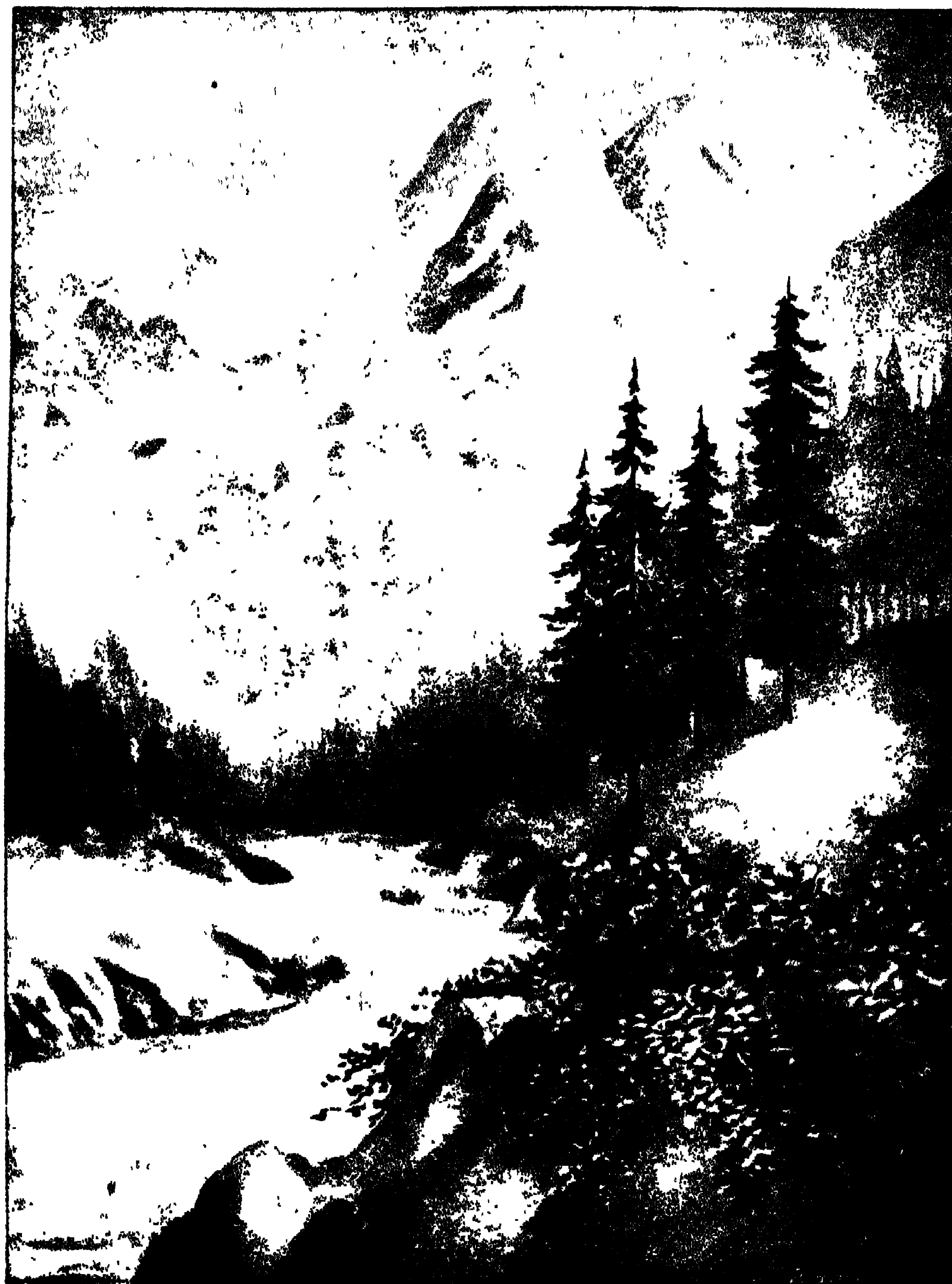
ফুঁ দিলে প্রদীপের শিখা নিবে যায়

নিবে যাবার কারণটিও তোমাদেব কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে। দীপশিখাব জন্যে তেলের দরকার হয়, তা তোমরা জান। এই তেল পলিতা সাহায্যে শিখার কাছে পৌছে। তখন একটা জ্বলন্ত কাঠি এই পলিতার কাছে ধরা যায়, আর পলিতাটা জ্বলে উঠে শিখার আকার ধারণ করে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা সহরে থাক, যেখানে গ্যাসের আলো বা ইলেকৃট্রিকের আলোর ব্যবহার বেশী তারা হয় ত প্রদীপের শিখা ফুঁ দিয়ে নেবাবার কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারবে না। কিন্তু যাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, তারা পাশেব ছবিখানি দেখে আমাদেব এই কথাটি অতি সহজেই বুঝতে পারবে।

ব্যাপার এই হয় যে, জ্বলন্ত কাঠিটার সংস্পর্শে এসে তেলটা গ্যাস হ'য়ে যায়, আর বাতাসেব অম্লজানের সংস্পর্শে এসে তাব সঙ্গে যৌগিক তৈরী হ'তে থাকে। এই অম্লজানের সঙ্গে যৌগিক হ'তে হলে একটা বিশেষ উঁচু উত্তাপের আবশ্যক হয়—তা না হলে যৌগিক তৈরী হ'তে পারে না। যতক্ষণ শিখাটা থাকে, ততক্ষণ এই উত্তাপটা বর্ত্তমান থাকে—কমতে পায় না। কিন্তু ফুঁ দিলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস গিয়ে শিখাতে লাগে আর তার উত্তাপ কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তেল আর অম্লজানের যৌগিক হওয়া সম্ভব হয় না, তার ফলে দাঁড়ায় যে, শিখাটা অন্তর্দ্ধান করে।

ব্যাপারটা সহজ, তোমরা কয়জনে এর কারণটা জান্‌তে বল দেখি ? এমনি কত ব্যাপাব আমাদেব চারিদিকে অনবরত ঘটছে —আমবা তা দেখেও দেখি না। আমরা ক্রমে ক্রমে তা তোমাদের কাছে বলবার চেষ্টা করব।



হিমাদ্রি শিখরে



ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

৪২৮ পৃষ্ঠার পর

সেরিন্দিয়ার যুগের বিস্তর নগর ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেশের মরুভূমির বালির নীচে হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীনারা অতি প্রাচীন কালে এই দেশ জয় করিয়াছিল, তাহাদের অধিকারের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতের সভ্যতার নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ ও অন্য ভারতীয় শাস্ত্রের সংস্কৃত পুঁথি এবং দেশ-ভাষায় লিখিত পুঁথি, ছবি, মূর্ত্তি প্রভৃতি। দেশটা পূর্ব্বে বেশ উর্ব্বর ছিল, এখন বহুস্থান জলশূন্য হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; মরুভূমির বালিতে প্রাচীন সব সহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেই সব বালি খুঁড়িয়া প্রাচীন ভারতীয় ও অন্য সভ্যতার এবং স্থানীয় শিল্পকলাদির প্রচুর নিদর্শন বাহির হইয়াছে। আমরা এই সব আবিষ্কারের ফলে এবং হিউএন-সাঙ-প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকগণের লেখা বইএর বিবরণ পড়িয়া এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, ভারতের অধিবাসিগণের কি বিরাট্ এক সভ্যতা মধ্য এশিয়ার লোকদের গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ক্রমে ইহারা মধ্য এশিয়াকে ভারতের একটি অংশ করিয়া তুলিয়াছিল। এখানকার বিশিষ্ট লোকেরা সংস্কৃত নাম লইতেন। কুচা রাজ্যের এক জন রাজার নাম ছিল 'স্বর্ণদেব'। কারা-সহরের এক রাজার নাম ছিল 'হরিপুষ্প' ও খোতানের রাজার নাম ছিল 'বিজয়'। ইহারা আনুমানিক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের লোক। সেরিন্দিয়ার সব চেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হইতেছে কুমারজীব। (জীবৎকাল আনুমানিক ৩৪৫-৪১৩ খৃষ্টাব্দ)। ইনি বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং কুচা হইতে চীনে গিয়া বিস্তর বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল 'কুমার'। পিতা ভারত হইতে কুচায় আগত এক রাজপুত্র ছিলেন এবং ইহার মাতা 'জীবা' ছিলেন কুচার রাজকুমারী। মাতা ও পিতার নাম মিলিত করিয়া ইহার নাম। এখন এই ভূভাগ আর ভারতের অংশ নহে; কেবল প্রাচীন ভারতের—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের স্মৃতি ইহার ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত। এইরূপ বহু নিদর্শন এদেশের প্রাচীন

সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে।

আজকাল যে দেশকে আমরা আফগানিস্থান বলি, সে দেশ দেড় হাজার বছর আগে আমাদের ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। এখন আফগানিস্থানের লোকেরা হয় ফারসী, নয় পশতু বলে। জাতিতে ইহারা ইরাণীয় আর্য্য, ধর্ম্মে এখন মুসলমান; কিন্তু তখন এই দেশের লোকেরা ছিল হিন্দুজাতীয়, ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের শাখা মানিত। গ্রীকেরা আফগানিস্থানকে India Meion অর্থাৎ India Minor বা 'ছোট-ভারত' বা 'প্র-ভারত' বলিত। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রচুর নিদর্শন ছিল। কাবুল শহরের ৩০ মাইল পশ্চিমে 'বামিয়ান' বা 'ব্রহ্মযান' নামক স্থানে পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈরী কতকগুলি বিরাট্ বুদ্ধ মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, খাড়াইয়ে এক একটা কলিকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। এছাড়া মন্দির, চিত্র, মূর্ত্তি—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচুর নিদর্শন বাহির হইয়াছে। এ দেশও এখন ভারতের অংশ নহে, ইহা ভারত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, পশতু-ভাষী পাঠান ও ফারসী-ভাষী তাজীক জাতি আসিয়া এই দেশ দখল করে, পরে ইহারা মুসলমান হয় ও ধীরে ধীরে এই দেশের প্রাচীন হিন্দুজাতি ইহাদের হাতে নিষ্পেষিত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদের রক্ষার বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। সুপ্রাচীন যুগ হইতেই যে দেশ ভারতের অঙ্গস্বরূপ ছিল, তাহা এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভারতের উত্তরের দেশ তিব্বতকেও এক হিসাবে বৃহত্তর ভারতের শামিল করিয়া লওয়া চলে। তিব্বত এখন নামতঃ চীন সাম্রাজ্যের অংশ—তিব্বতের লোকেদের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও মনোভাব আছে। জাতিতে ইহারা চীনাদের জ্ঞাতি, কিন্তু ধর্ম্মে ও সভ্যতায় ইহারা অনেকটা ভারতেরই। তিব্বতীরা চীনের পশ্চিম অংশে তাহাদের আদি বাসভূমি হইতে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক তিব্বতে আসিয়া বসতি করে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা অর্দ্ধ অসভ্য অবস্থায় ছিল, এবং তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্মে নানারূপ যাদু-বিদ্যাময় ক্রিয়াকলাপ ও পূজাঅনুষ্ঠান হইত। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মকে 'বোঙ' ধর্ম্ম বলে। তাহার পরে, যীশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসরের পরে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা ইহাদের অবস্থার অনেক উন্নতিসাধন হয়। ভারতীয় বর্ণমালা ইহারা গ্রহণ করে, এবং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি থোনমি সম্ভোট্ নামে একজন তিব্বতী পণ্ডিত ভারতীয় বর্ণমালায় তিব্বতী ভাষা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন ভারতের বহু শিল্প ও রীতিনীতিও ইহারা শিক্ষা করে। তিব্বতীরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের বলিত 'বোদ্' (এখন এই শব্দ ইহারা 'প্যো' এইরূপে উচ্চারণ করে); এই 'বোদ্' শব্দ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভারত-বর্ষে প্রায় পনের শত বৎসর পূর্ব্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া 'ভোট' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিব্বতের প্রাচীন ভারতীয় নাম হইতেছে 'ভোট দেশ।' বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি পণ্ডিত, প্রাচীনকালে ভোট দেশে গিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত, 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।' ইনি ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তিব্বতে যাইয়া সেখানকার বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এক নূতন শক্তি দান করেন। তিনি ভোটদেশে গিয়া সেখানকার নানা

উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। এখনও তিব্বতীরা অলৌকিক পুরুষ বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তিব্বতের লোকেরা চীনাদের সভ্যতার দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়। তবে মোটের উপর তাহাদের সভ্যতায় ও জীবনে ভারতবর্ষেরই প্রভাব বেশী। তাহারা এখনও বৌদ্ধ, তবে তাহাদের মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের প্রাচীন 'বোঙ' ধর্ম্মে মিশিয়া গিয়া তাহাদের পুরোহিত 'লামা'দের হাতে একেবারে নূতন আকার পাইয়া বসিয়াছে।

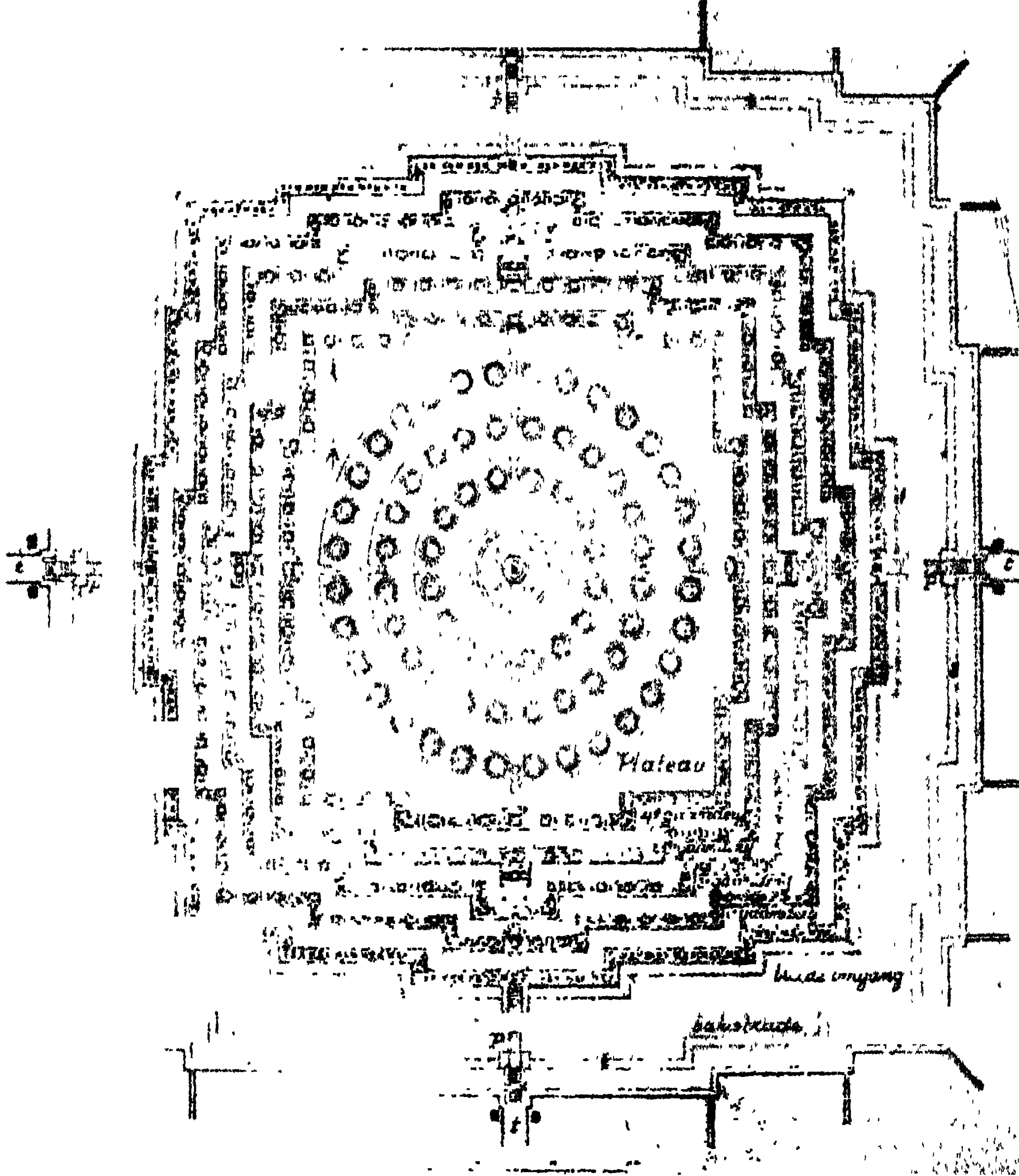
সিংহল দ্বীপে উত্তর ভারত হইতে ও দক্ষিণ ভারত হইতে ঔপনিবেশিকেরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংহল দ্বীপকে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে না ফেলিয়া আমাদের ভারতের অংশই বলা উচিত।

Serindia সেরিন্দিয়া বা মধ্য এশিয়া; India Minor ক্ষুদ্র ভারত, বা আফগানিস্থান; ভোটদেশ বা তিব্বত; Indo-China বা বর্ম্মা (উত্তর বর্ম্মা; দক্ষিণ বর্ম্মা বা সুবর্ণ ভূমি বা হংসাবতী); উত্তর শ্যাম; দক্ষিণ শ্যাম বা দ্বারাবতী ও নগর সুধর্ম্মরাজ; কম্বুজ বা কম্বোজদেশ; চম্পা উত্তর মালয়দেশ বা কটাহরাজ্য; এবং Indonesia বা দ্বীপময় ভারত (মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা বা শ্রীবিজয় অথবা শ্রীবিষয় বা সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বকদ্বীপ, বোর্ণিও ইত্যাদি) এত গুলি স্থান লইয়া বৃহত্তর ভারত। ইহাদের প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধে বড় বড় বই লেখা হইয়াছে—ইহাদের ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতিনীতি লইয়া অনেক কথা আছে। কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ এই সব দেশের প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দু আমলের ইতিহাস, মন্দির, শিল্প, সাহিত্য—সবই আমাদের খুব মন দিয়া আলোচনার বস্তু। আধুনিক যুগেও এই সব দেশের মাটির মধ্য হইতে হিন্দুযুগের যে সব প্রাচীন কীর্ত্তি বাহির হইতেছে, এই সব দেশের উপরে প্রাচীন মন্দিরাদিও যে সব প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও সগৌরবে অবস্থিত, এই সব জায়গায় লোকেদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে, রীতিনীতিতে, চালচলনে, ভাব-ভঙ্গীতে যে প্রাচীন ভারতীয় ভাব বিদ্যমান আছে, সমস্তই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

বৃহত্তর ভারতে আমাদের চর্ম্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান তিনটি বড় কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া এবারকার মত বৃহত্তর ভারত-কথা শেষ করিব। এই কীর্ত্তি তিনটি হইতেছে, তিনটি বিরাট্ মন্দির। ইহাদের একটি হইতেছে কম্বোজের বিরাট্ Angkor-Vat 'অঙ্কোরভট্'-এর মন্দির; দ্বিতীয়টি যবদ্বীপের (Boro-Boedoer) বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ; এবং তৃতীয়টিও যবদ্বীপের প্রম্বানানের ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবের মন্দির। এগুলি ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও অনেক কিছু আছে; সে সব কথা কিন্তু এক একটি দেশ ধরিয়া বলিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর বৃহত্তর ভারতের আর-কিছুর না হউক, অঙ্কোরভট্, বরবুদুর ও প্রম্বানান এই তিনটির নাম ও ইহাদের একটু পরিচয় জানিয়া রাখা উচিত।

অঙ্কোরভট কম্বোজ বা কম্বোডিয়া দেশে। কম্বোজে যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় লোকদের গতায়াত ছিল। 'কম্বু' নামে এক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ঐ দেশে বাস করেন, তিনি ঐ দেশে 'মেরা' নামে এক অপ্সরাকে বিবাহ করেন, কম্বু ও মেরার সন্তানেরা কম্বু হইতে জাত বলিয়া 'কম্বুজ' নামে খ্যাত হন, এবং তাহা হইতে জাতি ও দেশের নাম 'কম্বুজ' বা 'কম্বোজ', ইংরেজীতে Cambodia। কৌণ্ডিন্য নামে আর এক জন ব্রাহ্মণ আসেন, তিনি

'সোমা' নামে একজন নাগ বা স্থানীয় অনার্য্য রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। কৌণ্ডিন্য ও কম্বুর সন্তানেরা তুইটি রাজ্য স্থাপন করেন—খৃষ্ট জন্মের কিছু পরে।



বরবুদুর চৈত্যের ভূমির নকশা

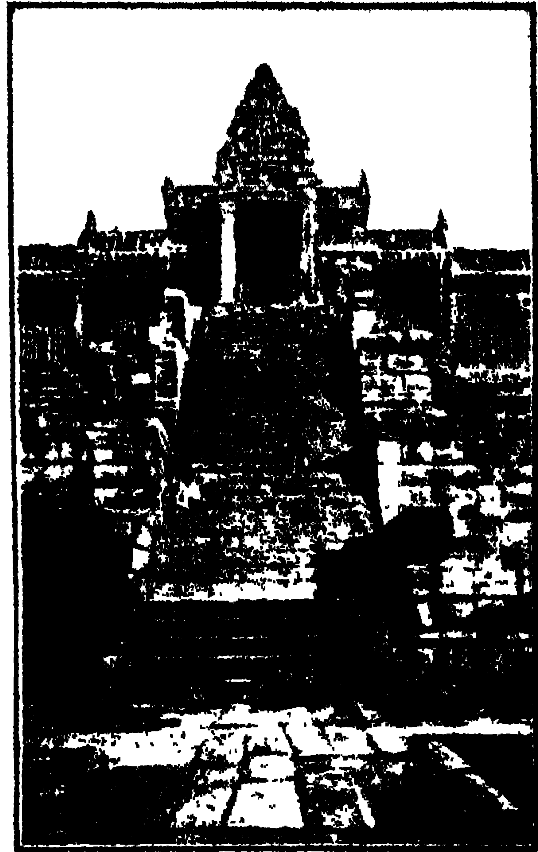
খৃষ্টীয় ৫৫০ হইতে কম্বোজ রাজ্যের একটি মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। রাজাদের সংস্কৃত অনুশাসন হইতে ইহাদের খবর জানা যায়। দ্বিতীয় জয়বর্ম্মা পরমেশ্বর নামে একজন রাজা (৮০২-৮৬৯ খৃষ্টাব্দ) একটি বিরাট্ কম্বোজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা যশোবর্ম্মা আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দে (Angkor Thom) অঙ্কোর থোম নামে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। এই অঙ্কোর থোমের কাছে রাজা দ্বিতীয়

সূর্য্যবর্ম্মা। (ইহার রাজত্বকাল খৃষ্টাব্দ ১১১২ হইতে ১১৫২ পর্য্যন্ত) (Angkor-Vat) অঙ্কোরভট-এর সুবৃহৎ প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সংস্কৃত 'নগর' শব্দ কম্বোজের ভাষায় 'অনগর', 'অঙ্গর' ও 'অঙ্কোর' রূপ ধারণ করে এবং ভট্ অর্থে মন্দির। এই মন্দিরে শিবের মূর্ত্তি ছিল। ভারতবর্ষেরই মত কম্বোজ ও চম্পায় শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, উমা, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতা পূজিত হইতেন। এই অঙ্কোরভট্ মন্দির ভারতবর্ষের বাহিরে হিন্দু শিল্পের এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। সমচতুষ্কোণ মন্দিরটির চারিদিকে বিরাট্ একটি পরিখা, পরিখাটির দৈর্ঘ্য এক এক দিকে এক এক মাইল করিয়া। পরিখা পার হইয়া মন্দিরে পৌঁছিবার জন্য দুইটি সাঁকো আছে। একটি পূর্ব্বে, একটি পশ্চিমে। পরিখার পরে মন্দিরের বাহিরের প্রাচীর প্রত্যেক দিকে এক মাইল করিয়া লম্বা। ইহা হইতেই মন্দিরের বিশালত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। এই বাহিরের দেওয়ালের পরে ভিতরে পর পর তিন তালা অতিক্রম করিয়া মাঝখানে বিমান বা দেবতার মূল মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। মূল বিমান ব্যতিরেকে, ছোটখাট মন্দির ও বিমান, শিখর ও গৃহ অনেক



গণেশ - যবদ্বীপ

আছে; এবং মন্দিরের ভিতরের দেওয়াল অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি ছাতযুক্ত টানা বারান্দা আছে। এই সব বারান্দা নানা খোদিত চিত্রে ভূষিত। ইহা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের ঘটনাবলীর চিত্র। সমস্ত খোদিত চিত্র পাশাপাশি করিয়া সাজাইলে সবটা কয়েক মাইল লম্বা হইবে। কম্বোজের শিল্প ভারতের শিল্পেরই রূপান্তর; ভারতীয় উপাখ্যান কি সুন্দরভাবে সমস্ত খুঁটিনাটির সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইতে হয়।



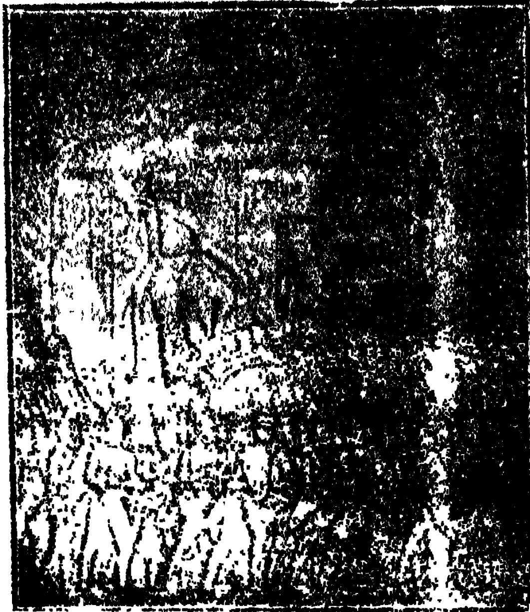
অঙ্কোরভট-এর প্রধান প্রবেশ-পথ

অঙ্কোরের এই মন্দিরের ও ইহার ভাস্কর্য্যের কতকগুলি চিত্র দেওয়া গেল। বরবুদুর স্তূপ বা চৈত্য মধ্য যবদ্বীপে বিদ্যমান। 'বর' হইতেছে 'বিহার' বা

মন্দির ; 'বুদুর-গ্রামের মন্দির' অর্থে 'বর-বুদুর'। যবদ্বীপের সব প্রাচীন মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। এগুলি (Dieng)



অঙ্কোরভট্ মন্দির গাত্রে খোদিত অশ্বারোহী সৈনিকদল



অঙ্কোরভট্ মন্দির-গাত্রে খোদিত পদাতিকদল

দিয়েঙ বলিয়া একটি স্থানে অবস্থিত। এই মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের বলিয়া মনে হয়। (এই সময়ের বহু পূর্ব্বে যবদ্বীপের ও বোর্ণিও দ্বীপের সংস্কৃত অনুশাসন আছে— সেগুলি হইতে বিষ্ণু প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজার ও ভারতবর্ষ হইতে আগত ব্রাহ্মণ



অঙ্কোরভট্-এর মন্দির-গাত্রে খোদিত যুদ্ধের

কর্ত্তৃক বৈদিক যজ্ঞ নির্ব্বাহ করার কথ



অঙ্কোরভট্-মন্দিরের একটি মূর্ত্তি

জানা যায়।) সুমাত্রা বা সুবর্ণদ্বীপে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় নামে একটি সাম্রাজ্য ছিল। এই

সাম্রাজ্যের রাজাদিগকে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বলিত। ইঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। এই রাজারা যবদ্বীপও জয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় নবম শতকে যবদ্বীপে ইঁহাদেরই চেষ্টায় এই বরবুদুর চৈত্য গঠিত হয়।

(সুমাত্রার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ৯৮৮ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রশাসন ভারতবর্ষে পাটনা জেলায় নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, বালপুত্রদের নামে কজন শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা নালন্দায় একটি বুদ্ধ-মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঐ স্থানে কতকগুলি গ্রাম কিনিয়া মন্দিরের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গ-গৌরব পণ্ডিত



মায়াদেবীর স্বপ্ন— বরবুদুরের মন্দির

...ান, যিনি ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন, যৌবনকালে সুমাত্রায় গিয়া সেখানে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।)

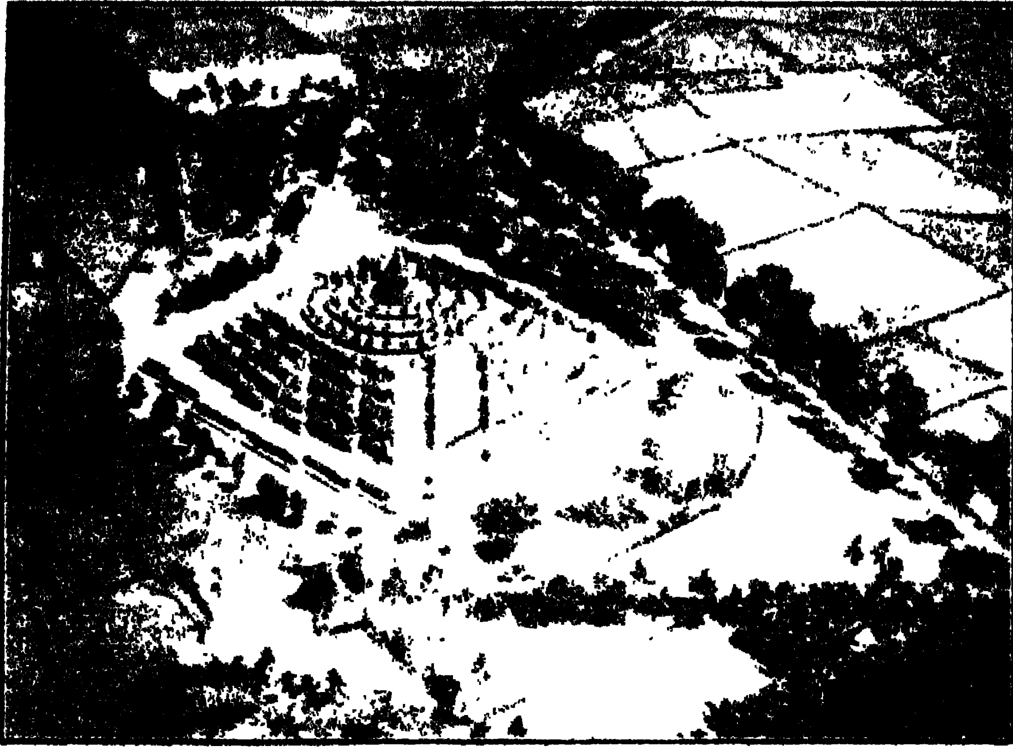
বরবুদুর ঠিক মন্দির নহে। বুদ্ধ বা অন্য মহাপুরুষের মৃত্যুর পর, তাহার অঙ্গ-খণ্ড বা কেশাদি দেহের কোন অংশ মাটিতে সমাহিত করিয়া তাহার উপরে প্রস্তরস্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। বিশেষ বিশেষ দিবসে ভক্তগণ আসিয়া এই স্তূপের বা চৈত্যের চারিধারে ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত বিশেষ পথ ধরিয়া ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতেন, ফুল, ধূপ-ধুনা আদি লইয়া স্তূপনিহিত মহাত্মার পূজা করিতেন। পর পর একাধিক তলায় এই প্রদক্ষিণ পথ হইত। সকলের উপরে বা মধ্যে থাকিত ধাতুগর্ভ বা মূল সমাধি। বরবুদুর চৈত্যটি সাততলার। এক এক



সিদ্ধার্থের জন্ম বরবুদুরের মন্দির

তলা অর্থে এক একটি বারান্দা, চৈত্যকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া গিয়াছে। এক তলা হইতে আর এক তলায় উঠিবার জন্য চারিদিকে চারিটি সিঁড়ির শ্রেণী আছে। প্রত্যেক বারান্দায় চৈত্যের গায়ে এবং বারান্দার আলিসায় পাথরে খোদাই করা চিত্রের শ্রেণী। চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনী ও নানা বৌদ্ধ উপাখ্যান হইতে গৃহীত। এগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে, ইহাদিগকে স্থাপিত। গুম্বজ সমেত সাততলার এই সমগ্র স্তূপটিকে দূর হইতে দেখিয়া মনে হয়, যেন বিরাট্ বৃক্ষশোভিত একটি পাহাড়।

বরবুদুরের ভাস্কর্য্য অপূর্ব্বসুন্দর জিনিষ। মূর্ত্তিগুলির সুঠাম গঠন এবং ইহাদের অতি স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর ভাব-দ্যোতক গতিভঙ্গী ভারতবর্ষের শিল্পেও দুর্লভ। বরবুদুর চৈত্যের ও ইহার



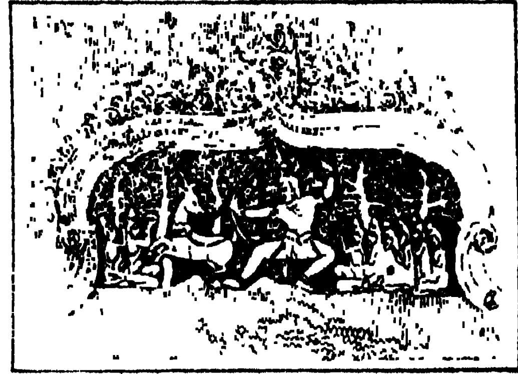
বরবুদুর চৈত্যের দৃশ্য – আকাশ হইতে গৃহীত চিত্র

পাশাপাশি সাজাইলে কয়েক মাইল ধরিয়া ইহাদের সারি হয়। এক এক তলায় কতক গুলি করিয়া চূড়া আছে, বারান্দাগুলিতে মাঝে মাঝে কতকগুলি কুলুঙ্গী এবং ঘণ্টার আকারে কতকগুলি গুম্বজের মত আছে। এই কুলুঙ্গী ও গুম্বজগুলির ভিতরে নানা অবস্থায় উপবিষ্ট বিস্তর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি অতিসুন্দর। বরবুদুর চৈত্যটি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে কতকগুলি খোদিত চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

বরবুদুরের মত প্রম্বানানও মধ্য যবদ্বীপে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে আছে তিনটি বিরাট্ সুউচ্চ মন্দির ; একটি বিষ্ণুর, একটি শিবের, একটি ব্রহ্মার। এই তিন দেবতার মন্দিরের সামনা সামনি ইহাদের তিন বাহনের জন্য ছোট ছোট মন্দির আছে। বিষ্ণুর মন্দিরের সামনে

গরুড়ের, শিবের সামনে তাঁহার বৃষভ নন্দীর, এবং ব্রহ্মার সামনে হংসের। মন্দির-প্রাঙ্গণের বেষ্টনী প্রাচীরের বাহিরে ছোট ছোট বহু দেবমন্দির। এই সমস্ত মন্দির উচ্চতায় বরবুদুরের চেয়েও অধিক। বরবুদুর চৈত্যের নির্ম্মাণের কিছু পরে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী কোনও যবদ্বীপীয় রাজা শিবের পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ এই স্থানে এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করান। বরবুদুর মন্দির ও এই মন্দির উভয়েই বিশেষ ভগ্ন দশায় পড়িয়া ছিল; এখন ডচ রাজ-সরকার এগুলির সুন্দর মেরামত করিয়া রাখিয়াছেন।

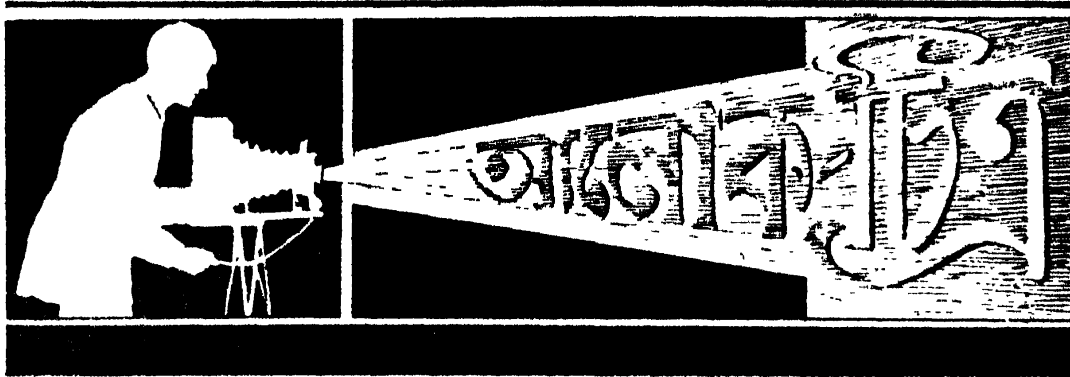
প্রম্বানানের তিনটি দেবতা মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। হিন্দু যবদ্বীপের মূর্ত্তিশিল্প অনুপম সুন্দর ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবতার মূর্ত্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। প্রম্বানানের মন্দিরের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়—তিনটি মন্দিরের বারান্দায়, মন্দিরের গায়ে ও বারান্দার আলিসার পাথরে খোদা কৃষ্ণ-চরিত্রের ও রামায়ণের ছবি। ভারতবর্ষেও এত সুন্দর রামায়ণ ও কৃষ্ণ-কথার ছবি চিত্রিত হয় নাই। বিষ্ণুর মন্দিরে আছে কৃষ্ণ-কথার ছবি; এগুলি বড়ই ভগ্ন অবস্থায় আছে। শিবের ও ব্রহ্মার মন্দিরে আছে, রামায়ণের ছবি। ব্রহ্মার মন্দিরটিও বিশেষ ভগ্ন অবস্থায়। মোটের উপর রামায়ণটির অনেকখানি, এই ছবিতে আমরা পাই। যবদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণ আমাদের সংস্কৃত রামায়ণ হইতে খুঁটিনাটি দুই একটি বিষয়ে একটু পৃথক্। তবে আমাদের এই রামায়ণের ছবি দেখিয়া গল্প বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। প্রম্বানানের ভাস্কর্য্যের ধরণ বরবুদুরের মতন হইলেও একটু আলাদা। আমাদের দেশে যেমন আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মান করি, যব দ্বীপীয়েরা বরাবরই তদ্রূপ করিয়া আসি-



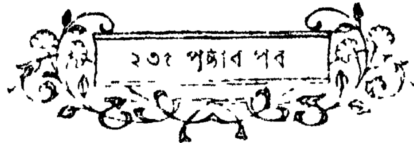
রামচন্দ্রের মৃগয়া

য়াছে—ইহার মূর্ত্তিও অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছে। প্রম্বানানের শিল্প হিন্দু-শিল্পজগতে প্রথম শ্রেণীর শিল্প। আমরা প্রম্বানানের মন্দিরের ও রামায়ণের কয়েকটি চিত্র এই প্রবন্ধে দিলাম।

F. 2



আধুনিক কেমেরা



পূর্ব্বে তোমাদের কাছে ছিদ্র কেমেরার বিষয় বলিয়াছি। ছিদ্র কেমেরার কতকগুলি আনুষঙ্গিক দোষ থাকাতে বর্ত্তমানে উহার ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে উজ্জ্বল ছবি তুলিবার উপযুক্ত জিনিস ছিদ্র কেমেরা নহে, কারণ, উহাতে প্রতিচ্ছবি বড়ই ক্ষীণ থাকে। খুব কম সময়ের মধ্যে চটপট ছবি তুলিতে হইলে কেমেরার ভিতরে যথেষ্ট আলোক চাই। কাজেই, লেন্স না হইলে চলে না। এ সমস্ত কারণে লেন্স কেমেরার প্রচলন হইয়াছে এবং উহার অনেক উন্নতিও হইয়াছে।

আজকাল ভাল ভাল কেমেরাতে যে সমস্ত লেন্স ব্যবহৃত হয়, তাহাদের গঠন অতীব জটিল এবং উহা তৈয়ার করিতে অতি উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। উহাদের কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে হইলে লেন্স সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমের ধারণা হওয়া দরকার। লেন্স সাধারণতঃ দুইপ্রকার স্থূলমধ্য (Convex) এবং ক্ষীণমধ্য (Concave)। সমতল জমির (plane surface) সহিত এই দুই প্রকারের সংমিশ্রণে আরও চার প্রকার লেন্সের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নের ছবিগুলি দেখিলেই । আকার সম্বন্ধে তোমাদে শ পরিষ্কা ইবে।

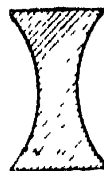
কেমেরাতে এই ছয় প্রক ক লেন্সই পরিবর্ত্তিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহাদের কোনটাই একা ব্যবহৃত হয় না। চার হইতে আটখানা লেন্সের সংযোগে যে যৌগিক (Compound) লেন্স তৈয়ার হয় তাহাই এখন ভা কমেরাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরপৃষ্ঠায় ২ নং ও ৩ নং ছবিগুলি হইতেই বর্ত্তমানের ভাল ভাল যৌগিক লেন্সের গঠনপ্রণালী বুঝিতে পারিবে।

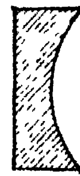
এইরূপ জটিল লেন্স ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? একখানা সহজ, সরল, মৌলিক লেন্স ব্যবহার করিলেও ত চলে। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। ঐরূপ মৌলিক লেন্স ব্যবহার করিলে প্রতিচ্ছবিতে নানাপ্রকার দোষ দেখা যায়। একখানা কাগজে ছোট ছোট সমচতুষ্কোণ আঁকিয়া উহার প্রতিচ্ছবি প্রথম তিন প্রকারের মৌলিক লেন্সসংযুক্ত


ক
স্থূলমধ্য


খ
সমস্থূল


গ
স্থূলক্ষীণ


ঘ
ক্ষীণমধ্য


ঙ
সমক্ষীণ


চ
ক্ষীণস্থূল

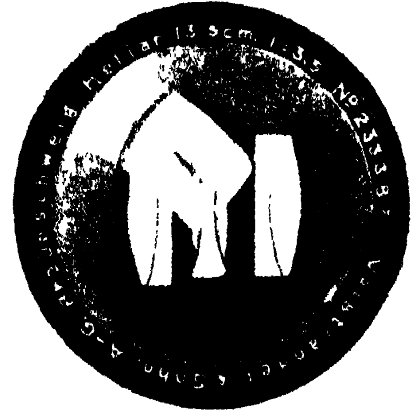
১ নং



(ক)

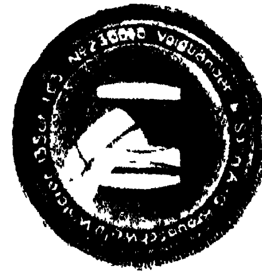


(খ)



(গ)





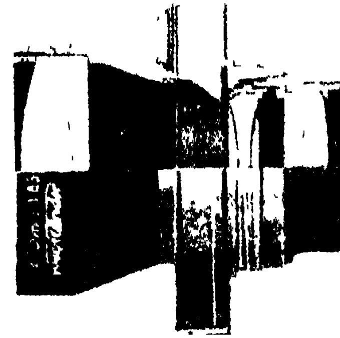
২ (ঙ)



৩ (ক)



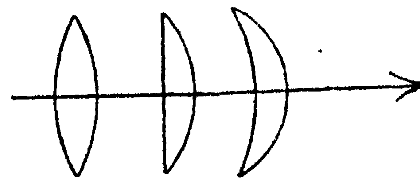
৩ (খ)

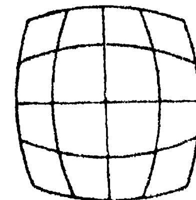


৩ (গ)

কেমেরাতে দেখিলে যেরূপ দেখিতে হইবে, তাহা নিম্নের ৪ নং চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

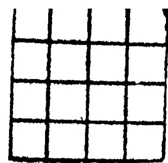
প্রতিচ্ছবির এইরূপ বিকৃতিকে ইংরাজীতে Barrel distortion বা মৃদঙ্গ বিকৃতি বলে। ১নং খ

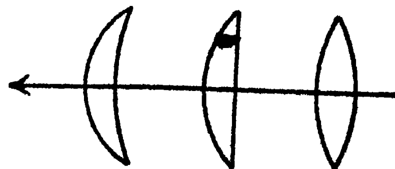


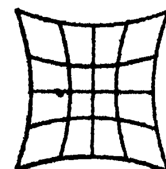


৪ নং

এবং ১নং গ লেন্সকে কেমেরাতে উল্টাইয়া বসাইলে এই বিকৃতি অন্য আকার ধারণ করে। নিম্নের ছবি হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

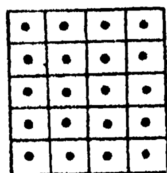


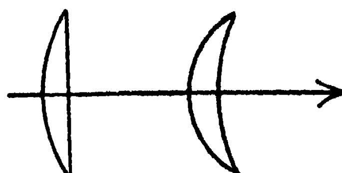


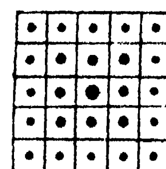


৫ নং

ইংরাজীতে ইহার নাম "Pin Cushion" distortion, বাঙ্গালাতে উহাকে সারঙ্গ বিকৃতি বলিতে পার।

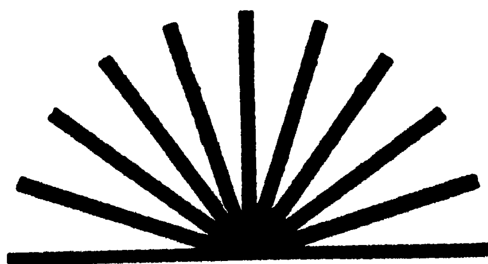




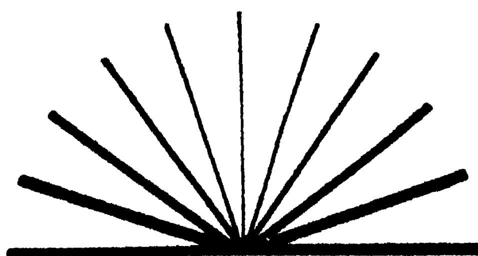


৬ নং

উপরিউক্ত বিকৃতি ভিন্নও আরও তিন প্রকার বিকৃতি এ সমস্ত মৌলিক লেন্স হইতে উৎপন্ন

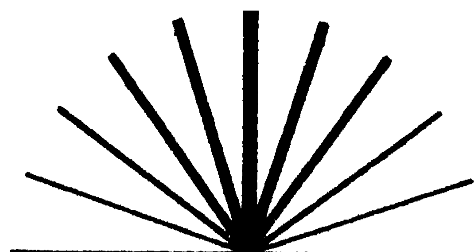


৭ (ক)—মূল চিত্র



৭ (গ)—তির্য্যক বিকৃতি

হইতে পারে। ইহাদের ইংরাজী নাম হইল Chromatic aberration বা বর্ণ বিকৃতি, Coma বা পর্য্যায় বিকৃতি এবং astigmatism বা তির্য্যক্ বিকৃতি। বর্ণ বিকৃতি কি প্রকারে হয় তাহার পরিচয় তোমরা নিশ্চয়ই পাইয়াছ। বড় বড় বাতির ঝাড়ের গায়ে ঝুলান যে সমস্ত কাচের কলম (prism) থাকে, তাহাদের মধ্য দিয়া চাহিলে সাধারণ জিনিষকে যেরূপ বহুবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়, সেইরূপ মৌলিক লেন্স কেমেরাতে ব্যবহার করিলে তাহার সাধারণ প্রতিচ্ছবিও বহুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উহাকে খারাপ করিয়া ফেলে। পর্য্যায় বিকৃতি ব্যাপারটা আরও জটিল। উহা বুঝিতে হইলে একটি সম-



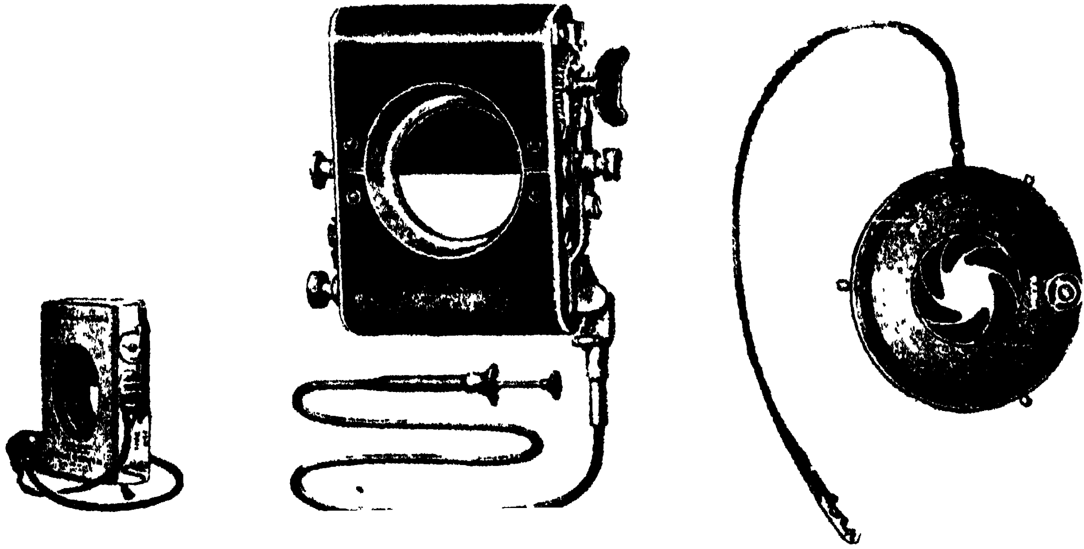
৭ (খ)—তির্য্যক বিকৃতি

চতুর্ভুজের ভিতর কতকগুলি সমান কাল বিন্দু আঁকিয়া উহাকে একটি মৌলিক লেন্সবিশিষ্ট কেমেরার ভিতর দিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, অঙ্কিত চিত্র ও তাহার প্রতিচ্ছবিতে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। প্রতিচ্ছবিতে দেখিবে, মাঝের বিন্দুগুলি বেশ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেমেরার দিকের বিন্দুগুলি ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৬ নং চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে।

Astigmatism ব্যাপারটা বুঝান সব চেয়ে কঠিন কাজ। ইহা বুঝিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্রের আকার

কতকগুলি মোটা কাল লাইন আঁকিয়া উহা মৌলিক লেন্স বিশিষ্ট একটা কেমেরার ভিতর দিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে যে, খাড়া (Vertical) লাইনগুলি এবং লম্বমান (Horizontal) লাইনগুলি কখনও একসঙ্গে সমান ও পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় না। যখন খাড়া লাইন পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় তখন লম্বমান লাইনগুলি অস্পষ্ট হইয়া উঠে, এবং লম্বমান লাইনগুলি যখন পরিষ্কার থাকে, খাড়া লাইনগুলি তখন আবছা হইয়া যায়। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় ৭ (ক), ৭ (খ), ৭ (গ) ছবি হইতেই ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিবে।

আলোকচিত্রের এই বিকৃতিকে সংশোধন করা বড়ই কঠিন কাজ। বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা একরূপ অসাধ্যই ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্ত্তমানে ইহা সহজসাধ্যই হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যে সমস্ত লেন্সে এ দোষকে সংশোধন করা হইয়াছে তাহাদিগকে Anastigmat বা বিতির্য্যক লেন্স বলে। সাধারণ লেন্স অপেক্ষা ইহাদের দাম অনেক বেশী। Zeiss কোম্পানির "Tessar" নামক লেন্স, Voigtlander এর "Collinear," Goerz এর 'Dagor," Ross এর "Homocentric," Dallmeyer এর "Pentac" প্রভৃতি খুব নাম করা বিতির্য্যক লেন্স। তোমরা হয়তো অনেকেই এরূপ লেন্সসংযুক্ত কেমেরা দেখিয়াছ।


৮ (খ) ৮ (ঘ)

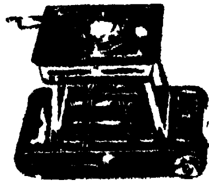
লেন্সএর পরই কেমেরার সব চেয়ে দরকারী জিনিস হইল Shutter বা বন্ধনী। কেমেরার মুখ সব



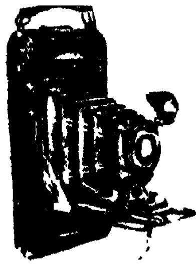
৮ (ঘ)


৮ (ঙ)

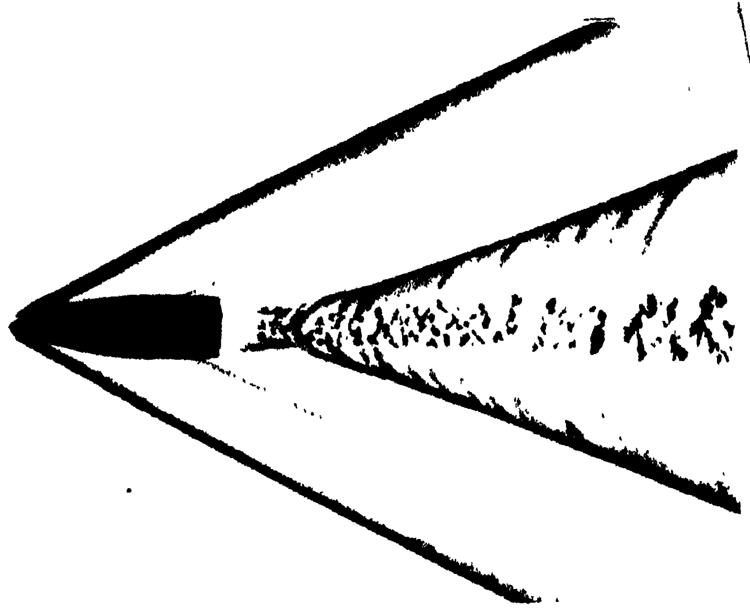
সময়েই বন্ধ থাকে, শুধু যখন আলোকনের প্রয়োজন হয় তখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খুলিয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। বন্ধনী সাধারণতঃ তিন প্রকার, (১) লেন্সের সামনে বা পিছনে (Thornton-Picard Shutter), প্লেটের সামনে (Focal plane shutter) এবং (৩) লেন্সের মধ্যে (diaphragm shutter)। প্রথম প্রকারের বন্ধনী আজকাল বড একটা ব্যবহার হয় না। ইহাতে একটা কাল পর্দ্দার মধ্যে বাড়ানো কমানো যাইতে পারে এইরূপ একটা লম্বছিদ্র (horizontal slit) থাকে। আলোকনের



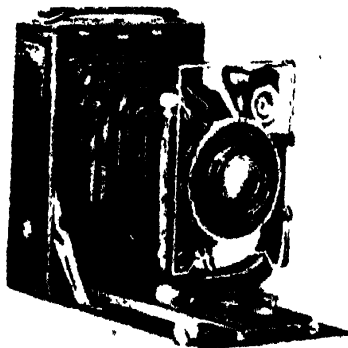
৯ নং



১০ (গ)



১০ (ক)



১০ (খ)

সময় সেটা লেন্সের সম্মুখ কিম্বা পিছন দিয়া দ্রুত চলিয়া যায়। ২নং বন্ধনীও এই প্রকারেরই, তবে সেটা কেমেরার পশ্চাৎ ভাগে থাকে এবং প্রায় প্লেটের গা বাহিয়া চলে। এই প্রকার বন্ধনী সবচেয়ে দামী এবং কার্য্যকরী, বেশী দামের কেমেরাতে ইহাই সাধারণতঃ লাগান থাকে। তৃতীয় প্রকার বন্ধনী তৈয়ার করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আজকালকার কেমেরাতে ইহাই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। ৮ (ক), ৮ (খ), ৮ (গ), ৮ (ঘ), ৮ (ঙ) ছবিগুলি হইতেই বিভিন্ন প্রকার বন্ধনীর আভাষ পাইবে।

চলন্ত জিনিষের ছবি তুলিতে হইলে দ্রুতগতি বিশিষ্ট বন্ধনীর প্রয়োজন। তাহা না হইলে ছবি আবছা (flurred) হইয়া যাইবে। সাধারণ রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করিতেছে এমন অবস্থায় ছবি তুলিতে হইলে ১/২৫ হইতে ১/৫০ সেকেণ্ড আলোকন দরকার, অর্থাৎ এতটুকু সময়ের মধ্যে বন্ধনী সম্পূর্ণ খুলিয়া আবার বন্ধ হওয়া চাই। আরও দ্রুতগতি বিশিষ্ট জিনিষের জন্য আরও কম আলোকনের প্রয়োজন, অর্থাৎ কেমেরার প্রতিচ্ছবিতে যে জিনিষের স্থানচ্যুতি (displacement) যত তাড়াতাড়ি হয় তাহার স্থির ফটো তুলিতে তত কম সময়ের দরকার হয়। ছেলেরা মাঠে ছুটাছুটি করিতেছে ইহার জন্য ১/১০০ হইতে ১/২৫০ সেকেণ্ড, ঘোড়া দৌড়াইতেছে ইহার জন্য

১/৫০ হইতে ১/১০০ সেকেণ্ড, মোটর খুব দ্রুত চলিতেছে ইহার জন্য ১/৫০০ হইতে ১/১০০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত আলোকনের প্রয়োজন হয়। মোটরের গতি ঘণ্টায় ২৫০ মাইলের বেশী আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহাদের গতির তুলনায় মোটরের এই ঘণ্টায় ২৫০ মাইল অতি অতি সামান্য। পারার (mercury) উপবিভাগে যন্ত্রের সাহায্যে যে ঢেউ উৎপন্ন করা যায়, উহা অনেক সময় ঘণ্টায় ৭০০ মাইল পর্য্যন্ত চলে। রাইফেলের গুলি ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল চলে। এই প্রকার তীব্রগতিবিশিষ্ট জিনিষের পরিষ্কার ফটো তুলিতে হইলে ১/৫০০০০ হইতে ১/১০০০০০ সেকেণ্ড আলোকনের প্রয়োজন। এত কম সময় আলোকন সাধারণ বন্ধনীর সাহায্যে হওয়া অসম্ভব। তাই বিশেষ প্রকারের যন্ত্র-পাতির প্রয়োজন হয়। ৯ নং ও ১০ (ক), ১০ (খ), ১০ (গ) চিহ্নিত ছবিগুলিতে এ সমস্ত তীব্রগতি বিশিষ্ট জিনিষের কেমন পরিষ্কার ছবি উঠিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে। রাইফেলের গুলির পিছনে যে ধূঁয়ার মত জিনিষ দেখিতেছ, তাহা বাস্তবিক ধূঁয়া নহে, উহা চাপ দেওয়া বাতাসের স্তর (compressed air column), ইহা হইতেই পরে শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়।

কেমেরাতে আর একটি দরকারী জিনিষ আছে, যাহা হয়ত তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছ। তাহা হইতেছে diaphragm বা অক্ষ। (১১ নং চিত্র) ইহা ধাতু-পাত্র-নিৰ্ম্মিত একটি ছিদ্র বিশেষ এবং ইচ্ছা



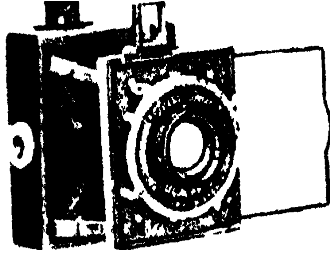
১১ নং

করিলে ছোট-বড় করা যায়। যে সমস্ত আলোক-রশ্মি কেমেরার ভিতর প্রবেশ করে, তাহাদের সকলকেই অক্ষের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক কেমেরাতেই অক্ষের আকৃতির একটা পরিমাণ বুঝাইবার জন্য কতগুলি অঙ্ক (figure) লেখা থাকে। যেমন f4·5, f5·5, f6·3 প্রভৃতি। অক্ষের আকার বাড়াইয়া কমাইয়া কেমেরার ভিতর আলোকের পরিমাণও বাড়ান কমান যাইতে পারে। f এর পর অঙ্কটি যত ছোট থাকিবে, অক্ষের আকৃতি তুলনায় ততই বড় হইবে। f4·5, f5·5 এর প্রায় দ্বিগুণ এবং f6·3 র প্রায় চতুর্গুণ। যে লেন্স যত বড় অক্ষের ভিতর দিয়া পরিষ্কার ছবি তুলিতে পারিবে, তাহার তত দাম ও কদর বেশী। অক্ষের আকৃতি ছোট করিলে প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতে আলোকের অভাব ঘটে, এবং সেজন্য এইরূপ অবস্থায় ফটো তুলিতে অধিকক্ষণ আলোকনের প্রয়োজন। বড় অক্ষবিশিষ্ট লেন্সের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি ফটো তোলা যায়।

লেন্স, বন্ধনী, অক্ষ প্রভৃতি ছাড়াও কেমেরাতে আরও একটি দরকারী জিনিষ থাকে যাহাকে (Bellows) বা হাপর বলে। ইহা সাধারণতঃ কাল রং এর চামড়া দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয় এবং ভাজ করা থাকে। হাপরের সাহায্যে শুধু লেন্সের মধ্য দিয়া যে আলোক আসে তাহাই প্লেটের উপর গিয়া পড়ে, বাহিরের অন্য সব আলোকই ইহাদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। তাহাতেই পরিষ্কার ছবি উঠে। লেন্সকে আগে পিছে চালাইয়া যখন স্থিতিনির্দ্দেশ (focussing) করা হয়, তখন হাপরও তাহার সঙ্গে বাড়ে-কমে। হাপরের একদিক লেন্সের সঙ্গে এবং অন্য দিক প্লেটের আধারের সঙ্গে আটকান থাকে। হাপর বহু প্রকারের হয়। পর পৃষ্ঠার কেমেরার ছবিগুলি হইতেই উহাদের রকমারীর কতকটা নমুনা পাইবে। আধুনিক কেমেরা সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে —(১) প্লেট কেমেরা ও (২) ফিল্ম কেমেরা। প্রথম প্রকারের কেমেরাতে "প্লেট" অর্থাৎ আলোকশোষী (light sensitive) মশলা মাখান এক প্রকার পাতলা কাচের পাত (sheet glass) ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের কেমেরাতে কাচের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ সেলুলয়েডের পাতলা চাদর থাকে। কাজেই, উহাকে ইচ্ছামতন গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। গত তিন চার বৎসর ধরিয়া কেমেরার গঠন-প্রণালীর এত উন্নতি হইয়াছে যে, আজকাল প্লেট কেমেরাতেও ফিল্ম ব্যবহার করা যায়। এবং ফিল্ম কেমেরাতেও প্লেট লাগান চলে। কাজেই, পূর্ব্বের মত কেমেরাকে আর দুই প্রকার শ্রেণীতে বিভাগ করা চলে না।

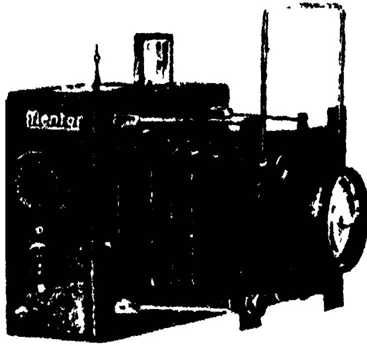
তবে বিশেষ কাজের জন্য আজকাল অনেকপ্রকার বিশেষ কেমেরার প্রচলন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) Focal Plane Camera—ইহাতে স্থিতি নির্দ্দেশের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। (১২ নং)



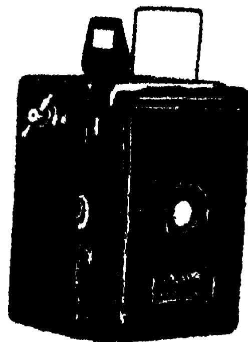
১২ (ক)

ইহাতে খুব বড় অক্ষবিশিষ্ট লেন্স থাকে এবং



১২ (খ)

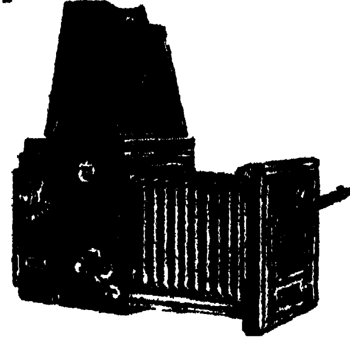
২নং বন্ধনী থাকে সংবাদ-পত্রের চিত্র সংগ্রহের



১২ (গ)

জন্যই ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য অনেক সময় উহাকে Press কেমেরাও বলে।

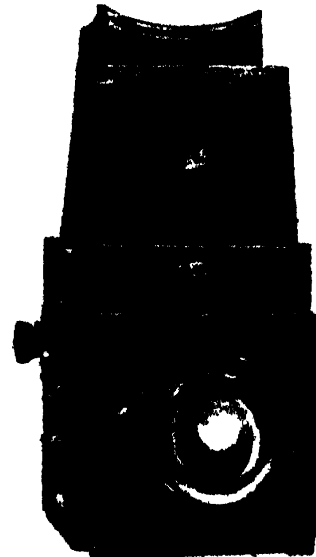
(২) Reflex Camera বা বিম্ব কেমেরা—ইহার ভিতরে একখানা আয়না থাকে (১৩নং) এবং উহা



১৩ (ক)



১৩ (খ)



২৩ (গ)

হইতে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি আলোকনের পূর্ব্ব-

১৪ (ক)

১৫ (ক)

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সোজা ভাবে উপর হইতে কিম্বা পাশ হইতে দেখা যায়। আলোকনের মুহূর্ত্তে উহা স্প্রীং-এর সাহায্যে চট্‌ করিয়া উপরে কিম্বা একপাশে

১৪ (খ)

সরিয়া যায়; কাজেই লেন্স হইতে আলোক-রশ্মি সোজা আসিয়া প্লেটের উপর পড়ে। এজাতীয়

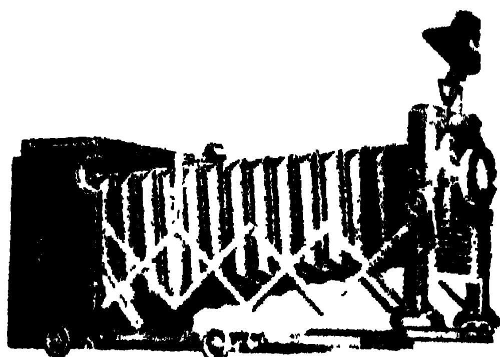
১৫ (গ)

১৫ (খ)

১৬ (ক)

কেমেরাই সব চেয়ে দামী এবং কার্য্যকরী। যে

F. 3



১৬ (খ)

২৩ নং—আমেরিকার বৃহত্তম কেমেরা

অন্য এক প্রকার কেমেরা

১৭ নং

১৮ নং

২০ (খ)

আধুনিক কেমেরা

২২ নং—জরীপের কেমেরা

২০ (ক)

কোন সময় চলন্ত জিনিষের ছবি তুলিতে ইহার মতন এমন চমৎকার কেমেরা আর নাই।

(৩) Stereoscopic Camera বা যুগ্ম কেমেরা (১৪ নং)। দুই চোখ দিয়া দেখিলে যেমন দুনিয়ার যাবতীয় জিনিষের আকার এবং অবস্থান বুঝিতে পারা যায়, তেমনি দুই চক্ষের মত দূরে অবস্থিত যুগ্ম কেমেরার সাহায্যে জোড়া ফটো তুলিয়া উহাদিগকে Stereoscope নামক যন্ত্রের সাহায্যে যুগপৎ একসঙ্গে দেখিলে উহার আকার ও অবস্থানের একটা সুস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে আনিয়া উহাকে বাস্তব বলিয়া মনে হয়।

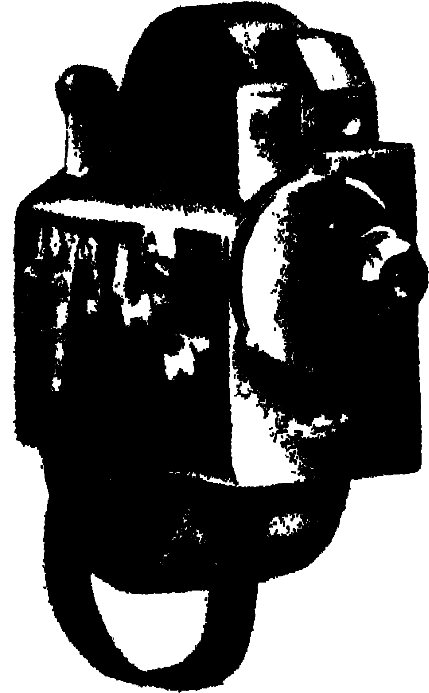
চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবার এবং হেলাইবার নানা প্রকার জটিল ব্যবস্থা থাকে।

(৬) Studio Camera বা পেশাদার কেমেরা ১৭ নং। ফটোগ্রাফ তুলিয়া যাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাদের জন্যই এই কেমেরা তৈয়ার হইয়াছে। ইহা সাধারণতঃ খুব বড় আকারের হয় এবং খুব মজবুত ত্রিপদের (Tripod stand) উপর বসাইতে হয়। ইহাতে ছোট বড় বহু আকারের ফটো তোলা যায় এবং ইহাতেও জরীপ কেমেরার মতন নানা প্রকার জটিল ব্যবস্থা থাকে।

(৭) Detective কেমেরা বা গুপ্ত কেমেরা—



১৯ (ক)



১৯ (খ)

(৪) Miniature Camera বা অণু কেমেরা—(১৫ নং)। সর্ব্বদা পকেটে কেমেরা লইয়া চলাফেরা করিবার সুবিধার জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ছবি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক ইঞ্চির বেশী হয় না। পরে উহাকে যন্ত্রের সাহায্যে বড় করা চলে।

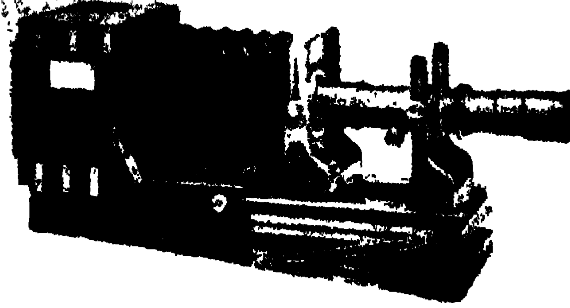
(৫) Field Camera বা জরীপ কেমেরা (১৬ নং)। ইহাতে খুব লম্বা হাপর থাকে এবং

(১৮ নং)। অন্যের অলক্ষ্যে ছবি লইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিতে কেমেরা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের থাকে। কখনও ঘড়ির মত, কখনও দূরবীণের মত ইত্যাদি নানা প্রকারের হয়।

(৮) Cine Camera বা চলচ্চিত্রের কেমেরা—(১৯ নং)। ইহাতে বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্রের ছবি লওয়া হয়। ইহার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে পরে তোমাদিগকে আরও অনেক কথা বলিব।

এসমস্ত বিশেষ প্রকার কেমেরা ছাড়াও যে সব কেমেরা সচরাচর জনসাধারণে (amateur) ব্যবহার করে, তাহাদিগকে Hand Camera বলে। এ সমস্তের ব্যবহার খুব সহজ। Hand Camera নানা

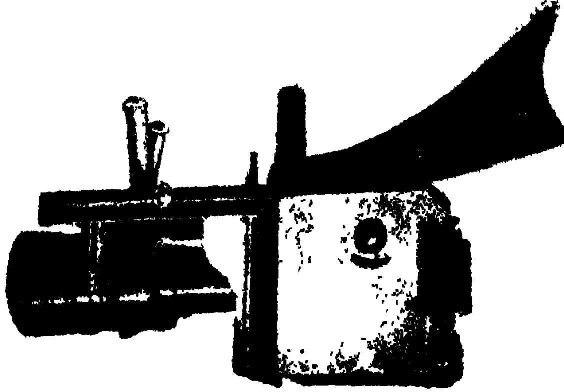
তুলিতে হইলে অণুবীক্ষণ কেমেরাও (২২ নং) কখন কখন ব্যবহৃত হয়। মার্কিন গবর্ণমেণ্টের জরীপের কাজের জন্য সম্প্রতি একটা কেমেরা তৈয়ার



২১ (ক)



অন্য এক প্রকার কেমেরা



২১ (খ)



২১ (গ)

প্রকারের হইয়া থাকে (২০ নং)। খুব দূরের জিনিষের ফটো তুলিতে হইলে দূরবীক্ষণ কেমেরা (২১ নং) এবং অতি ক্ষুদ্র জিনিষের বড় ফটো

হইয়াছে যাহা উচ্চতায় ৮ ফিট এবং লম্বায় ১৩ ফিট। এই অতিকায় কেমেরাটার ছবি তোমরা ৪৯৮ পৃষ্ঠার ২৩ নং চিত্রে দেখিতে পাইবে।



পৃথিবীর ইতিহাস—মিশর

মিশরের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও ললিতকলা


৪৬০ পৃষ্ঠার পর

সব প্রাচীন জাতির মধ্যেই পৃথিবীর সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মিশরবাসীদের কল্পনা যে, আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কেহ কেহ ভাবিত, আকাশটা বুঝি একটা মস্ত গরু, পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে তাহার পিছনের এক পা ও পশ্চিমপ্রান্তে সামনের এক পা এবং পৃথিবীর মাঝে আর দুই পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গরুটার বুকে আছে নক্ষত্রগুলি। কেহ কেহ আবার মনে করিত, আকাশটা আর কিছুই না, একটি স্ত্রীলোক। সে পূর্ব্বপ্রান্তে পা রাখিয়া পশ্চিমপ্রান্তে হাতে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহার কাহার আবার ধারণা ছিল আকাশটা একটা সমুদ্র—পৃথিবীর চারিপ্রান্তে চারিটি স্তম্ভ তাহাকে পৃথিবীর উপর তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রতিদিন সূর্য্যদেব নৌকায় চড়িয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যান, তার পর সমুদ্র হইতে পৃথিবীর নীচের একটা নদী বাহিয়া আবার পরদিন সকালে পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হন। সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল এই মহাসমুদ্রই বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে সেখানে একটি ফুলের আবির্ভাব হইল। এই ফুল হইতে সূর্য্যদেবের জন্ম হয়। সূর্য্যদেবের চারিটি সন্তান জন্মে—সু (Shu), টেফ্নুট (Tefnut) কেব্ (Keb) এবং নুট (Nut)। সু এবং টেফ্নুট কেবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া নুটকে তুলিয়া ধরিলেন। কেব হইলেন পৃথিবী, নুট আকাশ আর সু এবং টেফ্নুট্ বায়ুমণ্ডলী। কেব্ এবং নুট্ হইতে আবার চারিটি দেবতার জন্ম হয়—ওসিরিস (Osiris), আইসিস্ (Isis), সেট্ (Set) এবং নেফ্থিস্ (Nephthys)। এই নয়টি হইলেন আদি দেবতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে একটা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছিল যে, পাতালপুরীতে মৃতব্যক্তিদের রাজা ছিলেন ওসিরিস্। সূর্যদেবের পর তিনিই পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী আইসিস্ ছিলেন তাঁহার রাণী। খুব ভাল রাজা হইলেও ভাই সেটের সঙ্গে তাঁহার ছিল শত্রুতা। সেট্ তাঁহাকে হত্যা করেন। তখন রাণী আইসিস্ স্বামীর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শৃগালদেব আনুবিসের (Anubis) সাহায্য গ্রহণ করেন। আইসিস্ এমন শক্তিশালী মন্ত্রোচ্চারণ করেন যে, ওসিরিস্ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হন এবং সশরীরে পাতাল-পুরীতে গমন করিয়া সেখানকার রাজা হন। কিছুদিন পরে আইসিস্ হোরাস্ (Horus) নামে একটি পুত্র প্রসব করেন এবং গোপনে তাঁহাকে লালন-পালন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হোরাস্ সেটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য লাভ করেন। তখন সেট্ দেবতাদের কাছে অভিযোগ করেন যে, হোরাস জারজ, কাজেই তাঁহার পিতৃসিংহাসনে কোন অধিকার নাই।

বাণীদেব থথের (Thoth) সাহায্যে হোরাস তাঁহার জন্মের পবিত্রতার প্রমাণ দেন। অনেকে আবার মনে করিত যে, প্রকৃতপক্ষে ওসিরিসেরই বিচার হয় এবং তিনি জয়ী হন।

এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে কেহ কেহ মিশরের প্রধান দেবতারূপে মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রধান হইলেন সূর্য্যদেব। কোথাও তাঁহার নাম হইল রি (Re), কোথাও বা হোরাস্। ওসিরিসের পূজারও বহুল প্রচলন হইয়াছিল। আর একটি প্রধান দেবতা ছিলেন মেম্‌ফিস সহরের "টা" (Ptah) দেব। তিনি ছিলেন মিশরের বিশ্বকর্ম্মা। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় দেবতার প্রাধান্য ছিল। যখনই কোন সহর রাজনৈতিক কারণে প্রাধান্য লাভ করিত, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার স্থানীয় দেবতার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত।

এই সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি খুবই সাধারণ ছিল। কখন কখন মিশরবাসীরা নানা জীবজন্তুতে তাঁহাদের প্রকাশ দেখিতে পাইত। কাজেই, সেই সমস্ত জীবজন্তুর খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। তবে তাহাদের পূজা প্রথম প্রথম প্রচলিত হয় নাই— মিশরের ইতিহাসের শেষভাগেই ইহার প্রচলন হয়।

পিরামিড রাজাদের সময় সূর্য্যদেব 'রি'র বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায়। জমিদারতন্ত্রের সময় তিনি সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন। যে সহরে যে দেবতাই থাকুন না কেন, তাঁহার পুরোহিতেরা তাঁহার সম্মানের অংশ পাইবার জন্য প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের দেবতাও প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যদেব 'রি'ই, যদিও তাঁহারা সেই দেবতাকে ভিন্ন নামে ডাকিতেন। এইভাবে থিব্‌স্ সহরের স্থানীয় দেবতা অ্যামনের (Amon) পুরোহিতেরা তাঁহাকে 'রি'র অবতার বলিয়া প্রচার করিলেন ও 'অ্যামন রি' এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় 'ওসিরিসে'র প্রাধান্যও খুব বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার আদিম পীঠস্থান অ্যাবাইডস্ (Abydos) সহর মিশরের প্রধান তীর্থে পরিণত হইল। এখন হইতে সবারই আকাঙ্ক্ষা হইল যে, মৃত্যুর পর অ্যাবাইডসে ওসিরিসের মন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন তাঁহার সমাধি নির্ম্মিত হয়। তাহা সম্ভব না হইলে মৃতদেহ কিছুদিনের জন্য এখানে আনা হইত; ইহাও সম্ভব না হইলে অন্ততঃপক্ষে একটা স্মৃতিফলকও এখানে প্রোথিত হইত।

যখন থিব্‌স্ সহরের রাজারা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন এখানকার দেবতা "অ্যামন" মিশরের প্রধান দেবতা বলিয়া পূজা পাইতে আরম্ভ করিলেন। নগরে নগরে তাঁহার জন্য সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল। এমন কি তাঁহার পুরোহিত-দের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। মিশরের বাহিরেও অ্যামনের পূজার প্রচলন হইল।

সিংহাসনে বসিয়া রাজা টুটেন্‌খ্যামন এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুগন্ধ তৈল হাতে রাণী অঙ্খস্প্যাটেন। উপরে সূর্য্যদেবতা অ্যামন্ তাঁহার রশ্মিরূপ অসংখ্য হাত বাড়াইয়া রাজাকে ও রাণীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ দান দিতেছেন।

ইখ্‌ন্যাটন্ রাজা হইয়া কিন্তু অ্যামনের ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেন। এমন কি যেখানে যেখানে তাঁহার নাম ছিল, তাহাও তুলিয়া ফেলেন। এই সমস্ত দেবতাদের পরিবর্ত্তে তিনি "অ্যাটন" নামে সূর্য্যগোলকের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। এই সূর্য্যদেব "অ্যাটন" সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জগতের একমাত্র দেবতা বলিয়া

ইখ্‌ন্নাটন প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের ইতিহাসে ইখ্‌ন্নাটনকে প্রথম একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

ইখ্‌ন্নাটনের ধর্মবিপ্লব তাঁহার প্রজারা গ্রহণ করে নাই। তাহাদের মধ্যে গোপনে অ্যামনদেবের পূজা চলিতে থাকে। ইখ্‌ন্নাটনের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা টুটেন্‌খ্যামন আবার অ্যামনের প্রকাশ্য পূজা প্রচলিত করেন। রাজা হারমুহাবের সময় অ্যামনদেবের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের পূজাও প্রকাশ্যভাবে পুনরায় আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় র‍্যামসেসের সময় হইতে অ্যামনদেবের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি অসাধারণরূপে বাড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়ে বাল্, সুটেথ প্রভৃতি অনেক বিদেশী দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত হয়। এখন কুমীর, ভেড়া, শিয়াল, ষাঁড় (Apis Bull) প্রভৃতির মিশর হইতেই পূজা আরম্ভ হয়।

এই সমস্ত নানা দেবদেবীর পূজার জন্য মিশরের রাজরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। প্রত্যেক সহরেই অসংখ্য মন্দির ছিল আর এই সমস্ত মন্দিরেব ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজারা অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন ও জায়গীর দিতেন। মিশরবাসীরা মনে করিত যে, দেবতাবা মন্দিরেই বাস করেন, কাজেই ধনীব বাসগৃহে যে সমস্ত বন্দোবস্ত থাকিত মন্দিরেও সেই সকলেরই ব্যবস্থা করা হইত। যখন যে সহর রাজধানী হইত তখন সেখানকার স্থানীয় দেবতা ও তাঁহার মন্দিরের সমৃদ্ধি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইত।

পূজার পদ্ধতি খুবই সাধারণ ছিল। মানুষের যাহা দরকার দেবতাদের সেবায় তাহাই উৎসর্গ করা হইত। তাঁহাদের ভোগের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য, পানীয় দ্রব্য ও বসন-ভূষণ দেওয়া হইত। তাঁহাদের চিত্তবিনোদের জন্য নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত করা হইত। মাঝে মাঝে জাঁকজমক করিয়া বিশেষ উৎসবও পালন করা হইত। এইসব দেবতাদের পূজার জন্য পুরোহিত ছিল। স্ত্রীলোকেরাও হাথোর, নিট প্রভৃতি দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইত। তাহাদের কাজ ছিল নৃত্যগীত করা।

সাম্রাজ্যের যুগে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতে পুরোহিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতারও বিশেষ বৃদ্ধি হইল। এতদিন ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না। এখন থিব্‌সের অ্যামন-দেবের প্রতিপত্তি ও তাঁহার প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্যান্য সমস্ত মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁহার অধীন হইলেন। মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও জটিলতর ও জাঁকজমকে পূর্ণ হইল।

মিশরবাসীদের পরলোকের বিষয়ে ধারণা অনেকটা অস্পষ্ট ও জটিল। কিন্তু মিশরের ইতিহাস বুঝিতে হইলে তাহা জানা দরকার। মিশরবাসীরা মনে করিত যে, মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়। মৃত্যুর পর দেহ ও প্রাণ একসঙ্গেই পরলোকে প্রয়াণ করে। ইহাছাড়া প্রত্যেক লোকেরই আত্মা আছে। তাহাদের ধারণা অনুসারে ছায়াও দেহেরই অংশ। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। পরলোকের বিষয়েও তাহাদের ধারণা অসম্বদ্ধ ও পরস্পর বিরুদ্ধ। কখনও মনে করা হইত মিশরের পশ্চিমদিকে প্রেতলোক অবস্থিত। আবার কখনও মনে করা হইত যে, পাতালপুরীতেই মৃতেরা বাস করে। নক্ষত্রখচিত রাত্রিতে কিন্তু তাহারা আবার ভাবিত যে, মৃত্যুর পর মানুষ পাখীর রূপ ধরিয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং ভগবান 'রি'র অনুগ্রহে জ্যোতিষ্করূপ ধারণ করে। এদিকে অনেক সময় আবার তাহাদের মনে হইত যে, আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "মরুভূমি" বলিয়া একটি দেশ আছে। মরণের পর মৃতেরা সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ত পাওয়া যায়ই; তাহা ছাড়া পৃথিবীতে মৃতের কবরে যে ভোগদ্রব্য দেওয়া হয়, তাহাও তাহাদের ভোগে আসে। সবাই যে এই পুণ্য-ভূমিতে আসিতে পারে, তাহা নহে; কারণ ইহার চারিধারে মহাসমুদ্র। কাকপাখী অথবা বন্ধুভাবাপন্ন দেবতাদের অনুগ্রহ হইলে তাঁহাদের সাহায্যে এখানে আসা যাইতে পারে। সূর্য্যদেবও কাহাকে কাহাকেও তাঁহার নৌকায় করিয়া এখানে

পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ পুণ্যাত্মারা একজন খেয়ামাঝির সাহায্যে এখানে আসিয়া থাকেন। পাপীদের কিন্তু, সে তাহার নৌকায় উঠিতে দেয় না। এইখানেই প্রথম পাপপুণ্যের প্রভেদ ও পরলোকের উপর কর্ম্মফলের প্রভাব দেখা যায়।

পরবর্ত্তিকালে এই সমস্ত প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে ওরিরিসের আখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হয়। ওসিরিসই সর্ব্বপ্রথমে প্রেতলোকে গমন করিয়া সেখানকার রাজা হন। যাঁহারা ওসিরিসের মত সৎভাবে জীবন-যাপন করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর ওসিরিসের মত সশরীরে স্বর্গে যান, এবং ওসিরিসত্ব প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু হয় না। শুধু এ পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহারা অনত্র গমন করেন। তবে যাহাতে ওসিরিসত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য কবরের দেওয়ালে এই সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রপুরাণাদি খোদিত করা হইত। পিরামিডের প্রবেশপথে এই সমস্ত মন্ত্রাদি, লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাদিগকে "পিরামিডগ্রন্থ" (Pyramid) Tests) নাম দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু মজার কথা এই যে, যদিও মিশরবাসীরা মনে করিত পরলোক পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, তবু দেহছাড়া আত্মা যে পরলোকে যাইতে পারে একথা তাহারা ধারণাই করিতে পারিত না। কাজেই, দেহ যাহাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য তাহা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। ঔষধাদির সাহায্যে তাহাকে "মামি" (Mummy) করা হইত এবং যাহাতে কোন কারণে মামি বিনষ্ট না হয় সেইজন্য সুদৃঢ় কবর নির্ম্মাণ করা হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে মামিকে শবাধারে (Coffin) পুরিয়া প্রস্তরাধারে (Sarcophagus) রাখা হইত। আর মৃত ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য খাদ্যদ্রব্য,পোষাক-পরিচ্ছদাদি এবং সর্পাদি শত্রুর কৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য মন্ত্রপূত যষ্টি ও তাবিজাদি রাখা হইত। আবার কখন কখন পাশের একটি ঘরে মৃতব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও রাখা হইত। যাহাতে রীতিমত ভোগদ্রব্যাদি দেওয়া হয় সেইজন্য কবরের কাজে পুরোহিতও নিযুক্ত হইত এবং কবরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জায়গীরেরও বন্দোবস্ত করা হইত। অবশ্য জমীদার ও রাজারাজড়ারাই এতটা করিতে পারিতেন। সাধারণ-লোকের পক্ষে এই সমস্ত বন্দোবস্ত করা অসম্ভব ছিল। তাহাদের মাটির দেহ মাটিতেই মিশিত।

কালক্রমে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, যাহারা ওসিরিসলোকে গমন করিয়া থাকে ওসিরিসের মত তাহাদের বিচার হয়। বিচার করেন স্বয়ং ওসিরিস ৪২ জন কিম্ভূতকিমাকার দানবের সাহায্যে। এই ৪২ জন বিচারকের প্রত্যেকের কাছে মৃতব্যক্তি নরহত্যা, মিথ্যাভিযোগ, চৌর্য্যাদির এক একটি পাপের কথা অস্বীকার করে। সে সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহার হৃদয় ওজন করা হয়। মানদণ্ডের একদিকে থাকে তাহার হৃদয় অন্যদিকে থাকে একটি পালক—কারণ পালককে সত্যের চিহ্ন (Symbol) মনে করা হইত। যাহারা বিচারে পরাস্ত হইত, হয় তাহাদিগকে চিরদিন আলোকবাতাস-শূন্য কবরে ক্ষুধাতৃষ্ণায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, অথবা কিম্ভূতকিমাকার জল্লাদের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইত। এই জল্লাদেরা তাহাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিত। আর যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন তাঁহারা "সত্যবাক" আখ্যা লাভ করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন। এই ওসিরিস আখ্যান যে, মানুষের সম্মুখে একটা উচ্চনৈতিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এদিকে পরলোকে শত্রুর ভয়ও বিশেষ বাড়িয়াছিল। যাহাতে পরলোকে সে শান্তিতে ও সুখে না থাকিতে পারে, এই সব শত্রুরা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিত। এমন কি, তাহাকে বিনাশ করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ হইত না। ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে নানাবিধ যাদুমন্ত্র আওড়াইতে হইত। এই সব মন্ত্রাদি এখন শবাধারের ভিতর দিকে লিখিত আছে। অনেক সময়ে বিচারের চিত্রও আঁকা হইত এবং বিচারের সময় যাহা বলিতে হইবে তাহাও লিখিত হইত।

ওসিরিসের আখ্যান যে উচ্চ নৈতিক আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল, সাম্রাজ্যের যুগে বিকৃতির ফলে তাহা হইতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলিয়াছিল। প্রেতলোকের যাদুমন্ত্রাদির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্থানাভাবে এইগুলিকে আর শবাধারে লেখা হইত না। তাহার বদলে কাগজের মোড়কে (papyrus roll) লিখিয়া কবরে রাখা হইত। এই

ভাবে প্রেতগ্রন্থের বা মৃতের পুস্তকের (Book of the Dead) সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রজাল ও ধাপ্পাবাজীর সাহায্যেই এখন সমস্ত সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিলাসী আমীর-ওমরাহগণ প্রেতলোকেও শারীরিক পরিশ্রম করিতে নারাজ ছিলেন। কাজেই যাহাতে "মরুভূমিতে" তাঁহাদের খাটিতে না হয় সেইজন্য কবরে অসংখ্য প্রতিনিধির মন্ত্রপূত মূর্ত্তি রাখা হইত। ইহারাই তাঁহার হইয়া সব কাজ করিবে। ইহাদিগকে "উশেব্‌তী" বলা হইত। ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভের বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। একটি মন্ত্রপূত পাথরের পোকা তৈয়ারী করিয়া 'মামির' বুকের উপর কাপড়ের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইত। যখন ওসিরিসের কাছে তাঁহার বিচার হইত হাজার পাপ করিয়া থাকিলেও তখন এই পোকার প্রভাবে তাঁহার হৃদয় আর তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিত না। কাজেই তাঁহার পাপের কথা দেবতার অজ্ঞাত থাকিত এবং জয়ী হইয়া তিনি ওসিরিসত্ব লাভ করিতেন। সুবিধা বুঝিয়া পুরোহিতেরা বিচারের চিত্র সম্বলিত প্রেতগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন। লোকে এই পুঁথি কিনিত, কারণ ইহাতে নিজের নাম লিখিয়া কবরে স্থাপিত করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আর কোন ভয়ই থাকিত না। ইহার ফলে জাতির নৈতিক জীবনের বিশেষ অধঃপতন হইল।

এইত গেল মোটামুটি ধর্ম্মের কথা। এইবার আমরা সাহিত্যের বিষয় একটু আলোচনা করিব।

সাহিত্য

মধ্যযুগেই মিশরের সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। স্কুলের ছেলেদের শিক্ষার জন্য সুন্দর সুন্দর আদর্শ লিপি রচিত হইয়াছিল। গল্প সাহিত্যেরও এই সময় জন্ম হয়। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সিনুহির (Sinuhe) চিত্তাকর্ষক ভ্রমণবৃত্তান্ত ও রোমহর্ষক ঘটনাবলী খুবই জনপ্রিয় ছিল। সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের মত একটা গল্পও প্রচলিত ছিল। দার্শনিক বিষয়েও একটু আধটু আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য-সাহিত্যেরও বিকাশ দেখা যায়। এমন কি সাধারণ লোকেদের দৈনন্দিন জীবনের বিষয় লইয়াও গীত রচিত হইত। নাটকেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ওসিরিসের জীবনের ঘটনাবলী লইয়া নাটিকা রচিত হইত এবং অভিনীত হইত।

সাম্রাজ্যের যুগের সাহিত্যের নিদর্শনও বর্ত্তমান আছে। অ্যামনদেবের পুরোহিত তৃতীয় থথ্‌মোসের বিষয়ে একটি সুন্দর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। তবে এসময়কার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা হইতেছে একেশ্বরবাদী সম্রাট ইখ্‌নাটনের "অ্যাটন্ স্তোত্র"। এই স্তোত্রগুলির দার্শনিক ভাব উচ্চ দরের। ইহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে খাঁটি কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে গদ্য মহাকাব্য রচনার চেষ্টাও দেখা যায়। একজন অজ্ঞাত কবি দ্বিতীয় র‍্যামসেসের কাদেশের যুদ্ধ লইয়া সুন্দর একটি গদ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়কার সাহিত্যের বিশেষত্ব হইতেছে কথা-সাহিত্য। হিক্‌সস রাজা অ্যাপফিস্ ও থিব্‌সের সামন্ত রাজা সেকেনেরের যুদ্ধের বিষয়ে সুন্দর একটি গল্প প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ থথ্‌মোসের বিজয়কাহিনী লইয়াও অনেক গল্প রচিত হইয়াছিল। তবে "হতভাগ্য রাজপুত্রের" নাহরিণ রাজকন্যালাভের গল্পই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। এইরূপ অসংখ্য গল্প এই সময়ে প্রচলিত ছিল। কাব্য সাহিত্যেরও বিশেষ উৎকর্ষতা দেখা যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রেমের কবিতা ও ধর্ম্মসঙ্গীতও রচিত হয়। এইখানে "প্রেতগ্রন্থের" উল্লেখ করা প্রয়োজন। পিরামিড-রাজাদের সময় পিরামিড-পুঁথিতে সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ে তাহার পরিবর্ত্তে "প্রেতগ্রন্থে" অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার সময় মিশরের শিল্পের বিষয় অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই

শিল্প

এইখানে তাহার সংক্ষেপ আলোচনাই যথেষ্ট। বাস্তুশিল্পে মিশরবাসীরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ইহার পরিচয় পাই রাজাদের কবর ও দেবালয় নির্ম্মাণে। পিরামিডের বিশালতা ও শিল্পকৌশল সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যে শিল্পীরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল বাস্তুশিল্পের ইতিহাসে তাহাদের কীর্ত্তি চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। এই সময়কার মন্দির নির্ম্মাণের কৌশলও কম উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার প্রধান বিশেষত্ব স্তম্ভশ্রেণী। স্তম্ভগুলি দেখিতে হয় খেজুরগাছ, না হইলে প্যাপাইরাস (papyrus) গুচ্ছের মত।

মধ্যযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বিশেষ কিছুই বর্ত্তমান নাই। তবে ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবোর

(strabo) লেখা হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় অ্যামেনেমহেট অথবা অন্য কোন শক্তিশালী রাজা ফ্যায়ুমে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার সৌন্দর্য্য ও শিল্পকৌশল অসাধারণ ছিল। ষ্ট্রাবোর সময় ইহা ল্যাবিরিন্থ (Labyrinth) বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

সাম্রাজ্যের যুগে বাস্তুশিল্পের চরম উৎকর্ষতা দেখা যায়। এই সময়ে যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সৌন্দর্য্য ও বিশালতায় সত্যই তাহারা অতুলনীয়। প্রথম থথমোসের সময় হইতেই থিবসের নিকটস্থ কর্ণাকে অ্যামেনদেবের সুন্দর সুন্দর মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। রাণী হাটসেপস্থটের "দের এল্-বাহ্রি"র সমাধি মন্দিরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্রাট্ তৃতীয় থথমোস কর্ণাকে একটি সুন্দর ও বিশাল স্তম্ভশোভিত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি নানাজায়গায় অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এক হিসাবে মিশরের বাস্তুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তৃতীয় অ্যামেনহোটেপের সময় নির্ম্মিত হয়। থিবসের দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত লাক্সরে (Luxor) তিনি অ্যামনের যে মন্দির, তৎসংলগ্ন প্রকোষ্ঠ, হলঘর ও সুদৃশ্য স্তম্ভশোভিত দরদালান নির্ম্মাণ করেন সৌন্দর্য্য ও শিল্পকৌশলে তাহার সমকক্ষ দেখা যায় না। তবে দুঃখের বিষয়, বিশাল হলঘরটির নির্ম্মাণ কার্য্য তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির, প্রবেশদ্বার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। কর্ণাক মন্দিরের সম্মুখে অ্যামনহোটেপ যে বিশাল প্রবেশদ্বার নির্ম্মাণ করেন তাহার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। নদীর অন্য পারে তিনি তাঁহার অন্য একটি বিশাল সমাধি-মন্দিরও নির্ম্মাণ করেন।

মন্দির নির্ম্মাণে প্রথম সেটিও কম কৃতিত্ব দেখান নাই। কর্ণাকেও মন্দিরের সম্মুখে প্রথম র‍্যামসেস্ যে বিশাল স্তম্ভশোভিত হলঘর নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন তিনি তাহা অনেকটা সম্পূর্ণ করেন। আয়তনে ইহা তৃতীয় অ্যামেনহোটেপের লাক্সরের হলঘর হইতেও বড়। মিশরের প্রধান দেবতা ও ভূতপূর্ব্ব ফ্যারাওদের পূজার জন্য তিনি অ্যাবাইডসে একটি চমৎকার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরটির অনেকাংশ অতীতকালের শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ আজও দাঁড়াইয়া আছে। থিবসের পশ্চিমদিকে তিনি নিজের সমাধিমন্দিরও নির্ম্মাণ করেন। আরও অনেক মন্দির যে তিনি নির্ম্মাণ করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় র‍্যামসেসের সময় এত অধিকসংখ্যক মন্দির নির্ম্মিত হয় যে, তাহা সংখ্যাতীত। অ্যাবাইডসে তাঁহার পিতা যে সুন্দর মন্দির আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনি তাহা শেষ করেন। সেটির সমাধিমন্দিরের নিকট তিনি নিজের সমাধিমন্দির স্থাপনা করেন। এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকা কর্ণাকমন্দিরের সম্মুখস্থিত হলঘর তিনি সম্পূর্ণ করেন। এমন কি, সুদূর নিউবিয়া দেশে আবু সিম্বেলেও তিনি একটি চমৎকার গিরিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মোটকথা এমন সহর ছিল না যেখানে তিনি মন্দির স্থাপনা করেন নাই।

ভাস্কর্য্যশিল্পে মিশরের শিল্পীরা যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছে সত্যই তাহা বিস্ময়কর। বোধ হয় গ্রীক্ শিল্পী ছাড়া প্রাচীন জগতে এই বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। তবে প্রথমেই বলা দরকার যে; গ্রীক্‌দের মত মিশরবাসীরা নিছক সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল না। কাজেই

ভাস্কর্য্য

মিশরীয় ভাস্করেরা মূর্ত্তি গড়িত মন্দির অথবা কবরে ব্যবহারের জন্য—গৃহ-সৌষ্ঠব অথবা নগরের শোভাবর্দ্ধন করিবার জন্য নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশরীয় ভাস্করেরা যে সব মূর্ত্তি গড়িয়াছে তাহা যে কোন দেশের শিল্পীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। এই শিল্পীদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহারা মূর্ত্তিকে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পিরামিড্ রাজা খাপ্রের বিখ্যাত মূর্ত্তিটি যে শিল্পী গড়িয়াছে তাহার স্থান জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের পার্শ্বে। কঠিন অমসৃণ পাথর খুঁদিয়া রাজার জীবন্ত মূর্ত্তি গড়া যে সে ভাস্করের কাজ নয়। তারপর লুভার মিউজিয়ামের হেমসেটের (Hemset) উপবিষ্ট মূর্ত্তিটিও আর একটি বিস্ময়কর বস্তু। মূর্ত্তিটির চোখ মুখে যে সজীবতার ছাপ পড়িয়াছে সচরাচর তাহা বড় একটা দেখা যায় না। পুরোহিত র‍্যানোফারের (Ranofer) মূর্ত্তির মুখে যে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ফুটাইতে না জানি কত জন্ম সাধনা করিতে হয়। সেখ্-এল্-বেলেড্ (Shekh El Beled) নামে পরিচিত একজন রাজকর্ম্মচারীর কাঠের মূর্ত্তির মুখে



যে আত্মপ্রসাদ ও আত্মতৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছেই সম্ভবে। আর যে ভাস্করের বাটালির ঘায়ে বিখ্যাত "লুভার লেখকের" (LouvreScribe) সৃষ্টি হইয়াছে তাহার স্থান অমর-শিল্পী ফিডিয়াসের (Phidias) পাশে। যথার্থই একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয় যে, হঠাৎ যদি লেখক মহাশয় প্রাণ পাইয়া হস্তস্থিত কাগজে (পাথরে) লিখিতে আরম্ভ করেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই সময়ের শিল্পীরা তামার মূর্ত্তিও গড়িতেন। প্রথম পেপির (Pepi 1) যে তাম্রমূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ লক্ষিত হয়।

মধ্যযুগের ভাস্করশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, এই সময়ের শিল্পীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গড়িত, এমন কি ৪০।৫০ ফুট উচ্চ। এরূপ অনেক মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নানা জায়গায় পড়িয়া আছে। কতকগুলি মূর্ত্তি অভগ্ন অবস্থায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই সব মূর্ত্তির মুখে আর পূর্ব্বের মত সজীবতা দেখা যায় না। পাথরের বুকে শিল্পীরা আর নিজেদের বিশেষত্ব দেখাইতে পারে নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় অ্যামেনেম্‌হেটের বিশালকায় মূর্ত্তিতে ও তৃতীয় সেসোষ্ট্রিসের (Sesostris III) কর্ণাকে প্রাপ্ত মস্তকে যে বিশেষত্ব ও শিল্পনৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অসাধারণ।

সাম্রাজ্যের যুগে মিশরের ভাস্কর্য্য একহিসাবে অতুলনীয় ছিল। এখনকার ভাস্করেরা মূর্ত্তির প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে যে সতর্কতা ও মনোযোগ দেখাইয়াছে সত্যই তাহা বিস্ময়কর। প্রত্যেকটি মূর্ত্তিতে অসাধারণ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—তবে মনে হয় যেন পূর্ব্বেকার মুখের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইখ্‌নাটেনের সময়কার মূর্ত্তিগুলি এত সুন্দর যে, এগুলি গ্রীক ভাস্করদের হাতের কাজ বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় র‍্যামসেসের সময়ের মূর্ত্তিগুলি খুবই সুন্দর বিশেষতঃ টিউরিন্ মিউজিয়মে র‍্যামসেসের প্রতিমূর্ত্তি।

মিশরের ভাস্করদের রিলিফ-চিত্রের বিষয় কিছু জানা দরকার। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শিল্পীরা রিলিফ চিত্রে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মিশরের প্রথম রাজারা দেবালয়ে যে সমস্ত পত্রাদি উপঢৌকন দিতেন তাহাতে যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে নিপুণ শিল্পীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদের কবরের দেওয়ালেও বাস্তব জীবনের অনেক রিলিফ-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব চিত্র খুবই সুন্দর। ইহাতে রঙ দেওয়া হইত। রিলিফ-চিত্র ছাড়া সাধারণ চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রকরদের অঙ্কিত মেডুমের কোন কবরের হংসশ্রেণীর চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে এই বিদ্যায় ইহারা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যের যুগের শিল্পীর প্রতিভার চরম বিকাশ পাইয়াছে রিলিফ-চিত্রে। বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত মেম্‌ফিসের প্রধানপুরোহিতের শবযাত্রার চিত্রে তাঁহার পুত্রদের হৃদয়বিদারক শোকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এই অমর শিল্পীর কাছে আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হইয়া পড়ে। ইখ্‌নাটনের প্রাসাদের ভগ্ন মেজেতে ধাবমান্ কুকুর, পলায়নপর বৃষ ও উড়ন্ত পক্ষীর যে চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর মধ্যে তাহার স্থান। কর্ণাকে সেটির স্তম্ভশোভিত হলঘরের দেওয়ালে তাঁহার যুদ্ধের যে রিলিফ-চিত্র আছে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক সুন্দর তাঁহার অ্যাবাইডসের দেবমন্দিরের ও থিব্‌সের সমাধি-মন্দিরের রিলিফ-চিত্র। সাধারণ চিত্রেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়কার থিব্‌সের কবরে শিকারের যে চিত্র দেখা যায় তাহা শুধু শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকা হইতেই সম্ভবে। দ্বিতীয় র‍্যাম্‌সেসের কাদেশের যুদ্ধের যে রিলিফ চিত্রাবলী আজও বর্ত্তমান আছে তাহাতে একহিসাবে রিলিফ-চিত্রের চরম-পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে রিলিফচিত্রের অবনতি আরম্ভ হয়। তৃতীয় র‍্যামসেসের মেডিনেটহাবুর মন্দিরের চিত্রাবলী দেখিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। তবে মিশরের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে মিশরের শিল্প-প্রতিভা স্যামেটিকের সময় একবার যেন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়কার কবরে, মন্দিরে প্রাচীন মিশরের অনুকরণ বাস্তবজীবনের সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাস্করেরা সত্যই মিশরের গৌরবের সামগ্রী। শুধু রিলিফ-চিত্রে নয়, মূর্ত্তি গঠনেও ইহারা শ্রেষ্ঠ গ্রীক-শিল্পীদের সঙ্গে এক আসনে বসিবার উপযুক্ত





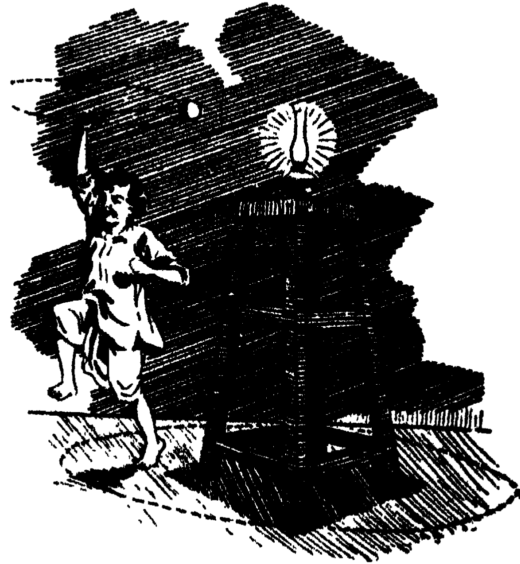
চাঁদ

তোমরা সকলে চাঁদ দেখিয়াছ। পূর্ণিমার



পৃথিবী ও চাঁদ

চাঁদ যখন সূর্য্যাস্তের পর একখানি রূপার থালার মত বাহির হইয়া আসে এবং ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় জল ও স্থল ভরিয়া দেয়, তখন কাহার না মন আনন্দে নাচিয়া উঠে? কবিরা চাঁদের বিষয়ে কত কবিতা লিখিয়াছেন। পুরাকালে লোকেরা চাঁদকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। জ্যোতির্ব্বিদেরা এখন জানেন যে, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ-মাত্র। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, চাঁদও তেমনই পৃথিবীর



একটি বালক বল দড়িতে বাঁধিয়া প্রদীপের চারিদিকে ঘুরাইতেছে

চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। একটা প্রদীপ

মাঝখানে রাখিয়া তুমি উহার চারিদিকে অনবরত ঘুরিতে থাক, আর সেই সঙ্গে একটি 'বল' দড়িতে বাঁধিয়া তোমার চারিধারে ঘুরাইতে থাক। প্রদীপটি হইল সূর্য্য, তুমি পৃথিবী সাজিয়াছ এবং 'বলটা' মনে কর তোমার উপগ্রহ চাঁদ। এখানে 'বল'টার গতি অনেকটা সত্যকার চাঁদের গতির মত। পৃথিবীর চারিধারে একবার ঘুরিতে চাঁদের প্রায় সাতাশ দিন আট ঘণ্টা সময় লাগে—যদি আমরা ধরিয়া লই যে, পৃথিবী স্থির। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবী স্থির নয়, উহা সূর্য্যের চারিদিকে ক্রমাগত ছুটিতেছে। পৃথিবী যদি স্থির থাকিত এবং আজ এখন যদি চাঁদ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকে, তাহা হইলে প্রায় সাতাশ দিন আট ঘণ্টা পরে চাঁদ আবার ঠিক সেই মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু পৃথিবী স্থির না থাকায়; এই সময়ের ব্যবধান একটু বাড়িয়া যায়; পুনরায় মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিতে চাঁদের প্রায় উনত্রিশ দিন তের ঘণ্টা সময় লাগে।

আকাশে যত সব গ্রহনক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলের চেয়ে চাঁদ আমাদের কাছে। জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মোটামুটি হিসাবে চাঁদ পৃথিবী হইতে প্রায় দুই লক্ষ, উনত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চাঁদ যে কক্ষের (orbit) উপর ঘুরিতেছে, তাহা ঠিক্ গোলাকার নহে, বরঞ্চ একটু ডিম্বাকার (elliptic)। সেইজন্যই উপরে চাঁদের দূরত্বের যে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে চাঁদ কখনও কখনও ষোল হাজার মাইল আরও কাছে আসিয়া পড়ে, আর কখনও বা আরও তের হাজার মাইল দূরে সরিয়া যায়। তোমরা অনেকে বোধ হয় রেলের "পাঞ্জাব মেল" কিম্বা



চন্দ্রলোক-যাত্রী

"তুফান মেলে" চড়িয়াছ। "পাঞ্জাব মেল" ঘণ্টায় ৪৫ মাইল চলে। পৃথিবী হইতে চাঁদ পর্য্যন্ত যদি রেল-লাইন তৈয়ার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনবরত চলিয়া পাঞ্জাব মেলের মত দ্রুতগামী রেলগাড়ীর চাঁদে পৌঁছিতে অন্ততঃ সাতমাস দশ দিন লাগিবে। এয়ারোপ্লেন (aeroplane) রেল-



গাড়ী হইতেও দ্রুতগামী। এয়ারোপ্লেন বা হাওয়াই-জাহাজ অনায়াসে ঘণ্টায় এক-শত মাইল যাইতে পারে। তোমার যদি এয়ারোপ্লেনে চাঁদের দেশে যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে তুমি প্রায় তিনমাস দশ-দিনে সেথায় পৌঁছিবে। যদি একটি পাকা রাস্তা চাঁদ পর্য্যন্ত তৈয়ার করা সম্ভব হয়, আর যদি না খাইয়া, না ঘুমাইয়া, না বিশ্রাম করিয়া, ঘণ্টায় চার মাইল হিসাবে তুমি ক্রমাগত হাঁটিতে থাক, তাহা হইলে চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে তোমার প্রায় ছয় বৎসর দশমাস সময় লাগিবে। আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। কাজেই, এই রশ্মি প্রায় ১·৩ সেকেণ্ডে চাঁদে পৌঁছিতে পারে।

পৃথিবীর ব্যাস মোটামুটি হিসাবে ৭৯২০ মাইল ধরা যাইতে পারে। আমাদের পৃথিবীর মত ৩০টা গোলাকার পিণ্ড যদি পাশাপাশিভাবে রাখা যায়, তাহা হইলে চাঁদে যাইবার এক প্রকাণ্ড পুল তৈয়ার হইতে পারে।

চাঁদের ব্যাস ২১৬৩ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় একশত ভাগের সাতাশ ভাগ মাত্র। পৃথিবী গড়িতে যত কাদামাটির দরকার হইয়াছে, তাহাতে প্রায় উনপঞ্চাশটা চাঁদ গড়িতে পারা যায়। পৃথিবীর ওজন চাঁদের ওজনের প্রায় ৮২ গুণ। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির ছয়ভাগের একভাগ। তুমি যদি চাঁদে যাও, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হইবে। তোমার ওজন যদি এইখানে একমণ হয়, চাঁদে তাহা এখানকার হিসাবে প্রায় সাত সেরের সমান হইবে। তুমি যদি এইখানে ২০ সের ভারি জিনিষ তুলিতে পার, চাঁদে গিয়া দেখিবে যে, তুমি অনায়াসে তিন মণ ভারী জিনিষ তুলিতে পারিতেছ। ধর, তুমি একজন নামজাদা খেলোয়াড় তুমি যদি ছয়ফুট উঁচু লাফাইতে পার, চাঁদে গিয়া



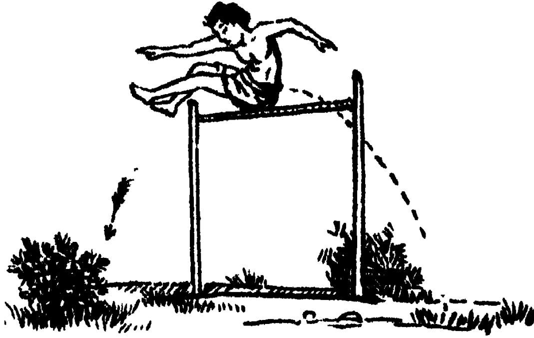
পৃথিবীতে আধমণি বোঝা তুলিতে কি কষ্ট



চাঁদের দেশে আড়াই মণ ও তিন মণ বোঝা কি হাল্কা

তুমি দোতলা বাড়ীর সমান উঁচু লাফাইতে পারিবে। আর যদি তুমি ১৫ ফুট লম্বাই

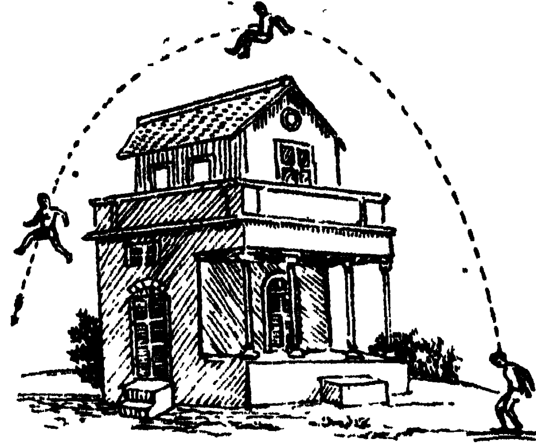
লাফাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে চাঁদে গিয়া তুমি অন্ততঃ ৯০ ফুট লম্বাই লাফাইয়া যাইতে পারিবে। চন্দ্রলোকে ছোটখাট নদী অনায়াসে লাফাইয়া পার হইতে পারিবে,



পৃথিবীতে ছয় ফুট উঁচু লাফাইতেছ

পুলের কোনও দরকার থাকিবে না। দুঃখের বিষয়, রেলগাড়ীতে, পদব্রজে কিংবা হাওয়াই জাহাজে চাঁদে পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। রেলের লাইন বা হাঁটিবার রাস্তা তৈয়ার করা সম্ভব নয়, আর বাতাস না থাকিলে এয়ারোপ্লেন্ উড়িতে পারে না। বাতাস পৃথিবীর উপরিতল (surface) হইতে কেবল ১০০ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত আছে।

যদি তুমি কোন-প্রকারে চাঁদে যাইতে পার, তাহা হইলে সেখানে গিয়া তুমি অল্পক্ষণমাত্র বাঁচিতে পারিবে, কারণ, চাঁদে না আছে বাতাস, না আছে অম্লজান (oxygen)। তুমি নিশ্বাসই লইতে পারিবে না। না আছে সেখানে গাছপালা, আর না আছে সেখানে জল—হয়ত সেখানে খুব জমাট বরফ আছে, তাহা এত ঠাণ্ডা এবং তাহার



চাঁদের দেশে দোতলা বাড়ী অনায়াসে লাফাইয়া পার হইতেছ

তাপ এত কম যে, চাঁদের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-তাপও এই জমাট বরফকে জল কিংবা বাষ্পে পরিণত করিতে পারে না। এই চাঁদের দেশে যাইলে, না পাইবে নিশ্বাস লইতে, না পাইবে আহার করিতে এবং না পাইবে জলপান করিতে; তাহা হইলে কতক্ষণই বা তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে! চাঁদের



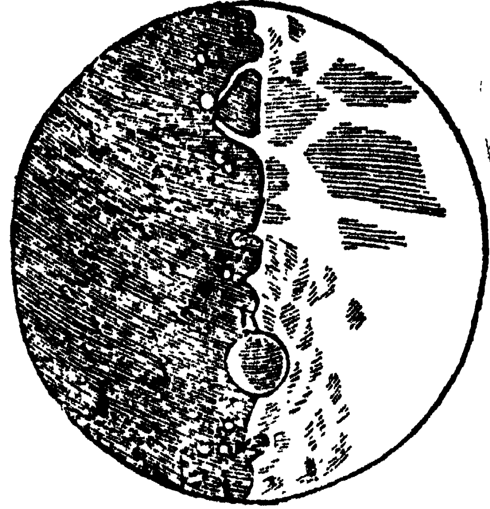
চাঁদের দেশে লাফাইয়া নদী পার হওয়া কি মজা

ভিতরটা খুবই ঠাণ্ডা হইয়া ও জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। চাঁদের এখনকার অবস্থায় সেখানে কোনও জীবজন্তু বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। চাঁদের চিরকাল এই দশা ছিল না, এককালে চাঁদও আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীবজন্তুর বাসের উপযোগী ছিল। পৃথিবীরও এককালে চাঁদের মত অবস্থা আসিবে। পরে এই বিষয়ে একটু বিশদ-ভাবে তোমাদিগকে বলিব।

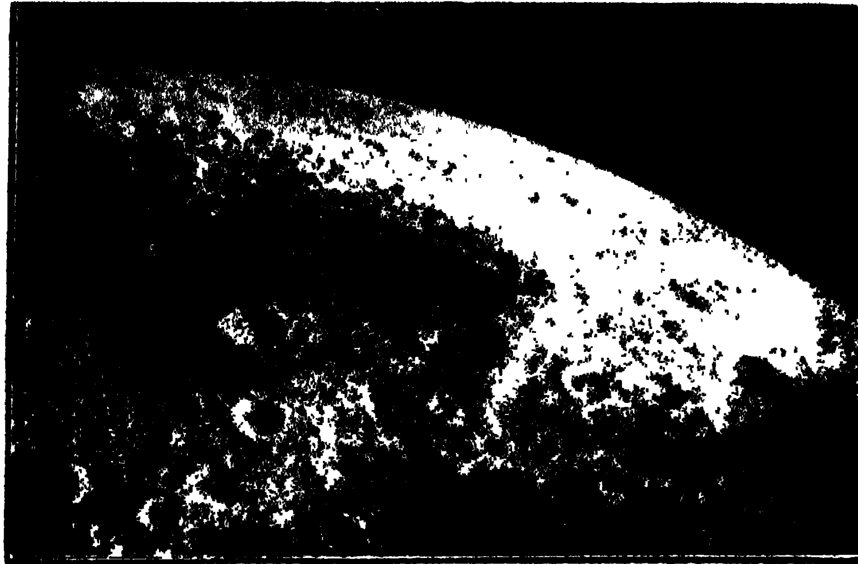


পৃথিবীর একটি খাল ডিঙ্গাইতেই মাথায় হাত

সাহায্যে চাঁদকে পরীক্ষা করিলেন। গ্যালিলেও প্রথমে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি সকলের আগে চাঁদকে এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া লইলেন। গ্যালিলিওর দূরবীণের মতন দূরবীন এখন খেলানার দোকানে তিন চারি টাকায় পাওয়া যায়। এখন দূরবীণের অনেক



গেলিলিয়োর আঁকা চাঁদের মানচিত্র



চাঁদের এক অংশের চিত্র

উন্নতি হইয়াছে। মার্কিনদেশে মাউণ্ট উইল্‌সন্ পর্ব্বতের উপর যে মানমন্দির আছে তাহাতে অতি বৃহৎ এক দর্পণযুক্ত দূরবীণ (reflecting) telescope) আছে, ইহার দর্পণের ব্যাস ১০০ ইঞ্চি হইবে। শুনা যায়, সম্প্রতি ইহার দ্বিগুণ বড় এক দূরবীণ তৈয়ার করা হইতেছে, যাহার দর্পণের ব্যাস ২০০ ইঞ্চি হইবে। চাঁদ দুইলক্ষ উনত্রিশ হাজার মাইল দূরে না

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হইবার পর হইতে জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রথমেই এই যন্ত্রের

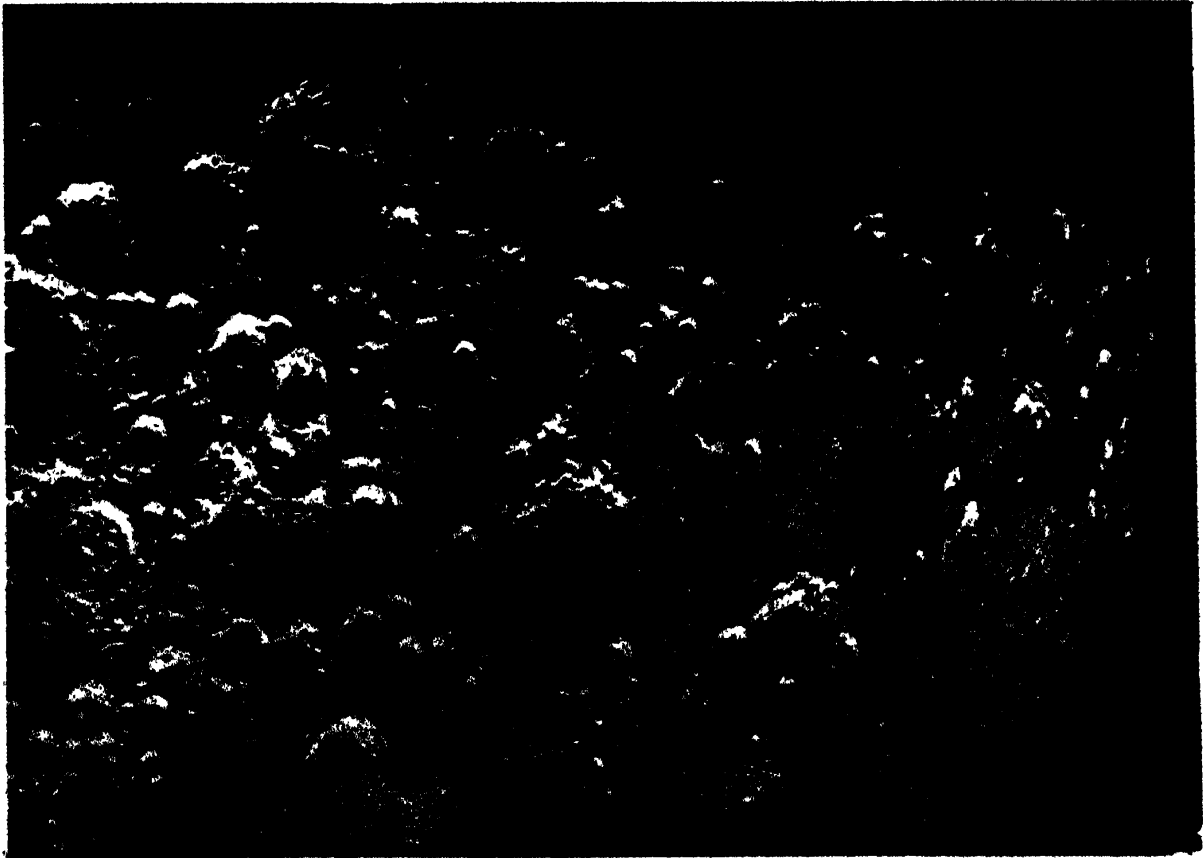
থাকিয়া কেবল পঞ্চাশ মাইল দূরে থাকিলে, শুধুচোখে যে রকম দেখাইত, এত



চাঁদের-দেশের কল্পিত-খাদ

বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে সেইরূপই দেখায়।

পারি। জ্যোতির্ব্বিদেরা চাঁদের মানচিত্র আঁকিয়াছেন। কোথায় কোন্ সমুদ্র, কোথায় কোন্ পর্ব্বত সবই আঁকিয়াছেন। অবশ্য চাঁদের সমুদ্রে এখন জল নাই, কেবল তাহার বৃহৎ খাদগুলিই পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায় কোন্ আগ্নেয়গিরি ছিল তাহাও জ্যোতির্ব্বিদেরা বাহির করিয়াছেন। চাঁদের দেশে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ সেখানে যাইতে পারে না এবং জ্যোতির্ব্বিদদের মানস-নেত্রেই এই জিনিষগুলি দেখিয়া লইতে হইবে। চাঁদের গায়ে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় আছে। কোন কোনটি ২৫,০০০ ফিটেরও বেশী উঁচু।



চাঁদের দেশে

এই দূরবীণের সাহায্যে চাঁদের উপরকার জিনিষ আমরা বেশ ভালভাবেই দেখিতে পাহাড়গুলির চূড়ার উপর যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে তখন সেইগুলি আলোয় ঝল্-মল্

F. 5

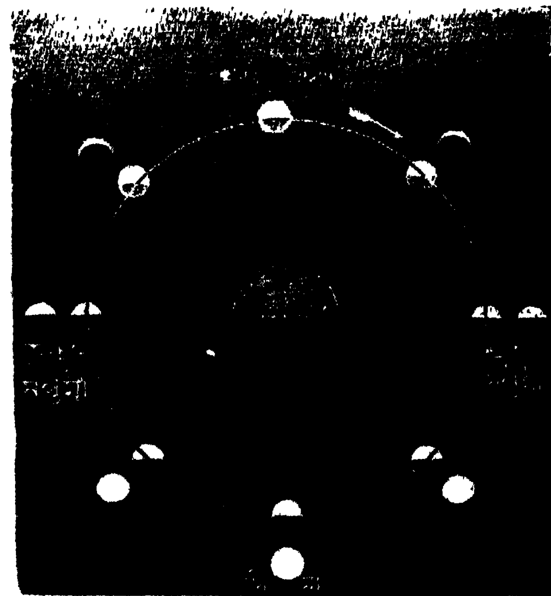
করিতে থাকে। এই সকল পাহাড়ের পার্শ্বে ছায়াময় অঞ্চল দেখা যায়, সেইগুলি সমতল ক্ষেত্র। চাঁদের গায়ে অনেকগুলি ধূসরবর্ণ দাগ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এইগুলি চাঁদের জলশূন্য সমুদ্র। এই সমুদ্রগুলি খুবই গভীর এবং শত শত মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। চাঁদের ত নিজস্ব আলো নাই। চাঁদের উপর সূর্য্য-কিরণ পড়াতেই ইহার উচ্চ পর্ব্বতশিখর-গুলি ঝক্‌মক্ করে। কিন্তু যেখানে গভীর গর্ত্ত, সেইখানে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না, সেইজন্যই গর্ত্তগুলি কালো দেখায়। চাঁদে অনেকগুলি বড় বড় আগ্নেয়পর্ব্বত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, এই সকল জ্বালামুখী হইতে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। চাঁদের ভিতরকার তাপ এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে, সেইজন্যই চাঁদের ভিতরটা একেবারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা এখনও খুব গরম এবং সেখানে ধাতুগুলি এখনও গলা অবস্থায় আছে। চাঁদের অভ্যন্তরটা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর মত খুব গরম অবস্থায় ছিল এবং ধাতুগুলি ফুটন্ত তরল অবস্থায় ছিল। কোনও কারণে যদি ভিতরকার চাপের কমবেশী হইত তাহা হইলে জলন্ত তরল ধাতু ও ধূম আগ্নেয় পর্ব্বতের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইত।

আগেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীর হিসাবে চাঁদের আকর্ষণশক্তি খুবই কম। চন্দ্রলোকে সব বস্তু ওজনে খুবই লঘু এবং সেজন্য তথায় তরল ধাতুর ফোয়ারা অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া অনেক উঁচুতে উঠিতে পারে এবং সেইজন্যই চাঁদে অনেক আগ্নেয় পাহাড়ের মুখ বেশ বড় হয়, এমন কি কোন কোনটার ব্যাস একশত মাইল পর্য্যন্ত হয়। চাঁদের কতকগুলি আগ্নেয় গিরির ছবি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। উপরে টাইকো (Tycho) গিরির ছবি দেখিতে পাইবে। প্রায় মধ্যস্থলে কোপার্নিকস্ (Copernicus) গিরি, তাহারই ডানদিকে কেপ্লার (Kepler) পর্ব্বত দেখিতে পাইবে।



চাঁদের জ্বালামুখী

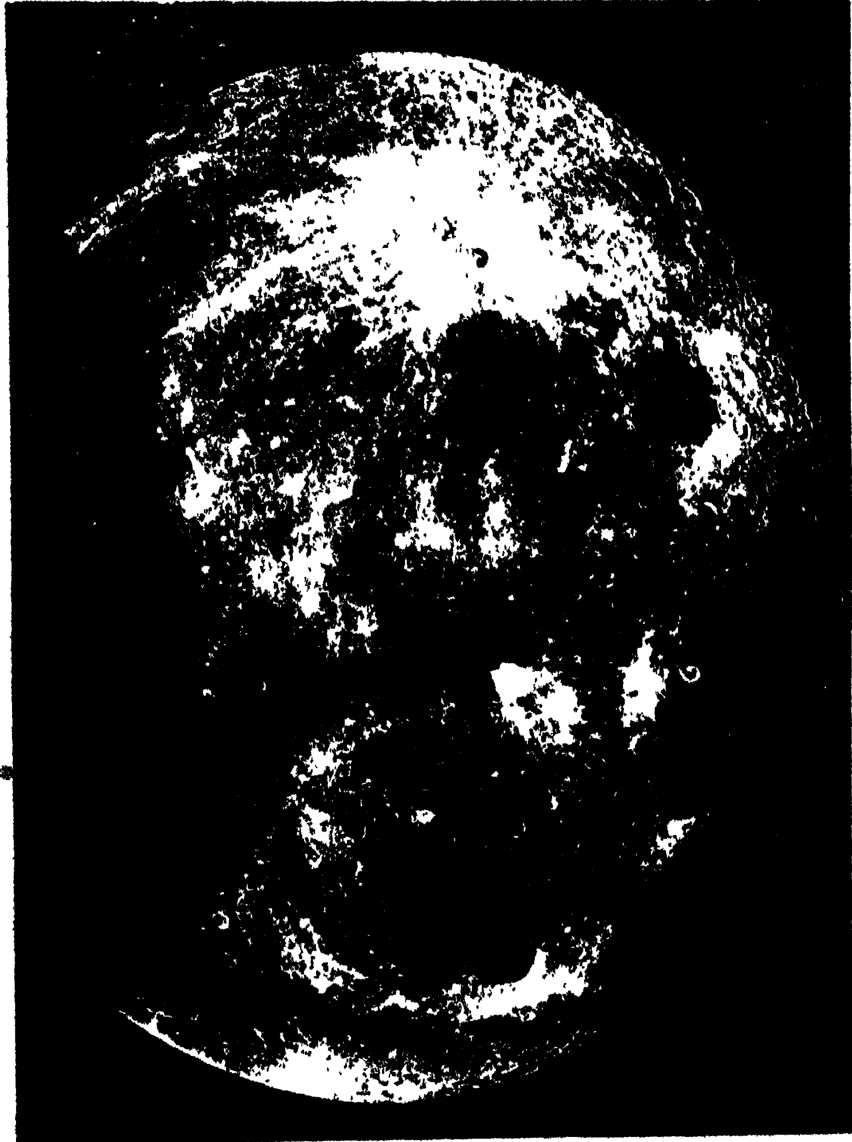
চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। অমাবস্যার রাত্রে চাঁদকে একে-



চাঁদের কলা

বারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইদিন চাঁদ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে থাকে।

আগেই বলিয়াছি চাঁদের নিজের আলো নাই। এই অমাবস্যার রাত্রে চাঁদের যে পিঠটা পৃথিবীর দিকে থাকে তাহার উপর সূর্য্যের আলো মোটেই পড়ে না, সেই জন্যই চাঁদকে একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। অমাবস্যার পর প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চাঁদ অনেকটা সরু কাস্তের মতন দেখায়। এই অবস্থায় চাঁদের যে পিঠটির উপর সূর্য্যের আলো পড়ে, তাহার অল্পাংশ মাত্রই পৃথিবী হইতে দেখা যায়। সপ্তমী তিথিতে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় আধখানা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশী কিংবা দ্বাদশীতে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা দেখিতে পাওয়া যায়। অমাবস্যার প্রায় পনেরোদিন পরে পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক্ বিপরীত দিকে আসিয়া পড়ে এবং পৃথিবী তখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যখানে পড়িয়া যায়। চাঁদের সমস্ত আলোকিত অংশ তখন দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাকার পূর্ণচন্দ্র তখন আমাদের নয়নগোচর হয়।

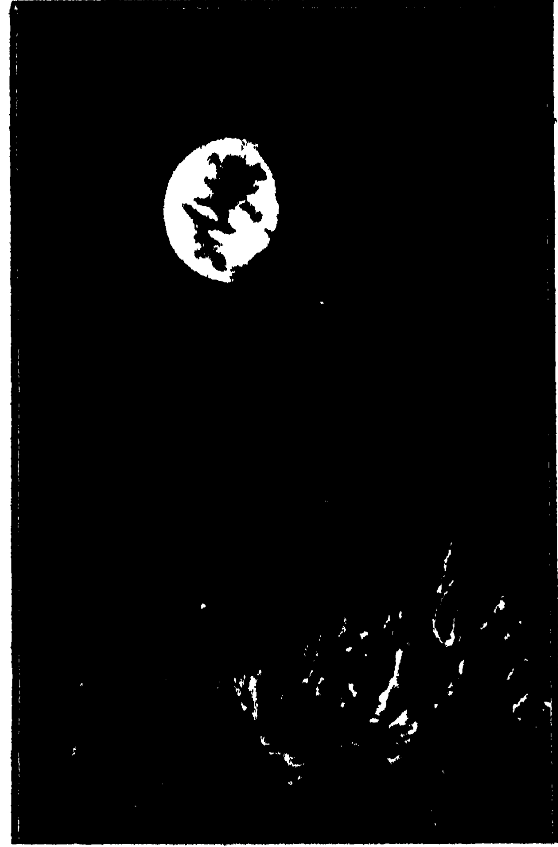


চাদের তিনটি আগ্নেয়গিরি (১) টাইকো, (২) কোপার্নিকস্, (৩) কেপলার

অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে পক্ষ, তাহাকে আমরা শুক্লপক্ষ বলিয়া থাকি এবং পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পক্ষে চন্দ্রের কলার হ্রাস হয়, তাহাকে আমরা কৃষ্ণপক্ষ বলি। শুক্লপক্ষে চাঁদের ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমার পর হইতে

চাঁদের ক্ষয় আরম্ভ হয়, কমিতে কমিতে চাঁদের আলোকিত অংশের বার আনা, আট আনা, চার আনা ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবশেষে পুনরায় চাঁদ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়—আবার অমাবস্যা আসে। এইরূপ চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হয়। চাঁদের এই হ্রাসবৃদ্ধিকে চন্দ্রকলা বলা হয়।

এক অমাবস্যার পর দ্বিতীয় অমাবস্যা আসিতে প্রায় উনত্রিশ দিন তের ঘণ্টা সময় লাগে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে দুই অমাবস্যার মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় সাতাশ দিন আট ঘণ্টা হইত। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার চাঁদের সঙ্গে এক অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কাস্তের মত অংশটা খুব উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু বাকী অংশটায় আব-ছায়া রকমের আলো দেখা যায়। কাস্তের মতন অংশটা অবশ্য সূর্য্যের আলোয় খুব উজ্জ্বল দেখা যায়; কিন্তু তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, চন্দ্রের ত' আর নিজের বলিয়া কোন আলো নাই, তবে বাকী অংশটার উপর আবছায়া আলো কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরটি বড়ই চমৎকার। উত্তর হইতেছে—পৃথিবীর উপর চাঁদ যেমন জ্যোৎস্না দেয়, তেমন চাঁদের উপরও পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে। পৃথিবীদত্ত জ্যোৎস্না, চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়ে চৌদ্দগুণ বেশী উজ্জ্বল। চাঁদের উপর এই পৃথিবীদত্ত জ্যোৎস্নার আলোকই আমরা দেখিতে পাই। এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, রাত্রিতে যখন পৃথিবীর জ্যোৎস্না চাঁদের উপর পড়ে, তখন চাঁদে অন্ধকার থাকে না। সপ্তমী বা অষ্টমীর দিনও কিংবা আরও বড় তিথিতে চাঁদের অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে, কিন্তু সূর্য্যকিরণে আলোকিত চাঁদের অংশ এত বেশী উজ্জ্বল যে, পৃথিবীদত্ত জ্যোৎস্নায় অপেক্ষাকৃত অতি মৃদু আলো আমাদের চক্ষে পড়ে না। একটি উদাহরণ দিলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে যদি একটি জোনাকী পোকা বাহিরে উড়িয়া বেড়ায় তাহা হইলে তুমি স্পষ্টই তাহা লক্ষ্য করিবে। কিন্তু তোমার পড়িবার ঘরের টেবিলের উপর যদি একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়া



চাঁদের দেশে পৃথিবীর জ্যোৎস্না

রাখ, এবং জোনাকীপোকাটি যদি এই উজ্জ্বল আলোর নিকটে উড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে জোনাকীপোকাটি অনেক সময়ে তোমার নজরে পড়িবে না। এই একই কারণে সপ্তমী কিংবা আরও বড় তিথিতে চাঁদের উপর পৃথিবীর দেওয়া জ্যোৎস্না আমরা দেখিতে পাই না। শুক্ল-পক্ষই হউক আর কৃষ্ণপক্ষই হউক যখনই জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদের

উপরিতল (surface) পরীক্ষা করিয়াছেন, সব সময়ই চাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট পিঠই তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন। অন্য পিঠে কি আছে, তাহা কোন সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আগেই বলিয়াছি, পণ্ডিতেরা চাঁদের মানচিত্র আঁকিয়াছেন। মানচিত্রে যেখানে যে পর্ব্বত কিংবা সমুদ্র আছে, সেগুলি সর্ব্বদাই যথাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, চাঁদ পিঠ বদলায় না এবং সর্ব্বদা তাহার একই পিঠ আমরা দেখিতে পাই। পৃথিবী যেন জোর করিয়া চাঁদের একটা পিঠ নিজের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চাঁদ যদি এখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকে, তাহা হইলে পুনরায় সেই মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিতে ইহার প্রায় ২৯ দিন ১৩ ঘণ্টা লাগিবে। পণ্ডিতেরা সেইজন্য স্থির করিয়াছেন যে, নিজের মেরুদণ্ডের চারিপাশে ঘুরপাক খাইতে চাঁদের ২৯ দিন ১৩ ঘণ্টা লাগে। সেই কারণেই চাঁদে প্রায় পনেরো দিন দীর্ঘ দিবস ও পনেরো দিন দীর্ঘ রাত্রি হয়। একটি উদাহরণ দিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। তুমি একটি সরু দণ্ড লও। ইহার একপ্রান্তে একটি চাকা শক্ত করিয়া লাগাইয়া দাও এবং অন্য প্রান্তটি তুমি হাতে করিয়া ভাল ভাবে ধরিয়া থাক। তুমি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ঘুরপাক খাইতে থাক এবং সেই সঙ্গে তোমার চারিধারে চাকাটিকেও ঘুরাইতে থাক। তোমার মুখ যখন পশ্চিম দিকে থাকিবে, চাকার যে-পাশটা তুমি দেখিতে পাইতেছ, তাহা তখন পূর্ব্ব দিকে থাকিবে। তুমি যখন দক্ষিণদিকে ফিরিবে, চাকার এই পাশটা তখন উত্তরদিকে ফিরিয়া যাইবে। তুমি যখন পূর্ব্ব দিকে তাকাইবে, চাকার এই মুখটি তখন পশ্চিম দিকে ফিরিবে। তুমি যখন উত্তর দিকে ফিরিবে, তখন চাকার এই পিঠটি দক্ষিণমুখী হইবে। পুনরায় যখন তুমি পশ্চিমে তাকাইবে, তখন চাকার এই পাশটি পুনরায় পূর্ব্বমুখী হইবে। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, যে-সময়ে চাকাটি তোমার চারিধারে একবার ঘুরিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের মেরুদণ্ডের চারিপাশে একবার ঘুরপাক খাইয়াছে। চাঁদের ঠিক এই অবস্থা—চাঁদের এক দিন পৃথিবীর প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিনের সমান।

আরও দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পনেরো দিবসব্যাপী দিনে অনবরত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চাঁদের উপরিতলের (surface) অনেক অংশ খুবই গরম হইয়া উঠে। চাঁদে ত বাষ্প ও বাতাস নাই, সেজন্য যে-সকল জায়গায় পাথর আছে, তাহা শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং কোনও কোনও স্থানে উত্তাপ ২৫৬° ফারন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত হয়। সূর্য্য অস্ত গেলে রাত্রিতে শীঘ্র শীঘ্র এই সকল অংশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। রাত্রিও পনেরো দিবসব্যাপী। কোনও কোনও স্থান এত ঠাণ্ডা হইয়া যায় যে, ইহার উত্তাপ—১০০° ফারন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। ৩২° ফারন্‌হাইট্ উত্তাপেই জল বরফ হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, যখন উত্তাপ—১০০° ফারন্‌হাইটে নামিয়াছে তখন ঠাণ্ডাটা কিরূপ!

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এককালে চাঁদ পৃথিবীর অংশ ছিল। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে বলিব। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার—যদি চাঁদ এককালে পৃথিবীরই অংশ ছিল, তাহা হইলে চাঁদের বাতাস গেল কোথায়? এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও

একমত হইতে পারেন নাই। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে, এককালে চাঁদে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইত সেইজন্য চাঁদে বৃহদাকার অনেক গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে এবং ভিতরকার পাথরগুলি ফাঁপা হইয়া গিয়াছে। এই ফাঁপা পাথরগুলির মধ্যে চাঁদের বাতাস প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া আছে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, চাঁদ যখন পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল, ইহার নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি অনেক কম বলিয়া বাতাসের কণাগুলিকে আর আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না। অল্পে অল্পে বাতাসের কণাগুলি পলাইয়া গিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। এখন আর চাঁদে বাষ্পও নাই, বাতাসও নাই।

অধ্যাপক রাসেল (Russell) আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। তাঁহার মতে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি এত কম যে, চাঁদ পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইয়া যাওয়া মাত্রই নিজের বায়ুমণ্ডলকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তোমরা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে, চাঁদের অপর পৃষ্ঠে কি আছে? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নানারূপ কল্পনা করিয়াছেন। দুই একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ এমনও বলিয়াছেন যে, চাঁদের অপর দিকে জল বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে আছে—এমন কি, সেখানে গাছপালা জন্মে ও জীবজন্তু বাস করে। কিন্তু ইহা সম্ভব নয়, কারণ চাঁদের দুই পার্শ্বেরই প্রাকৃতিক অবস্থা এক প্রকার। অপর দিকেও কেবল উঁচু পাহাড়, জলশূন্য সমুদ্র ও বৃক্ষলতা বিহীন মরুভূমি থাকাই সম্ভব—বাতাসও নাই এবং কোন জন্তুও বাস করিতে বা বাঁচিতে পারে না।

চাঁদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পৃথিবী যখন খুব গরম ছিল তখন তাহার দেহ কোমল ও বাষ্পের আকারে ছিল, সেই অবস্থায় কোনও সময়ে চাঁদ ছিট্‌কাইয়া গিয়া পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। চাঁদ তখন খুব গরম ছিল এবং সেই সময়ে চাঁদ ও পৃথিবীর তাপ সমান ছিল। কিন্তু চাঁদ আকারে ছোট বলিয়াই শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। উনুনে এক বড় ডেক্‌চি ভরা জল ফুটাইয়া লও এবং পরে উনুন নিবাইয়া দাও। এই ডেক্‌চি থেকে এক পেয়ালা গরম জল লইয়া ডেক্‌চির পাশে রাখিয়া দাও। তুমি দেখিবে যে পেয়ালার জল শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং বড় ডেক্‌চির জল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকিবে। চাঁদ ও পৃথিবীর ঠিক এই অবস্থা। পৃথিবী চাঁদের চেয়ে অনেক বড় বলিয়াই ইহার ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লাগিতেছে। চাঁদের বায়বীয় দেহ শীঘ্র শীঘ্র তরল হইয়া জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ইহার বাহিরের আবরণটি জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়া গেল এবং তখনও ইহার ভিতরটা গরম ছিল, সেই সময়ে চাঁদে হাজার হাজার আলামুখী দেখা দিল এবং অনবরতঃ অগ্ন্যু-পাত হইতে লাগিল। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে চাঁদের উপরিভাগে (surface) যে পর্ব্বত-গহ্বর গুলি আগ্নেয়গিরির মুখ (crater) বলিয়া পরিচিত সেইগুলির উৎপত্তি অগ্ন্যুৎপাত হইতে হয় নাই। বড় বড় উল্কাপিণ্ড সবেগে চাঁদের উপর পড়িয়া এই সকল বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকার আরিজোনা (Arizona) প্রদেশে উল্কাপিণ্ডের আঘাতে উৎপন্ন এইরূপ একটি বৃহৎ গহ্বর দেখা যায় আমাদের মনে হয় যে, চাঁদের কোনও কোনও গহ্বরের উৎপত্তির কারণ উল্কাপাত হইতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগ এই সকল পর্ব্বত-গহ্বর অগ্ন্যুৎপাত দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। চাঁদের ভিতরটা যখন গরম ছিল তখন ভিন্ন ভিন্ন অংশে চাপের তারতম্যের জন্যই ঘন ঘন

অগ্ন্যুৎপাত হওত। ক্রমশঃ চাঁদ আরও ঠাণ্ডা হইয়া পৃথিবীর এখনকার যে অবস্থা সেই অবস্থা পাইল। আগেই বলিয়াছি যে, রাসেল সাহেবের মতে চাঁদ পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইবামাত্রই নিজের বাষ্প ও বাতাস হারাইয়া ফেলিল। রাসেল সাহেবের মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে কোনও কালে চাঁদ জীব-জন্তুর বাসের উপযোগী ছিল না—আমাদের কিন্তু মনে হয় চাঁদ অল্পে অল্পে নিজের জল ও বাতাস হারাইয়াছে। তাহা হইলে কোনও এক সময়ে চাঁদের প্রাকৃতিক অবস্থা গাছপালা জন্মিবার ও জীবজন্তু থাকিবার উপযোগী ছিল। অবশেষে চাঁদের ভিতরটাও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া একেবারে জমাট বাঁধিয়া গেল এবং এখানকার অবস্থায় আসিয়া পড়িল। আমরা কিন্তু নিশ্চয়ভাবে বলিতে পারি না যে চাঁদে কোনও প্রাণী কখন বাস করিত কি না এবং সেখানখার সমতল ক্ষেত্রগুলি পৃথিবীর ন্যায় শস্যশ্যামলা ছিল কি না। এখন এই সমতলক্ষেত্রগুলি মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দিনের বেলায় ও রাত্রিতে তাপের বেশী তারতম্য হওয়াতে চাঁদের উপরিভাগের অনেক জায়গা ফাটিয়া গিয়াছে। পৃথিবীরও এককালে এই চাঁদের দশা হইবে।

অধ্যাপক পিকারিং (Pickering) একজন নামজাদা জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। জ্যামাইকার (Jamaica) উপরকার বায়ুমণ্ডল খুব পরিষ্কার বলিয়া তিনি সেইখানে গিয়া দূরবীণ দিয়া চাঁদকে ভাল করে পরীক্ষা করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ঋতু বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের কোনও কোনও অংশের পরিবর্ত্তন ঘটে ইহা তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল জায়গায় গাছপালা জন্মায় বলিয়াই এইরূপ হয়। পিকারিং সাহেবের দেখিতে ভুল হইতে পারে, সত্য সত্যই এই সকল অংশে উদ্ভিদ জন্মায় কি না তাহার কোনও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয়, পিকারিং সাহেবের অনুমান সত্য নয়। চাঁদের এখনকার অবস্থা বৃক্ষলতা জন্মিবার উপযোগী নহে। আর একটি মজার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক গডার্ড (Goddard) সাহেব একটি বড় এবং অতি দ্রুতগামী রকেট (Rocket) নির্ম্মাণ করিয়া চাঁদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক এমনও মতলব আঁটিয়াছেন যে, তাঁহারা মস্তবড় একটা রকেট তৈয়ার করিবেন—এবং এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, যখন রকেট শূন্যে ছুটিবে ইহার গতির বেগ কিংবা মুখ ইচ্ছামত বদলাইতে পারা যাইবে। পৃথিবী থেকে প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগ হিসাবে রকেটটিকে ছোড়া হইবে এবং ইহা গিয়া চাঁদের চাঁদ কিংবা উপগ্রহ হইয়া চাঁদকে কয়েকমাস প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে। এই রকেটটিতে যাত্রী যাবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং এক বৎসরের জল রসদ ও অম্লজানের জোগাড় রাখিতে হইবে। কতদিনে বৈজ্ঞানিকদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা যায় না এবং কোনও কালে হইবে কি না তাহাতেও গভীর সন্দেহ আছে। তোমাদের মধ্যে কি কেহ রকেটে চড়িয়া চন্দ্রলোকের যাত্রী হইতে রাজী আছ?

পরে তোমাদিগকে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের কথাও কিছু বলিব এবং চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য পৃথিবীতে কিরূপে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহাও বলিব।



দুই সওদাগর

সে বহুকালের কথা। এক দেশে দুই সওদাগর থাকৃত। তারা এক সাথে দেশ-বিদেশে ঘুরে বাণিজ্য ক'রে বেড়াত। টাকা পয়সা যা হ'ত, দুই জনে ভাগ ক'রে নিত। এমনি ক'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কেটে যায়।

হঠাৎ পর পর কয়েক সন অজন্মা হ'য়ে দেশে বড় দুর্ভিক্ষ হ'ল। গোলায় ধান নেই, পুকুরে জল শুকিয়ে উঠ্‌ল—লোকে খেতেই পায় না—বাণিজ্য আর কি করে চলে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমন যে ধনী দুই সওদাগর তাদেরও আপনার বলতে আর কিছুই রইল না। তারা অত্যন্ত গরীব হ'য়ে পড়ল। দাসদাসীর যাদের সংখ্যা ছিল না, নানারকম জিনিষে ঘর যাদের সর্ব্বদা ভরা থাকৃত, তাদের এখন শূন্য পুরীতে গা ছম্ ছম্ করে, দুবেলা দুটি খেতে জোটে না।

এম্‌নি কষ্টে দিন যায়। ক্ষুধার জ্বালা ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। একদিন ছোট সওদাগর এসে বড়কে বলে, "ভাই, তিন দিন ধ'রে উপোস ক'রে আছি—চাল হোক্, কড়ি হোক্, যা তোমার ঘরে আছে আমাদের ধার দাও, আমরা খেয়ে বাঁচি।"

বড় সওদাগর মাথায় হাত দিয়ে বলে, "হা অদৃষ্ট, আমাদেরও যে আজ দুদিন ধরে অন্ন নেই, তোমায় কোথা থেকে কি দিই?" ছোট আর কি করে? মুখটি চুণ ক'রে খালি হাতেই ফিরে এল।

এ দিকে হয়েছে কি, বড় সওদাগরের কাছে একখানা রূপোর থালা ছিল। এত কষ্টে পড়েও সে কি জানি কেন সেটিকে খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল, হাত ছাড়া করেনি। ছোট সওদাগরও সে কথা জানত। নিরাশ হ'য়ে সে যখন বাড়ী ফিরে গেল, তখন বড় সওদাগর এসে তার বৌকে ডেকে চুপি চুপি বল্‌লে, "দেখ, আমাদের এই থালাখানার কথা তো ছোট সওদাগর জানে, সে নিশ্চয়ই রাতে এটা চুরি করতে আসবে। তা এক কাজ করা যাক্। থালাখানাতে জল দিয়ে আমাদের মাথার উপর একটা শিকায় টাঙিয়ে রাখি। চুরি করতে এসে থালায় হাত দিলেই আমাদের মুখে জল পড়বে; তখনই আমাদের ঘুমও ভেঙে যাবে। ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে থালাখানা ঝুলিয়ে রেখে তখন তারা দুজনই ঘুমিয়ে পড়ল।

নিশুতি রাত; পশু পাখী সব অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ছোট সওদাগর তো ঘরে ঢুকেছে—থালাখানা নিয়ে যাবে—উপোসের কষ্ট আর সয় না। ভাঙা ঘরের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মিট্‌মিটে তারার আলো দেখা যাচ্ছিল। তাইতেই ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে ছোট সওদাগর ব্যাপারখানা ঠিক্ বুঝতে পারলে। বুদ্ধিতে সেও তো কম যায় না। ধীরে একটি আঙুল থালার উপর রেখেই সে বুঝলে, যে, থালা ভরা জল রয়েছে। মনে মনে হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা, দেখা যাক্ কে কত বাহাদুর!" তারপর করলে কি না এক রাশ বালু নিয়ে এসে আস্তে আস্তে সেই থালায় ঢেলে দিলে। অম্‌নি সমস্ত জল চই ক'রে শুকিয়ে গেল। তখন ধীরে ধীরে থালা নামিয়ে নিয়ে সে

পৃথিবীর ছয়টি উচ্চ পর্ব্বত শিখর



এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফিট)—এশিয়া



কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৭৮ ফিট)—এশিয়া



একাঙ্কাগুয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা—(২২,৮৩৪ ফিট)



কেনিয়া, ব্রিটিশ-পূর্ব-আফ্রিকা, (২০,০০০ ফিট উচ্চ)



পোপোকাটিপিটল, উত্তর-আমেরিকা—(১৭,৪০০ ফিট)



মণ্টব্ল্যাঙ্ক (১৫,৮১০ ফিট)—ইউরোপ

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বড় সওদাগর আর তার বৌ তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ছোট সওদাগর কিন্তু থালাখানা নিয়ে তখনই বাড়ী গেল না। কারণ, এ তো তার জানাই আছে



জলের নীচে পাঁকের মাঝে থালাখানা লুকিয়ে রাখল

যে, থালা না পেলেই বড় সওদাগর আস্‌বে তার বাড়ী খোঁজ করতে! কাছেই ছিল পুকুর, তার জল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে, তারই ভিতর নেমে গিয়ে থালাটিকে সে জলের নীচে পাঁকের মাঝে লুকিয়ে রাখল—সুযোগ পেলেই উঠিয়ে এনে বিক্রী করে দিবে। জায়গাটিতে চিহ্ন রাখবার জন্য জলের ধার থেকে লম্বা একটা ঘাস এনে সেখানে পুঁতে দিলে—যেন জলের মধ্যেই ঘাস হ'য়ে আছে।

পরদিন খুব ভোর বেলায় বড় সওদাগরের তো ঘুম ভেঙেছে। চম্‌কে চোখ চেয়েই দেখে যে, শিকের উপর থালা নেই! তখনি বুঝে নিলে যে, এ ছোট সওদাগরেরই কীর্ত্তি! "আচ্ছা, দেখা যাক্" বলে সে তো বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে পুকুর-ধারে এসে ভাব্‌লে নেয়ে নিবে। জলে নাম্‌তে গিয়ে দেখে—বাঃ, এ তো ভারি মজা! কোথাও কিছু নেই, মাঝপুকুরে শুধু একটি ঘাস হ'য়ে আছে! মনে মনে ভাল ক'রে ভেবে দেখলে,—না, কোথায়, কাল এটাকে এখানে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না! ব্যাপারটা তবে দেখ্‌তেই হচ্ছে। এই ভেবে চিন্তে সে তখনি নেমে সেখানে গেল। গিয়ে একটু এদিক্ ওদিক্ হাত্‌ড়াতেই পাঁকের নীচে থালায় হাত পড়ল। খুসী মনে বড় সওদাগর থালাখানা তুলে নিয়ে কাপড়ে ঢেকে বাড়ী ফিরে এল। শুধু জলের মাঝে ঘাসটি যেখানে ছিল সেইখানেই যেমন ছিল তেম্‌নি দাঁড়িয়ে হাওয়ায় হেল্‌তে দুল্‌তে লাগ্‌ল।

দু'তিন দিন বাদে ছোট সওদাগর এসেছে—থালাখানা তুলে বিক্রী করতে নিয়ে যাবে! নেমে গিয়ে জলের মধ্যে বসে প'ড়ে সে কত খুঁজতে লাগ্‌ল, একবার এদিকের পাঁকে হাত দিচ্ছে, একবার ওদিকের পাঁকে হাত দিচ্ছে। কাদায় জলে তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে গেল, কিন্তু তবু কি তার খোঁজার শেষ হয়! অবশেষে যখন বুঝলে যে থালাখানা সেখানে সত্যি নেই, বড সওদাগর তুলে নিয়ে গিয়েছে, তখন উঠে নেয়ে ধুয়ে নিয়ে বড় সওদাগরের বাড়ী যেয়ে হাঁক দিলে। বড়ও বেরিয়ে এল। তখন তো দুই শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি! তারপর ছোট সওদাগর বল্লে, "ভাই, বুদ্ধিতে দেখছি আমরা কেউই কম নই; দুজনে মিলে একসঙ্গে এতদিন বাণিজ্য করেছি, চল এবার দুজনে মিলে দূরদেশে গিয়ে নূতন রকমে ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্। এবার বুদ্ধির জোরে লোক ঠকিয়ে টাকা-পয়সা উপার্জ্জন ক'রতে হবে। এম্‌নি ক'রে তো দিন আর চল্‌ছে না!"

বড় সওদাগরও দেখলে যে, এ বুদ্ধি মন্দ নয়। সেও তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেল। তারপর দুজন বেরিয়ে পড়ল।

চল্‌তে চল্‌তে অনেক দূরে এক নূতন রাজ্যে তারা যখন এসে পৌছল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। খাবার সন্ধানে বেরিয়ে তাদের মনে হ'তে লাগল, সারা সহরের লোক যেন অত্যন্ত ব্যস্ত। পথে যেতে যেতে তাদের কথাবার্ত্তা খুব মন দিয়ে শুনে দুই বন্ধু বুঝতে পারল যে, সেই সহরের সবচেয়ে ধনী সওদাগর ধনপতি শেঠের আগের দিন রাতে হঠাৎ মৃত্যু হ'য়েছে। সেইদিন সকালে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'বে, তাই সহর জুড়ে সবাই ব্যস্ত। শুন্‌তে শুন্‌তে বড় সওদাগরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ছোট সওদাগরকে ডেকে আড়ালে নিয়ে এসে কি করতে হ'বে তা সব তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে যেখানে ধনপতি শেঠের চিতা জলছিল দুজনে মিলে সেখানে এল। অন্ধকারে বেশ ক'রে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে ছোট সওদাগর তার ভিতর লুকিয়ে রইল। বড় সওদাগর তার উপর পোড়া কাঠ-কুটো এমন

ভাবে সাজিয়ে দিলে যে, বোঝবার আর যো রইল না, সেখানে একটা গর্ত্ত রয়েছে। মনে হ'তে লাগল যেন চিতারই নিভে-যাওয়া আধ-পোড়া কাঠগুলি এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।



এই দেখ দলিল, বাপের ঋণ শোধ কর

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তে বড় সওদাগর তো কতকগুলি কাগজ-পত্র হাতে ধনপতি শেঠের বাড়ী এসে উপস্থিত। এসে তার ছেলেদের বল্লে, "আমি দূরদেশের বিদেশী সওদাগর। তোমাদের বাপ আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। এই দেখ তার দলিল; এব্‌ার তোমরা বাপের ঋণ শোধ কর।" ছেলেরা তাই শুনে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। তারপর বাপের কাগজ-পত্র পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে নিয়ে বল্লে, "কোথায়, কাগজ-পত্রের মধ্যে তো চল্লিশ হাজার টাকার ঋণের কথা কোথাও লেখা নেই।" সে কথা শুনে সওদাগর যেন ভয়ানক বিপদে পড়েছে এমনি ক'রে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তারপর আর কোন উপায়ই যেন নেই এই ভাবে ছেলেদের বল্লে, "আচ্ছা, চল শ্মশানে গিয়ে তোমাদের বাপকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, এ যদি সত্যি ঋণ হয় তবে তিনি স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই জবাব দিবেন। নয় তো আমি ফিরেই যাব।"

তাতে রাজী হ'য়ে লোকজন সাক্ষী ইত্যাদি সব নিয়ে সবাই শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সেখানে গিয়েই বড় সওদাগর চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, ওহে ধনপতি, তুমি যদি সত্যি আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে থাক, তবে স্বর্গ হ'তেও সে-কথা সবার সামনে বল।" প্রথম বার কোন সাড়াশব্দ নেই। সব চুপ্ চাপ্। আবার বড় সওদাগর ডাক্‌লে। এবারও কোন সাড়া নেই। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। কিন্তু তৃতীয় বার ডাকের পরে চিতার ভিতর থেকে মৃদুস্বরে জবাব এল, "এই ঋণ সত্য। এ শোধ না হ'লে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"



এই ঋণ সত্য

ছেলেরা তো একথা শুনে পরম সমাদরে বড় সওদাগরকে ডেকে নিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েই দিলে। সেই সঙ্গে টাকা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাধাও দিয়ে দিলে। বড় সওদাগর বিদায় নিয়ে মহা ফুর্ত্তিতে টাকা নিয়ে গাধার পিঠে চড়ে বস্‌লো। তারপরে গান গাইতে গাইতে বাড়ীর পথ ধ'রে চল্‌ল। ছোট সওদাগরের কথা তার আর একটুও মনে পড়ল না।

এদিকে ছোট সওদাগর সেই গর্তের মধ্যে বসে আছে তো আছেই। বড় সওদাগরের আর দেখাই নেই। শেষকালে ভাবলে, "তাই তো, বড় সওদাগর ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়েনি তো। তার তো ভারি রাগ হ'ল। ভাবলে, "কী? সারারাত শ্মশানে গর্তের ভিতর বসে কষ্ট করলাম আমি, আর টাকার বেলায় বড় সওদাগর একা!" তখনই গর্তের ভিতর থেকে উঠে ছোট সওদাগর হন্ হন্ ক'রে বাড়ীর পথ ধরে চলা সুরু করলে।

কিছুদূর গিয়েই দেখলে ঐ যে সাম্‌নেই বড় সওদাগর গাধার পিঠে টাকার বস্তা চাপিয়ে বেশ ফূর্ত্তিতে চলেছে। অমনি ছোটও চুপি চুপি তার পিছনে চল্‌ল।

খানিক দূর গিয়ে বড় সওদাগর দেখলে, জরীর কাজ করা খুব সুন্দর একটি জুতো রাস্তার উপর পড়ে আছে। কিন্তু টাকা পাওয়ার আনন্দেই মন



ছোট সওদাগর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল

তখন তার ভরে আছে, জুতোর দিকে সে আর তাকিয়েও দেখলে না, চলে গেল। একটু পরেই ছোট সওদাগর সেখানে এসে সেই জুতো দেখতে পেল। অমনি সে এক মতলব এঁটে জুতোটি তুলে নিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে যে একটা সরু রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে তাই ধ'রে ছুটে চল্‌ল। ছুটতে ছুটতে যেখানে সেই মেঠো পথ বড় রাস্তায় এসে মিলেছে সেখানে সে বড় সওদাগরের অনেক আগেই পৌঁছল। তখন সেখানে সেই জুতোটা ফেলে রেখে কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে রইল। এদিকে বড় সওদাগর তো দিব্যি গাধায় চেপে গান গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে চলেছে। হঠাৎ দেখলে সাম্‌নে ঠিক আগেরই মত একপাটি জুতো পড়ে আছে। এবার তার মনে হল "তাইতো, বড় বোকামি হ'য়ে গেছে, ওপাটিও তবে নিয়েই আসা যাক।" এই না ভেবে ঝোপের কাছে গাধাটিকে দাঁড় করিয়ে সে চল্‌ল আর এক পাটির খোঁজে। চোখের আড়াল হতেই ঝোপের ভিতর থেকে ছোট সওদাগর বেরিয়ে এসে টাকার বস্তা পিঠে গাধাটিকে নিয়ে একেবারে নিজের বাড়ীর দিকে প্রস্থান করলে। এদিকে অনর্থক জুতোর খোঁজে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে ফিরে এসে বড় সওদাগর দেখে ঝোপের কাছেও সব শূন্য পড়ে আছে। কোথায় বা গাধা, আর কোথায় বা টাকার বস্তা! বুঝতে দেরী হ'ল না, এ সব ছোট সওদাগরের চালাকি। কি আর করে—ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীকে সব কথা ব'ল্ল। দুজনে মিলে তখন ভাবতে বস্‌ল কি করে এ টাকা ফিরে পাওয়া যায়।

এদিকে ছোট সওদাগর তো টাকা এনে ঘরের মেজেয় পুঁতে রেখে গ্রামের বাইরে এক ভাঙ্গা কূয়োর নীচে গিয়ে লুকিয়ে আছে। ছোট সওদাগরের স্ত্রী রোজ তার খাবার নিয়ে যায়। রোজ দেখে দেখে বড় সওদাগর ভাবতে লাগল, "ভালরে ভাল, রোজ রোজ একই সময়ে ছোট সওদাগরের বৌ একা একা কোথায় যায়? এ দেখতে হচ্ছে।" একদিন সন্ধ্যায় সওদাগরের বৌ যখন খাবার নিয়ে যাচ্ছে, তখন অন্ধকারে লুকিয়ে পা টিপে টিপে বড় সওদাগর তার পিছন নিলে। যেতে যেতে সেই ভাঙ্গা কূয়োর কাছে যেয়ে ব্যাপার দেখে তো সবই বুঝলে। সেদিন আর কিছু না ক'রে চুপ্‌চাপ্ বাড়ী ফিরে এল।

পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়ের কিছুক্ষণ আগে মেয়ে সেজে সব পচা গলা খাবার নিয়ে বড় সওদাগর তো কূয়োর কাছে যেয়ে উপস্থিত। একটা দড়ি ফেলে প্রতিদিনের মত খাবার নামিয়ে দিলে। সেই খাবার মুখে দিয়ে ছোট সওদাগর তো রেগেই আগুন। তখন বড় সওদাগর করলে

কি, মেয়েদের মত গলা ক'রে বল্‌তে লাগল, "আমার কি দোষ, তুমি টাকা দাও না, পয়সা দাও না, আমি মেয়ে মানুষ, কোথা থেকে রোজ রোজ পয়সা জুটিয়ে ভাল খাবার আন্‌ব ?" শুনে তো ছোট সওদাগর আরো চটে উঠ্‌ল। চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "শোবার ঘরের মেঝের নীচে সেদিন যে চল্লিশ হাজার টাকা এনে পুঁতে রাখলুম তাও কি তুই জানিস্‌নে ? সেখান থেকে টাকা তুলে নিতে পারিস্ নি ? কাল থেকে ভাল খাবার না আন্‌লে দেখতে পাবি মজা !"



ছোট সওদাগরের বাড়ী এসে উপস্থিত

বড় সওদাগরকে আর পায় কে ? ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে একেবারে চুপচাপ সেখান থেকে সে সোজা ছোট সওদাগরের বাড়ী এসে উপস্থিত ! এসে দেখে ছোট সওদাগরের বৌ সমস্ত বাড়ী অন্ধকার করে ভাত নিয়ে চলে গিয়েছে। চুপি চুপি মাটী খুঁড়ে সব টাকা তুলে নিয়ে বড় সওদাগর বাড়ী এসে বৌ-এর কাছে হাজির হ'ল। তারপর দুজনে মনের আনন্দে খুব হাসলে।

হাসি থাম্‌লে বড় সওদাগর স্ত্রীকে বল্‌লে, "দেখ এখনি তো ছোট সওদাগর আসবে খোঁজ করতে। তা কিছু একটা তো করতে হয়। এক কাজ করা যাক্। আমি মরার মত শুয়ে থাকি, আর তুমি খুব চীৎকার ক'রে কাঁদ। আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় আমি ভাণ করব যেন আমায় ভূতে পেয়েছে। সবাই তখন আমায় ফেলে পালিয়ে যাবে। তারপরে দুপুর রাতে চুপি চুপি ফিরে এসে টাকার থলে নিয়ে তুমি আর আমি, অন্য দেশে পালিয়ে যাব।" এই ঠিক ক'রে বড় সওদাগরকে কাপড় চাপা দিয়ে তার স্ত্রী চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল।

এখন ছোট সওদাগরের কি হ'ল দেখা যাক্। বড় সওদাগর চলে আসার কিছুক্ষণ পরে যখন সত্যি সত্যি তার স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে হাজির হ'ল, তখন তো তার চক্ষুস্থির ! ব্যাপার সবই বুঝতে পেরে কুয়ো থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে দেখলে, যা ভেবেছে ঠিক তাই ! সব শূন্য পড়ে আছে। দুজনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, এমন সময় শুনলে পাশের বাড়ীতে ভীষণ কান্নার রোল উঠল। ব্যাপার কি দেখতে দুজনেই ছুটে গেল। গিয়ে দেখে বড় সওদাগর শুয়ে আছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চাদরে ঢাকা, আর পাশে বসে তার স্ত্রী খুব চীৎকার ক'রে কাঁদছে। প্রতিবেশীরা চারধারে দাঁড়িয়ে কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে, কেউ বা শ্মশানে নিয়ে যাবার যোগাড় করছে। ছোট সওদাগর কিছু না বলে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে কারো কাছে কিছু না বলে একেবারে শ্মশানে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড গাছের উপর লুকিয়ে বসে রইল। সে তো জানে যে, এ সবই চালাকি।

এদিকে প্রতিবেশীরা সবাই মিলে তো বড় সওদাগরকে শ্মশানে এনে নামিয়েছে, এমনি সময় বাঁধনের ভিতর থেকে বড় সওদাগর বিকট সুরে চীৎকার ক'রে উঠেছে। তাই শুনে ভূতে পেয়েছে ভেবে আর কি কেউ সেখানে দাঁড়ায় ! তখন কে কত আগে পালাবে সেই চেষ্টাই চল্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্মশান আবার শূন্য পড়ে রইল। চারিধারে কেবল অন্ধকার আর শেয়াল-কুকুরের চীৎকার।

ছোট সওদাগর খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে আসবে, এম্‌নি সময়ে দূরে অনেক পায়ের শব্দ শুন্‌লে। তখন সে আবার চুপ চাপ নিজের জায়গায় বসে রইলো।

এখন হয়েছে কি, সাত চোর চলেছে চুরি করতে—কিছুদূর যেতেই অন্ধকারে কি যেন পায়ে ঠেক্‌ল। ভাল ক'রে দেখে বুঝলে মড়া প'ড়ে আছে। তখন তাদের সর্দ্দার বল্লে, "ভাই, পথে মড়া দেখ্‌তে পাওয়া বড় ভাল। আজ যদি আমাদের কাজ ভাল ক'রে শেষ করতে পারি, তাহ'লে ফিরে এসে একে কিছু ভাগ দিব।" এই বলে তারা চলে গেল। বড় আর ছোট সওদাগর যে যেমন ছিল, তেম্‌নিই রইল। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল। চারধার নিঝুম, কেবল সেই ফাঁকা শ্মশানের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে দুই একটা পাখী উড়ে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড় আর ছোট সওদাগর অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। অপেক্ষা করে করে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, এমন সময় চোরেরা ফিরে এল—সঙ্গে তাদের চৌদ্দ ঘড়া মোহর। মোহরের ঘড়া নামিয়ে রেখে কাণা সর্দ্দার বল্লে, "দাঁড়া ভাই, একটা মজা করছি।" এই না বলে খানিক দুর্গন্ধ নোঙরা জল বড় সওদাগরের মুখে ঢেলে দিয়েছে। বড় সওদাগর তো সে জল মুখে যেতেই ভয়ানক ভাবে কাশ্‌তে সুরু করে দিয়েছে। সেই সুযোগে গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে ছোট সওদাগর বিকট স্বরে চীৎকার করে উঠেছে, "ধর্‌, ধর্‌, পিছনের গুলো ছেড়ে দিয়ে আগে সামনেরটার ঘাড় ভাঙ্গ!" এই না দেখে এবং শুনে চোরেরা কি আর সেখানে দাঁড়ায়! ঘাড় ভাঙ্গার ভয়ে চোখ বুঁজে যে যেদিকে পারলো মোহরের ঘড়া ফেলে দৌড়োলো। তখন আর কি! ছোট সওদাগরও গাছ থেকে নেমে এল, বড় সওদাগরও গা ঝেড়ে উঠে বস্‌ল। একজন আর একজনকে বল্লে, "ভাই এতকাল মিথ্যে একজন আর একজনকে ঠকাতে



চোরেরা যে যেদিকে পারলে দৌড়োলো

গিয়ে কষ্ট পেলুম। চল এবার দুজনে মিলে কাজ করব।" এই বলে মোহরের ঘড়া তুলে বাড়ী ফিরে এল। তারপর সব টাকাকড়ি সমান ভাগ ক'রে নিয়ে দুজন মহাসুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

চিল্‌নী-মা

(পূর্ব্ববাংলার রূপকথা)

—১—

এক রাজা। রাজার দুই রাণী। কোন রাণীরই ছেলেপিলে হয় না—রাজার মনেও শান্তি নাই, রাণীদের মনেও শান্তি নাই।

রাজা যাগ করেন, যজ্ঞ করেন, রাণীরা বারমাসে তের ব্রত করেন, কিছুতেই কিছু হয় না! একদিন পূর্ণিমার রাতে ছোটরাণী হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন—রাজবাড়ীর অন্দরমহলে দুধপুকুরের মাঝখানে সাদা-ধব্‌ধবে একটা পদ্ম ফুল ফুটিয়া আছে; সেই ফুল তুলিয়া আনিয়া তিনি বাটিয়া খাইয়াছেন, আর কোলে পাইয়াছেন দিব্য-ফুটফুটে একটি রাজকন্যা। সেই রাজকন্যার নাকের নিঃশ্বাসে জলপদ্মের গন্ধ, তার গায়ে দুধে-আলতা মিশানো স্থল-পদ্মের রং আর কালো-কুচ্‌কুচে দুই ভুরুর মাঝে শ্বেত-পদ্মের একটি টিপ্‌।

স্বপ্ন দেখিয়াই ছোটরাণী তড়াক্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া খিড়্কির দরজা খুলিয়া দুধ-পুকুরের পাড়ে ছুটিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন—সত্য-সত্যই দুধপুকুরের মাঝখানে সাদা-ধব্‌ধবে একটা পদ্মফুল! পদ্মফুল দেখিয়া ছোট রাণীর আর তর্ সয় না—জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুধ-পুকুরের মাঝখানে গিয়া পদ্মফুলটি তুলিয়া আনিলেন।



দুধপুকুরের পাড়ে ছুটিয়া গেলেন

তারপর রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া ফুলটি বাটিয়া খাইয়া শুইয়া রহিলেন।

—২—

দিনের পর দিন যায়, কিছুদিন যাইতে না যাইতে ছোটরাণীর মনে আনন্দ ধরে না—স্বপ্নের ফল বুঝি সত্য হইল। বড়রাণী আড়-চোখে ছোট-রাণীর দিকে চান, আর মনের হিংসায় জলিতে থাকেন—হায় হায়, ছোটর কপাল হইল বড়, আর বড় হইয়াও তাঁর মান বুঝি আর থাকে না!

বড়রাণী দিনরাত নিজের দাসী বাঁদীর সঙ্গে যুক্তি করেন, রাজবাড়ীর ধাইকে ডাকাইয়া আনিয়া কানে কানে কথা কন। দশমাস দশদিনের দিন বড়রাণী আঁতুড় ঘরের পিছনে লুকাইয়া রহিলেন। আঁতুড়-ঘরে যাই-না ছোটরাণীর মেয়ে হইয়াছে, অম্‌নি ধাই পিছন দিক দিয়া তাঁহাকে বড়রাণীর হাতে দিলেন আর ছোট-রাণীর কোলের কাছে রাখিয়া দিলেন একটা বিড়ালছানা। রাজবাড়ীর কেহই জানিতে পারিল না—ব্যাপার কি হইল; ছোটরাণীও বুঝিতে পারিলেন না—কেন এমন হইল।



ধাই মেয়েকে বড়রাণীর হাতে দিলেন

বড়রাণী রাজকন্যাকে রাজবাড়ীর ত্রিসীমানাও রাখিলেন না—নতুন হাঁড়ির ভিতর শোয়াইয়া নতুন সরা মুখে চাপা দিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

হাঁড়ির ভিতরে রাজকন্যা নদীর জলে ভাসিয়া চলিয়াছেন। নদীর ঢেউয়ে হাঁড়িতে যখন দোলন লাগে, রাজকন্যা কাঁদিয়া উঠেন। নদীর পাড়ে বটগাছের মাথায় এক শঙ্খচিলের বাসা। শঙ্খ চিল বাসায় বসিয়া শোনে হাঁড়ির ভিতর মানুষের কান্নার শব্দ। শঙ্খচিল শোঁ করিয়া উড়িয়া আসিয়া হাঁড়ির উপর বসিল। তারপর ঠোঁট দিয়া হাঁড়ির

মুখের সরা সরাইয়া দেখে—দিব্য-সুন্দর ফুটফুটে এক রাজকন্যা! শঙ্খচিল রাজকন্যাকে মুখে করিয়া বটগাছের মাথায় লইয়া গেল।

রাজকন্যা শঙ্খচিলের বাসায় থাকেন, শঙ্খচিলের পিঠে চড়িয়া নীচে নামিয়া আসেন, আর শঙ্খচিল যখন চরিতে যায়, তিনি তখন নদীর পারে বসিয়া খেলা করেন। শঙ্খচিল এদেশে যায়, ওদেশে যায়, রাজকন্যার জন্য ঠোঁটে করিয়া রাজ্যের জিনিষ লইয়া আসে। রাজকন্যার সাজ-সজ্জার, খাবার-দাবারের দুঃখ নাই,—দিনে দিনে রাজকন্যা শঙ্খ-চিলের বাসায় বাড়িয়া উঠেন।

—৪—

একদিন সেই নদী দিয়া সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া এক সদাগর চলিয়াছেন। সদাগর ডিঙ্গায় বসিয়া জলপদ্মের গন্ধ পান। নদীর জলে পদ্ম ফুল কোথায়? সদাগর এদিকে চান, ওদিকে চান, নদীর পাড়ে নজর পড়িতে দেখেন—যেন থোকা-বাঁধা পদ্মফুলের রাশ! কিন্তু কেমনই বা এই পদ্ম-ফুল?—হাওয়ায় যে পদ্ম দোল খায়, তাহা বোঁটার সঙ্গেই নড়ে-চড়ে। এ যে দেখি চলন্ত পদ্ম!—এদিকে যায়, ওদিকে যায়, কোনোখানেই স্থির নাই! সাত ডিঙ্গা কূলে ভিড়াইয়া সদাগর নদীর পাড়ে উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন—

চলন্ত পদ্মই বটে,—এ কোন্ পদ্মফুল!—
চক্ষে কভু পড়ে নাই রে এমন রূপের তুল!

চোখে পলক পড়ে না, সদাগর একদৃষ্টে রাজকন্যার দিকে তাকাইয়া ভাবেন—এ কি স্বর্গের অপ্সরী!

সদাগর ডিঙ্গা লাগাইয়া নদীর পাড়ে সাত দিন রহিলেন। রাজকন্যাকে না পাইলে তিনি দেশে ফিরিবেন না। সদাগর শঙ্খচিলকে ধরিয়া পড়িলেন—তিনি রাজকন্যাকে বিয়ে করিতে চান। শঙ্খচিল ভাবিল—বিয়ের বয়স হইয়াছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় ক্ষতি কি। রাজকন্যা শঙ্খচিলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'চিলনী-মা, তোমার কোলে আমি এত বড় হইয়াছি, এখন আবার কাহার কাছে যাইব! তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।' শঙ্খচিল রাজকন্যাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া রাজী করিল। রাজী হইয়া রাজকন্যা বলিলেন—'বেশ, আমি সদাগরের সঙ্গে যাইব। কিন্তু যে ঘরে আমি থাকিব সেই ঘরের সঙ্গে আর চিলনী-মায়ের বাসায় একগাছা সুতা বাঁধিয়া দিতে হইবে। আমি সেই সুতায় তিনবার নাড়া দিয়া যখনই বলিব—

সুতাগাছটি নড়েচড়ে,
চিলনী-মা আমার উড়িয়া পড়ে!

তখনই কিন্তু চিলনী-মায়ের দেখা পাওয়া চাই।'



এ যে দেখি চলন্ত পদ্ম!

শঙ্খচিল বলিল—'আচ্ছা।' সদাগরও বলিল—'আচ্ছা।'

ইহার পর সদাগর রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া চলিলেন।

দেশে গিয়া সদাগর রাজকন্যার কথামত তাঁর শোবার ঘরে আর শঙ্খচিলের বাসায় একগাছা সুতা বাঁধিয়া দিলেন।

—৫—

সদাগর এখন হইতে দিনরাত রাজকন্যার ঘরেই থাকেন,—ব্যবসা-বাণিজ্যে আর মন নাই। ছেলের কাণ্ড দেখিয়া সদাগরের মা ভাবিয়া অস্থির—এমন

হইলে ঘর-সংসার চলে কি করিয়া! সদাগরের মা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিলেন—বৌকে যদি ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত রাখা যায়, তাহা হইলেই ছেলের মনও কাজকর্ম্মের দিকে ফিরিয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়া সদাগরের মা ফরমাসের উপর ফরমাস দিয়া রাজকন্যাকে দিনরাত খাটাইবার ফন্দি করিলেন।

আজন্ম পাখীর বাসায় মানুষ,—রাজকন্যা এত ফাই-ফরমাস খাটেন, সাধ্য কি! তার উপর কাজকর্ম্মেরই বা তিনি জানেন কি! সদাগরের মা আগের দিন শোবার আগে পরের দিনের রাজ্যের কাজের ফরমাস করিয়া রাখেন। রাজকন্যা ঘরে গিয়া শঙ্খচিলের বাসায় বাঁধা সুতা গাছা ধরিয়া তিন তিনবার নাড়া দিয়া বলেন—

'সুতাগাছটি নড়েচড়ে
চিল্‌নী-মা আমার উড়িয়া পড়ে!'

অমনি শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতে উড়িতে শঙ্খচিল তাঁর কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজকন্যা শঙ্খচিলের কাছে কাঁদিয়া বলেন—'চিল্‌নী-মা, আমি তো কাজকর্ম্ম কিছুই জানি না। এখন উপায়?" শঙ্খচিল বলে—'ভয় কি! আমিই সব করিয়া দিতেছি।'—এই বলিয়া শঙ্খচিল রাজকন্যার সমস্ত কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পরের দিন সদাগরের মা উঠিয়া দেখেন—কোন কাজই বাকী নাই।

কিন্তু দিনের পর দিন এই রকম হয়, অথচ ছেলে-বৌ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে—দেখিয়া সদাগরের মায়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি রাজকন্যার ঘরের পিছনে লুকাইয়া রহিলেন, আর সেখানে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন—রাজকন্যা আর শঙ্খচিলের কাণ্ড। তারপর ঘরে ফিরিয়া গিয়া তিনি মনে মনে আর এক ফন্দি আঁটিয়া রাখিলেন।

ইহার পর একদিন সদাগর বাইরে গিয়াছেন, আর রাজকন্যা নাইতে গিয়াছেন, সেই সুযোগে সদাগরের মা চুপে চুপে রাজকন্যার ঘরে গিয়া সুতা ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন—

'সুতাগাছটি নড়েচড়ে'
চিল্‌নী-মা আমার উড়িয়া পড়ে!'

অমনি শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতে উড়িতে শঙ্খচিল রাজকন্যার ঘরে আসিয়া হাজির। সদাগরের মাও তখনই খপ্ করিয়া শঙ্খচিলকে ধরিয়া ফেলিলেন। তার পর তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া মাংস রাঁধিয়া রাখিলেন।

দুপুরবেলা রাজকন্যা খাইতে বসিয়াছেন, সদাগরের মা বাটি ভরিয়া মাংস আনিয়া তাঁর পাতের কাছে দিলেন। রাজকন্যা হাতের গ্রাস মুখে তুলিবেন, মাংসের গন্ধ নাকে যাইতেই



শঙ্খচিল তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়

চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তাঁর পাতের ভাত পাতে পড়িয়া রহিল। রাজকন্যা কাঁদিতে লাগিলেন—

'একি খাইতে দিলেন, ঠাক্‌রুণ,—এমন খাবার
কেমনে আজ খাই?—

পাতের কাছে কেন আমার চিল্‌নী-মায়ের
গায়ের গন্ধ পাই!'

রাজকন্যার আর খাওয়া হইল না,—ছুটিয়া তিনি ঘরে গিয়া সুতা ধরিয়া তিন তিনবার নাড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—

'সুতাগাছটি নড়েচড়ে,
চিল্‌নী-মা আমার উড়িয়া পড়ে!"

কিন্তু, কই, সূতা ধরিয়া যতই নাড়েন, শঙ্খচিল তো আসে না! রাজকন্যা এদিকে চান, ওদিকে চান, দেখেন, ঘর-ভরা শঙ্খচিলের পালক। পালক দেখিয়া রাজকন্যার বুঝিবার কিছুই বাকী রহিল না। পালকগুলি গুছাইয়া বুকে তুলিয়া লইয়া তিনি আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।



আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

সদাগর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রা· এইভাবে দেখিয়া অস্থির।

ওরে, এই যে রাখিয়া গেলাম
অজা পদ্মের কলি,
কোন্ কালো-ঝড় আসিল রে—
পড়িয়াছে ঢলি!

সদাগর রাজকন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

— ৬ —

সেই হইতে রাজকন্যা ভূঁইয়ে পড়িয়াই আছেন—নানও না, খানও না; সদাগর কিছু বলিতে চাহিলে ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠেন, বলেন—'চিল্‌নী-মাকে আমার আনিয়া দাও, নইলে এ প্রাণ রাখিব না।' রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে সদাগরেরও নাওয়া-খাওয়া বন্ধ।

সদাগরের মা দেখিলেন—এ যে বিপদের উপর বিপদ হইল! ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য না করুক্, প্রাণের তো ভয় নাই। এখন যে, বৌয়ের সঙ্গে ছেলেও না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে!

ছেলের মায়ায় মায়ের মনে সোয়াস্তি নাই। সদাগরের মা দেবতার দুয়ারে গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া রহিলেন—দেবতা দয়া না করেন তো সেইখানে শুকাইয়া মরিয়া থাকিবেন।

মানুষের মনের কথা দেবতার জানিতে দেরী হয় না। সদাগরের মায়ের মনের কথা জানিতে পারিয়া দেবতার দয়া হইল। তিনদিনের দিন সদাগরের মা স্বপ্ন পাইলেন—দুইমাসের পথের পর এক রাজপুরী আছে; সেখানে সাদা-ধব্‌ধবে দুধের রঙের জল, এক দুধপুকুর আছে; শঙ্খচিলের পালক লইয়া রাজকন্যা সেই পুকুরে পূর্ণিমার রাতে নাইয়া উঠেন তো শঙ্খচিল জীয়ন্ত হইয়া উঠিবে।

স্বপ্ন পাইয়া সদাগরের মা স্বপ্নের কথা ছেলেকে আর ছেলের বৌকে বলিলেন। সদাগর তখন রাজকন্যাকে লইয়া দুধপুকুরের খোঁজে চলিলেন।

নদীর জলে ছল্‌ছল্ করিয়া সদাগরের ডিঙ্গা চলিল। ডিঙ্গার মাঝি-মাল্লারা পথের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে—'সাদা-ধব্‌ধবে দুধের রঙের জল এমন দুধপুকুর আছে যে রাজবাড়িতে তাহা কি তোমরা চেন?' পথের লোকেরা কেউ বলে—'উঁহু'; কেউ বলে—'হুঁ'। যে হুঁ বলিল, তার নিকট হইতে পথ-ঘাট চিনিয়া লইয়া ডিঙ্গা চালাইতে চালাইতে মাঝি-মাল্লারা দুইমাস পরে রাজবাড়ির ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে আসিয়া সবাই শোনে রাজবাড়ির অন্দরমহলে সত্যই এক দুধপুকুর আছে, আর তার জলও দুধের মতই সাদা।

দুধপুকুরের খোঁজ তো মিলিল; উহাতে নাইতে হইলে রাজবাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া চাই, আর নাইতেও হইবে পূর্ণিমার রাতে;—সদাগরের ডিঙ্গা রাজবাড়ির ঘাটেই বাঁধা র'হল। পূর্ণিমার রাতে সদাগরকে ডিঙ্গায় রাখিয়া রাজকন্যা দুধপুকুরে নাইতে রাজবাড়ির অন্দরমহলে চলিলেন।

কোথাকার কোন্ বিদেশী দুধপুকুরে নাইতে আসিয়াছে, রাজপুরীতে আগেই সে কথা রটিয়া

গিয়'ছে। রাজপুরীর লোকজনেরা সন্ধ্যা হইতেই দুধপুকুরের পাড়ে সার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজকন্যা পুকুরের ঘাটে পা দিতেই জল-পদ্মের গন্ধে চারিদিক ম'—ম'। তার উপর তাঁহাকে দেখিয়াও সবাই অবাক্—কে এই স্বর্গের অপ্সরী, গায়ে দুধে-আলতা-মিশানো স্থল-পদ্মের রং, আর কালো-কুচ্‌কুচে দুই ভুরুর মাঝে শ্বেতপদ্মের একটি টিপ্।

ছোট রাণীর দাসী ছোট রাণীর মহলে দৌড়াইয়া গিয়া খবর দিল—'রাণী-মা, স্বর্গের কোন্ অপ্সরী যেন দুধপুকুরে নাইতে আসিয়াছে! সে পুকুরের ঘাটে পা দিতেই জলপদ্মের গন্ধে চারিদিক ম'-ম'। তার উপর তার গায়ে দুধে-আল্‌তা-মিশানো স্থলপদ্মের রং, আর কালো-কুচকুচে দুই ভুরুর মাঝে শ্বেত-পদ্মের একটি টিপ।'

দাসীর কথা শুনিয়া ছোটরাণী চম্‌কাইয়া উঠিলেন। ছ্যাং করিয়া স্বপ্নের কথা তাঁর মনে



কার ঝিয়ার তুমি, বাছা?

পড়িল। দুধপুকুরের পদ্মফুল বাটিয়া খাইয়া তাঁর যে-রাজকন্যাকে পাওয়ার কথা ছিল, এতদিনে সেই আসিল নাকি! ছোটরাণী দুধপুকুরের ঘাটের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু চোখের দেখা দেখিয়াই মনের ধাঁধা ঘোচে কই? ছোটরাণী রাজকন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কার ঝিয়ারি তুমি, বাছা!
কোথা তোমার ঘর?
কাদের কুলের বৌ গো তুমি?
কেবা তোমার বর?'

রাজকন্যা উত্তর করিলেন—

'কার ঝিয়ারি নাহি জানি,
সদাগর মোর স্বামী।
জন্ম হ'তে চিল্‌নী-মায়ের
কোলে মানুষ আমি।'

'চিলনী-মায়ের কোলে মানুষ!'—ছোটরাণী বলিলেন—'সে কি?'

রাজকন্যা ছোট রাণীকে তাঁর চিল্‌নী-মায়ের কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

ছোট রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সে চিল্‌নী-মা কোথায় থাকে?'

রাজকন্যা শঙ্খ-চিলের পালকগুলি ছোট রাণীকে দেখাইয়া বলিলেন—'চিল্‌নী মা-মারা গিয়াছে। এই তার পালক। ইহার জন্যই দুধপুকুরে নাইতে আসিয়াছি। পূর্ণিমার রাতে দুধপুকুরে এই পালক লইয়া নাইলে চিল্‌নী-মা আমার বাঁচিয়া উঠিবে।'

ইহার পর ছোটরাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন—শঙ্খচিল আগে বাঁচিয়া উঠুক। তারপর আর যে কথা আছে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

—৭—

শঙ্খচিলের পালক লইয়া রাজকন্যা দুধপুকুরের জলে নামিলেন। দুধপুকুরের জল পালকে লাগিতেই শঙ্খচিল বাঁচিয়া উঠিল। শঙ্খচিলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাজকন্যা পাড়ে উঠিলেন। ছোটরাণী তখন আদর করিয়া রাজকন্যাকে ডাকিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন।

রাজকন্যাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে গিয়া ছোটরাণী শঙ্খচিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যযুগের পাখী তুমি, শঙ্খচিল,—সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার

কোলে মানুষ এই যে কন্যা, ইহাকে তুমি কোথায় পাইয়াছ।'

শঙ্খচিল বলিল—'নদীতে ইহাকে পাইয়াছি। নতুন সরা ঢাকা নতুন হাঁড়ির ভিতর ভাসিয়া যাইতেছিল, কান্না শুনিয়া ইহাকে আমার বাসায় লইয়া গিয়াছিলাম।'

ছোটরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে কত বছর হইল?'

শঙ্খচিল রাজকন্যার বয়স গণিয়া বছরের হিসাব দিল।

বছরের হিসাব পাইয়া ছোটরাণীর আর ধৈর্য্য ধরিতেছিল না। দাসীর দিকে ফিরিয়া তিনি হুকুম দিলেন—'রাজবাড়ীর ধাইকে এখনই ডাক দেখি।'

রাজবাড়ীর ধাই বুড়ামানুষ। ছোটরাণীর হুকুম পাইয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে তখনই রাজ-বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল।

ছোটরাণী ধাইকে বলিলেন—'ধাই, তুমি রাজ-বাড়ীর তিনপুরুষের ধাই-মা। সত্য করিয়া বল দেখি —মানুষের পেটে বিড়াল-ছানা হইতে দেখিয়াছ?'

কোন্ সময়ের কি মনে করিয়া ছোটরাণী এ কথা বলেন, বুড়া বয়সে ধাইয়ের কি অত খেয়াল আছে। ফোকলা মুখে হাসিয়া সে জবাব দিল—'তাহা কি কখনও হয়, রাণী-মা!'

ছোটরাণী রাজকন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন—'তবে বল দেখি এখন সত্য করিয়া—জন্মের সময় ইহাকে তুমি দেখিয়াছিলে কি না।'

ধাই রাজকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—তাই তো! ছোটরাণীর আঁতুড়-ঘরে এই রকমই তো রাজকন্যা জন্মিয়াছিল!—এই রকমই তো গায়ে দুধে-আল্‌তা-মিশানো স্থলপদ্মের রং, আর কালো কুচ্‌কুচে দুই ভুরুর মাঝে শ্বেতপদ্মের একটি টিপ্! তার উপর·· তার উপর আবার··· ধাই জলপদ্মের গন্ধ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিল—এ কে! কিন্তু মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলার জো কি আছে! ধাইয়ের মুখে কথা সরিল না, মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোট রাণীর বুকে তখন মায়ের স্নেহের ঝড় উঠিয়াছে। ধাইয়ের জবাব না পাইয়া ধাইয়ের কাছে তিনি আগাইয়া গেলেন; তারপর নিজের হাতে তার হাত দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'বল, ধাই, বল, একবার মুখের কথা বল—এই কন্যাই আমার আঁতুড়-ঘরে জন্মিয়াছিল কি না। তোমাকে আমার এই গলার হার দিতেছি—তুমি একবার শুধু বল, হাঁ।' বলিয়া ছোটরাণী গলার হার খুলিয়া সত্যসত্যই ধাইয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন।



ছোটরাণী গলার হার খুলিয়া ধাইয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন

ধাইয়ের মনে কি হইল, কে জানে? সে দুই একবার ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলিল—'রাণী-মা, অভয় পাই তো বলি—এই রাজকন্যাই আপনার আঁতুড়-ঘরে জন্মিয়াছিলেন।'

—'তার পর?'

—'তারপর যাহা, বড়-রাণী মা জানেন। শুনিয়াছি, নতুন হাঁড়িতে শোওয়াইয়া নতুন সরা মুখে দিয়া রাজকন্যাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।'

ধাইয়ের মুখের কথা শেষ না-হইতেই ছোটরাণী পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া রাজকন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

—৮—

সুখের খবর হাওয়ায় ছোটে। রাজকন্যাকে দেখিতে দুপুর রাতেই রাজ্যের লোক রাজবাড়ীতে ছুটিয়া আসিল। রাজা আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা!

কিছুক্ষণ পরে রাজা বড়রাণীকে তলব দিয়া শোনেন—রাজপুরীতে তাঁর খোঁজ নাই; রাতারাতি কোথায় তিনি পলাইয়া গিয়াছেন।

রাজকন্যা সদাগরের স্ত্রী হইয়াছেন, সদাগর রাজার জামাই হইলেন। বুড়া রাজার পর রাজ্যের রাজা তিনিই হইবেন, ঠিক হইল।

ছোটরাণী দুধপুকুরের চারিপাড় সোনায় বাঁধাইয়া দিলেন—এই দুধপুকুরের দৌলতেই তিনি রাজকন্যাকে পেটে ধরিয়াছিলেন, আবার ইহারই দৌলতে তাঁর হারানো কন্যা লাভ হইল। রাজকন্যা শঙ্খচিলের জন্য বানাইয়া দিলেন একটা সোনার বটগাছ—সেই বটগাছে শঙ্খচিলের বাসা হইল।



রাজকন্যা একশবার ডাকেন—চিল্‌নী মা! রাজকন্যা সোনার বটগাছের কাছে যাইয়া দিনের মধ্যে একশবার ডাকেন—চিল্‌নী মা!

চাঁদ সূর্য্যের দেশে

(চীন পুরাণের গল্প)

সে অতি সত্যিযুগের কথা। একদিন চীন-সম্রাট ইয়াও তাঁর রাজধানীর পথে পথে ঘুরে রাজ্যের অবস্থা দেখে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। এক হাতে তার প্রকাণ্ড এক ধনুক, আর এক হাতে তার মস্ত বড় তীর; এসে বল্লে, "আমার নাম চী-চিয়াং। পৃথিবীতে আমার মত ওস্তাদ্ তীরন্দাজ আর নেই। এ ছাড়া আরো একটা কাজ আমি পারি। হাওয়ার বুকে ভেসে আমি যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারি।" সম্রাট ইয়াও তাকে পরীক্ষা করবার জন্য বল্‌লেন—"আচ্ছা, ঐ যে সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আর তারই চুড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি গাছ—যেন নীল আকাশের গায়ে একটি সরু কাল রেখা—ঐখানে যদি তোমার তীর যায় তবেই বুঝব তুমি বাহাদুর!", বলতে বলতেই শন্ শন্ ক'রে তীর ছুটল, আর সঙ্গে সঙ্গে চী-চিয়াংও হাওয়ায় উড়ে চল্‌ল—যেন আকাশের কোলে একটি পাখী ভেসে চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে যখন তীর নিয়ে সে ফিরে এল, তখন তো সবাই অবাক্! খুসি হয়ে রাজা তার নাম দিলেন "শেন-ই"—কি না "স্বর্গের

তীরন্দাজ।" আর তাকে খুব বড় পদ দিলেন। শেন্-ই শুধুই ফুলের মধু খেত আর রাজার পাশে পাশে থাকত।

ক্রমে যত দিন যেতে লাগল, শেন্ ই তার অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়ে সবাইকে ততই অবাক ক'রে দিতে লাগল। যুদ্ধ ক'রে ঝড়ের দেবতাকে হারিয়ে দিয়ে সমস্ত চীন দেশকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচালো। অদ্ভুত আকারের নয়টা পাখী যখন মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের ক'রে সমস্ত দেশ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, তখন শেন-ই গিয়ে তাদের শাস্তি দিলে। আবার যখন কিছুদিন বাদে কোথা থেকে প্রবল বন্যা এসে সমস্ত চীন-দেশ ভাসিয়ে দিয়ে গেল, তখন শেন-ই গিয়ে জলের দেব্তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তার ছোট বোন হেঙ্-হোকে নিয়ে বাড়ী এল। মহাসমারোহে চীন-সম্রা'ট্ তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। আরো যে কত কি পুরস্কার দিলেন তা কি আর গোণা যায়?

একদিন দুপুর রাতে ঘুম ভেঙে সম্রাট্ ইয়াও দেখলেন, হীরের হারের মত ঝলমলে একটি আলোর রেখা যেন পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে এসে দূরে আর এক প্রান্তের পাহাড়ের গায়ে মিশিয়ে গিয়েছে। কি হয়েছে, জানবার জন্য তখুনি রাজা শেন-ইকে পাঠালেন। শেন-ই গিয়ে সেই পাহাড়ের দেবী চীন-মুর প্রাসাদে উপস্থিত। গিয়ে শুন্‌লেন দেবীর মেয়ে সেই আলোর রাস্তা বেয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। যা হোক দেবী শেন্-ইর পরিচয় শুনে তাকে আদর করে ডেকে বসিয়ে বল্লেন, তাঁকে একটি প্রাসাদ তৈরী ক'রে দিতে। চমৎকার একটি প্রাসাদ তৈরী ক'রে দেবীকে খুসী করে দিয়ে তাঁর বদলে শেন্-ই তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিলে অমৃত—যা খেলে লোক অমর হয়। কিন্তু দেবী তাকে বলে দিলেন যে, এক বছরের আগে তাঁর দেওয়া এই অমৃত খেলে কোন ফল হবে না। শেন-ই বাড়ী এসে সেটাকে লুকিয়ে রেখে আর একটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে দূর দেশে চলে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বছর কেটে গেল। একদিন শেন্-ইর স্ত্রী হেঙ্-হো দেখতে পেলে যে, ঘরের এক কোণে একটুখানি জায়গা থেকে যেন জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে, আর সমস্ত বাড়ী যেন ফুলের সুগন্ধে ছেয়ে গিয়েছে। অবাক্ হয়ে সেইখানটিতে গিয়ে সে সেই অমৃত দেখতে পেয়ে তাই তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। অমনি তাঁর মনে হ'ল যে সমস্ত শরীর যেন দেখতে দেখতে তুলোর মত হাল্কা হ'য়ে গেল—যেন ইচ্ছে করলেই সে এক্ষুনি উড়ে যেতে পারে। এমনি সময় শেন্-ই বাড়ী ফিরে এল। এসে অমৃত খুঁজে না পেয়ে হেঙ্-হোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় তার লুকানো অমৃত-ভাণ্ড? সব শুনে হেঙ্-হো ভয় পেয়ে তখনি জানালা খুলে উড়ে পালিয়ে গেল। শেন্-ই রেগে তীর-ধনু নিয়ে তার পিছনে ছুটল।



হেঙ্-হো ভয় পেয়ে জানালা খুলে উড়ে পালিয়ে গেল

পূর্ণিমার রাত। ফুটফুটে পরিষ্কার চারিধার! তারি মাঝে শেন্-ই দেখতে পেলে যে হেঙ্-হো চাঁদের দিকে উড়ে যেতে যেতে ক্রমে ছোট হ'য়ে হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছুটে সে তাকে ধরতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া এসে তাকে, মাটিতে ফেলে দিলে—যেন শুক্‌নো পাতা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ল।

এদিকে হেঙ্-হো তো উড়তে উড়তে চাঁদে এসে উপস্থিত—প্রকাণ্ড দেশ—চারধারে জমাট্

বরফ কাঁচের মত ঝক্ ঝক্ করছে। গাছপালা আর কোন-কিছু নেই—শুধু দারচিনির গাছ চারধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উড়ে উড়ে সে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তাই শিশিরের জল দিয়ে তেষ্টা মিটিয়ে দারচিনি খেয়ে সে বিশ্রাম ক'রে নিলে। তারপর চাঁদের দেবী হ'য়ে সেখানেই রয়ে গেল।

এদিকে ঝোড়ো হাওয়া শেন-ইকে তুলে যে পর্ব্বতের উপর দেবতাদের রাজা থাকেন সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে দেবরাজ তাকে বললেন, "হেঙ্-হো ভুল করে অমৃত খেয়ে অমর হয়েছে বলে তুমি তার উপর রাগ ক'রো না। সে চাঁদের দেশে গিয়ে চাঁদের দেবতা হয়ে র'য়েছে। তোমার কাজের পুরস্কার তুমি পাবে। তুমি হবে সূর্য্যের দেবতা। তোমার ইচ্ছে হ'লেই তুমি গিয়ে হেঙ্-হোকে দেখে আসতে পারবে, কিন্তু হেঙ্-হো তোমার কাছে আসতে পারবে না।

তখন খুসী হ'য়ে শেন্-ই সূর্য্যের দেশে গিয়ে সূর্য্যের দেবতা হয়ে রইল। কিন্তু হেঙ্-হোর কথা সে ভুললে না। একদিন আলোর রথে চড়ে সে চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড সেই বরফের দেশে জন-মানব-হীন জায়গায় একটি গাছের নীচেয় হেঙ্-হো চুপ্‌টি ক'রে একাএকা বসে আছে—মুখখানি তার শুক্‌নো। শেন্-ইকে দেখেই সে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। শেন্-ই কিন্তু মিষ্টি কথায় তার ভয় ভাঙ্গিয়ে দিলে; আর তাকে খুব সুন্দর একটি প্রাসাদ তৈরী ক'রে দিলে। বল্লে, প্রতি মাসে একবার করে এসে সে হেঙ্-হোকে দেখে যাবে। হেঙ্-হোর বিষণ্ণ মুখখানি খুসীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সেদিন থেকেই চাঁদ সূর্য্যের কাছে আলো পায়। সূর্য্য যখন চাঁদের কাছে আস্‌বার জন্য যাত্রা ক'রে তখনই ধীরে ধীরে চাঁদের মুখখানি হাসিতে ভ'রে ওঠে। তার সেই হাসির আভা জ্যোৎস্না হ'য়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, তারও মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে যায়। আবার যখন সূর্য্য ধীরে ধীরে তার নিজের দেশে চলে যায়, তখন চাঁদের মুখের



শেন্-ইকে দেখেই সে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল

দীপ্তিটুকু ক্রমে ক্রমে ম্লান হ'য়ে একেবারে নিবে যায়। এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা।



আলো


৩৫০ পৃষ্ঠার পর

যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা সূর্য্যাস্তের পরও সূর্য্যকে দেখা সম্ভব কি না, তখন নিশ্চয়ই তোমরা এ প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দিবে; কিন্তু যতই প্রলাপের মত শুনিতে হউক না কেন, ইহা অতি সত্য যে, আমরা সূর্য্যকে নিত্যই তাঁহার প্রকৃত উদয়ের পূর্ব্বে ও প্রকৃত অস্ত যাইবার পরেও কিছুক্ষণের জন্য দেখিয়া থাকি। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় তাহা এইবার শোন। তোমরা পূর্ব্বেই শিখিয়াছ যে, ঘনত্ব যেমন যেমন বেশী হয়, আলোক-রশ্মির তির্য্যকত্ব-প্রাপ্তিও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলে। এই তত্ত্বটি মনে করিয়া রাখিও; তাহা হইলে ব্যাপারটি বুঝিতে কঠিন লাগিবে না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বায়ুর একটা স্তর আছে ইহা তোমরা জান—ইহাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বলে। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবী হইতে যত দূর চলিয়া গিয়াছে তত লঘু হইয়া গিয়াছে। এয়ারোপ্লেনে বা পাহাড়ে উঠিলে বায়ুর এই হাল্কা হইয়া যাওয়া বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাহাড়ে গিয়াছ সেখানকার পাহাড়ের লঘুতার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সঞ্চয় করিয়াছ। এই লঘুতার কারণ পাহাড়ের উচ্চতা। বায়ুমণ্ডল পাহাড় ছাড়াইয়া আরও বহুদূর উঠিয়া গিয়াছে—অতএব বুঝিতেই পারিতেছ ইহার গুরুত্বও ধীরে ধীরে কমিয়া কমিয়া শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলের উপরিতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত ইহার ঘনত্ব সর্ব্বত্র একরূপ নাই—ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে নামিয়া আসিয়াছে। এরূপ বস্তুর ভিতর দিয়া যদি আলোক-রশ্মি চলিতে চায় তাহা হইলে প্রতি পদেই তাহাকে তির্য্যকত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং তাহার পথ বক্র হইয়া পড়িবে। সূর্য্যাস্ত মানে, সূর্য্যের দিক্‌-চক্র-রেখার নীচে নামিয়া যাওয়া। কিন্তু দিক্‌-চক্র-রেখার উপর দিয়া যে রশ্মি চলিয়া যাইতেছে এবং যাহার সাধারণভাবে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িয়া সূর্য্যকে দৃশ্যমান করিবার কোনও শক্তি নাই—তাহা বায়ুমণ্ডলের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থার জন্য বাঁকিয়া গিয়া সূর্য্যাস্তের পরেও পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কাজে কাজেই দিক্‌-চক্র-রেখার নীচে থাকিলেও সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্যোদয়ের সময়ও এই কারণেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সূর্য্য বর্ত্তমান থাকে। অতএব তোমরা যখন সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য কর, প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যোদয় তাহার পরে ও সূর্য্যাস্ত তাহার পূর্ব্বেই হইয়া যায়।

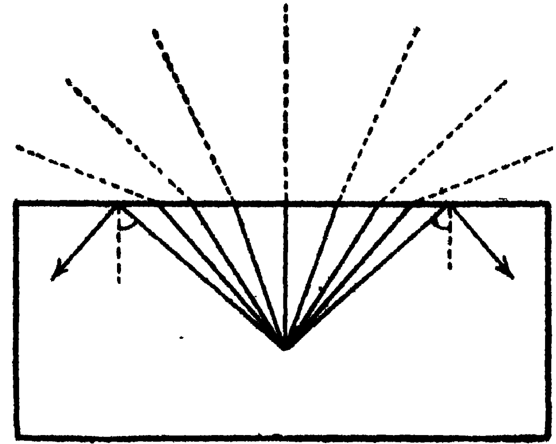
রাতের আকাশে নক্ষত্র দেখিলে তোমাদের মনে সাধারণতঃ এই প্রশ্নের উদয় হয় যে তাহারা

মিট্ মিট্ করে কেন? মিট্ মিট্ করার অর্থ ইহাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া। উজ্জ্বলতার এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার কারণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ভূমিসংলগ্ন ইহার নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে কমিয়া গিয়াছে। এই সুক্রমিকভাবে হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শীত ও উষ্ণ বাতাসের স্রোতের সংমিশ্রণের ফলে কোথাও কোথাও অকস্মাৎ ইহার ঘনত্বের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এই বিপর্য্যস্ত স্তর পার হইবার কালে বাতাসের ঘনত্বের বিভিন্নতা হেতু নক্ষত্র হইতে আগত আলোক-রশ্মিগুলির কোনটা একদিকে আবার কোনটা অপরদিকে তির্য্যকতা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে বায়ুর এই বিপর্য্যস্ত স্তরটি পার হইবার পর রশ্মিগুলি স্থানে স্থানে একত্রীভূত হইয়া পড়ে। রশ্মি একত্রীভূত হইতেছে এরূপ কোনও স্থানে আমাদের চোখ যদি বর্ত্তমান থাকে তবে আমরা নক্ষত্রটিকে উজ্জ্বল হইতে দেখিব, অপর পক্ষে যেখানে রশ্মি আসে নাই বা কম আসিয়াছে এরূপ স্থানে থাকিলে সেখানে নক্ষত্রটি হয়ত দেখা যাইবে না অথবা অনুজ্জ্বলভাবে লক্ষিত হইবে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর বাতাসের বিপর্য্যস্ত স্তরটি এক জায়গায় কখনও স্থির থাকিতে পারে না—তাহার সৃষ্টি, সঞ্চরণ ইত্যাদি সব কিছুই বায়ুর স্রোতের উপর নির্ভর করে। তাই রশ্মিগুলির ও সব সময় একই স্থানে একত্রীভূত হইতে পায় না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, নক্ষত্রটি একবার উজ্জ্বল হইয়া ওঠে এবং পরক্ষণেই তাহার উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়—এইরূপ অনবরত হইতেছে—এবং এই কারণেই নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিতে থাকে।

তোমরা মৃগতৃষ্ণিকার নাম শুনিয়াছ। মরুভূমিতে যাহারা ভ্রমণ করে, কখনও কখনও তাহাদের এক বিষম বিপদে পড়িতে হয়। তৃষ্ণায় আর্ত্ত হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে করিতে কখনও কখনও তাহারা দূরে বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পায় এবং সেই দিকে আগাইয়া যায়। তাহারা যতই অগ্রসর হউক না কেন শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই জলাশয়ের নিকট পৌছিতে পারে না—অবশেষে পরিশ্রান্ত অবস্থায় দেখিতে পায় যে, সমুদ্রবৎ জলাশয় শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। কত যাত্রীকে এইরূপ মরুভূমির মায়ায় পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহারও মূলে রহিয়াছে ঘনত্বের বিভিন্নতা হেতু আলোক-রশ্মির তির্য্যকতা প্রাপ্তি।

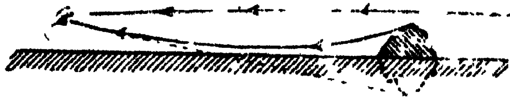
মৃগতৃষ্ণিকার কারণটি ঠিক করিয়া বলিতে হইলে আলোক-রশ্মির তির্য্যকতা-প্রাপ্তির ব্যাপারটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলিতে হয়। তোমরা জান যে, কোনও ঘন বস্তু হইতে লঘু বস্তুতে যাইতে হইলে রশ্মির পথ ঊর্দ্ধরেখা হইতে দূরে সরিয়া যায়। এখন ঘন বস্তু দিয়া চলিবার সময় আলোকরশ্মি যে পথ করিয়া লইয়াছে তাহা যদি ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধরেখাটি হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তির্য্যকরশ্মিও সঙ্গে সঙ্গে আরও দূরে সরিয়া যাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সীমাতলের উপর দিয়া নিজের পথ করিয়া লইবে। ইহার পরেও যদি প্রথম রশ্মিটিকে আরও দূর দিয়া যাইতে দেওয়া হয়



আলোক-রশ্মির তির্য্যকতা-প্রাপ্তি

তখন কি হইবে? বুঝিতেই পারিতেছ যে, এই রশ্মিটি হইতে ঊর্দ্ধরেখার নিকটতর রশ্মি মহত্তম তির্য্যকতা অগ্রেই পাইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার আর তির্য্যকতা পাইবার (refracted হইবার) কোনও সম্ভাবনা নাই। এরূপ অবস্থায় দুইটি বস্তুর সীমাতলটি রশ্মিটির নিকট দর্পণের ন্যায় হইয়া উঠে এবং রশ্মিটি ঘন বস্তুটির ভিতরেই পরাবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঘন বস্তু হইতে লঘু বস্তুতে আলোক যাইবার কালে প্রথম রশ্মিটির এক অবস্থায় তাহার তির্য্যকতা-প্রাপ্তির অক্ষমতার জন্য পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া ব্যাপারটিই হইল মৃগতৃষ্ণিকার প্রধান কারণ। এইটি যদি ঠিক ধরিতে পার, তবে পরে যাহা বলিতেছি তাহা তোমরা ঠিক মত বুঝিতে পারিবে।

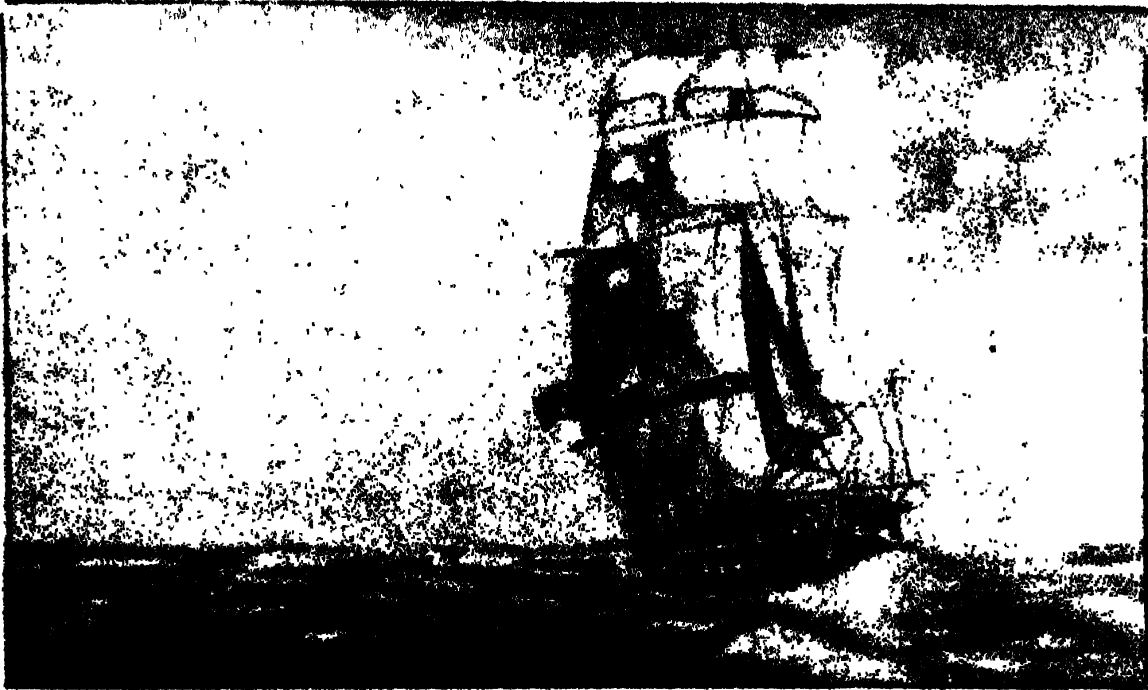
বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ক্রমে ক্রমে উপর দিকে কমিতে কমিতে উঠিয়া গিয়াছে ইহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। মরুভূমির দিগন্তপ্রসারিত শ্বেতবর্ণের বালুকাময় পৃষ্ঠে মেঘবাষ্পহীন আকাশ হইতে প্রখর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া তাহাকে দারুণ উত্তপ্ত করিয়া তুলে। এই অসম্ভব উত্তাপের সংস্পর্শে আসার ফলে বালুকা-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের কিছু অংশও উত্তপ্ত হয় বলিয়া এই অংশের ঘনত্বও স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক কমিয়া যায়। এই লঘু স্তরের ভিতর দিয়া রশ্মিগুলি মাটির দিকে যাইবার সময় কিছুক্ষণ ত তির্য্যকতা প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিতে থাকে এবং



রশ্মিগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে

অবশেষে এমন এক অবস্থায় পৌছায় যখন ইহাদের পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আসিয়া পড়িবে। একটি ত সাধারণ রশ্মি—যাহা অব্যাহত ভাবে সরল পথে তাহার নিকট আসিতেছে এবং অপরটি—যাহা গুরু হইতে লঘুভার স্তরের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া স্তরটির লঘুতার এক বিশেষ অবস্থার জন্য স্তরটির দ্বারা পূর্ণ পরাবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, পদার্থটিকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিবিম্বও দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তৃত স্থানে এরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া জলাশয়ের দ্বারা উৎপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে হওয়া আমাদের অভিজ্ঞতায় নাই বলিয়া দৃশ্যটী বৃহৎ জলাশয়ের দ্বারাই প্রতিবিম্বিত হইতেছে বলিয়া ধারণা করিয়া লই।

আলোকের তির্য্যকতা প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতির মধ্যে এ জাতীয় নানা প্রকার দৃষ্টি-বিভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। সবগুলিকে অবশ্য মৃগতৃষ্ণিকা নাম দেওয়া চলে না, কারণ ইহাদের বেশীর ভাগই বিস্তৃত



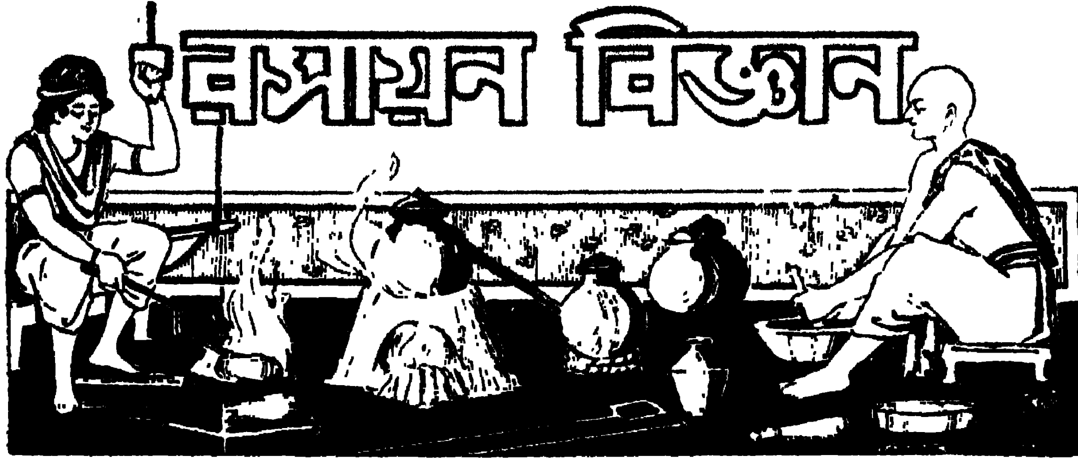
সমুদ্র-বক্ষে পালের জাহাজ

তখন তাহাদের আবার উপর দিকে উঠিয়া আসিতে হয়। এ অবস্থায় যদি কেহ দূরস্থিত কোনও পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করে তবে তাহার চোখে সেই পদার্থ হইতে আগত দুই প্রকার রশ্মি জলভাগের উপরেই ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে একটির বিবরণ তোমাদিগকে দিতেছি। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে করিয়া যাইবার কালে কখন কখন আকাশে উল্টা হইয়া জাহাজ ভাসিয়া যাইতে দেখা

যায়। কখনও বা আবার আকাশের মধ্যেই স্থলভাগ, তটভূমি ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়া উঠে। প্রাচীনকালে নাবিকদের ও যাত্রীদের হৃদয়ে এই সব অলৌকিক ব্যাপারে আতঙ্কের সঞ্চার হইত। আকাশের স্তরে স্তরে নানারূপ বাতাসের স্রোত অনবরত বহিতেছে। কিন্তু কখন কখন কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে আকাশের কোন উচ্চস্তরে অত্যন্ত তপ্ত বাতাস অনেকটা স্থান জুড়িয়া হঠাৎ যদি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে সব রশ্মি এই তপ্ত স্তরটা ভেদ করিয়া উপর দিকে চলিতে চায় তাহাদের অনেকগুলি তপ্ত হওয়ার দরুণ এই স্তরের ঘনত্ব অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় শেষপর্য্যন্ত তির্য্যকতা প্রাপ্ত হয় না এবং পূর্ণরূপে পরাবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আসে। দর্পণ দ্বারা কোন বস্তু পরাবর্ত্তিত হইলে যেমন দর্পণের মধ্যেই সেই বস্তুটিকে উল্টা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি এই স্তরটির দ্বারা পরাবর্ত্তিত হইবার পর যে বস্তু হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া এরূপ অবস্থা পাইয়াছে সেই বস্তুটি এই স্তরটির মধ্যে উল্টা হইয়া যেন আকাশে ঝুলিয়া আছে এরূপ অবস্থায় দৃষ্ট হইবে। ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডের নিকটতম স্থানের নাম ডোভার। একবার ডোভারের সমুদ্রতটের লোকগুলি আকাশে হঠাৎ ফ্রান্সের সমুদ্রতট ও সেখানে বাঁধা জাহাজগুলি উল্টা অবস্থায় আকাশে চিত্রিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি যে, বাতাস হইতে কাঁচের ঘনত্ব অধিক বলিয়া বাতাসের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিবার পর যখন আলোক-রশ্মি কাঁচের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন ইহার পথ বাঁকিয়া যায়। কাঁচের এই গুণ থাকাতে আমাদের কত যে সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাচের নানারকম পরকলা (lens) তৈয়ার করিয়া লোকে নানান্ কাজে লাগাইয়াছে। ভাগ্যদোষে যাঁহাদের চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছে তাঁহারা কাঁচের চশমা পরিয়া আর অসুবিধা ভোগ করেন না। দূরবীণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার করিতে অন্ততঃ দুইখানি করিয়া কাঁচের পরকলার দরকার হয়। দূরবীণের সাহায্যে আমরা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। অণুবীক্ষণ দিয়া আমরা অতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরার মুখে কাঁচের পরকলা থাকে। একদিক্ হইতে আলোক-রশ্মি আসিয়া যখন এই পরকলায় প্রবিষ্ট হয়, তখন ইহার পথটি বাঁকিয়া যায়। আবার যখন পরকলা ছাড়িয়া আলোক-রশ্মি বাহিরে আসে তখন ইহার পথটি পুনরায় বাঁকিয়া যায়। যদি পরকলার এক পিঠ সমতল ও অন্য পিঠ কুব্জ (Convex) কিম্বা উভয় পিঠই কুব্জ হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, আলোক-রশ্মিগুলি পরকলা হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর একত্র বা কেন্দ্রীভূত (Convergent) হইবার চেষ্টা করে। যদি পরকলার এক পার্শ্ব সমতল এবং অন্য পার্শ্ব নতোদর (Concave) বা রাঁধিবার কড়ার ভিতরের পিঠের ন্যায় হয় কিম্বা উভয় পার্শ্বই নতোদর হয়, তাহা হইলে আলোক-রশ্মিগুলি পরকলা হইতে বাহিরে আসিবার পর আরও ছড়াইয়া (Devergent) যায়। এইরূপ ছড়াইয়া পড়ায় যে সকল রশ্মি দূরের জিনিষ হইতে আসিতেছিল, মনে হয় যেন সেইগুলি নিকট হইতে আসিতেছে। যাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ এবং যাঁহারা দূরের জিনিষ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পান না, তাঁহাদের চশমার জন্য এইরূপ নতোদর পরকলা ব্যবহার করিতে হয়। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা দিয়া যদি কোন জিনিষকে দেখা যায় তাহা হইলে মনে হয় যেন সেই জিনিষটা আরও পিছনে, আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে।

দূরে সরিয়া যাইবার দরুণ ইহার আকারটাও আরও বড় হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার এই বিশেষ গুণ যে, ইহা ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়। বুড়া মানুষের চশমার জন্য এইরূপ পরকলাই ব্যবহার করিতে হয়। আর এক প্রকার কাঁচের পরকলা তৈয়ার করিতে পারা যায়—যাহার একপার্শ্ব নতোদর এবং অপর পার্শ্ব কুব্জপৃষ্ঠ। এরূপ পরকলার কোন কোনটা আলোক-রশ্মিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং কোন কোনটা রশ্মিগুলিকে আরও ছড়াইয়া দেয়। যে পরকলার অক্ষের (axis) উপর অংশটাই সবচেয়ে বেশী মোটা তাহার আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার ক্ষমতা আছে এবং যে পরকলার অক্ষের উপর অংশটা সবচেয়ে বেশী পাতলা উহা রশ্মিগুলিকে আরও ছড়াইয়া দেয়।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হিন্দু রসায়ন

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের লোকেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেন। আমরা পুরাতন হাতেব লেখা পুঁথি হইতে তাহা জানিতে পারি।

পৃথিবীর সবদেশেই বর্ত্তমানকালে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে রসায়ন-বিজ্ঞান ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা আমরা ভাল করিয়া জানিতাম না। হিন্দু রসায়নের প্রাচীনতা, হিন্দু রসায়নের ইতিহাস ও বিশেষত্ব আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' প্রকাশিত হইবার পর পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। আমরা হিন্দু রসায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্ব্বে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দেব (১২৬৮ বাঙ্গলা) আগষ্ট মাসের ২রা তারিখে খুলনা জেলার রাড়ুলি নামক একটি ছোট গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি যেমন পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ইংরাজী সাহিত্যের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যোৎসাহী হরিশ্চন্দ্র নিজ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের ঐ বিদ্যালয়েই হইয়াছিল। গ্রামের পড়া শেষ হইলে পর তাঁহার পিতা ছেলেদের শিক্ষা যাহাতে আরও বেশী ভাল হয় সেজন্য তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিবার পর প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ারস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এ সময়ে তাঁহার পড়ার দিকে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। হেয়ারস্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় দুই বৎসর স্কুলে পড়িতে পারেন নাই। সেই দুই বৎসর কাল তিনি বাড়ীতে বসিয়া নিজের চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা ইংরাজী, ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষা শিখিয়াছিলেন। এ সময় হইতেই তাঁহার ইতিহাসের উপর একটা আন্তরিক আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়িয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' লিখিবার সময় তাঁহার এই ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে অনেক সাহায্য হইয়াছিল।

সুস্থ হইবার পরে প্রফুল্লচন্দ্র এলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। বি, এ পড়ার সময়েই গিলক্রাইষ্ট (Gilchrist) বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত গমন করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাম্র, লৌহ, নিকেল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া এক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে—প্রফুল্লচন্দ্র এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার গবেষণার বিবরণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এডিনবরা রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভার কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ডি, এস, সি উপাধি এবং হোপ্ (Hope Prize) নামক পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ সেখানকার রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে অধ্যাপনা দ্বারা তিনি অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন, তাঁহার অনেক ছাত্র বর্ত্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে পালিত প্রফেসারের পদে বরণ করিয়াছিলেন।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পরেই তাঁহার ছাত্র-জীবন শেষ হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—তিনি আজীবন ছাত্র; ছাত্রাবস্থার কখনও শেষ হয় না। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, এখনও তিনি প্রতিদিন দুইঘণ্টাকাল নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করেন। এই সময় সত্য সত্যই ধ্যানরত তাপসের মত তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। এই দুই ঘণ্টাকাল প্রফুল্লচন্দ্র নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠ করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ এই যে, "জ্ঞান কেবল কতকগুলি বইয়ের মধ্যেই পুঞ্জীভূত নহে। স্কুল-কলেজের নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্ঞানের দৃষ্টিপথ বাড়াইতে হইবে, সব কিছুরই যথাসাধ্য চর্চ্চা করিতে হইবে।" তাঁহার নিজের জীবনে এই জ্ঞানানুশীলনের দিকটা অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

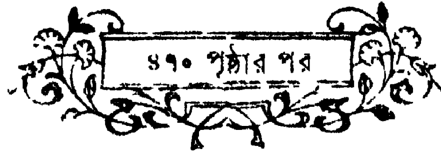
ইঁহার প্রণীত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ ভারতবাসীর গৌরবের জিনিষ। বিভিন্ন যুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রে হিন্দুরা কতটা উন্নত ছিল, ঐ ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কথা বলিব।

বেঙ্গল কেমিকেল নামক বিরাট ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। সামান্য আটশত টাকা মূলধন দ্বারা উহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঔষধালয় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারাও যে আমাদের দেশের লোকেরা অর্থলাভ করিতে পারেন—ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলস্বরূপ সামান্য ৮০০ আটশত টাকা মূলধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিকেল এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনে পরিণত হইয়াছে। "দেশের সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম"—প্রফুল্লচন্দ্র এখন ভারতের সর্ব্বত্র এই পুণ্যমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।



ভারতবর্ষ

মগধের অভ্যুদয়



আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বুদ্ধের সময়ের কিছু পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে ষোলটি বড় বড় রাজ্য বা 'মহাজনপদ' ছিল। মানচিত্রে এই দেশগুলির অবস্থান দেখ। দেশগুলির পরিচয়ও এখানে দেওয়া গেল। এই গুলির মধ্যে চারটি রাজ্য ধীরে ধীরে খুব প্রভাবশালী হইয়া উঠে; অবন্তি, বৎস, কোসল ও মগধ। বুদ্ধের মৃত্যুর দু'তিন শত বৎসরের মধ্যে মগধ ক্ষমতায় অন্য দেশগুলিকে ছাড়াইয়া উঠে এবং মগধের রাজগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়া পড়েন। এই সময় সুদূর দক্ষিণের অবস্থা কিরূপ ছিল, বলা যায় না। বাঙ্গলাদেশের নামও বিশেষ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী দেশের নাম ছিল বৎস, রাজধানী কৌশাম্বী। এই নগরে পাণ্ডবদের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। বুদ্ধের সময়ে এই নগরে রাজা ছিলেন উদয়ন। উদয়ন বড় আরামপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন, রাজকার্য্য বড় একটা দেখিতেন না। যৌগন্ধরায়ণ নামে তাঁহার এক বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজ্যের সব কাজ দেখিতেন।

আজকাল আমরা যে দেশকে মধ্যভারত (Central India) বা মালোয়া বলি, পুরাকালে তাহার নাম ছিল অবন্তি, রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। কৌশাম্বীতে যখন উদয়ন রাজা ছিলেন, তখন উজ্জয়িনীতে প্রদ্যোত-মহাসেন নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। শুনা যায়, প্রদ্যোত নাকি বড় রাগী ও নিষ্ঠুর লোক ছিলেন, সেইজন্য লোকে তাঁহাকে চণ্ডপ্রদ্যোত বলিত। তাঁহার গোপালক ও পালক নামে দুই পুত্র ও বাসবদত্তা নামে এক কন্যা ছিল। প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল যে, বৎসরাজ উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ দেন। এই প্রস্তাব করিয়া তিনি উদয়নের নিকট লোক পাঠান, কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রদ্যোত কিন্তু সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি উদয়নকে ধরিবার জন্য

এক ফাঁদ পাতিলেন। উদয়নের হাতী শিকার করিবার বড় সখ ছিল। প্রদ্যোত এক ছদ্মবেশী লোককে দিয়া উদয়নের নিকট খবর পাঠান যে, অমুক বনে অনেক হাতী আসিয়াছে। উদয়ন যখন হাতী ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করেন, তখন প্রদ্যোতের সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া উজ্জয়িনীতে লইয়া যায়। প্রদ্যোত তাঁহাকে অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া বাসবদত্তার নিকট রাখিয়া দেন। উদয়ন নিজের বন্দী অবস্থা ভুলিয়া শত্রুগৃহে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন।

এদিকে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ নিজের প্রভুর বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন এবং ভিক্ষুকের বেশে প্রদ্যোতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। তিনি উদয়নকে পলাইতে উপদেশ দেন; কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা যৌগন্ধরায়ণ উদয়ন ও বাসবদত্তা দু'জনকে লইয়া কৌশাম্বীতে পলাইয়া আসেন। প্রদ্যোত প্রথম প্রথম একটু রাগ করিলেও পরে উদয়নকে ক্ষমা করেন ও উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহে সম্মতি দেন। সংস্কৃত ও পালি অনেক গ্রন্থে উদয়ন ও বাসবদত্তার এই গল্প নানারূপ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতের লোকের কাছে ইহা খুবই প্রিয় গল্প ছিল। ইহার সকল অংশ সত্য কিনা বলা যায় না, তবে প্রধান ঘটনাগুলি যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদয়ন ও প্রদ্যোত দু'জনেই বুদ্ধের সময়কার লোক। শোনা যায় যে, উদয়ন চন্দনকাঠের একটি চমৎকার বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করান। প্রদ্যোতের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই কথার সত্যতা অনেকে সন্দেহ করেন, কারণ কোনো প্রাচীনগ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।

এই সময় কোসলদেশে (বর্ত্তমান আউধ) প্রসেনজিৎ নামে রাজা ছিলেন। মানচিত্রে দেখ, ইহার রাজত্বের উত্তরে ছিল শাক্যদের দেশ, এই শাক্যদের বংশে বুদ্ধের জন্ম হয়। মনে হয়, বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন প্রসেনজিতের অধীন ছিলেন। কোসলের পূর্ব্বদিকে কাশীরাজ্যও প্রসেনজিতের বশে ছিল। প্রসেনজিৎ বৌদ্ধদের অনুগ্রহ করিতেন ও বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসের জন্য কয়েকটি বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের উপরও তিনি সদয় ছিলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পুত্র বিডূডভ বিদ্রোহ করে। সেই-কারণে তিনি সাহায্যের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রুর নিকট পলাইয়া যান। কিন্তু মগধের রাজধানীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রসেনজিতের সমসাময়িক লোক ছিলেন। বৌদ্ধগণ বলেন যে, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধের মৃত্যু খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দে হইয়াছিল, সুতরাং অজাতশত্রু খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯১ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। বৌদ্ধগণের মতে অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন; সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল ৫৪৩ হইতে ৪৯১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। বিম্বিসার প্রসেনজিতের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার ভগিনী কোসলাদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহে যৌতুক স্বরূপ বিম্বিসার কাশীরাজ্য পাইয়াছিলেন। পরে বিম্বিসার অঙ্গদেশের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপে কাশী ও অঙ্গ অধিকৃত হওয়াতে বিম্বিসারের রাজত্ব

ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাজনপদের মানচিত্র

এই মানচিত্রে প্রাচীন ভারতের মহাজনপদগুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের কতখানি প্রভেদ ঘটিয়াছে এবং কোন্ কোন্ প্রদেশের নামের পরিবর্ত্তনও কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই প্রাচীন মানচিত্রের সহিত বর্ত্তমান মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

অনেক বাড়িয়া গেল। বুদ্ধ বিম্বিসারের বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার রাজধানী গিরিব্রজে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরও বিম্বিসারের রাজত্বে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। জৈনদের ধর্ম্মগ্রন্থে বিম্বিসারের নাম শ্রেণিক ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর নাম কুণিক।

পালিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজাতশত্রু পিতার মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। পিতৃ-ঘাতককে কাশীরাজ্য ভোগ করিতে দেওয়া উচিত নয়, এই ভাবিয়া কোসলরাজ প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর নিকট হইতে কাশীরাজ্য কাড়িয়া লন। কিন্তু অজাতশত্রু বিনা যুদ্ধে কাশী ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। এইরূপে মগধ ও কোসলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক বৎসর যুদ্ধ

চলিতে থাকে, কখন বা অজাতশত্রুর জয় হইত, কখন বা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে হারাইয়া দিতেন। অবশেষে দুই রাজার মধ্যে সন্ধি হইল, ফলে কাশীরাজ্য মগধের অধিকারে আসিল।

অজাতশত্রু বৈশালীর অধিবাসী বৃজ্জি-গণকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করেন। কথিত আছে, ষোল বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে। অবশেষে অজাতশত্রু কৌশলে বৈশালী অধিকার করিয়া লন। এইরূপে বিম্বিসারের সময় অঙ্গ এবং অজাতশত্রুর সময় কাশী ও বৈশালী অধিকৃত হওয়াতে মগধসাম্রাজ্য বেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজাতশত্রু রাজা হইবার কিছু দিন পরে পিতৃহত্যার জন্য অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে প্রকৃত অনুতপ্ত দেখিয়া ক্ষমা করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উদয়ী (৪৫৯ হইতে ৪৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ) রাজা হন। তিনি গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নামে এক বিরাট নগর স্থাপিত করেন। বহুশত বৎসর ধরিয়া এই নগর সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ইহার অন্য নাম ছিল কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। গ্রীকগণ ইহাকে পালিবোথ্রা (পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ) বলিয়া জানিতেন।

উদয়ীর বহু বৎসর পরে মগধে শিশুনাগ নামে এক রাজা হন (৪১১—৩৯৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ)। রাজা হইবার পূর্ব্বে তিনি কাশীরাজ্যে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। পরে মগধের রাজাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিয়া বাহু-বলে সিংহাসন অধিকার করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শিশুনাগ বিম্বি-সারের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অবন্তীরাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপে মগধ অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজ্য হইয়া পড়ে।

শিশুনাগের দুই তিন পুরুষ পরে মগধে মহাপদ্ম নন্দ নামে এক প্রবল রাজা হন। অত্যন্ত নীচবংশে সম্ভবতঃ নাপিতের ঘরে, ইহার জন্ম হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু ইহার মত পরাক্রান্ত রাজা ভারতে খুব কমই হইয়াছেন। তাঁহার একটি প্রকাণ্ড সেনা ছিল, তাহাতে ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ রথ ও ৩,০০০ রণহস্তী ছিল। এই প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া তিনি পাঞ্জাব ব্যতীত সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ও সম্ভবতঃ দক্ষিণভারতেরও অনেকখানি অংশ জয় করেন। এইরূপে তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া খ্যাত হইলেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপদ্ম ও তাঁহার আট জন পুত্র (নবনন্দ) মিলিয়া প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না এবং খুব সম্ভব নন্দগণ প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। নন্দগণ তাঁহাদের ধনসঞ্চয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের রাজকোষে নাকি ৯৯০০ কোটি মুদ্রা জমা ছিল। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নন্দগণ চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন। এই কারণে চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত নামে এক বীরপুরুষের সাহায্য লইয়া নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন।

নন্দগণ যখন মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭—৩২৬ অব্দে) পাঞ্জাবদেশ গ্রীকদেশীয় বীর আলেক্জান্দার

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আলেক্জান্দার কিরূপে একে একে বিপাশা নদী (Beas) পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় করেন, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু নন্দগণ এত প্রবল ছিলেন যে, আলেক্জান্দারের সেনা বিপাশা নদী পার হইতে সাহস করে নাই।

উপরে যে কয়েকটি রাজ্যের নাম করিয়াছি, সেগুলি ছাড়া উত্তর-ভারতে আরও অনেকগুলি রাজ্য ছিল। যেমন চেদি, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, গান্ধার, কাম্বোজ প্রভৃতি। বিন্ধপর্ব্বতের দক্ষিণে ও গোদাবরীর তীরে মূলক ও অশ্মক নামে দুইটি রাজ্য ছিল। আরও দক্ষিণে কোনও রাজ্যের নাম জানা যায় না।

এই রাজ্যগুলি ছাড়া আর একশ্রেণীর কতকগুলি রাজ্য ছিল, তাহার নাম 'গণরাজ্য। এই সকল রাজ্যে একজন রাজার বদলে অনেকগুলি শাসক থাকিতেন। শাসকেরা কিরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন বলা যায় না, তবে এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, প্রজাগণ শাসকদিগকে নির্ব্বাচিত করিত। বরং বোধ হয় যে, শাসকগণ বংশানুক্রমেই রাজ্যশাসন করিতেন। প্রধান শাসকের নাম ছিল 'রাজা'। প্রত্যেক গণরাজ্যে একটি করিয়া প্রকাণ্ড সভাগৃহ থাকিত, তাহার নাম সংস্থাগার। এইখানে প্রজাগণ একত্র হইয়া রাজকার্য্য আলোচনা করিত। বোধ হয় তাহাদের আলোচনার যে ফল হইত, শাসকগণ তাহাই নির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপ গণরাজ্য হিমালয়ের দক্ষিণে ও পাঞ্জাবে অনেকগুলি ছিল। প্রধান কয়েকটির নাম করিলাম। কপিলাবস্তুর শাক্যগণ (ইহাদের রাজকুলে বুদ্ধের জন্ম হয়), পিপ্‌ফলিবনের মৌর্য্যগণ; কুশীনগরের মল্লগণ ও বৈশালীর বৃজ্জিগণ। বৃজ্জিগণের মধ্যে একটি প্রধানভাগ ছিল লিচ্ছবিগণ। ইহাদের অবস্থান মানচিত্রে দেখ। কথিত আছে যে, কোসলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিডূডভ শাক্যদিগকে নৃশংসভাবে বিনষ্ট করেন। অজাতশত্রুর বৃজ্জিবিরোধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পাঞ্জাবের সমস্ত গণরাজ্য আলেক্জান্দার কর্ত্তৃক বিজিত হয়, পরে চন্দ্রগুপ্ত সেগুলি মগধসাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে গণরাজ্যগুলি ভারতবর্ষ হইতে লোপ পায়।

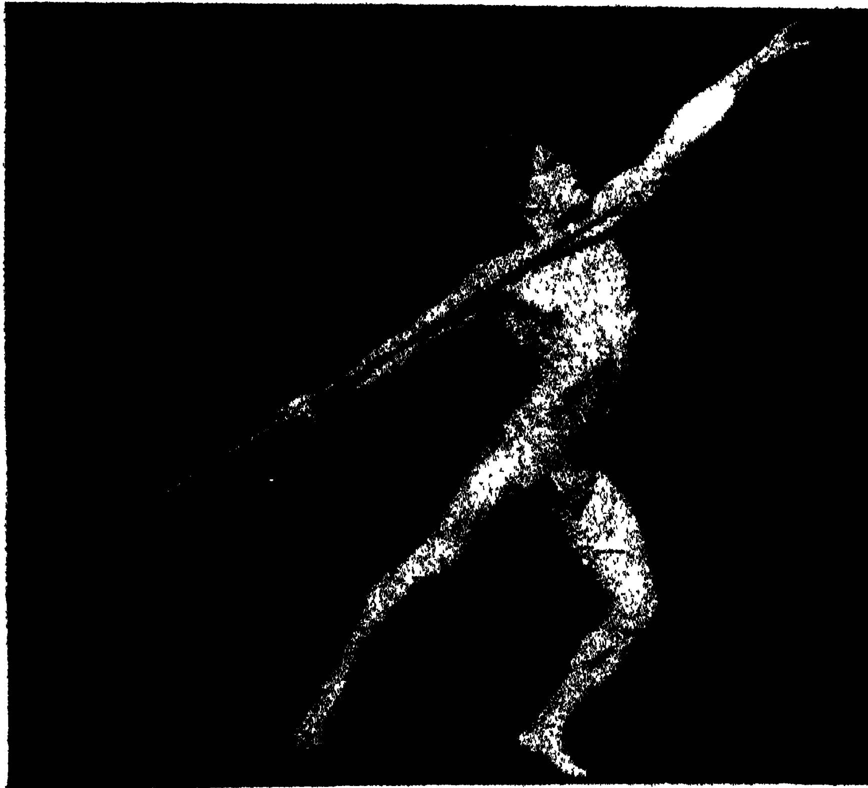
বুদ্ধের কাল হইতে আলেক্জান্দারের ভারত আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলসূত্র মগধের অভ্যুত্থান। কিরূপে ধীরে ধীরে অঙ্গ, বৈশালী, কাশী, অবন্তি প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করিয়া মগধ নিজের আকৃতি বৃদ্ধি করিতেছিল, ইহাই এই সময়কার ইতিহাসের প্রধান কথা। আরও কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজত্বকালে মগধসাম্রাজ্য সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।



ব্যায়াম ও খেলা

৪৪৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যায়াম ও খেলা পরস্পর বিরোধী না হলেও দুটোর মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। ব্যায়াম ধরে নেওয়া যাক এমন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ শারীরিক গতি—যাতে শরীর গঠনই হয়ে থাকে। পূর্ব্ব-প্রবন্ধের হিসাবে ব্যায়ামের মোটামুটি প্রভাবটা পড়ে শারীরিক প্রক্রিয়া ও শরীর গঠনের উপর। এককালে এর কতকটা মূল্য ছিল বটে কিন্তু আধুনিক মাপকাঠি হিসাবে ওটুকু যথেষ্ট নয়। পূর্ব্বযুগে মনটাকে বলি দিয়ে শরীর গঠন করা হত। তাতে বলিষ্ঠ মানুষ ও বলবান জানোয়ারের মধ্যে কোন তফাৎ থাকত না। পূর্ব্বযুগ বলতে আমি গ্রীকদের সময়কার ব্যায়ামের উদ্দেশ্যের কথা বলছি না, কারণ এখনকার ব্যায়াম সেই আদর্শটাই পুনরায় অনুসরণ করছে। আমাদের দেশে ঐ দোষবহুল প্রথাটা চলেছিল ঠিক বছর পঞ্চাশ আগে, যখন সার্কাসীব্যায়ামেরপ্রতি খুব লক্ষ্য ছিল, দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ থেকে ওটা এখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায়নি।



শরীরের গতি

সেই জিনিষটাই শ্রেষ্ঠ বা সমাজের ও বহুতম মানবের পক্ষে কল্যাণকর, কাজেই আমরা ব্যায়ামের সামাজিক দিক ও প্রভাবটা খুঁজে নিতে বাধ্য। শরীর সুস্থ রাখা ও বলশালী হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। কিন্তু মানসিক গুণগুলিকে বলি দিয়ে সেটা করতে গেলে সমাজ খুব নীচু স্তরে নেমে যায়। যুগ ব্যাপী চিন্তা যে সভ্যতার নিরিখ তার হিসাবে সে সমাজ মৃত হয়ে যায়। উৎকৃষ্ট ব্যায়াম বা খেলা তাকেই বলতে হবে যাতে পূর্ব্ব প্রকাশিত নিরিখ হিসাবে তিনটি প্রভাবই বর্ত্তমান। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে সব ব্যায়াম পদ্ধতি ও খেলার সহিত পরিচিত, কোনটাই ও হিসাবে সম্পূর্ণ নয়, কাজেই বিশেষজ্ঞেরা ব্যায়াম ও খেলার এমন একটি সংমিশ্রণ করে নিয়ে থাকেন, যাতে উপকারটা আমরা পুরোপুরিই পাই।

ব্যায়াম করবার কি খেলবার কি লক্ষ্য তোমাদের হতে পারে? মূলতঃ লক্ষ্য তিনটি—পেশাদার পালোয়ান হওয়া; দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও কার্য্যক্ষম করা এবং আনন্দ লাভ করা। আমরা বলে থাকি প্রথম লক্ষ্যটির চেয়েও বাকি লক্ষ্য দুইটিই শ্রেষ্ঠতর, কারণ দেশের স্বাস্থ্যের মাপকাঠি তৈরী হয় বহুতম সুস্থ লোক দিয়ে, জন কয়েক বড় পালোয়ান দিয়ে নয়। জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কাইসার প্রায়ই বলতেন—একজন অতি শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের চেয়ে ১০,০০০ সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি দেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করে। তবে শ্রেষ্ঠ পালোয়ান বা খেলোয়াড়ের যে প্রয়োজন নেই এমন কথাও আমি বলতে চাই না, তারা জাতীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে এবং আপন আপন জাতির শারীরিক উৎকর্ষের একটা চরম



কুস্তি খেলা

আদর্শ হয়ে থাকে, এ ছাড়া তাদের কোন বিশেষ মূল্য নেই। অন্যদিকে সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির সমষ্টি দেশের উন্নতি বিধান নানাদিক থেকে করে থাকে।

অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটা মূল্য আছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অনুপাতে তার উপার্জ্জন ও তা থেকে সমাজের কল্যাণ নির্ভর

করে। এই কারণে প্রত্যেক মানুষই সমাজের শক্তি ও সম্পত্তি। আমাদের দেশে আপাততঃ শিক্ষাটা


মুষ্টি যুদ্ধ


সুইডিস্ ব্যায়াম

সর্বজনব্যাপী নয়, তা হলেও অর্থকরী শিক্ষা দৈহিক স্বাস্থ্যের তুলনায় বড় হত না, কেননা মোটের উপর দৈহিক স্বাস্থ্য প্রত্যেক মানুষের অর্থোপার্জন করবার ক্ষমতাটাকে সম্পূর্ণ প্রসারতা দিয়ে থাকে। পটু


ভার তোলা


দৌড়ান



ফুটবল



হকি

বা অপটু শ্রমিক, যাদের প্রত্যেক দেশে সংখ্যাধিক্য আছে, সুস্থ হলে অর্থোপার্জ্জনে আপনার চরমশক্তি নিয়োজিত করতে পারে। এই ধরণের শ্রমিকের উপর ধনীদের নির্ভরতা ও কলকারখানার উৎপাদন করবার শক্তিও অধিকতর হয়ে থাকে।

ব্যায়াম-বিশেষজ্ঞেরা স্বাস্থ্যের এই দিকটা আজ পর্য্যন্ত বিচার করে দেখেন নি, কিন্তু আমার ব্যক্তি-যে নিয়ম আছে তার উদ্দেশ্য আরও বড়। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি ত আছেই কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ব্যায়াম বা খেলার উদ্দেশ্য নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে ও সম্পূর্ণ আত্মাধীন হতে শেখা এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি ভুলে গিয়ে সঙ্ঘের ইষ্টানিষ্টের কথাটাই ভাবতে শেখা। এই হল ব্যায়াম ও খেলার আসল শিক্ষার দিক এবং এই ফল পাওয়া



হাডুডু বা কপাটি খেলা

গত অভিজ্ঞতা এইদিকটাই আমার কাছে বড় করে দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস ব্যায়াম সম্বন্ধে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ যুক্তি আর কিছু থাকতে পারে না।

শরীর সুস্থ রাখা ও কার্য্যক্ষম করার অর্থ কি? সোজা কথা এই মনে রাখতে হবে যে, শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যায়াম ও খেলার দ্বারা এমন নিয়মানুবর্ত্তী করতে হবে যাতে দেহের ক্ষিপ্রতা ও সহিষ্ণুতা বাড়ে ও ছোটখাট বা নিবার্য্য রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করা যায়। এটা কিন্তু ব্যক্তিগত ফল এবং সাধারণ ব্যায়ামের দ্বারা আমরা লাভ করতে পারি।

শিক্ষালয়ে তোমাদের ব্যায়াম করার বা খেলার সম্ভব বলেই ওদুটি আজ এত করে রাষ্ট্র ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

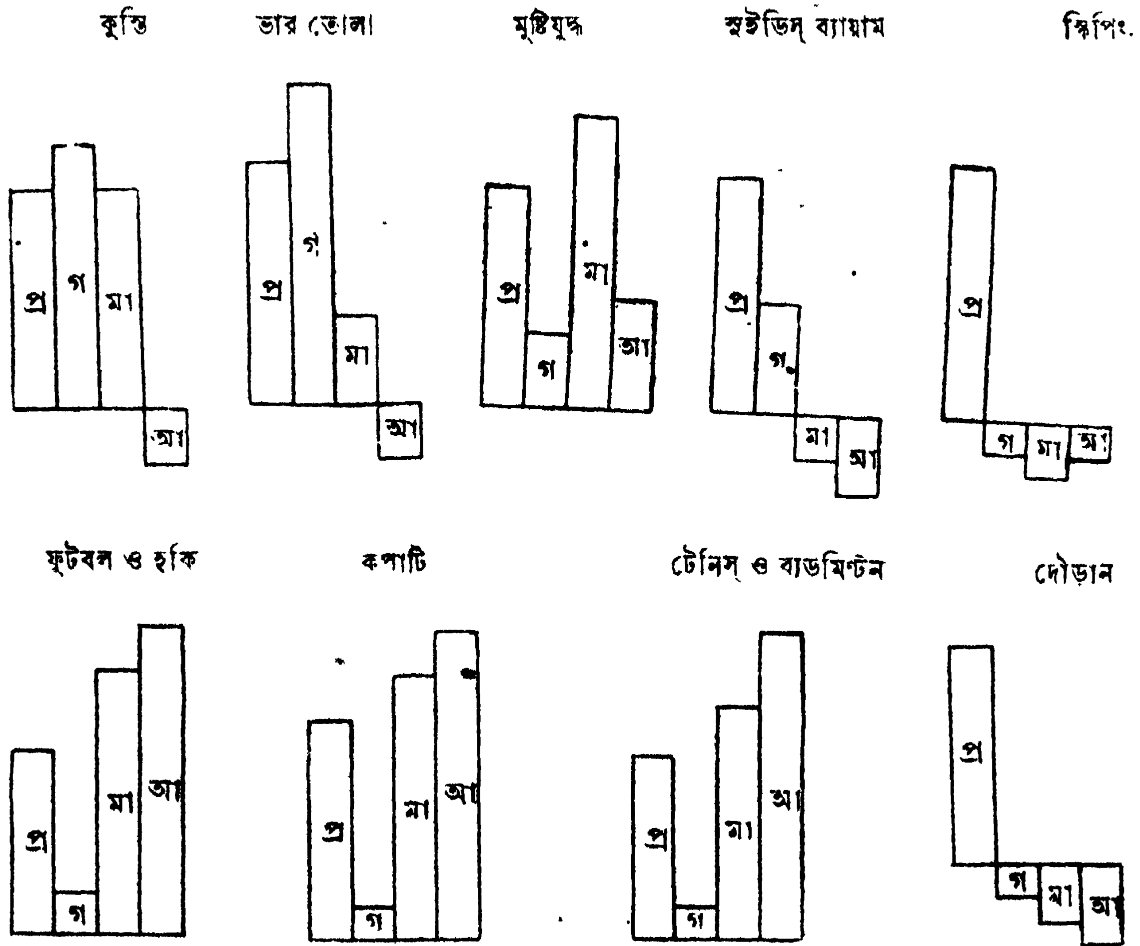
যে সব দেশ স্বাধীন এবং যে দেশকে আত্মরক্ষার জন্য সেনা-বাহিনী প্রতিপালন করতে হয়, জনগণের দৈহিক স্বাস্থ্য ও পটুতা তার কাছে সম্যক আদরের। আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যে খেলার প্রতি বিরুদ্ধতা আছে তার কারণ এ বিষয়ে শিক্ষার দারুণ অভাব।

খেলার দ্বারা আনন্দ লাভ করা ও খেলার সামাজিক প্রভাব অনেকটা একই জিনিষ। অনেকগুলি ব্যায়াম পদ্ধতি আছে যা থেকে কোন আনন্দ লাভ করা বা অন্যের সাহচর্য্য পাওয়া যায়

না, কারণ সেগুলি ব্যক্তিগত কিন্তু প্রত্যেক খেলার অন্যের সহিত আদান-প্রদানটাই বড় কথা। খেলার ভিতর দিয়ে আমরা অন্যের অধিকারটা স্বীকার করতে ও তার গুণগুলিকে শ্রদ্ধা করতে শিখি। তা ছাড়া খেলা একমাত্র জিনিস যাতে বয়স, জাতি, আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে সমান পর্যায়ভুক্ত হয়ে পরস্পরের সহিত মেশবার সুযোগ হয়ে থাকে।

তোমরা একথাটা অবশ্যই জান যে, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ভিন্ন শুধু ব্যায়ামে দেহ গঠিত হয় না। ব্যায়াম যদি শুধু শারীরিক পরিশ্রমে দাড়ায় তাহলে তার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি বলি ব্যায়াম থেকে আনন্দ লাভ করতে পারলে তার উপযোগিতা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম ও খেলার মূল উদ্দেশ্য জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা, আনন্দ যে সেই জীবনী-শক্তিটাকে ঢের বেশী বাড়ায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমাদের সুপরিচিত ব্যায়াম বা খেলার পদ্ধতি-গুলির প্রক্রিয়ার, গঠন, মন ও আনন্দের দিক দিয়ে কতটুকু মূল্য আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে খানিকটা নির্ণয় করতে পারি। এই চিত্রগুলির মধ্যরেখার উপরটা সক্রিয় ও নীচের দিকটা নিষ্ক্রিয় দিক।—



ভালি বল, বাস্কেট বল প্রভৃতি অন্যান্য খেলারও এ রকম বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(প্র— প্রকরণশীল, গ— গঠনশীল, মা— মানসিক, আ— আনন্দ)



তিব্বত



ষোল বৎসর বয়সে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন—তোমরা তোমাদের পড়ার বইতে কিংবা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে এইরূপ পড়িয়া থাকিবে। তিনি সেখানে যাইয়া সেখানকার বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী লামাদের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাকথার



তিব্বতের লোক

আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ভ্রমণকারী রাজা রামমোহন রায়ের তিব্বত যাইবার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপুরুষ বাঙ্গালী দীপঙ্কর তিব্বতের রাজার আহ্বানে তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত যাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী। তোমরা 'বৃহত্তর ভারত' পড়িয়া জানিয়াছ, একদিন ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতের বাহিরে যে সকল দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল—তিব্বত তাহাদের মধ্যে একটি।

তিব্বত যেন রূপকথার বিচিত্র দেশ। হিমালয়ের পরপারে সে কোন্ স্বপ্নপুরী ঐ তিব্বত তাহার সম্বন্ধে আমরা তেমন ভাবে কিছুই জানিতাম না। ইউরোপের লোকেরা বহুদিন পর্য্যন্ত তিব্বতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই ; এইত সেদিন মাত্র তাঁহারা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী এবং বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী ভ্রমণকারী শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ হইতে আমরা আজকাল নিষিদ্ধনগরী (Forbidden City) লাসা ও তিব্বত সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিতেছি। আমরা শরৎচন্দ্র দাসের বিচিত্র ভ্রমণকাহিনীর কথা ও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধেও দুই একটি কথা তোমাদের কাছে বলিব। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র তিব্বতে যান, তাঁহার আগে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়ান সিং এবং তাঁহার পরে কিষণ সিং



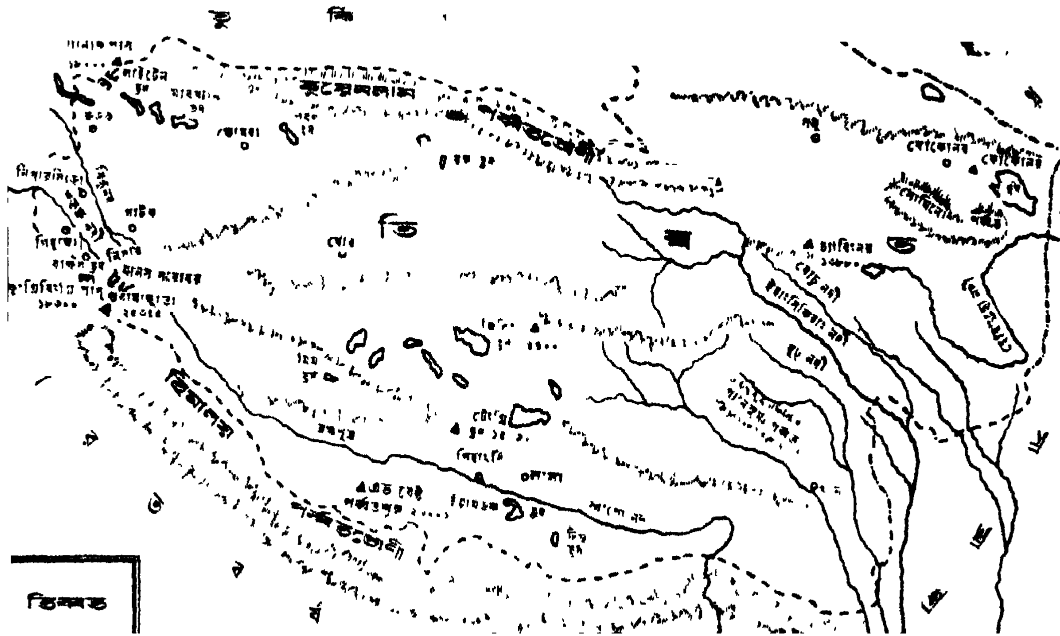
রাজা রামমোহন রায়

নামে আরও দুইজন ভারতবাসী তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

তিব্বত পাহাড়ের দেশ। ইংরাজীতে তিব্বতকে টিবেট্ বা থিবেট্ (Tibet or Thibet) বলে।

সাধারণ বর্ণনা

সমতল ভূমির মানুষের কাছে অতি উচ্চ গিরিশিখরের অধিবাসী তিব্বতীয়দের কথা জানিবার জন্য বহুকাল হইতেই নানা কৌতূহল জাগিয়া আসিতেছে। মানুষের স্বভাব এই যে, তাহার মন যাহা কিছু বিচিত্র যাহা কিছু নূতন, তাহার সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। তিব্বতের প্রাকৃতিক বিভাগ, তিব্বতের লতা-পাতা, ফুল, ফল, তিব্বতের পুরুষ, ও নারী, তিব্বতের বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, নদ-নদী, হ্রদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই নূতন—তার শাসন, রাজনীতির সহিত অন্য দেশের রাষ্ট্রনীতির কত প্রভেদ! বাহিরের নানাদেশ বর্ত্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত, কিন্তু তিব্বতের এই পর্ব্বত প্রাচীরের অন্তরালে এখনও সে আলো যাইয়া পৌছায় নাই—কবে পৌছিবে, বলা বড় সহজ নয়। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য মনে করিবে যে, প্রতাপশালী মোঙ্গলেরা দেশের পর দেশ জয় করিয়াছে, মধ্য এশিয়ায় লুঠতরাজ ও হত্যা করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া দিয়াছে, এমন কি রুশিয়ার সম্রাট্ জারের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই, কিন্তু মোঙ্গলেরা পর্য্যন্ত তাহাদের দেশের অতি নিকটবর্ত্তী এই তিব্বতে আসে নাই। পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে চীন পর্য্যটকেরা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি,



কিন্তু তাঁহারা কেহই তিব্বত সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেন নাই।

এশিয়ার দক্ষিণ ভাগে তিব্বত অবস্থিত। কাজেই, ইহার উত্তর সীমা মধ্যএশিয়া, দক্ষিণ সীমা হিমালয় পর্ব্বত। দেশটির পরিমাণ ফল ৪৬৩,২০০ বর্গমাইল। সাধারণতঃ তিব্বতের প্রশস্ত সমতল ভূ-ভাগের উচ্চতা ১০,০০০ দশ হাজার ফিট্ হইবে। এশিয়ার অনেক বড় বড় নদীর উৎপত্তিস্থান তিব্বতের পর্ব্বতশ্রেণী। সিন্ধু (Indus), শতদ্রু (Sutlej), ব্রহ্মপুত্র, হোয়াঙ্ হো (Hoang Ho), ইয়াঙ্-শি-কিয়াঙ্ (Yang tse kiang) এসকল বড় বড় নদী তিব্বতের উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর বুক হইতে নামিয়া আসিয়া দেশে দেশে বহিয়া চলিয়াছে।

তিব্বতে অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। এখানকার অনেক হ্রদ ১৩,৮০০ হইতে ১৫,০০০ ফিট্ উঁচুতে অবস্থিত। মানস সরোবর নামক হ্রদ, রাবণ হ্রদ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বতে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগের দিক দিয়া তিব্বতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তিব্বতের পশ্চিম ভাগে লোকজনের বসতি বড় কম। এমন কি, এক বর্গ



তিব্বতপর্য্যটক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস

মাইল পরিমিত স্থানে একজনের বেশী লোক বাস করে না। এ অঞ্চলটা সমুদ্রতটরেখা (Sea-level) হইতে প্রায় ১৫,০০০ ফিট উঁচু, এত উঁচুতে কোন ফসল ফলে না।

প্রাকৃতিক বিভাগ

এ অঞ্চলের ভূ-ভাগ পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে ঢালু। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের উপত্যকা কোন কোন স্থানে ৫,০০০ ফিটের বেশী উঁচু নয়; এখানে মূলা, গোল আলু, গম, যব, মটর, ভুট্টা এমন কি ধানও জন্মে। এজন্য এ ঢালু অঞ্চলটায় লোকসংখ্যা বেশী। পশ্চিমদিকের উপরের অংশে মাঝে মাঝে ভয়ানক তুষার-ঝড় বহে। সেই ঝড়ে কাহারও সাধ্য হয় না যে, ঘরের বাহির হইতে পারে।

তিব্বতীয়েরা বেশীর ভাগ লাসা ও চীন-সীমান্তের মধ্যে বাস করে।

তিব্বতের উত্তর দিকের সমতল ভূভাগের নাম চাঙ্ টাঙ্ (Chang Tang) চাঙ্ টাঙ্ শব্দের অর্থ উত্তরদিকের সমতল ভূমি। ইহার উত্তরে কুইএন্ লুন (Kuen Lun) পর্ব্বতশ্রেণী। চাঙ্ টাঙ্ অঞ্চলে অনেক হ্রদ আছে। চারিদিকের পাহাড় হইতে যে সকল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে তাহারা সকলে আসিয়া এই সব হ্রদে মিশিয়াছে। তিব্বতের অধিকাংশ হ্রদের জলই লোনা, কেবল এখানকার হ্রদগুলির জল সুমিষ্ট। এখানে গাছপালা নাই, আর শীত খুব বেশী। অত ঠাণ্ডায় গাছপালা জন্মে না। এখানে যে পরিমাণ ঘাস জন্মে তাহাতে বুনো চমরী গরু, বুনো গাধা, বুনো ভেড়া, বুনো ছাগল এসকলের জীবন রক্ষা হয়।



শতদ্রুর স্রোতোধারা

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা ভারতের দিকে অবস্থিত। তিব্বতের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে যে সকল নদীর



ব্রহ্মপুত্রের জন্মভূমি

উৎপত্তি হইয়াছে, সে সব নদী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম দেশ, চীন, মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কীস্থানের দিক দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ১৫০০ পনের শত মাইল উত্তর হইতে দক্ষিণে ৫০০ পাঁচ শত মাইল। প্রায় ষোল হাজার ফিট্ উঁচু তিব্বতের পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত থাকিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তিব্বতের পশ্চিম দিকে সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর অধিত্যকা প্রদেশ। ব্রহ্মপুত্র নদী এ প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে জন্ম-লাভ করিয়াছে। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম সাঙ্গ পো (Tsang Po) বা পবিত্র নদী। সাঙ্গ পো নদীর শাখা-নদীর তীরে লাসা (Lhase), শিগাৎসি (Shigatse) এবং গিয়ানৎসি (Gyantse) অবস্থিত। তিব্বতীয়েরা সে দেশের সব বড় নদীকেই সাঙ্গ পো বলে। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র এবং



তিব্বতের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের দৃশ্য



সিন্ধুনদের বুকে

শতদ্রু এই তিনটি নদীই মানসসরোবরের কাছাকাছি পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কৈলাস পর্ব্বত শতদ্রু ও সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থান। কবি কালিদাসের মেঘদূত নামক কাব্যে এই কৈলাস পর্ব্বতের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। কালিদাস লিখিয়াছেন—আকাশে শত শত উচ্চ চূড়া-শোভিত কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে অতি মনোহর। অতি সাদা বরফের স্তূপে উহার শিখরগুলি ঢাকা। এই পাহাড়ের গা এত স্বচ্ছ যে, দেবতার মেয়েরা দর্পণের বদলে ইহার গায়ে মুখ দেখেন—তাঁহাদের আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না।

১২,০০০ হাজার ফিট্ উঁচু পাহাড়ে বুক দিয়া যে সকল নদী বহিয়া চলিয়াছে, সে সব নদীর জলে নৌকা চলাচল করে। লা (La) নামক গাছের কাঠ দিয়া নৌকার কাঠামো প্রস্তুত করিয়া চমরী গরুর চামরা দিয়া ঢাকিয়া ইহারা নৌকা তৈয়ারী করে। এদেশের লোকেরা গাধা, ঘোড়া, গরু (চমরী), ভেড়া ছাগল, কুকুর এ সকল পোশে এবং ইহাদের সাহায্যে নানারূপ কাজ করিয়া থাকে।

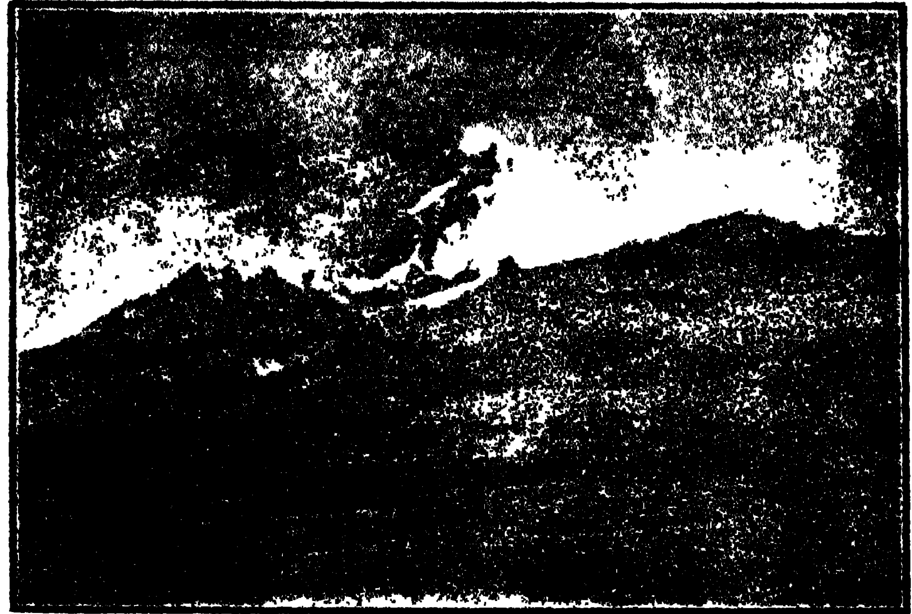
তিব্বতের সকলের চেয়ে বড় হ্রদটির নাম কোকোনোর (Koko Nor)। এই হ্রদটির আয়তন ১,৬৩০ বর্গ-মাইল। টেঙ্গ্রি (Tengri) হ্রদের আকার হইবে প্রায় ১,০০০ বর্গ মাইল। আর ছোট ছোট হ্রদগুলির কোনটির আয়তনই ১০০ বর্গ-মাইলের কম নহে। পূর্ব্বে এই সব হ্রদগুলি আয়তনে আরও অনেক বড় ছিল। এ দেশের বড় বড় হ্রদে অনেক সময় ভয়ানক ঝড় উঠে।

তিব্বত পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু দেশ। এত উঁচু দেশের আব্‌হাওয়া যে অদ্ভুত রকমের হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় এখানে ভয়ানক শীত থাকে। সে শীত নিবারণ করা পশু-লোম দ্বারা নির্ম্মিত পোষাক-পরিচ্ছদও সহজ হইয়া উঠে না। তারপর তুষার-ঝটিকার উৎপাতে কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। এ সব দেশে জ্বালানি কাঠের আদর যে কত বেশী তাহা সহজেই বুঝিতে পার।



চুম্বি উপত্যকা

চুম্বি উপত্যকা—১২,০০০ ফিট্ উঁচু। চুম্বি প্রদেশের সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর। এখানে শীত বেশী হইলেও তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং সহ্য করা যায়। এখানে ব্যারাম ও পীড়ার প্রাদুর্ভাব বড় কম। চুম্বি অঞ্চলে টোমো (Tomo) নামে একজাতি লোক বাস করে। টোমোরা কষ্টসহিষ্ণু জাতি। বরফ পড়িতেছে—শীতের বাতাস তুষার কণা বেগে বহিয়া চলিয়াছে, তবুও দেখিতে পাইবে যে, টোমোরা হাসি-মুখে জিনিষ-পত্র লইয়া হয় লাসার দিকে, নতুবা দার্জ্জিলিং বা কালিম্পোর দিকে আসিতেছে ও যাইতেছে। চুম্বি উপত্যকা কাঠের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নানা-জাতীয় গাছ জন্মে। সাধারণতঃ দেবদারু গাছের সংখ্যা বেশী। চুম্বির প্রাকৃতিক শোভা যেমন মনোহর, তেমনি এখানকার ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী। ১২,০০০ ফিট্ উঁচু এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে, এত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে যে, চার পাঁচ হাজার লোক পরম পরিতৃপ্তির সহিত জীবনধারণ করিতে পারে। এ অঞ্চলের বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাটও বেশ ভাল।



চুম্বি উপত্যকার চোমোলহরি বা দেবী পাহাড়



ধাঁধা-হেঁয়ালী

ধাঁধা ও 'হেঁয়ালীর' জন্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতি পুরাতন কালে হেঁয়ালী প্রচলিত ছিল। গ্রীসের ও মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে 'স্ফিংক্স' নামক অদ্ভুত কল্পিত জীবের উল্লেখ দেখা যায়। এই জীবের শরীর সিংহের মত, মুখ মানুষের মত, আবার দুটি ডানাও আছে। কথিত আছে, প্রাচীন গ্রীসের থিব্‌স নগরে একটি স্ফিংক্স নগরের অধিবাসীদিগকে হেঁয়ালীর উত্তর বাহির করিতে বলিত; উত্তর বাহির করিতে না পারিলে সে অধিবাসীদিগকে হত্যা করিত।

মহাভারতেও হেঁয়ালীর উল্লেখ দেখা যায়। বন-পর্ব্বের এক জায়গায় আছে, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক জলাশয়ে জল পান করিতে আসায় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পর জল পান কর।" তাঁহারা যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না, কিন্তু জল পান করেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির ভাইদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেখানে আসায় যক্ষ তাঁহাকেও সেই কথাই বলেন। যক্ষের সে হেঁয়ালীর-প্রশ্নের উত্তর দিয়া যুধিষ্ঠির ভাইদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন। যক্ষের কয়েকটি প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরের উত্তরগুলি নীচে দিলাম :—

যক্ষ—"পৃথিবীর চেয়ে ভারী কে? আকাশের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশী?"

যুধিষ্ঠির—"মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারী, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশী।"

য—"কে ঘুমাইলে চোখ বোজে না? কে জন্মিয়া নড়ে চড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতেই বড় হয়?"

যুধিষ্ঠির—"মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না, ডিম জন্মিয়া নড়ে চড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী নিজের বেগের দ্বারা বড় হয়।"

যক্ষ—"সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?"

যুধিষ্ঠির—"যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে যে চারিটি শাক-ভাত খাইতে পায়, সেই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি যে লোকে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য্য। মহাপুরুষেরা যে পথে যান তাহাই পথ। সময় যেন পাচক সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ।"

পুরাতন অনেক রূপকথা ও হেঁয়ালীর কথা পাওয়া যায়। অন্যান্য ধাঁধার জন্ম হেঁয়ালীর অনেক পরে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুরাতন আরবী পুস্তকে নানা প্রকার অঙ্কের ধাঁধার উল্লেখ আছে। মাপ-জোক, ভাগাভাগি ইত্যাদির ধাঁধা, আরবীদের মধ্যে বহুকাল আগেই প্রচলিত ছিল। গ্রীস ও রোমেও ধাঁধার-হেঁয়ালী বহুকাল আগে প্রচলিত ছিল। "অঙ্কের যাদুর চৌকি" (Magic Square) প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন পুস্তকে পাওয়া যায়।

গোলক ধাঁধাও বহুকালের পুরাতন জিনিষ। গ্রীক ও মিশরদেশীয় পুরাণে গোলক ধাঁধার উল্লেখ আছে। এশিয়া ও ইউরোপের নানাদেশের বাগানে ও উঠানে এখনও বহুকালের পুরাতন গোলোক ধাঁধা পাওয়া যায়;—কোনটি বা ইট-পাথরের

কোনটি শুধু মাটিতে 'আল্' বসাইয়া করা হইয়াছে, আবার কোনটি ছোট গাছের বেড়ার তৈয়ারি। এই সকল গোলক ধাঁধার অনেকগুলির মধ্যে প্রবেশ করা বেশ কঠিন। কলিকাতার উত্তরে "মরকত কুঞ্জ" নামে একটি বাগানে টিনের বেড়ার তৈয়ারি একটি গোলক ধাঁধা আছে। তাহার মাঝখানে যাইতে পারিলে দেখা যায় একটি কাঠের ফলকে লেখা আছে:—

"এমনি সংসার পথ ধাঁধায় ভ্রমণ,
যে পায় প্রকৃত পথ সেই বিচক্ষণ।"

কোন্ ধাঁধার পর কোন্ ধাঁধার জন্ম হইয়াছে, ঠিক বলা যায় না, তবে, কয়েক প্রকারের ধাঁধাকে 'আধুনিক' আর কয়েক প্রকারের ধাঁধাকে অতি 'আধুনিক' বলা চলে। 'আধুনিক' শ্রেণীর ধাঁধার মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম, 'অতি আধুনিক' ধাঁধার বিংশ শতাব্দীতে জন্ম। 'আধুনিক' শ্রেণীর ধাঁধার মধ্যে 'শব্দ চৌকি' (Word squares), 'লুকানো নাম' (Hidden names) 'শব্দ বদল' (Transformation) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অতি আধুনিক' ধাঁধার মধ্যে 'শব্দ ছক্' (Cross-word Puzzles) 'অংশহারা ছবি' (Missing-detail pictures); প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক ধাঁধার কয়েকটি আবার পুরাতন ধাঁধার রূপান্তর মাত্র। 'অতি আধুনিক' কোন কোন ধাঁধাও আধুনিক ও পুরাতন ধাঁধার রূপান্তর। অধিকাংশ আধুনিক ও পুরাতন অঙ্কের ধাঁধা প্রকৃতপক্ষে এক একটি [illegible] কষিবার নিয়ম জানা থাকলে তাহার উত্তর অনায়াসে কষিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

এখানে কয়েকটি ধাঁধার উদাহরণ এবার দেওয়া হইল। এরূপ এবং অন্যান্য নানা প্রকারের ধাঁধা পরে দেওয়া হইবে।

ধাঁধা

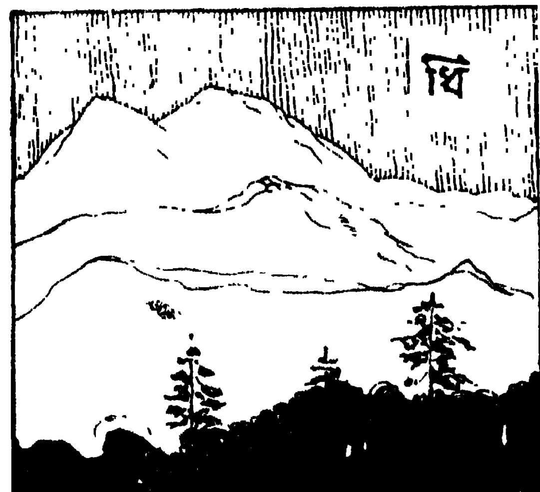
১। অঙ্কের যাদুর চৌকি (Magic squares)

এই ধাঁধার কয়েকটি সংখ্যা চৌখোপির মধ্যে এমনভাবে সাজান হয়, যাহাতে ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নীচে, সকল দিকেই যোগ বা গুণ করিলে ফল একই হয়; কোন কোনটাতে ভাগ বা বিয়োগেরও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এরূপ নানাভাবের চৌখোপী হইতে পারে। কোনটিতে কোণাকুণি যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি করিলেও এক ফল হয়, কোনটিতে মাঝখান হইতে কোথা পর্য্যন্ত যোগ, বিয়োগ বা গুণ করিলে চারিদিকেই এক ফল হয়, ইত্যাদি। এখানে যে চৌখোপী দেওয়া হইল, ইহাতে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি এমনভাবে সাজান আছে, যাহাতে কোণাকুণি, পাশাপাশি, যে ভাবেই যোগ করা যায়, তিনটি সংখ্যার যোগফল ১৫ হয়।

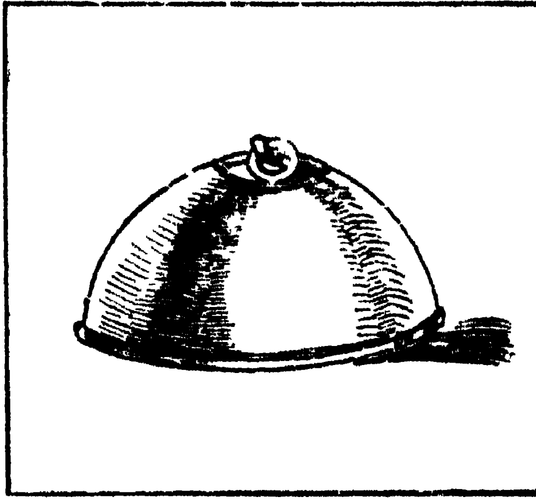
২	৭	৬
৯	৫	১
৪	৩	৮

২। লুকানো নাম

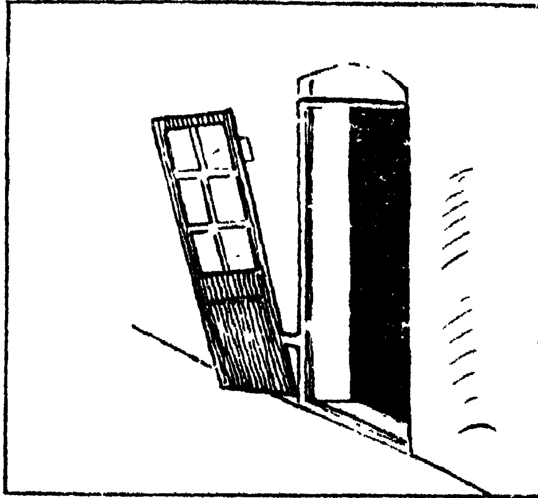
এই ধাঁধায় ছবি আঁকিয়া দেওয়া হয়। অর্থ বাহির করিতে পারিলে একটি নাম ধরা পড়ে। যেমন, নীচের একটি ও পরপৃষ্ঠার তিনটি ছবিতে ভারতবর্ষের চারটি জায়গার নাম লুকানো আছে।



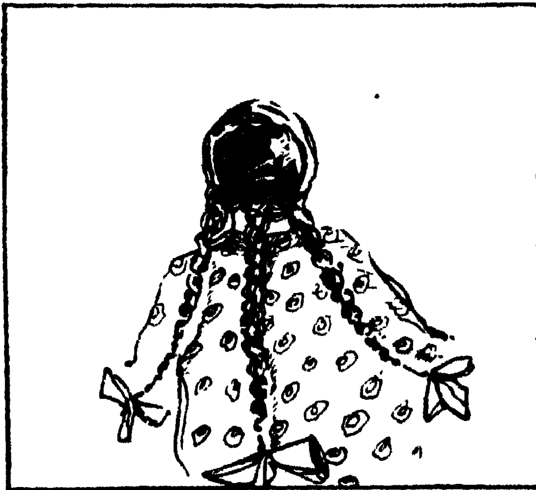
গিরিধি



ঢাকা



দ্বারভাঙ্গা



ত্রিবেণী

৩। অংশ-হারা ছবি

এই ধাঁধায় ছবির বিশেষ কোন অংশ বাদ দিয়া ছবিটি আঁকা হয়। কোন্ অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে বাহির করিতে হইবে। নীচের ছবি দুইটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। ছবির নামেরও



দো—ম উত্তর—দোলার মজা



বে—ফু—প্র—ছ
উত্তর (বেশ ফুটিয়েছে প্রতিহিংসা ছবিতে)

প্রথম অক্ষরটি দেওয়া হইয়াছে। ছবির হারা অংশ বাহির করিতে পারিলে নামের হারা-অংশও সহজে বাহির করা যাইবে।

৪। শব্দ-ছক্ (Cross-word puzzle)

এই ধাঁধায় একটি ছক্ দেওয়া থাকে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘর সাদা আর কয়েকটি ঘর কালো। সাদা ঘরের কোন কোনটিতে এক একটি সংখ্যা (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি) লিখিয়া দেওয়া থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পাশাপাশি' এবং 'উপর হইতে নীচে' বসাইবার জন্য কয়েকটি কথার অর্থ বা নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে। কথার এক একটি অক্ষর ছকে ঠিক মত বসাইতে পারিলে ছক পূর্ণ হইয়া যায়। কালো ঘরে কোন অক্ষর বসে না। 'পাশাপাশি' বা 'উপর হইতে নীচে' কথাগুলি বসাইবার সময় দেখিতে হইবে যে পরবর্ত্তী সংখ্যার আগের ঘরেই আগের কথাটি যেন শেষ হয় (যদি সে ভাবে নম্বর দেওয়া থাকে)। যেমন উপরের ছকটিতে ১১নং 'পাশাপাশি' বসিবার কথাটি ১২নং লেখা ঘরের আগেই শেষ হইবে; অর্থাৎ দুই অক্ষরের কথা হইবে। উদাহরণ—

'পাশাপাশি' কথা—

(১) আলোক-ছটা, (৩) পদ্ম, (৬) খালি, (৮) নূতন, (৯) মুখ, (১১) জল, (১২) বোবা, (১৫) তোমার, (১৬) জোর, (১৭) সুন্দর, (১৮) পাত্র-বিশেষ।

'উপর হইতে নীচে' কথা

(১) তলোয়ার, (২) শরীরের ভিতরে বহে, (৪) মানস (৫) ইহা ভিন্ন ব্যঞ্জনে স্বাদ নাই, (৭) ক্রমাগত (৯) এশিয়ার দেশ, (১০) চক্ষু, (১৩) যাহা তলাইয়া দেখা যায় না, (১৪) দাগ, (১৬) বিবাহের পাত্র।

ইহার উত্তরটি দেখিলেই শব্দ-ছক করিবার উপায় সহজে বুঝা যাইবে।

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭	■	৮	
	■	৯		১০	■	
■	১১		১২			■
১৩	■				■	১৪
১৫		■		■	১৬	
১৭			■	১৮		

কি	র	ণ	■	ক	ম	ল
রি	ক্ত	■	অ	■	ন	ব
চ	■	আ	ন	ন	■	ণ
■	নী	র	ব	য়	ন	■
অ	■	ব	র	ন	■	ক
ত	ব	■	ত্	■	ব	ল
ল	লি	ত	■	ক	র	ঙ্ক

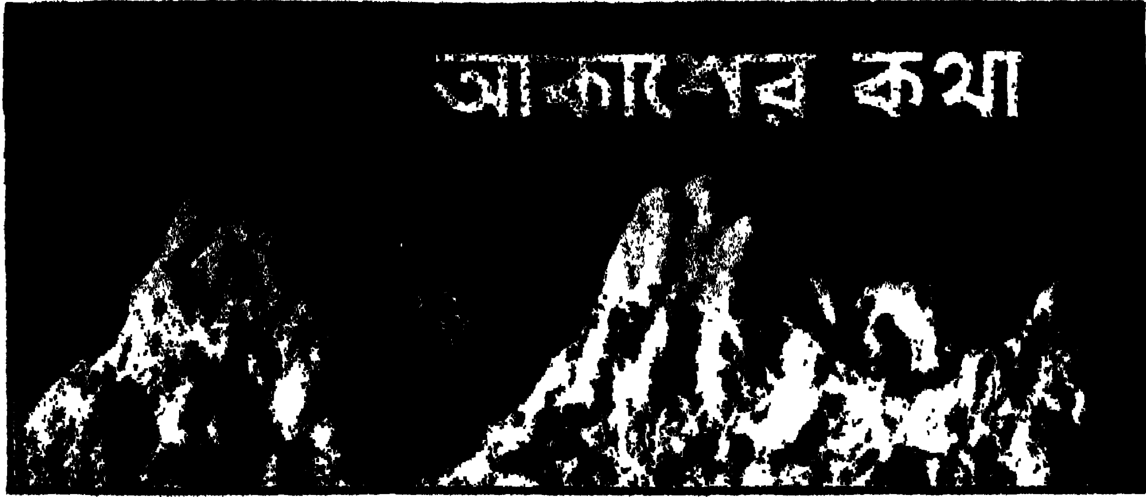
৫। শব্দ-বদল

উদাহরণ: 'পচা'কে 'তাজা' কর।

উত্তর: পচা—পড়া—পাড়া—তাড়া—তাজা।

এই ধাঁধায় একটি কথার এক একটি অক্ষর বা আকার-ইকার ইত্যাদি বদলাইয়া ক্রমে আর একটি কথা তৈয়ারী করিতে হইবে। একবারে একটি অক্ষর বা আকার-ইকার বদল বা যোগ করা যায় এবং প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এমন একটী কথা তৈয়ারী করিতে হইবে যাহার অর্থ হয়।





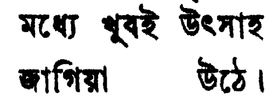
মঙ্গলগ্রহ



তোমাদের কাছে চাঁদের কথা বলিয়াছি, এইবার মঙ্গলগ্রহের কথা বলিব। তোমরা অনেকেই বোধ হয় মঙ্গলকে দেখিয়া থাকিবে। সাধারণতঃ ইহাকে লালরঙের নক্ষত্রের মত দেখায়। সেইজন্যই প্রাচীনকালে জ্যোতিষীরা ইহার নাম 'লোহিতাঙ্গ' রাখিয়াছিলেন। সেকালের হিন্দু জ্যোতিষীরা মঙ্গলকে নবগ্রহের একটি গ্রহ বলিয়া ইহার স্তব ও স্তুতি করিয়াছেন। এই মঙ্গলকে লইয়া পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক দিন হইতেই নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর মত মঙ্গলগ্রহও জীব-নিবাসের উপযুক্ত। সে সকল কথা একে একে তোমাদের কাছে বলিব। তাহার পূর্ব্বে মঙ্গল সম্বন্ধে অন্যান্য যাহা জানা গিয়াছে তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

মঙ্গলও পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে। সৌরজগতে মঙ্গল ও শুক্র এই দুই গ্রহকেই পৃথিবীর প্রতিবেশী বলা যাইতে পারে। পৃথিবী অপেক্ষা শুক্র আরও নিকটে এবং মঙ্গল আরও দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে অনবরত প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে মঙ্গলের দূরত্ব গড়ে ১৪১,৫০০,০০০ মাইল, কিন্তু ইহার পথ অনেকটা ডিমের আকারের মত বলিয়া ইহার দূরত্ব কখনও কখনও আরও ১২,০০০,০০০ মাইল কমিয়া যায় এবং কখনও বা ১৪,০০০,০০০ মাইল বাড়ে। মঙ্গলের ও পৃথিবীর কক্ষ দুইটির (orbits) চিত্র দেওয়া গেল। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, মঙ্গলের কক্ষের ন্যায় পৃথিবীর কক্ষ অতটা ডিম্বাকার নয়। সূর্য্যের চারিধারে একবার প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন লাগে। ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীও যথাকালে সূর্য্য ও মঙ্গলের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। আজ যদি পৃথিবী সূর্য্য ও মঙ্গলের মাঝখানে থাকে, তাহা হইলে ৭৮০ দিন পরে পুনরায় পৃথিবী এই মধ্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিবে। পৃথিবী যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে এই কালের ব্যবধান ৬৮৭ দিন

হইত, কিন্তু পৃথিবীও নিজে ঘুরিতেছে বলিয়া এই ব্যবধান বাড়িয়া ৭৮০ দিন হয়। যখন পৃথিবী সূর্য্য ও মঙ্গলের মাঝখানে থাকে, তখন এই দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্ব গড়ে ৪৮,৬০০,০০০ মাইল হয়। কখন কখন এমন হয় যে মঙ্গল যখন নিজের কক্ষের যে স্থানটি সূর্য্যের সব চেয়ে কাছে, সেখানে অবস্থান করে, তখন পৃথিবী ও সূর্য্য এবং মঙ্গলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময় পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্ব খুব কমিয়া গিয়া মোটে ৩৪,০০০,০০০ মাইল হয়। মঙ্গল যখন এত কাছে আসে, তখন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মধ্যে খুবই উৎসাহ জাগিয়া উঠে। তাঁহারা বড় বড় দূরবীণ লাগাইয়া মঙ্গলগ্রহকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত হন। প্রতি ১৫ কিংবা ১৭ বৎসর ব্যবধানে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ১৯০৯ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আবার এই সুযোগ আসিবে। সূর্য্য যখন পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যায় তখন মঙ্গল অনেক দূরে সরিয়া যায়, এবং দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান গড়ে ২৩৪,৪০০,০০০ মাইল হয়। কোনও কোনও সময়ে মঙ্গল

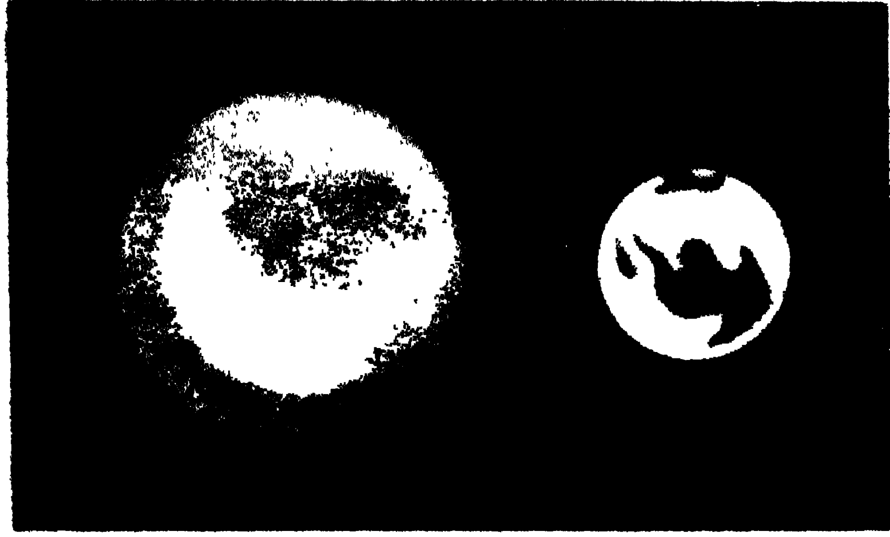


মঙ্গল ও পৃথিবীর কক্ষ

পৃথিবী হইতে দূরত্ব হিসাবে মঙ্গলকে যেমন ছোট, মাঝারি ও বড় দেখায়



২৪৯,০০০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত দূরে সরিয়া যায়, তখন ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মঙ্গলের ব্যাস ৪২১৫মাইল মাত্র। পৃথিবী আয়তনে মঙ্গলের প্রায় সাত গুণ। পৃথিবীকে ভাঙিয়া চুরিয়া যত কাদামাটি পাইবে, তাহাতে সাতটা মঙ্গলগ্রহের সমান গোলাকার পিণ্ড তৈয়ার করিতে পারিবে।



পৃথিবী ও মঙ্গলের আয়তনের তুলনা করা হইয়াছে



১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গল গ্রহকে যেমন দেখা গিয়াছিল

ওজনে পৃথিবী মঙ্গলের প্রায় সওয়া ন-গুণ। যদি একটা প্রকাণ্ড তুলাদণ্ড যোগাড় করিতে পার এবং তাহার একটি পাল্লায় নয়টা মঙ্গলগ্রহ চাপাইয়া দাও ও অন্যটিতে কেবল পৃথিবীকে রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে, পৃথিবীর দিকের পাল্লাটি অপেক্ষাকৃত বেশী ভারী বলিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি মঙ্গলের আকর্ষণশক্তির প্রায় পৌনে তিন গুণ। যে জিনিষের ওজন পৃথিবীতে ১০০ সের, মঙ্গলগ্রহে তাহা (এখানকার হিসাবে) ৩৮ সেরের মত হাল্কা বোধ হইবে।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় লাটিম লইয়া খেলা করিয়াছ। মঙ্গল ও পৃথিবী লাটিমের মত নিজেদের মেরুদণ্ডের চারধারে ঘুরপাক্ খাইতেছে। পৃথিবীর একবার ঘুরপাক্ খাইতে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময় লাগে। পৃথিবী যদি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ না করিত এবং কেবল এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া লাট্টুর মত ঘুরপাক্ খাইত, তাহা হইলে আমাদের দিবারাত্রির পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট হইত। কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়াই দিবা-

রাত্রির পরিমাণ একটু বেশী হইয়া ২৪ ঘণ্টা হইয়াছে। মঙ্গলের নিজের মেরুদণ্ডের চারিপাশে ঘুরপাক্ খাইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট লাগে। মঙ্গলও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; সেজন্যই ইহার দিবারাত্রির পরিমাণ কিছু বেশী হইয়া ২৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট হইয়াছে।

মঙ্গলের দুইটি চাঁদ আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক আসাফ্‌হল্ (Asaph Hall) কোনও এক রাত্রে ওয়াসিংটন্ (Washington) নগরের মানমন্দিরে বড় দূরবীন দিয়া মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুইটি ছোট আলোক-বিন্দু মঙ্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, এই দুইটি আলোক-বিন্দু মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ মাত্র। মঙ্গলের ইংরাজী নাম Mars। প্রাচীন রোমান্‌দের যুদ্ধ-দেবতার নামও Mars ছিল। এই দেবতার দুই অনুচর ফোবস্ (Phobos)—ভয় ও ডাইমস্ (Deimos)—বিপ্লব। মঙ্গলের দুই চাঁদের নাম ফোবস্ ও ডাইমস্ রাখা হইল। মঙ্গলের কেন্দ্র হইতে ফোবস্ ৫৮২৬ মাইল দূরে এবং ডাইমস্ ১৪,৮০০ মাইল দূরে ঘুরিতেছে। মঙ্গলের চারিধারে ঘুরিয়া আসিতে ফোবসের ৭ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট লাগে এবং ডাইমসের ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট লাগে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ফোবসের একমাস প্রায় আট ঘণ্টায় এবং ডাইমসের একমাস প্রায় ৩০½ ঘণ্টায় হয়। মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ফোবসের মঙ্গলের এক-দিনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় লাগে। ফোবসের এই একটি বিশেষত্ব। অন্য কোনও গ্রহের নিজের মেরুদণ্ডের চারিধারে ঘুরপাক্ খাইতে যত সময় লাগে, তাহার অপেক্ষা উহার উপগ্রহের উহাকে প্রদক্ষিণ করিতে বেশী সময় লাগে। তোমরা অনেকে বোধ হয় সুইফ্‌ট্ (Swift) সাহেবের প্রণীত গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (Gulliver's Travels) নামে একটি গল্পের বই পড়িয়াছ। গালিভার (Laputa) দেশে গিয়া দেখিলেন যে, সেখানকার অধিবাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রে ও সঙ্গীতবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী; অন্যান্য বিষয়ে তাহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য এবং তাহাদের প্রকৃতিও অদ্ভুত ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই এই ভয়ে শঙ্কিত থাকিত যে, যদি



ডাইমো হইতে মঙ্গলকে যেমন দেখায়

সূর্য্য-কলঙ্ক বেশী বাড়িয়া সূর্য্যের তেজ অনেক কমিয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর কি দশা হইবে। কিংবা যদি কোনও ধূমকেতু পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং সেজন্য প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইবে? সেখানে সকাল বেলা দুই বন্ধুতে দেখা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই উঠে যে, সূর্য্যের

অবস্থা কি প্রকার কিংবা ধূমকেতুটি কত কাছে আসিয়াছে। গালিভার আরও জানিতে পারিলেন যে, লাপুটাবাসী জ্যোতির্ব্বিদেরা মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি দশ ঘণ্টায় এবং অপরটি ২১½ ঘণ্টায় মঙ্গলকে পরিভ্রমণ করিতেছে। অবশ্য গালিভারের গল্প উপকথা, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সুইফ্‌ট্ (Swift) সাহেব মঙ্গলের চাঁদ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা অনেক অংশে সফল হইয়াছে। তোমরা ভাবিয়া দেখ—পৃথিবীর যদি দুই চাঁদ থাকিত তাহা হইলে কি মজাই হইত। ফোবসের আট ঘণ্টা-ব্যাপী একমাস মঙ্গলের সওয়া বার ঘণ্টা ব্যাপী একরাত্রির চেয়েও কম। ইহার বিচিত্র ফল এই যে, ফোবস্ পশ্চিমে উঠিয়া পূর্ব্বে অস্ত যায়—তোমরা দেখিয়াছ যে, পৃথিবীর চাঁদ পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ফোবসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং বিবিধ কলা মঙ্গল হইতে প্রত্যেক রাত্রিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাইমসের গতিরও কিছু বিশেষত্ব আছে। তোমরা বোধ হয় জান যে, পৃথিবী নিজের অক্ষের (axis) চারিধারে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরপাক্ খাইতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে, আকাশের নক্ষত্রগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম যাইতেছে। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চাঁদের প্রায় ঊনত্রিশ দিন লাগে—ইহা এক দিবসের অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষ-ভ্রমণ (rotation) কালের চেয়ে অনেক বেশী সময়। সে জন্য আমরা প্রতিদিন চাঁদকে পূর্ব্বদিকে উঠিতে ও পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখি। তুমি যদি মঙ্গলে যাও সেখানেও দেখিতে পাইবে যে, তারাগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতেছে। ডাইমসের প্রদক্ষিণ কাল মঙ্গলের অক্ষ-ভ্রমণ কালের অপেক্ষা অল্পই অধিক। অবশ্য প্রদক্ষিণ-কালের সময় অধিক বলিয়াই ডাইমস্ পূর্ব্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কিন্তু এই দুই কালের মাত্রার প্রভেদ অল্প বলিয়াই, প্রতিদিন ডাইমস্‌কে উঠিতে দেখা যায় না—কয়েকদিন পরে পরে ডাইমস্ পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। এখন যদি ডাইমস্ পূর্ব্বদিকে উঠে, তাহা হইলে ১৩২ ঘণ্টা পরে ইহা আবার পূর্ব্বদিকে উঠিবে। তুমি যদি মঙ্গলগ্রহে যাও, তাহা হইলে, পৌনে তিন-দিন তুমি অনবরত ডাইমস্‌কে দেখিতে পাইবে এবং তাহার পর পৌনে তিন দিন উহা তোমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে। এই পৌনে তিনদিনের মধ্যে সে অন্ততঃ দুইবার কলা পরিবর্ত্তন করিবে।

পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছেন যে, ফোবসের ব্যাস ১০ মাইল ও ডাইমসের ব্যাস ৫ মাইল মাত্র। ফোবস্ মঙ্গলের খুব কাছে বলিয়াই উহাকে মঙ্গল হইতে একটি ছোট রেকাবীর মত দেখায়। এই রেকাবীর ব্যাস পৃথিবী হইতে চাঁদ যত বড় দেখায় তাহার ব্যাসের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। মঙ্গল হইতে ফোবস্ খুব কমই উজ্জ্বল দেখায়, পঁচিশটা ফোবস্ একত্র করিলে তবে আমাদের চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখাইবে। তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, মঙ্গলগ্রহের উপর ফোবসের জ্যোৎস্না কতই কম উজ্জ্বল। ফোবসের পূর্ণিমার সময় মঙ্গলের উপর যে জ্যোৎস্না পড়ে, তাহা আমাদের দ্বিতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল নয়। মঙ্গল হইতে ডাইমস্‌কে শুক্রের মতন একটি উজ্জ্বল তারার ন্যায় দেখায়। ডাইমস্ যে জ্যোৎস্না দেয় তাহা নগণ্য।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও (Galileo) দূরবীন দিয়া সকলের আগে মঙ্গলকে

দেখিয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া মঙ্গলকে দেখিবার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, চাঁদের মত মঙ্গলেরও ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প। মঙ্গলকে কখনও কাস্তের মত সরু কিংবা অর্দ্ধগোলাকার অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে কেবল ন্যুব্জ (gibbous) কিংবা পূর্ণ-গোলাকার অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে জ্যোতির্ব্বিদ্ হাইগেম্স (Huyghems) মঙ্গলের লাল রঙের পিঠের উপর কতকগুলি সামান্য কাল দাগ দেখিতে পাইলেন। এইগুলি দেখিয়া তিনি সর্ব্ব-প্রথমে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলের ছবি আঁকিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মারাল্ডি (Maraldi) নামে একজন জ্যোতিষী মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর উপর শাদা রঙের আবরণ দেখিতে পাইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্সেল (Herschel) লক্ষ্য করিলেন যে, মঙ্গলের ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সাদা আবরণটির আয়তন কমে ও বাড়ে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছিল। সেই সময়ে এই গ্রহটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার খুব সুবিধা হইয়াছিল। এই সুযোগ পাইয়া বিয়র্ (Beer) ও মাডলার্ (Madler) নামে দুই জ্যোতির্ব্বিদ মঙ্গলের বিস্তারিত মানচিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশে বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিতেন যে, মঙ্গলের উপরিভাগের লাল অংশগুলি "ভূখণ্ড" এবং মলিন স্থানগুলি "সাগর"। ইহারা সাগরগুলির পৃথক্ পৃথক্ নাম দিলেন এবং ভূখণ্ডকে বিভিন্ন "মহা-দেশে" বিভক্ত করিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। পরে অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদেরা আরও অনেক উৎকৃষ্ট মানচিত্র তৈয়ার করি-লেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মঙ্গল আবার পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছিল। সেই সময়ে ইটালিদেশে মিলান (Milan) মানমন্দিরের অধ্যক্ষ গিওভ্বানি শিয়াপারেলী (Giovani Schiaparelli) বড় দূরবীন দিয়া মঙ্গলকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মলিন রেখা মহাদেশগুলির উপর দিয়া আড়া-আড়ি-ভাবে চলিয়া গিয়াছে। তিনি এই রেখাগুলিকে 'খাল' (*canali*) বলিয়া অবিহিত করিলেন। অনেকগুলি রেখা দেখিতে 'সরল' বলিয়াই তিনি এইগুলির



গিওভ্বানি শিয়াপারেলী

নাম 'খাল' রাখিয়াছিলেন। এইগুলি যথার্থ জলপূর্ণ খাল কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। সেই সময়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা এই রেখা-গুলির আবিষ্কারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অন্য কেহ এইগুলি দেখিতে না পাওয়ায় অনেকে শিয়াপারেলীর কথা বিশ্বাসই করিলেন না।

১৮৭৯ ও ১৮৮১ খৃঃ শিয়াপারেলী পুনরায় এই খালগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন। তিনি আরও আবিষ্কার করিলেন যে, কোনও কোনও খাল "দু-পুরু" (double)। এই "দু-পুরু" খালের কথা শুনিয়া অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দু-পুরু খাল ত' দূরের কথা, একপুরু খালও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, শিয়াপারেলী নিশ্চয় উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন কিংবা কোনও বিষম মোহে



হেন্‌রী পেরোটিন

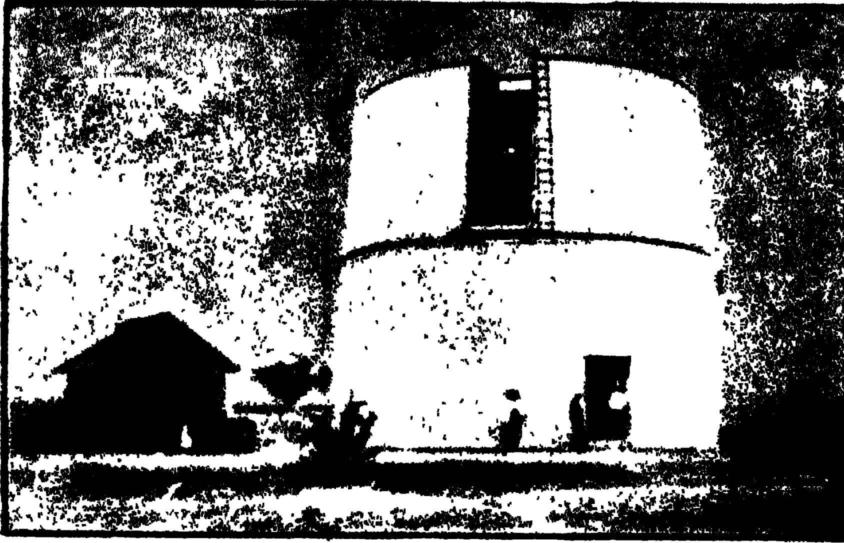
পড়িয়াছেন। সুখেব বিষয়, ১৮৮৮ খৃঃ ফ্রান্সদেশের নিস্ (Nice) নগরে পেরোটিন (Perrotin) সাহেব ৩০ ইঞ্চ দূরবীন দিয়া খালগুলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। কিছুদিন পরে আমেরিকার লিক্ (Lick) মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদেরা ৩৬ ইঞ্চ দূরবীন দিয়া এই রেখাগুলি দেখিতে পাইলেন এবং কোনও কোনও রেখা যে দু-পুরু, তাহাও তাঁহারা দেখিলেন। এখন আর খালগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। শিয়াপারেলীর নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ১৮৯২ খৃঃ অধ্যাপক পিকারিং (Pickering) দেখিতে পাইলেন যে, যে অংশগুলিকে 'সাগর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাদের উপর দিয়াও কয়েকটি খাল চলিয়া গিয়াছে। ১৮৯৪ খৃঃ আরিজোনা (Arizona)



পি, লাওয়েল

প্রদেশের ফ্লাগষ্টাফ্ (Flagstaff) মানমন্দিরের অধ্যক্ষ লাওয়েল্ (Lowell) সাহেবও দেখিতে পাইলেন যে, 'সাগর' সমুদয় ভেদ করিয়া অনেকগুলি খাল গিয়াছে। খালগুলিকে স্থায়ী অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তরল জলের উপর এইরূপ স্থায়ী দাগ থাকিতে পারে না। অতএব যে অংশগুলিকে 'সাগর' নাম

দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কোনওক্রমে জলপূর্ণ সাগর হইতে পারে না। লাওয়েল্ (Lowell) সাহেব আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই মলিন অংশগুলির রঙ ও আকার ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাইয়া যায়। লাওয়েল্ সাহেব মঙ্গলের বিষয় নানারূপ জ্ঞানলাভ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিলেন। এমন একনিষ্ঠ সাধক খুব কমই দেখা যায়। মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লাওয়েল্ সাহেব লিখিয়াছেন।

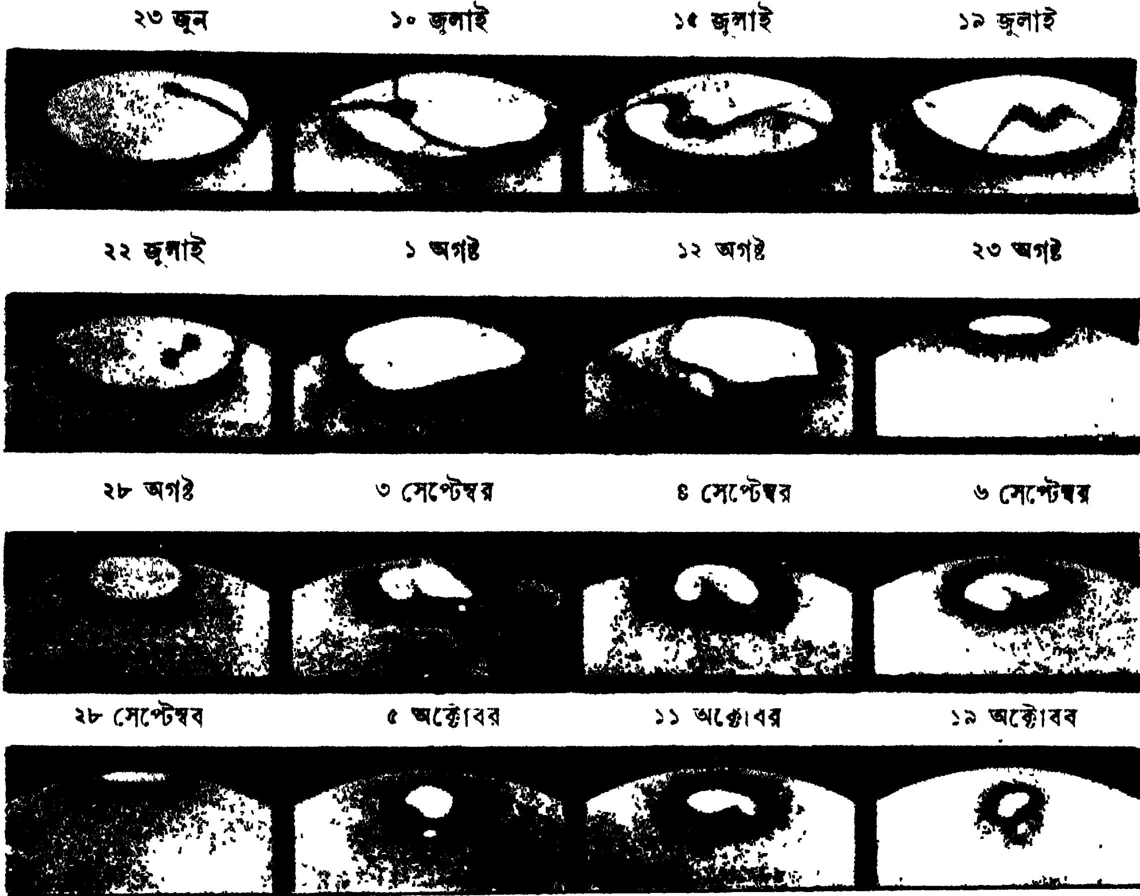


মেক্সিকো দেশে লাওয়েল্ মানমন্দির

সূর্য্য হইতে যে আলোক আসে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া পদার্থবিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সকল মূল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সবগুলিই সূর্য্যে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন যে, এককালে গ্রহগুলি সূর্য্যেরই অংশ ছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পৃথিবী যে যে উপাদানে গঠিত, মঙ্গলেরও সেই সমস্ত উপাদানে গঠিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কোনও একটি পদার্থ সত্য সত্যই মঙ্গলে আছে কি না, তাহা জানিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রমাণের আবশ্যক।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উভয় মেরুর উপর শাদা রঙের আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই শাদা আবরণ দুইটা কি পদার্থ। হার্শেল সাহেব সর্ব্বপ্রথমে অনুমান করেন যে, মেরু দুইটির শাদা "টুপি" (polar caps) বরফের তৈয়ারী। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শাদা আচ্ছাদন দুইটি জমাটবাঁধা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ (carbon dioxide)। এই শাদা আবরণটি কি বরফ, কি কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্, কি অন্য কোনও পদার্থ, এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। শীতকালে টুপিটির আকার বেশ বড় হয়। শীত কমিয়া যেমন গ্রীষ্ম বাড়িতে থাকে, এই টুপিটিও ছোট হইতে থাকে ; শেষ একটি ক্ষুদ্র টুক্‌রামাত্র বাকী রহিয়া যায়। পরে গ্রীষ্ম কমিয়া আবার যখন শীত বাড়িতে থাকে, শাদা আবরণটি পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বের আকার ফিরিয়া পায়। ইহা হইতে মনে হয়, এই 'টুপি'টি এমন কোন পদার্থের তৈয়ারী, যাহা গ্রীষ্মকালে গলিয়া তরল হয় এবং শীতকালে জমিয়া বরফের মত দেখায়। গ্রীষ্মের সময় যখন এই আবরণটি কমিতে আরম্ভ করে, তখন ইহার চারিধারে একটি নীলবর্ণের মণ্ডল (ring) নজরে পড়ে। শীতকালে এই মণ্ডলটি আবার বিলীন হইয়া যায়। অধ্যাপক

পিকারিং (Pickering) পোলারিস্কোপ্ (Polariscope) যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই নীলবর্ণের মণ্ডলটি হইতে যে আলো আসে, তাহার কম্পনগুলি এক সমতল তটেই আবদ্ধ থাকে। পদার্থবিৎ মাত্রেই জানেন, কাঁচ কিংবা কোন মসৃণ তরল পদার্থের সমতল তট (plane surface) মধ্যে মিলাইয়া যায়। শাদা আবরণটি জমাট কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ হইতে পারে না, কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ, সেই চাপের মধ্যে জমাট বাঁধিতে হইলে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের তাপক্রম (temperature)-১১০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নামিয়া যাওয়া আবশ্যক। তাপ যদি আরও কম হয়, তাহা হইলে



মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের তুষারের আবরণ—১৯০৯ খৃষ্টাব্দ

দ্বারা প্রতিফলিত (reflected) আলোকের কেবল এই গুণ থাকে। মণ্ডলটি কাঁচ কিংবা অন্য কোনও কঠিন স্বচ্ছ পদার্থের তৈয়ারী হইতে পারে না, কারণ ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের মণ্ডল কমিতে, বাড়িতে কিংবা বিলীন হইতে পারে না। 'মণ্ডল'টি সেজন্য কোনও তরল পদার্থ দ্বারাই গঠিত হইবে এবং শীতকালে ইহা জমিয়া শাদা টুপির জমাট বাঁধিবার জন্য এই পদার্থের তাপক্রম আরও কম হওয়া দরকার। তোমরা পরে জানিতে পারিবে যে, মঙ্গলেও বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু ইহার চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে অনেক কম। মঙ্গলে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের জমাট বাঁধিতে হইলে তাপক্রম—১৫০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নামিয়া যাওয়া দরকার। রাসায়নিকেরা

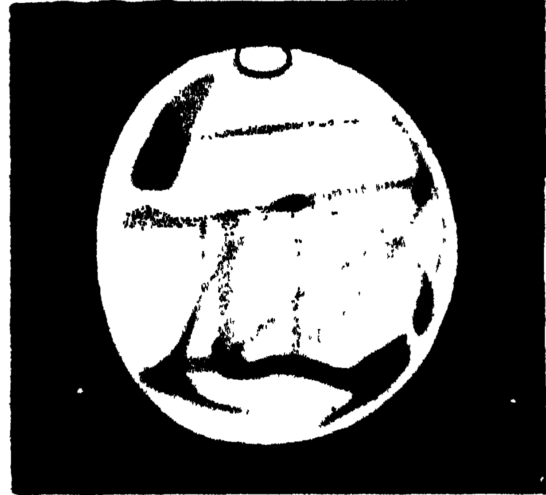
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, চাপ যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের পাঁচগুণের কম হয় এবং এই চাপের মধ্যে জমাট কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ যদি গলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ইহা তরল না হইয়া একেবারে অনিল (gas) অবস্থায় চলিয়া যায়। এদিকে অধ্যাপক পিকারিং দেখাইয়াছেন যে, মঙ্গলের মেরুর শাদা টুপিটি গলিয়া কোনও



অধ্যাপক ই, সি পিকারিং

তরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, শাদা আবরণটি কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডে গঠিত নয়।

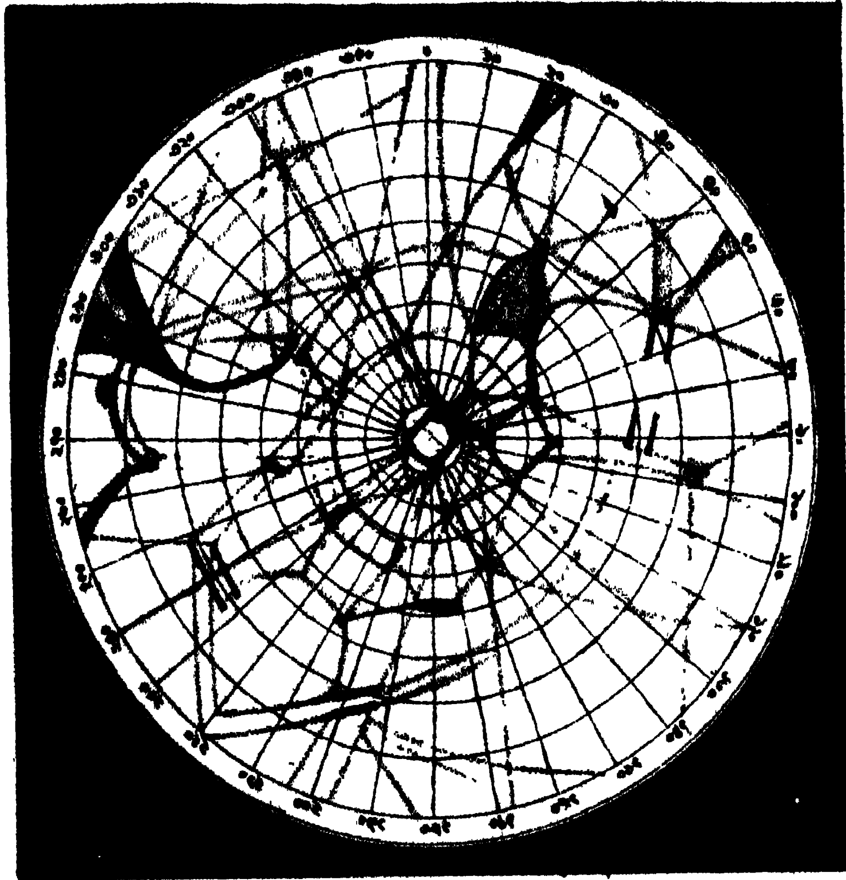
বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান যে, শুভ্রবর্ণের আলোর মধ্যে নানাবর্ণের আলোক আছে। এমন একটি কাঁচের কলম লও যাহার তিনটি পাশ ও তিনটি শির আছে। সূর্য্যের আলো শাদা, কিন্তু এই আলো যদি কাঁচের কলমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার বাহিরে আসে তাহা হইলে উহা আর শাদা না থাকিয়া নানাবর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। এই নানারঙের আলো যদি একটি পর্দ্দার উপর গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহার সুন্দর বর্ণচ্ছটা বা কিরণচিত্র (Spectrum) দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণচ্ছটায় কতকগুলি আঁধার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়—যেগুলিকে ফ্রান্‌-হোফারের (Fraunhofer) রেখা বলা হয়। এই রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে, সূর্য্যে কোন্ কোন্ পদার্থ অনিল অবস্থায় আছে। ১৯১৪ খৃঃ ফ্লাগষ্টাফ্ মানমন্দিরে ডাক্তার স্লাইফার (Dr. Slipher) মঙ্গলের আলোকরশ্মির কিরণচিত্রের এক ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে



১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহকে যেমন দেখা গিয়াছিল (গ্রীনউইচ)

এই কিরণচিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে যখন মেরুর টুপিটি গলিয়া কমিয়া যায় সে সময়ে মেরুর উপরকার বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। মেরুর শাদা আবরণটি যে বরফ এবং গ্রীষ্মকালে ইহার চারিধারে যে নীলমণ্ডলটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে জল, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিবার কারণ নাই। গ্রীষ্মকালে বরফের

বেশীর ভাগ গলিয়া জল হইয়া যায় এবং কিছু অংশ গলিয়া যাইবার পর বাষ্পে পরিণত হয়। শীত কালে মেরুর উপরকার বাতাসে জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হইয়া ও জমিয়া গিয়া মেরুর নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর বরফ হইয়া পড়ে এবং সে-জন্যই মেরুর টুপির আকার বাড়িয়া যায়। আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে, মঙ্গলে জল, বরফ ও বাষ্প তিন বস্তুই আছে।

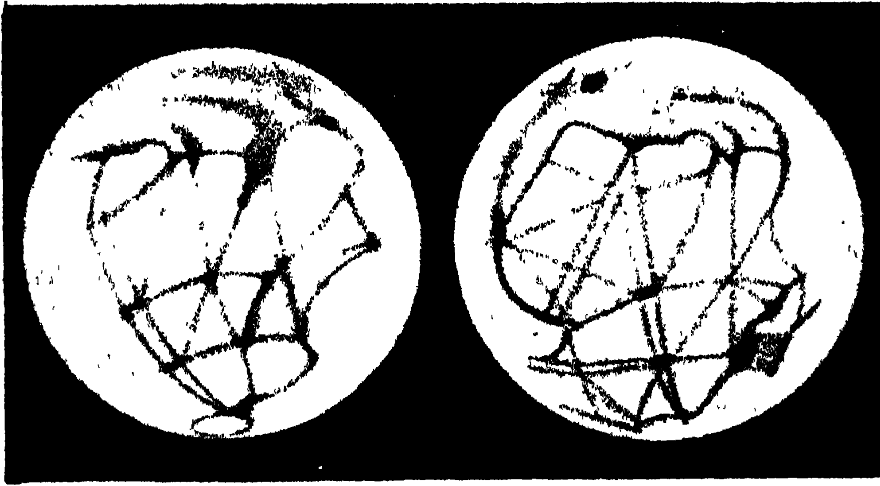


গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের উত্তর মেরু

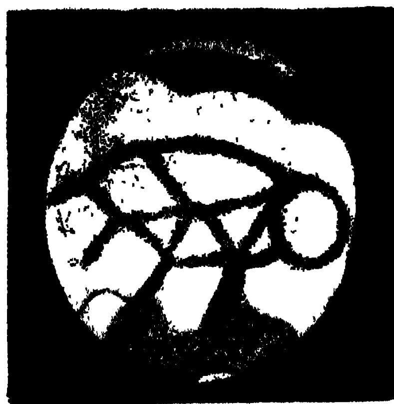
তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মঙ্গলেও বায়ু-মণ্ডল আছে। এখন দেখা যাউক কি কি কারণে বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা মঙ্গলে "সান্ধ্যজ্যোতিঃ"ও (twilight) লক্ষ্য করিয়াছেন। মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল না থাকিলে সেখানে সান্ধ্যজ্যোতিঃ সম্ভব হইত না। বায়ুর ঘনত্বের জন্য সূর্য্যরশ্মির পথ বায়ু-কণাগুলির দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া বাঁকিয়া যায় এবং সেইজন্যই সূর্য্যাস্তের পরও আমরা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সান্ধ্যজ্যোতিঃ দেখিতে পাই। এমন প্রায়ই হয় যে, মঙ্গলে কোনও কোনও অংশ এক সময়ে অতি পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে উহা অস্পষ্ট হইয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পরে আবার উহা স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহা হইতে মনে হয় যে, মঙ্গলের এই সকল অংশ যখন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়, তখন এইগুলি অস্পষ্ট হইয়া উঠে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভাসমান মেঘখণ্ডগুলি সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে এবং নীচে মঙ্গলের গায়ের উপর ইহাদের ছায়া পড়িয়াছে। এই ভাসমান শুভ্রখণ্ডগুলি অনবরত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে—সেজন্য এগুলি মেঘেরই অংশ। বরফে-ঢাকা উচ্চ পর্ব্বতশিখরও অনেক সময় সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করে কিন্তু উহা স্থান পরিবর্ত্তন করে না এবং একই জায়গায় স্থায়িভাবে থাকে। বায়ুমণ্ডল না থাকিলে কুজ্ঝটিকারও উদয় হইত না এবং মেঘগুলিও

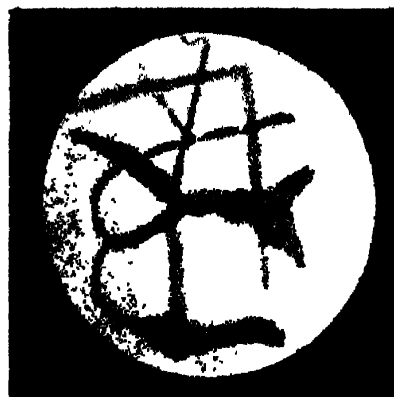
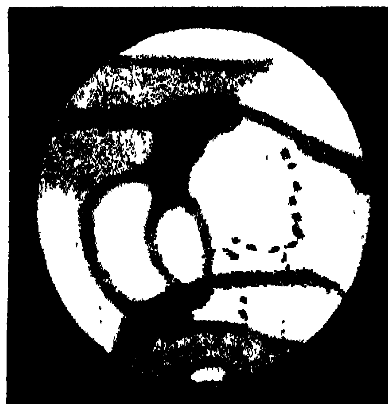
ভাসিতে পারিত না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও কোনও সময় মেঘখণ্ডগুলি মঙ্গলের পিঠ হইতে প্রায় ২০ মাইল উপরে উড়িয়া বেড়ায়। কখনও কখনও হলুদ রঙের মেঘও দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে,ইহা উড্ডীয়মান বালুকারাশি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

মঙ্গলে যে বায়ুমণ্ডল আছে, সম্প্রতি তাহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে —সে বিষয়ে এখন তোমাদিগকে কিছু বলিব। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে মঙ্গলের আলোকচিত্র (photograph) লওয়া হইতেছে। তোমরা অবশ্য জান যে, মঙ্গলের নিজস্ব আলো নাই; সূর্য্যকিরণগুলি মঙ্গলের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া যখন আমাদের কাছে পৌঁছায়, তখন আমরা মঙ্গলকে দেখিতে পাই। এক একটি আলোচিত্র লইবার সময়, ক্যামেরার (camera) মুখে পৌঁছাইবার আগে আলোকরশ্মিগুলিকে একরূপ পর্দ্দার ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই পর্দ্দাকে “রঙের ছাকৃনি” (colourfilter) বলা যাইতে পারে। নানারকম ছাকৃনি হয়। কোনও ছাকৃনি দিয়া কেবল মাত্র লাল রঙের রশ্মি যাইতে পারে বা কোনটা দিয়া কেবল বেগুনি বা অন্য কোনও রঙের আলো যাইতে পারে—এক একটার ভিতর দিয়া কেবল একপ্রকার রঙের আলোই প্রবেশ করিতে পারে। ১৯২৪ খৃঃ আমেরিকার লিক্-মানমন্দিরের অধ্যাপক রাইট্ (Wright) মঙ্গলের দুইটি আলোকচিত্র লইবার সময় দু প্রকার রঙের ছাকৃনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই দুইটির মধ্যে একটা লাল আলো যাইবার ছাকৃনি ও অন্যটি বেগুনি আলো যাইবার ছাকৃনি। লালরশ্মির আলোকচিত্রে মঙ্গলের গায়ের মলিন অংশ ও রেখাগুলি স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু বেগুনি রশ্মির চিত্রে এগুলি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র উভয় মেরুর বরফের ‘টুপি’ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বেগুনি রশ্মির ফটোগ্রাফে মঙ্গলের ছবি একটু বড় দেখায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, লালরশ্মির ও বেগুনিরশ্মির দুই আলোকচিত্রের মধ্যে এত প্রভেদ থাকাতেই বোঝা যায় যে, মঙ্গলে নিশ্চয় বায়ুমণ্ডল আছে। যে কিরণগুলি মঙ্গলের গায়ে পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হয় তাহার মধ্যে লাল রশ্মিগুলি প্রায় সমস্তই মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদিগের নিকটে পৌঁছায়, সে-জন্যই প্রথম আলোকচিত্রে মঙ্গলের গায়ের নানাবিধ দাগ ও মলিন অংশগুলি স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু বেগুনি রশ্মিগুলির বেশীভাগ পুনরায় মঙ্গলের বায়ু-



১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহকে যেরূপ দেখা গিয়াছিল





১৯২০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহকে যেরূপ দেখা গিয়াছিল।

কণার দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায় এবং মঙ্গলের ছবির আকারটা কিছু বাড়াইয়া দেয়। বেগুনি রশ্মিগুলির অতি অল্প অংশই পৃথিবীতে পৌছায়, সে জন্যই দ্বিতীয় ছবিতে মঙ্গলের পিঠের দাগগুলি দেখা যায় না। আমরা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল আছে। রাইট্ সাহেবের মতে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল প্রায় ১০০ মাইল উঁচু। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে য়্যাডামস্ (Adams) ও সেণ্ট জন্ (St. John) নামে দুই জ্যোতিষী মঙ্গলের গায়ে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির বর্ণচ্ছটা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে অম্লজানও পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন কিংবা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস এই বায়ুমণ্ডলে আছে কি না, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

আগেই বলিয়াছি যে, মঙ্গলের উপরিভাগের মলিন অংশগুলি ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদ্লাইয়া যায়। পণ্ডিতেরা এখন বিশ্বাস করেন যে, এই সকল স্থানে গাছ-পালা জন্মায় এবং সেইজন্যই ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অংশের রঙ ও আকার বদ্লায়। মেরুর বরফ যখন গলিয়া কম হইয়া যায় সেই সময় মেরুর নিকটবর্ত্তী ছায়াময় অংশগুলি আরও বেশী মলিন হইতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী ছায়াময় অংশগুলিও অধিক মলিন দেখায়। শরৎকাল শেষ হইয়া গেলে এবং শীত আরম্ভ হইলে এই সকল স্থান ফ্যাকাশে হইতে আরম্ভ করে এবং শীত ঋতুর মধ্যভাগে এই সকল জায়গা অনেকটা বিবর্ণ হইয়া যায়। লাওয়েল সাহেব এই মলিন অংশগুলি অনেকদিন ধরিয়া খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মলিন অংশগুলি দুই তিন বার রঙ্ বদ্লায়। শীতকালে এই স্থানগুলি প্রথমে বাদামী রঙের হয়, পরে বিবর্ণ হইয়া যায়। বসন্তকাল আসিলে এই ক্ষেত্রগুলি ঈষৎ হরিৎবর্ণের হয়, এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহাদের রঙ্ গাঢ় সবুজবর্ণে পরিণত হয়। লাওয়েল সাহেব মঙ্গলের মলিন অংশগুলির রঙ্ পরিবর্ত্তনের এক সুন্দর কারণ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সকল স্থানে শীতকালে গাছের পাতা শুকাইয়া গিয়া বাদামী রঙের হইয়া যায়। যখন এই পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে, তখন গাছের শাখাগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন মেরুর বরফ-গলা জল এই সকল ছায়াময় অংশে আসিয়া পৌছায়, তখন সেইখানকার গাছপালাগুলি সতেজ ও সবুজ হইয়া উঠে। সুইডেনের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আর্হেনিয়াস্ (Arrhenius) মনে করিতেন যে, মঙ্গলের ছায়াময় অংশগুলি বৃক্ষলতা-পরিপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র নয়। তাঁহার মতে নানাপ্রকার দ্রবণীয় লবণ (Soluble Salts) এই সকল স্থানের মাটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। উপরকার বাতাসে যখন জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বাড়িয়া যায়, তখন তাহা আর্দ্র হইয়া উঠে। এই লবণগুলি তখন বাতাস হইতে জলের কণা কাড়িয়া লয় এবং সেজন্যই মাটি ভিজিয়া গিয়া আরও মলিন দেখায়। কিন্তু যখন উপরকার বাতাসে বাষ্পের পরিমাণ খুব কম হইয়া যায়, তখন শুষ্ক বাতাস জলের কণাগুলিকে আবার ফিরাইয়া লয়। সেইজন্য মাটি শুকাইয়া গিয়া পুনরায় বিবর্ণ

হইয়া যায়। আর্‌হেনিয়াস্ সাহেবের অনুমান ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। ঋতু বদ্‌লাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ছায়াময় স্থানগুলি বিভিন্নবর্ণের হয়—কখন ঈষৎ হরিৎ, কখন বাদামী, আবার কখনও বা গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। আর্‌হেনিয়াস্ সাহেবের অনুমান সত্য হইলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা এই মতের অনুমোদন করেন না।

মঙ্গলের গায়ের পাঁচভাগের তিনভাগের রঙ্‌ অনেকটা কমলা লেবুর ন্যায়। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অংশগুলির রঙ্‌ বদ্‌লায় না। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই স্থানগুলি বালুকাপূর্ণ মরুভূমি।

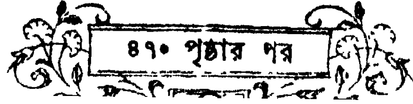
মঙ্গলের গায়ের তাপ কিরূপে মাপিতে পারা যায়, এখন সেবিষয়ে কিছু বলিব। থার্ম্মোকাপল্ (Thermo-couple) নামে অতি সূক্ষ্মযন্ত্র দ্বারাই গ্রহগুলির তাপ মাপিতে পারা যায়। অতি ক্ষুদ্র এক ধাতু-খণ্ডকে প্রদীপের ভুসা দিয়া কালো করিয়া লও। ইহার সঙ্গে বিভিন্ন মিশ্রধাতুর (alloy) দুইটি তার লাগাইয়া দাও। তার দুইটির অন্য প্রান্ত একটি সূক্ষ্ম গ্যালভ্যানোমিটারের (Galvanometer) সঙ্গে যুক্ত করিয়া দাও। তোমরা কেহ কেহ বোধ হয় জান যে, গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রদ্বারা তড়িৎ-ধারা (electric current) মাপিতে পারা যায়। কোন গ্রহের যদি কোন অংশের তাপ মাপিতে হয়, তাহা হইলে সেই অংশ হইতে যে কিরণগুলি আসিতেছে, সে-গুলি এই কালো ধাতুখণ্ডের উপর ফেল। এই কিরণগুলিতে যে তাপ আছে, তাহা এই ধাতুখণ্ডকে অল্প গরম করিয়া দিবে, এবং সেইজন্য এই তার দুইটিতে ক্ষীণ তড়িৎধারা সঞ্চারিত হইবে। গ্যালভ্যানোমিটারের সাহায্যে এই ক্ষীণ তড়িৎধারার পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। এই তড়িৎ ধারার পরিমাণ হইতে গণনা দ্বারা যে অংশ হইতে আলোক কিরণ আসিতেছে তাহার তাপক্রম সহজেই বাহির করিতে পারা যায়। আমেরিকার বুরো অব্ ষ্টাণ্ডার্ড্‌সের (Bureau of Standards) অধ্যক্ষ ডাক্তার কব্‌লেনটস্ (Coblentz) সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র ও অতি সূক্ষ্ম থার্ম্মোকাপল্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার ব্যাস মোটে $\frac{১}{২৫০}$ ইঞ্চ্। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই মঙ্গলের বিভিন্ন অংশের তাপ মাপিতে পারা যায়। সম্প্রতি ডাঃ কবলেন্টস্ ও লাওয়েল মানমন্দিরের ডাঃ ল্যাম্পল্যাণ্ড (Lampland) বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের অংশগুলির তাপ মাপিয়াছেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের তাপক্রম ১৫° হইতে ৫০° ফারন্‌হাইট্ (Fahrnheit) পর্য্যন্ত হয়। দক্ষিণ-শীতোষ্ণ মণ্ডলে(South Temperate Zone) গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তাপক্রম ৬০° হইতে ৭৫° ফারনহাইট হয়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলে (Tropics) তাপক্রম ৬৫° হইতে ৮০° ফারনহাইট পর্য্যন্ত উঠে। উত্তর-শীতোষ্ণমণ্ডলে(North Temperate Zone) এই সময়ে শীতকাল এবং শীতকালেও মধ্যাহ্ন সময়ে এই প্রদেশের তাপক্রম ৩০° হইতে ৬০° পর্য্যন্ত উঠে। উত্তর মেরুপ্রদেশে এই সময়ে শীতকাল; সেখানে দ্বিপ্রহর বেলায় তাপক্রম —৪০° হইতে —১০° ফারনহাইট পর্য্যন্ত হয়। রাত্রিকালে মঙ্গলে প্রায় মেঘের উদয় হয়। সে-জন্য রাত্রিতে তাপক্রম যতটা কমিয়া যাইবার কথা, ততটা কমিতে পারে না। মেঘ না থাকিলে রাত্রিকালে মঙ্গলের উপরিভাগ আরও অনেক বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খৃঃ মঙ্গল যখন অনেক নিকটে আসিয়াছিল, ডাঃ কব্‌লেন্টস্ তখন ইহার বিবিধ অংশের তাপক্রম মাপিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি আশা করেন যে, মঙ্গল আবার যখন খুব নিকটে আসিবে, তখন তিনি আরও

ভাল করিয়া মঙ্গলের নানাস্থানের তাপক্রম মাপিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এক বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের মেরুস্থিত বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে ইহার যাহা তাপক্রম হওয়া উচিত, বৈজ্ঞানিকেরা গণনা করিয়া তাহার চেয়ে অনেক কম তাপক্রম পাইতে লাগিলেন। কোথায় যে ভুল হইতেছে,তাহা তাঁহারা বহুদিন পর্য্যন্ত ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাঃ কব্‌লেণ্টস্ ভুলটা ধরিয়া সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। মেরুস্থিত বরফখণ্ডের রশ্মি-বিকিরণ শক্তি (Radiation) অল্প বলিয়াই সেখান হইতে যে কিরণগুলি আমাদের নিকট পৌঁছায়, তাহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। সেজন্যই পূর্ব্বেকার গণনানুসারে তাপক্রম অনেক কম বলিয়াই বোধ হয়। ডাঃ কব্‌লেণ্টস্ এই গণনার সংশোধন করিয়া মেরুপ্রদেশের তাপক্রমের যে মাপ দিয়াছেন তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। আগেই লিখিয়াছি যে, ডাঃ কব্‌লেণ্টসের মতে মেরু-প্রদেশে গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরবেলায় তাপক্রম ১৫° হইতে ৫০° ফারনহাইট পর্য্যন্ত উঠে এবং শীতকালে মধ্যাহ্নে—১০° হইতে—৪০° ফারনহাইট পর্য্যন্ত নামে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদেরা মঙ্গলকে যত ঠাণ্ডা মনে করিতেন, এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে তাহার চেয়ে মঙ্গল যথেষ্ট বেশী গরম।

আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে, মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল, জল, বরফ, জলীয় বাষ্প, অম্লজান উদ্ভিদ ইত্যাদি আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষার ফলে ইহাও জানা গিয়াছে যে, মঙ্গলের তাপক্রম (Temperature) জীবজন্তুর বাসের উপযোগী। মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প আছে বলিয়াই মঙ্গলের উপরিভাগ বেশী ঠাণ্ডা হইতে পারে না। আগেই বলিয়াছি যে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলের উপরিতলে তাপক্রম যখন ৬০° সেণ্টিগ্রেড হয় তখন জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আমেরিকার আণ্ডেস্(Andes) পর্ব্বতের উপর এবং হিমালয় ও তিব্বতের এমন স্থলে মানুষ বাস করে, যেখানে বায়ুর-চাপ অর্দ্ধেক হইয়া যায়। মানুষও বেলুনে এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখানকার বায়ুর চাপ নীচেকার চাপের তিনভাগের একভাগ মাত্র। ইহা এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, কোন কোন জীব স্বভাবগুণে এমন স্থানেও থাকিতে পারে, যেখানকার বায়ুর চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের এক-চতুর্থাংশ কি এক-পঞ্চমাংশ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে মঙ্গলের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকাংশে জীবজন্তুদের বাসের উপযোগী। কিন্তু সেখানে কোনও প্রাণী সত্যসত্যই বাস করে কি না, তাহার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। মঙ্গলে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে কি না, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উদ্ভিদের বাঁচিবার জন্য এই গ্যাসটির বিশেষ আবশ্যক। মঙ্গলে যখন গাছপালা জন্মায়, তখন মনে হয়, মঙ্গলে এই গ্যাসটিও পাওয়া যায়।



চীনের অর্দ্ধমানব



তোমরা মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষের কথা শুনিয়াছ। এখন তোমাদিগকে চীনের অর্দ্ধ মানবের কথা বলিব। মানুষের পূর্ব্বপুরুষের কথাগুলি আর একবার মনে করিয়া লওয়া যাক। মানুষ বড় হইয়াছে বুদ্ধির বলে। বুদ্ধির বিকাশের জায়গা মাথার মগজের পরিপুষ্টিতে। সুতরাং মগজ যত বাড়িয়াছে ও পাক খাইয়াছে, ততই মানুষের বুদ্ধি বাড়িয়াছে। যতই দেখিবার ও শুনিবার শক্তি বাড়িয়াছে, মগজও আবার সেই সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমে অনুভব করিবার ও অঙ্গ চালনা করিবার ক্ষেত্র বড় হইয়াছে, তারপর বাড়িয়াছে সামঞ্জস্য ক্ষেত্র। গাছ-পালার কোনও নড়িবার শক্তি বিশেষ নাই—দণ্ডহীন প্রাণীর নড়া-চড়া খুবই সীমার মধ্যে, মাছ প্রভৃতি জীবের চলা-ফেরার জন্য মগজের ঘ্রাণের অংশই বেশী ছিল। ভেক-সরীসৃপাদি জীবের রক্ত ঠাণ্ডা বলিয়া তাহাদিগকে শীতের সময়ে নিদ্রায় কাটাইতে হয়। তাই গরম-রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব হইল। তারপর আবার গাছে উঠার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির আধিক্য আসিল এবং মগজের অগ্র-ললাটের কুণ্ডলী বেশ পাক খাইল। ক্রমশঃ দেখা দিল বনমানুষ, তারপর আধামানুষ, সবশেষে মানুষ। ধাপে ধাপে ব্রহ্মরন্ধ্র বাড়িয়া চলিয়াছে, সামঞ্জস্য ক্ষেত্র বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সারা ব্রহ্মরন্ধ্রটা পাকে ভর্ত্তি হইয়াছে ও ওজনে বাড়িয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, মাথার খুলি উঁচুতে, লম্বায়, চওড়ায় বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। এই রকম আয়তন বাড়ার কয়েকটা ধাপ আমরা প্রধানতঃ তিনটা আধামানুষে পাইয়াছি, যথা, চীনের অর্দ্ধ-মানব, যবদ্বীপের কপিমানব ও ইংলণ্ডের পিল্টডাউন গ্রামের উষামানব।

এই সব আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীব শ্রেণী-বিভাগ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই ভাবে করিয়াছেন। জরায়ুজ (mammal)-বর্গে একটি বংশ শ্রেষ্ঠ (Primate), তার মধ্যে স্থান হইয়াছে টার্শিয়াস, নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর বানরাদি, গিবন, বনমানুষ ও মানবগোষ্ঠীর। এই মানব-গোষ্ঠীর (Hominidal) মধ্যে কয়েকটা ভিন্ন শ্রেণী (Species) ও ভিন্ন গণ (Genus) বিভাগ করা হইয়াছে। এখন পৃথিবীতে যত রকমের মানুষ আছে—কি শ্বেতকায় ইউরোপীয়, কি কৃষ্ণকায় নিগ্রো, কি লোহিতকায় চীনবাসী সকলেই এক গোষ্ঠী, এক গণ ও এক শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের পার্থক্য বর্ণ (race)-গত মাত্র, কিন্তু ২০।২৫ হাজার বছর আগেকার মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ছিল। তাহাদের পার্থক্য এখনকার মানুষের মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। অনেকটা যেমন বিড়াল, ব্যাঘ্র ও সিংহের মধ্যে শ্রেণী বা (Species)-এর প্রভেদ আছে। কিন্তু গণ এক Felis, সেইভাবের। আবার আগেকার যে আধামানুষদের কথা বলিলাম, তাহাদের সঙ্গে প্রভেদ অনেক বেশী—যদিও এক গোষ্ঠীর মধ্যে, তথাপি তাহাদের গণ বা Genus

তফাৎ। এই ব্যাপারটি এইভাবে তোমরা বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে সহজ হইবে।

মানবগোষ্ঠী (Hominidal)

গণ		শ্রেণী	বর্ণ
মানব (Homo)		(ক) বুদ্ধিজীবী (Sapiens)	শ্বেত (ইউরোপীয়, আর্য্য, আরব প্রভৃতি স্থানে)
			পীত (চীন, জাপান ও মালয় উপদ্বীপে)
			কৃষ্ণ (আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে)
		(খ) ক্রোম্যাগনন্ প্রভৃতি	বিশ হাজাব বছর পূর্ব্বে।
		(গ) নিয়াণ্ডারটাল (প্রায়মানব)	চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে।
		(ঘ) রোডেশীয়	ঐ
		(ঙ) হাইডেলবার্গ	পঞ্চাশ হাজার " "
		(চ) ওয়াজাক, টালগাই প্রভৃতি	বিশ হাজাব " "
২।	উষামানব (Zonnthropus)	ডসন প্রাপ্ত (Dawsoni)	পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে।
৩।	কপিমানব (Pithecanthropus)	ঋজু (erectus)	২।৪ লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে।
৪।	চীনের অর্দ্ধমানব (Sinanthropus)		ঐ

আমরা প্রথমে শেষটা দিয়া আরম্ভ করিব। ১৯২০ সালে সুইডেনের ভূবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার জে. জি. এণ্ডারসন্ (Dr. Andersson) প্রথমে পিকিঙ সহরের মাত্র ৩৭ মাইল দূরে চুকুতিয়াঁ (Chou-kowtien) নামক গ্রামে প্রায়াধুনিক বা Pleistocene যুগের প্রথম ভাগের নানা জীবজন্তুর পাথরের শক্ত শক্ত হাড় বা প্রশীল পান। ১৯২৬ সালে তাঁহার সহকর্ম্মী জার্ম্মানীর ডাক্তার জেডিন্স্কি (Dr. Zdansky) ছুইটি পুরাতন মানুষেব দাঁতপান। পর বৎসর অক্টোবর মাসে ডাক্তার বলিন (Dr. Bohlin) নীচের চোয়ালের একটা দাঁত পান। এইটা দেখিয়াই পিকিঙ মেডিক্যাল কলেজেব অধ্যক্ষ সাব্যস্ত করেন যে, এই দাঁত কোনও প্রাচীন আধামানুষের ও তিনি তাহার নামকরণ করেন Sinanthropus বা চীনেব অর্দ্ধমানব। ১৯২৮ সালে নিম্ন চিবুকের কিছু ও আরও চারিটি দাঁত পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলির উপরিভাগেরও


পিকিং মানুষের দাঁত


কপিমানবের মাথার খুলি

কিছু পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌভাগ্যক্রমে এই আধামানুষের প্রায় সমস্তটা মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে।

চীনের অর্দ্ধমানবের মাথার খুলি

আগেই বলা হইয়াছে যে, মগজ যতই বাড়িয়াছে ততই মাথার খুলি বড় হইয়াছে। এই চীনের আধামানুষটির মাথার খুলি ও করোটির অন্য সব ভাগ কতকটা বেশ এখনকার মানুষের মত। লম্বায়

পিকিং মানুষের মাথার খুলির উপরের অংশ

১৯০ মিলিমিটির ও চওড়ায় ১০০ মিলিমিটির, আধুনিক মানুষের করোটির সঙ্গে ইহার প্রায় মিল আছে। কিন্তু মাথার তালু তত উচ্চ নয়—আধুনিক মানুষে উহা প্রায় ১১০ মিলিমিটির, ইহাতে মাত্র ৭৬ মিলিমিটির। কিন্তু যবদ্বীপের কপিমানবের তুলনায় ইহার মাথার তালুর উচ্চতা ২ মিলিমিটির বেশী। মগজের পরিমাণটা দেখিলে কেন ইহাকে আধামানুষ বলিতেছি, বুঝা যাইবে। গিবন বা

কপি মানবের মাথার খুলি

উল্লুকজাতীয় জন্তুদের মগজের পরিমাণ ৮০ হইতে ১৫০, বনমানুষদের ২৯০ হইতে ৬৫০, আধুনিক মানবে ইহা ১০০০ হইতে ১৯৫০ ঘন সেণ্টিমিটির। কিন্তু যবদ্বীপের কপিমানবে ইহার পরিমাণ ঠিক

রোডেশিয়ান

মাঝামাঝি প্রায় ৮০০ হইতে ৯০০ ও চীনের অর্দ্ধমানবে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী—প্রায় ১০০০ ঘন সেণ্টিমিটির। ইংলণ্ডের উষামানবের মগজের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশী; তবে তাহার চিবুক ও চোয়াল একেবারে বনমানুষের মত, তাই তাহাকেও আধামানুষ বলিয়া ধরা যায়।

আরও অনেক বিষয়ে এই চীনের আধামানুষ কপিমানবের মত। বনমানুষে প্রায়ই দেখা যায়

যে, ভ্রূর উপরের উঁচু জায়গা একটানা ও খুব উঁচু অর্থাৎ তাদের ভ্রূতুঙ্গ বা suprorbital ridge আছে। এটা প্রায়মানবে বা নিয়াণ্ডারটালে ও কপিমানবে এতদিন ধরা পড়িয়াছিল। উষামানবে ইহা মোটেও নাই কিন্তু চীনের অর্দ্ধমানবে ইহা বেশ আছে। ইহার প্রস্থের পরিমাণ ১০৯, কপিমানবে প্রায় ১০৩, নিয়াণ্ডারটাল প্রায়মানবে ১১৯ ও রোডেশীয় মানবে ১২৯ মিলিমিটর।

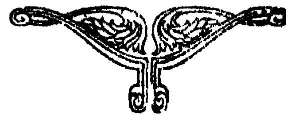


পিথেনথ্রোপাস মানুষ

উপর হইতে মাথার খুলি ও করোটি দেখিলে দুইপাশে গণ্ডমূলে চিহ্নস্থানের (temporal lines) দূরত্ব বর্ত্তমান মানুষে দেখা যায় ৯৮, নিয়াণ্ডারটাল প্রায়মানবে ১০০, চীনের অর্দ্ধমানবে ৮৩ ও কপিমানবে ৮৪ মিলিমিটর। এই হিসাবে চীন ও যবদ্বীপের আধামানুষ দুটি খুব কাছাকাছি বোধ হয়।

পশ্চাৎ হইতে দেখিলে এই অর্দ্ধমানবে কতকগুলি বানরের মত লক্ষণও দেখা যায়। যেখানে গ্রীবাদেশে মস্তিষ্কে যুক্ত হয় তাহার পরিসর ইহাতে প্রায় ১৪৫ মিলিমিটর। করোটির পৃষ্ঠাস্থি বা Occipital bone প্রস্থে ১৩২ মিলিমিটর, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি—গ্রীবাসংযোগ স্থলের উপরিভাগ উহার ৫১ মিলিমিটর—কপিমানব অপেক্ষা ২০ মিলিমিটর অধিক ও নিয়াণ্ডারটাল অপেক্ষা ৯ মিলিমিটর কম। করোটির পার্শ্বাস্থি বা parictal bone হইতেও দেখা যায় যে, উপরের দিকে সঙ্কুচিত। বর্ত্তমান মানুষে এই পার্শ্বাস্থি বেশী প্রসারিত ও পৃষ্ঠাস্থি প্রস্থে অল্প কিন্তু খাড়াইয়ে অধিক হইয়াছে। সুতরাং চীনের অর্দ্ধমানব ও কপিমানব দুইটিই প্রায় এক রকমের—আধামানুষ ও বর্ত্তমান মানুষ হইতে ভিন্ন।

চোয়ালের নিম্নাংশ ও দন্ত কয়েকটি দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সব অংশ এই আধামানুষে অনেকটা বর্ত্তমান মানুষের মত; অন্ততঃ উষামানব ও হাইডেলবার্গ মানব অপেক্ষা উন্নত। এই আধামানুষের চোয়াল ও চিবুকও মাঝামাঝি রকমের। বনমানুষের এই চিবুকের লেশমাত্র নাই; হাইডেলবার্গ ও উষামানবের চিবুক প্রায় তাহাদেরই মত। চীনের অর্দ্ধমানবের অল্প চিবুক আছে। ভিতরের দিকে কিন্তু চিবুক খাদ বা genial pit প্রায় বনমানুষদের মতই আছে।





ফুলের ফসল

তোমরা সকলেই ফুল ভালবাস কারণ, ফুল দেখিতে সুন্দর; শুধু কি তাই? না, তাহা নয়। কারণ, পঞ্চমালায় তোমরা সকলেই পড়িয়াছ যে, মতি যখন তাহার পিতাকে বলিল, সব ফুলের চেয়ে রাঙ্গা পলাশ ফুল ভাল, তখন তাহার পিতা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ফুলের প্রকৃত গুণ তাহার সুন্দর গন্ধ। কিন্তু তোমরা বোধ হয়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, গোলাপ ফুল ভিন্ন অধিকাংশ সুগন্ধ ফুলের রং শাদা এবং দেখিতে তত ভাল নয়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, ফুলের গন্ধের সহিত তাহার রঙ্গের ও চেহারার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। গাছ হইতে তুলিবার পর প্রায় সকল ফুলেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ থাকে। এমন কি, ফুল শুকাইয়া গেলেও অনেক সময় তাহার গন্ধ একেবারে উড়িয়া যায় না।

তোমাদের অনেকেরই হয়ত ধারণা যে, গন্ধ শুধু ফুলেই থাকে, কিন্তু তা নয়। এমন অনেক গাছ আছে যাহার পাতায়, কচি ডালে, এমন কি, শুষ্ক কাষ্ঠে পর্য্যন্ত সুগন্ধ পাওয়া যায়। তুলসীর পাতায় ও কচি ডালে বেশ সুন্দর গন্ধ, দারুচিনির গন্ধ তাহার গাছের ছালে, চন্দনের গন্ধ তাহার কাঠে, খসখসের গন্ধ তাহার শিকড়ে, লেবু ও কমলার গন্ধ তাহার ফলে, জিরে, মৌরী ইত্যাদির গন্ধ তাহার বীজে এবং ধূপ ও ধুনায় গন্ধ গাছের আঠায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, প্রায় সকল প্রকার ফুল ইত্যাদির গন্ধ দেশ ও আব্‌হাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

এখন তাহা হইলে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, গন্ধ কি জিনিষ এবং কেন হয়? "গন্ধ কি জিনিষ" তাহা বোধ হয় কতকটা বলিতে পারা যায়। কিন্তু কেন হয়, ইহা বলা বড়ই কঠিন। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।

তোমরা বোধ হয় জানিতে চাও যে, ফুলের ভিতর হইতে তাহার গন্ধ বাহির করিতে পারা যায় কি না? হাঁ, তাহা পারা যায় ও সকল প্রকার সুগন্ধ ফুল ইত্যাদি হইতে তাহার গন্ধ পদার্থ বাহির করা হইয়াছে। অধিকাংশ গন্ধ পদার্থ দেখিতে তেলের মত কিন্তু প্রভেদ এই যে, গন্ধ তেল গরম বাষ্পের সহিত উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং সাধারণ তেল যেমন—তিল, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি, তাহা পারে না। এইজন্য গন্ধ-তেলকে 'আতর' (essential oil) বা (Volatile oil) ও সাধারণ তেলকে স্থায়ী (fixed oil) কহে।

ফুল, ফল ইত্যাদিতে এই গন্ধ-তেলের পরিমাণ অতিশয় সামান্য, কিন্তু আতরের গন্ধ এত তীব্র যে, ক্ষুদ্র পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তাহা বেশ পাওয়া যায়।

তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, প্রায় ৪০০০ গোলাপ ফুল হইতে এক ফোঁটা আতর পাওয়া যায় কিংবা একমণ খসখস ঘাস হইতে বড় জোর তিন ছটাক আতর বাহির হয়।

গন্ধ পদার্থ বাহির করিবার উপায়

গন্ধ পদার্থ বাহির করিবার উপায় মোটের উপর তিন প্রকার, যথা—(১) বাষ্প দ্বারা, (২) হাত বা যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া এবং (৩) কোন তরল পদার্থের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া। এই তিন উপায়ের ভিতর বাষ্পের সাহায্যে বাহির করাই পুরাতন প্রথা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) যখন ফুল ইত্যাদি কোন পাত্রের ভিতর রাখিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করা হয়, তখন ফুল হইতে আতর বাহির হইয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। পরে যখন এই মিশ্রিত বাষ্প আবার ঠাণ্ডা করা হয় তখন আতর জলের উপর ভাসিয়া থাকে ও সহজেই জল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট যে জল থাকিয়া যায় তাহাও খুব সুগন্ধ-যুক্ত হয় এবং ইহাই তোমাদের পরিচিত "গোলাপজল", "কেওড়ার জল" ইত্যাদি। ফুলের নাম অনুসারে এই জলের এইরূপ নামকরণ করা হয়। এই উপায়ে গোলাপ, কেওড়া, লেভেণ্ডার (Lavender), মোতিয়া, খসখস, চন্দন, জোয়ান ও আরও অনেক দ্রব্য হইতে আতর বাহির করা হয়। ইহাতে যন্ত্রাদির আবশ্যকতা খুব কম সুতরাং খরচও খুব অল্প এবং যন্ত্রাদি যাহা লাগে তাহাও সহজ উপায়ে চালান যাইতে পারে। এইজন্য আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপায় অবলম্বন করা হয়। একটি তাম্র বা লৌহ পাত্রে ফুল বা ঘাস ভরিয়া তাহাতে খানিক জল ঢালিয়া দিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দেওয়া হয়। উনানে আঁচ অল্প রাখা হয়। পাত্রের মুখের উপর এমন এক ঢাকনা থাকে যাহাতে কেবলমাত্র একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র হইতে একটি কাঠের বা তামার নল বাহির করিয়া অপর একটি নলের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়, এই দ্বিতীয় নলটি বেশ লম্বা ও একটি জলের চৌবাচ্চার ভিতর রাখিয়া সর্ব্বদা ঠাণ্ডা করা হয়। নলের অপর মুখের নীচে একটি পাত্র রাখিয়া নলের ভিতর হইতে যাহা বাহির হয় তাহা সংগ্রহ করা হয়।



চোয়াইয়া ফুল হইতে আতর বাহির করা হইতেছে

বলা বাহুল্য যে, এই উপায়ে আতর বাহির করিতে হইলে খুব সাবধানে কাজ করিতে হয়। কারণ, যদি কোন সময় আগুনের উত্তাপ বেশী হয় তাহা হইলে আতরে একরূপ পোড়াগন্ধ আসে এবং সেই আতরের মূল্য অনেক কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য কারণের জন্য আধুনিক কারখানায় জলীয় বাষ্প ফুলের পাত্র হইতে অন্যত্র উৎপাদন করিয়া (steam boiler) পরে ফুলের ভিতর দেওয়া হয়। অনেক সময় ইহা ব্যতীত ফুলের পাত্রটি আর একটি পাত্রের ভিতর বসান থাকে। এই দ্বিতীয় পাত্রের ভিতর দিয়া বাষ্পাধার হইতে বাষ্প আনাইয়া ফুলের পাত্রটি গরম রাখা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে ফুল কোন ক্রমেই অধিক মাত্রায় গরম হইয়া পুড়িতে পারে না।

কেবলমাত্র লেবুর খোসার গন্ধতেল চাপ প্রণালীতে বাহির করা হয়। তোমরা হয়ত

ইটালী প্রদেশের নাম অনেকেই শুনিয়াছ। এখনও ইটালীর দক্ষিণভাগে ও সিসিলি দ্বীপে এই উপায়ে লেবুর গন্ধ বাহির করা হয়। বেশীর ভাগ গন্ধরস হাত দিয়া নিঙড়াইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনেক ফুল ও লতা-পাতা হইতে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে আতর বাহির করা যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা হইতে এই উপায়ে আতর বাহির করিতে গেলে আতরের গন্ধ অল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ হইবার বোধ হয় প্রধান কারণ এই যে, এ সকল গন্ধবস্তু এত কোমল ও সূক্ষ্মস্পর্শী যে, তাহা জলীয় বাষ্পের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উষ্ণ জলীয় বাষ্প ব্যবহার না করিয়া অপর কোন তরল বস্তু বা কোন রকম তেল, বা মোম বা চর্ব্বি, ঠাণ্ডা বা গরম অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে আজও কনৌজের লোকেরা সাদা তিল ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পরে তাহা বেলা, চামেলী ইত্যাদি ফুলের সহিত রাখিয়া দেয়। এইরূপে ফুলের গন্ধ তিলে প্রবেশ করে; পরে এই তিল যন্ত্রে পিষিয়া তেল বাহির করে ও এই তেল "সুগন্ধিত চামেলীর তেল" বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। বলা বাহুল্য যে, এই চামেলীর তেলে আসল চামেলীর গন্ধ আতর খুব অল্প থাকে। প্রায় সবটাই খাঁটি তিলের তেল। আধুনিক বড় বড় কারখানায় তিলের পরিবর্ত্তে ভাল চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়। ফুলের গন্ধ-ভরা চর্ব্বিকে পমেড (Pomade) কহে। এই পমেড হইতে আসল আতর বাহির করিতে হইলে পমেড ও সুরা (alcohol) এক সঙ্গে মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, চর্ব্বি হইতে গন্ধ বাহির হইয়া সুরায় চলিয়া গিয়াছে। যেহেতু চর্ব্বি সুরার সহিত মিশ্রিত হয় না, অতএব উহা সহজেই পৃথক করিয়া ফেলিতে পারা যায়। এই উপায়ে ফুল হইতে গন্ধ বাহির করাকে "Enflemage process" কহে। জুই, বেলা, চামেলী, রজনীগন্ধা ইত্যাদির আতর এই উপায়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় বাহির করা হয়।



মাডাগাস্কার দ্বীপে লিমন ঘাসের চাষ

আর এক প্রকার প্রণালীতে আতর বাহির করা হয়—যাহাকে "solvent extraction process" বলে। প্রায় সকল পদার্থেরই আতর সুরা, Petroleum ether) অথবা "chloroform"র মত তরল পদার্থে খুব বেশী রকম দ্রব (soluble), সুতরাং এই সকল তরল পদার্থের সহিত ফুল রাখিয়া অল্পবিস্তর গরম করিলে ফুল হইতে গন্ধ বাহির হইয়া যায়। পরে ছাঁকিয়া ফুল ফেলিয়া দিয়া গরম করিলে তরল solvent বাহির হইয়া যায় ও আতর থাকিয়া যায়।

এখন বোধ হয় তোমরা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ যে, কি উপায়ে ফুল ইত্যাদি হইতে তাহার গন্ধ বাহির করা হয়।

এইবার তোমাদিগকে ভাল, দামী আতরের বিষয় কিছু বলিব। তোমাদের ভিতর এমন কেহই নাই যাহার গোলাপের গন্ধ ভাল না লাগে। সুতরাং সকল ফুলের চেয়ে গোলাপের গন্ধের আদর

বেশী ও গোলাপ ফুলের চাষ সব ফুলের চেয়ে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। যদিও গোলাপের চাষ অনেক দেশেই হইয়া থাকে কিন্তু বুলগেরিয়াতে (Bulgeria) ইহা একরূপ সরকারী ব্যবসা। "গোলাপের অটো" (otto of rose) বুলগেরিয়া ছাড়া অন্য দেশে খুব অল্প তৈয়ার করা হয়।

এদেশে প্রায় ১৬,০০০ একর্ (acre) জমিতে গোলাপের চাষ হয়। ফুলের সময় (Season) মে মাস ও জুনের কয়েক দিন পর্য্যন্ত। এদেশে ছোট-বড় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪০টি "otto" বাহির করিবার কারখানা আছে। ফুল তোলা প্রত্যহ ভোর বেলা সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করিয়া থলের ভিতর ভরিয়া বাগান হইতে কারখানায় পাঠান হয়। এখানে ইহা বড় বড় লোহার বাসনের ভিতর পুরিয়া জলীয় বাষ্পের সাহায্যে চুয়ান (distil) হয়। এইরূপে প্রথমে গোলাপজল প্রস্তুত হয়। ইহাতে ottoর মাত্রা বড় অল্প সুতরাং এই গোলাপজল নূতন ফুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আবার 'distil' করা হয়। এইরূপে অন্ততঃ তিনবার নূতন ফুলের সহিত ফুটাইবার পর যে গোলাপের জল প্রস্তুত হইল, তাহা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিলে গোলাপের গন্ধতেল বা otto উপরে ভাসিয়া উঠে এবং অতি যত্নের সহিত আস্তে আস্তে অপর একটি পাত্রে বাহির করিয়া লওয়া হয়। যে জল রহিয়া গেল তাহাই "গোলাপ জল"।



ল্যাভেণ্ডার ফুলের চাষ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোলাপের আতর ছোট ছোট পাত্রে বাগানের ভিতরেই বাগানের মালিকগণ নিজেই বাহির করিয়া লইতেন, কিন্তু আজকাল কয়েকটি বড় বড় কারখানা হইয়াছে। এই সকল কারখানার ফুল চোয়াইবার পাত্র আকারে এত বড় যে, তাহাতে একবারে প্রায় ২০ মণ ফুল লইতে পারা যায়। একটি কারখানায় এইরূপ একশত পাত্র এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশে গোলাপ হইতে প্রধানতঃ গোলাপ জলই প্রস্তুত করা হয় এবং ইহা পুরাতন প্রথাতেই করা হয়। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিলাতী "otto" ও আমাদের দেশের "আতরে" অনেক প্রভেদ। "otto" আসল গন্ধ দ্রব্য, কিন্তু আতরে আসল গন্ধ দ্রব্যের সহিত অন্য জিনিষ—প্রধানতঃ চন্দনের তৈল মিশ্রিত থাকে। গোলাপ ফুলে আসল গন্ধ পদার্থের পরিমাণ খুব অল্প। প্রায় ১০০ মণ ফুল হইতে এক সের "Otto" বাহির করিতে পারা যায়। সুতরাং গোলাপের "Otto"র দাম খুব বেশী এইজন্য ইহাতে ভেজাল দিবার খুব চেষ্টা করা হয়। ভেজাল দেওয়ার সুবিধাও খুব, কারণ, ভেজাল ধরা খুব কঠিন। ইহাতে কি ভেজাল দেওয়া হয় তাহা জানিবার কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। ইহা বোঝা একটু শক্ত এবং বুঝিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রে সামান্য জ্ঞান থাকা দরকার। গন্ধদ্রব্যমাত্রই এমন জিনিষ যে তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা সম্ভব। যে কোন ফুল বা ফলের গন্ধবস্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে

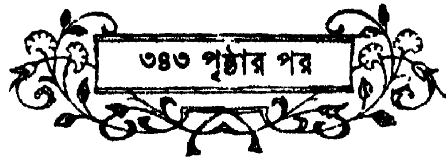
তাহার বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ জানা যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ কাজের ভিতর (chemical analysis) ইহা বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত, তথাপি রাসায়নিক পণ্ডিতদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক-গুলি ফুলের গন্ধের বিষয় অল্পবিস্তর জানা গিয়াছে। সুতরাং এ সকল পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়া বা অপর কোন সস্তা ফুল, ঘাস, পাতা বা গাছ-গাছড়া হইতে বাহির করিয়া পরে পরিমাণ মত মিশ্রিত করিলে এমন জিনিষ প্রস্তুত হয় যাহা অনেকটা আসল ফুলের "Otto"র

ফুল হইতে অটো বাহির করণ

গন্ধের সহিত সাদৃশ্য রাখে। এইরূপে প্রস্তুত গন্ধ আসল ফুলের গন্ধের মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত, তবে প্রস্তুতকারকের নিপুণতার উপর জিনিষের গুণ খুব বেশী রকম নির্ভর করে। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, মিশ্রিত আতর যতই ভাল হইবে, ততই তাহার মধ্যে ফুলের আসল আতরের পরিমাণ বেশী থাকিবে। সাধারণের বিশ্বাস যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তুত গন্ধ দ্রব্যের সৃষ্টির জন্য ফুল হইতে বাহির করা আতরের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে বরং ফুলের আতরের প্রস্তুতকার্য্য ও তাহার ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধে এমন এক তীব্র ভাব থাকিয়া যায়, যাহা আসল ফুলের গন্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোমল ও প্রীতিকর করিতে পারা যায় না। এইবার তোমাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের সেণ্টের (Scent or Perfume) কি কি গুণ হওয়া উচিত এবং সেজন্য কি প্রকারের গন্ধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, এই বিষয়ে কিছু বলিয়া শেষ করিব। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, অধিকাংশ সেণ্ট ব্যবহার করিবার অল্প সময়ের ভিতরই গন্ধ উড়িয়া যায় কিন্তু বেশী দামী সেণ্টে তাহা হয় না বরং গন্ধ কয়েকদিন অল্পবিস্তর থাকিয়া যায়। সকল প্রকার "সেণ্ট" কয়েকটি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে blending কহে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মিশ্রিত গন্ধ মধুর, স্থায়ী ও প্রীতিকর হইবে। পরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে, কতক-গুলি গন্ধদ্রব্যের সহিত যে কোন গন্ধ মিলাইয়া দিলে এই মিশ্রিত গন্ধ বেশ স্থায়ী হয়। এইরূপ দ্রব্যকে "Fixative" কহে। চন্দনের তেল, খস্‌খস্‌ ও কস্তুর বেশ ভাল fixative ও প্রায় অধিকাংশ "সেণ্টে" অল্পবিস্তর পরিমাণে থাকে।



উদ্ভিদের খাদ্য ও উহার গ্রহণ-প্রণালী



তোমরা জান যে, আমরা চারিদিকে যে সকল গাছ-পালা, তরুলতা দেখি, উহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলে। উহারা সাধারণতঃ মাটিতেই জন্মে। ইহাও তোমরা জান, আমরা সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই, বীজ হইতেই উহাদের উৎপত্তি হয় এবং উহাদের চারিটি প্রধান অংশ থাকে। যথা—(১) শিকড়, (২) কাণ্ড, (৩) পাতা, (৪) ফুল। ফুলই অবশেষে ফলে পরিণত হয় এবং ফলের মধ্যেই বীজ থাকে; সেইজন্য ফুল, ফল ও বীজকে একটি অংশ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহাদের প্রথম তিনটি অংশকে উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীল অংশ ও চতুর্থটিকে বংশরক্ষক অংশ বলে। বীজ উৎপন্ন করাই উদ্ভিদের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, বীজ হইতেই উহাদের বংশ বাড়ে। ইহাও তোমরা জান যে, বীজ হইতে অঙ্কুর; অঙ্কুরের যে অংশ মাটির দিকে যায় তাহা হইতে শিকড় এবং যে অংশ আকাশের দিকে উঠে, তাহা হইতে কাণ্ড; ক্রমে কাণ্ড হইতে ডালপালা, পাতা ও ফুল বাহির হয়। অবশেষে ফুল হইতে ফল ও বীজ পাওয়া যায়।

যদিও প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তোমরা জান, যাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদিগকে প্রাণধারণের জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য ও খাদ্য গ্রহণ করিতেই হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের কত প্রয়োজনীয়, তাহা তোমরা দুই এক মিনিট কাল নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমরা না খাইয়া অল্প কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতিরেকে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, বলিলেই চলে। এইজন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের আর একটি নাম জীবন। যতক্ষণ আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করিতে পারি ততক্ষণই আমরা বাঁচিয়া থাকি ও আমাদের শরীর গরম থাকে, উহা বন্ধ হইয়া যাইবামাত্র আমাদের শরীর শীতল হইয়া যায় ও আমরা মরিয়া যাই, সেইজন্য মৃত্যু হইলে ইংরাজীতে বলে "Breathed his বা her last" অর্থাৎ সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া কাহাকে বলে, তোমরা জান কি? ইহা তোমরা নিশ্চয়ই জান যে বাতাস না থাকিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতে পারে না। আমাদের চারিধারেই সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে বাতাস রহিয়াছে, বলিতে গেলে আমরা বাতাসের মধ্যে ডুবিয়া আছি। এমন কি, একটি ছিপি বন্ধ-করা খালি শিশির ভিতরকার সমস্ত অংশই বাতাস অধিকার করিয়া থাকে, তোমাদের মনে আছে ত যে, শক্ত মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির মাঝখানের ফাঁকের মধ্যেও বাতাস ঢুকিয়া আছে। ইহা হইতেই তোমরা বাতাসের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারিবে। আমরা দিবারাত্র—কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত, সকল অবস্থায় আমরা নাসিকার দ্বারা

বাতাস গ্রহণ করিয়া শরীরের মধ্যে চালনা করিয়া দিতেছি। এই বাতাসে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান বাষ্প আছে; নিঃশ্বাসের দ্বারা বাতাস হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই অম্লজান বাষ্পের কতক অংশ আমাদের দেহের গঠন কার্য্যে লাগে ও শরীরের উত্তাপের সৃষ্টি করে। অবশিষ্ট অংশ আমরা আমাদের শরীর হইতে বাহির করিয়া দিই; কিন্তু উহা তাড়া খাইয়া বাহির হইয়া আসিবার সময় একাকী আসিতে পারে না, একটি বন্ধুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিয়া আসে অর্থাৎ শরীরের ভিতরকার অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া যৌগিক অবস্থায় অঙ্গারক বাষ্পরূপে বাহির হইয়া আসে। বাতাসের অম্লজান-বাষ্প গ্রহণ করা ও উহার অকেজো অংশ অঙ্গারক বাষ্পরূপে বাহির করিয়া দিবার নামই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া। ইহা দ্বারা শরীরের উত্তাপের সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহাকে দহন ক্রিয়াও বলে।

প্রাণধারণের জন্য প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদ্-দিগকেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিতে হয় অর্থাৎ তাহাদিগকেও বাতাস হইতে অম্লজান গ্রহণ ও উহার অকেজো অংশ শরীর হইতে অঙ্গারক বাষ্পরূপে বাহির করিয়া দিতে হয়। এই কথায় তোমরা প্রথমেই হয় ত খুব হাসিবে ও বলিবে উদ্ভিদের নাক কোথায়? আমাদের মত তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য একটি মাত্র যন্ত্র অর্থাৎ নাসিকা নাই, তাহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রগুলিও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। তবে জানিয়া রাখ যে, উহাদের দেহের প্রত্যেক অংশ—শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিতেছে; এমন কি, বীজ ও কুঁড়িকেও এই কার্য্য করিতে হয়। তোমাদের বাড়ীতে হাঁড়ির মধ্যে যে সকল শুক্‌না বীজ থাকে, তাহারাও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে।

উদ্ভিদেরা যে তাহাদের সকল অংশ দিয়া বাতাস হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ ও উহার অকেজো অংশ শরীরের ভিতর হইতে অঙ্গারক বাষ্পরূপে বাহির করিয়া দিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা দুইটি পরীক্ষা করিলে তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। এই দুইটি পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে তোমরা জানিয়া রাখ যে, বাতাসের অম্লজান-বাষ্প ছাড়া আগুন জ্বলিতে পারে না এবং স্বচ্ছ ও নির্ম্মল চূণের জল অঙ্গারক বাষ্পের সহিত মিশিলে উহার রং দুধের মত শাদা হইয়া যায়। দুইটি বড় মুখওয়ালা বোতল লও; যে কোন গাছের কতকগুলি বীজ (ছোলাই ধর না কেন) জলে ভিজাইয়া একটি বোতলে রাখিয়া উহার মুখ শক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া দাও। অপরটিতে কতকগুলি ভিজা পাথরের কুচি রাখিয়া ঐরূপে শক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া দাও। একদিন পরে যে বোতলটিতে বীজ দিয়াছিলে উহার ছিপি একটুখানি ফাঁক করিয়া একটি দেশলাইএর কাঠি জ্বালিয়া বোতলটির ভিতরে দিলে দেখিবে যে, দেশলাইএর কাঠিটি নিভিয়া যাইবে। কিন্তু অপর বোতলটিতে যাহাতে পাথরের কুচি ছিল, উহার ভিতরে একটি জ্বালা দেশলাইএর কাঠি দিলে, উহা নিভিয়া যাইবে না। ইহাতে তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, যে বোতলটিতে বীজ রাখিয়াছিলে সেই বোতলটির মধ্যে অম্লজান-বাষ্প নাই বলিয়াই দেশলাইএর কাঠিটি নিভিয়া গেল। ভিজা বীজগুলি তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বোতলের মধ্যের বাতাস হইতে তাহার অম্লজান বাষ্প সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। পাথরের কুচিগুলির প্রাণ নাই বলিয়া তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দরকার হয় নাই। সেইজন্য বোতলের ভিতরকার বাতাসের অম্লজান-বাষ্প কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। সুতরাং কাঠিটি নিভিয়া যায় নাই।

আবার ঐরূপ দুইটি বোতলের একটিতে যে কোন গাছের কয়েকটি ফুলের কুঁড়ি রাখিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া দাও। অপরটিতে পাথরের কুচিগুলি দাও। দুইটি বোতলকে অন্ধকার স্থানে একদিন রাখিয়া দাও। একদিন পরে যে বোতলটিতে ফুলের কুঁড়িগুলি দিয়াছিলে, অতি সাবধানে তাহার ছিপি একটুখানি তুলিয়া খানিকটা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল চূণের জল ঢালিয়া দাও। দেখিবে যে, ঢালিবামাত্র চূণের জলের রং দুধের মত শাদা হইয়া যাইবে। যে বোতলটিতে পাথরের কুচিগুলি রাখিয়াছিলে তাহাতে চূণের জলের রং কিছুমাত্র বদলাইবে না ও উহা শাদা হইয়া যাইবে না। তাহা হইলে তোমরা দেখিতেছ যে, যে বোতলটিতে ফুলের কুঁড়ি রাখিয়াছিলে, সেই বোতলে অঙ্গারক-বাষ্পের

উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই অঙ্গারক-বাষ্প ফুলের কুঁড়িগুলিই নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিয়াছে। উদ্ভিদেরও যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আছে, ও উহারা যে উহাদের যে কোন অংশ দ্বারা উহা সম্পন্ন করিতে পারে, এখন তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এই দুইটি পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যখন অম্লজান-বাষ্প গ্রহণ ও অঙ্গারক-বাষ্প ত্যাগ করা হয়, তখন বীজের বোতলটিতে চূণের জল দিয়া অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগের বিষয় প্রথম পরীক্ষা দ্বারা বুঝান হইল না কেন? দ্বিতীয় পরীক্ষা করিবার সময় বোতল দুইটি অন্ধকার স্থানে রাখিতে বলিবার উদ্দেশ্য কি? ইহা তোমাদিগকে পরে বুঝাইয়া দিব।

এখন উদ্ভিদের খাদ্যের কথা ও তাহা গ্রহণের প্রণালী তোমাদের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিব। উদ্ভিদের খাদ্যের কথা বলিতে গেলে, আমাদের প্রথমেই বীজের কথা লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে। বীজ হইতে যখন অঙ্কুর বাহির হয়, তখন অঙ্কুরের খাদ্য কোথা হইতে আসে? আমরা যেমন শিশুকালে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকি ও নিজেদের আহার নিজেরা সংগ্রহ করিতে পারি না, মায়ের দুধের উপরেই আমাদের নির্ভর করিতে হয়, অঙ্কুরের বেলাতেও ঠিক সেই কথা খাটে। গাছই অঙ্কুরের পিতামাতা এবং সেই পিতামাতা তাহাদের শিশুর জন্য বীজের মধ্যেই তাহার আবশ্যকীয় খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং যতদিন ঐ শিশুটি অর্থাৎ অঙ্কুরটি বড় হইয়া নিজের আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে না পাবে, ততদিন বীজের ভিতর সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য-গুলি খাইয়াই সে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের উপরে যেমন ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ, উদ্ভিদের উপরেও তাঁহার সেইরূপ অসীম অনুগ্রহ আছে। তিনি আমাদেরও যেমন ভালবাসেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, উদ্ভিদ্‌গণও তাঁহার কাছে সেইরূপ আদর-যত্ন পাইয়া থাকে। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ্, তাঁহারই দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তোমরা যেমন মানুষকে ভালবাস, উদ্ভিদ্‌কেও ভালবাসিতে শিখিও। আমাদের বেলায় দুধের বিশ্লেষণ করিয়া যেমন আমাদের বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, উদ্ভিদের বেলাতেও ঠিক সেইরূপ অঙ্কুরের জন্য বীজে যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, সেই খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, প্রাণীদিগের জন্য যে যে জাতীয় খাদ্যের দরকার হয়, উদ্ভিদেরও সেই সেই জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক।

একটি গাছকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া উহার জলীয় ও কঠিন অংশ (ছাই) বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের ও অন্যান্য প্রাণীদিগের শরীর যে সকল মৌলিক উপাদানে গঠিত, উদ্ভিদের শরীরও সেই সেই মৌলিক উপাদানে গঠিত হয়। আবার ঠিক আমাদেরই মত মৌলিক উপাদান-গুলির মধ্যে অঙ্গার, জলজান এবং অম্লজানই তাহাদের বিশেষ দরকারী। ইহা ছাড়া যবক্ষার-জান ও কতকগুলি ধাতব পদার্থের প্রয়োজন আছে। উহাদের মধ্যে লৌহ, প্রস্ফুরক, পত্রক ও লবণব প্রধান। উদ্ভিদের শরীরে জলেব ভাগই বেশী। অঙ্গার, জলজান ও অম্লজানই তাহাদের নানাপ্রকার সংমিশ্রণের দ্বারা অবশিষ্ট ভাগ গঠিত করিয়াছে। আবার উদ্ভিদের কঠিন অংশে মোটামুটি অঙ্গারের ভাগ অৰ্দ্ধেক; যবক্ষারজান শতকরা ২ ভাগ, ও অন্যান্য ধাতব পদার্থেব মৌলিকগুলির সমষ্টিকে ২ ভাগ ধরা যাইতে পারে।

আমাদের দেহের অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, শিরা প্রভৃতি যেমন বিভিন্ন মৌলিকের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, উদ্ভিদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিও সেইরূপ এই সকল মৌলিকের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। আমরা যেমন আমাদের খাদ্য সামগ্রীগুলি দ্বারা আমাদের শরীরের মধ্যে মৌলিক উপাদানগুলি সরবরাহ করিয়া থাকি, উদ্ভিদ্‌কেও ঠিক সেইরূপ খাদ্য-সামগ্রীগুলি দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় মৌলিকগুলি শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনের জন্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু আমরা কিংবা অন্য প্রাণীরা আমাদের দেহ গঠনের উপযোগী কাঁচা মৌলিক উপাদানগুলি যেমন বিভিন্ন খাদ্যদ্বারা কি কঠিন, কি তরল অবস্থায় শরীরের মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকি, উদ্ভিদ্‌গণ সেইরূপ পারে না; উহাদিগকে কাঁচা মৌলিক উপাদান-গুলি কেবলমাত্র তরল কিংবা বাষ্পীয় অবস্থায় শরীরের মধ্যে প্রথমে সরবরাহ করিতে হয়। তোমরা জান যে, উদ্ভিদ্‌ই আমাদের খাদ্য-ভাণ্ডার; কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য-ভাণ্ডার বাতাস ও মাটি।

উহারা উহাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে অঙ্গার, অম্লজান, জলজান ও যবক্ষারজান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাতাস হইতে সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট ধাতব উপাদানগুলি মাটি হইতে জলের সাহায্যে তরল অবস্থায় গ্রহণ করে। কোন কোন উদ্ভিদ্ এক প্রকার কীটাণুর সাহায্যে বাতাস হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে পারে। ঐ কীটাণুগুলি উদ্ভিদের মূলে জন্মগ্রহণ করে এবং বাতাস হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া মাটিতে সরবরাহ করে। ঐ যবক্ষারজান মাটিতে পৌছিয়া ধাতব পদার্থের সহিত মিলিয়া যৌগিকরূপে তরল অবস্থায় উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে।

এখন মৌলিক উপাদানগুলির দ্বারা উদ্ভিদ্ তাহার শরীরের ভিতরে প্রধানতঃ কোন্ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা মোটামুটি বলিতেছি। অঙ্গার, জলজান ও অম্লজানই উহার বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের প্রধান মৌলিক উপাদান। ইহাদেরই বিভিন্ন প্রকারের সংমিশ্রণে দুই জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, শ্বেতসার ও তৈলজাতীয় খাদ্য। যদিও দুই জাতীয় খাদ্যের উপাদানগুলি একই, কিন্তু দুই জাতীয় খাদ্যেরই কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। এই দুই জাতীয় খাদ্য ছাড়া উদ্ভিদের শরীরে আর এক জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, উহাকে অম্লসার বলে। অম্লসার প্রস্তুতের সময় উপরোক্ত তিনটি উপাদানকে যবক্ষারজান ও অল্প পরিমাণে আরও কয়েকটি ধাতব মৌলিকের সাহায্য লইতে হয়। উহাদের মধ্যে গন্ধক, প্রস্ফুরক (Phosphorus) ও লৌহ প্রধান। এই তিন জাতীয় খাদ্য ছাড়া কোন কোন উদ্ভিদ্কে যেমন গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ্, রজন, ধুনা, ধূপপ্রদ উদ্ভিদ্ ও দ্রাবকপ্রদ উদ্ভিদের আরও দুই এক জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপরোক্ত তিন জাতীয় খাদ্যই সাধারণতঃ উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য এবং ইহার উপরই উহার জীবন নির্ভর করে।

উদ্ভিদ্ উক্ত তিন জাতীয় খাদ্য নিজের দেহের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া নিজের প্রাণধারণ ত করেই অধিকন্তু উহার শিশুর জন্য বীজের মধ্যে ও প্রাণীদিগের জন্য উহার দেহের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত করিয়া রাখে। শ্বেতসারের দ্বারাই উদ্ভিদের দেহের অধিকাংশ ভাগ গঠিত হয়। ইহা কোন কোন উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। যেমন চাউল (ধান হইতে প্রাপ্ত), গম, যব, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি। এই শ্বেতসার হইতেই আবার উদ্ভিদ্-দেহে শর্করার উৎপত্তি হয় এবং কোন কোন উদ্ভিদে শর্করা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যেমন ইক্ষু, বীট, কিস্‌মিস্ ইত্যাদি। তৈল জাতীয় খাদ্য কোন কোন উদ্ভিদের বীজে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। যেমন তিল, সরিষা, রেড়ি, মসিনা, নারিকেল, বাদাম ইত্যাদি। ময়দা বা আটা জলে ভিজাইলে আঠার মত যে পদার্থ বাহির হয়, তাহাতে অম্লসারের প্রাচুর্য্য আছে।

উদ্ভিদে সঞ্চিত তিন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্কে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য-শস্য হিসাবে ধরা হয়। যথা:—শ্বেতসার জাতীয় বা শর্করা জাতীয় খাদ্য-শস্য, তৈলপ্রদ খাদ্য শস্য ও অম্লসারজাতীয় খাদ্য-শস্য। তোমাদের মনে আছে ত, আমাদের ঠিক এই তিন জাতীয় খাদ্যেরই দরকার। আমাদের খাদ্য-তালিকায় আমরা আমিষ জাতীয় খাদ্য বলিয়াছি। অম্লসার ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের একই উপাদান। এখন তোমরা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিলে যে, আমাদের তিন জাতীয় খাদ্যের জন্যই আমরা উদ্ভিদের কাছে কত ঋণী। কারণ উদ্ভিদ্ এই তিন জাতীয় খাদ্য তাহার দেহে আমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং আমরা উহা আহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারি। এখানে ইহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, আমরা—প্রাণীরা, খাদ্য ধ্বংস করি ও উদ্ভিদেরা খাদ্য গঠন করে।



অ্যাসিরিয়া

অস্থর

অস্থর সহরের পত্তন

ব্যাবিলনিয়ার কিছু উত্তরে টাইগ্রিস্ নদের পশ্চিম পারে (বর্ত্তমান কিলে শেরঘাটে গ্রামের নিকটে) প্রাচীনকালে অস্থর বলিয়া একটি সহর ছিল। কখন্ ও কাহারা প্রথম এই সহরের পত্তন করে, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃপক্ষে ৩০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে একদল সেমিটিক লোক এই সহর স্থাপন করে। অবশ্য তাহারা আসিবার পূর্ব্বে এখানে এক পাহাড়িয়া জাতি বাস করিত। তাহাদের সঙ্গে সংমিশ্রণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অ্যাসিরিয় জাতির উদ্ভব হয়। বোধ হয় এই সেমিটিকজাতীয় লোকেরা ব্যাবিলনিয়া হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে (অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মত যে, তাহারা অন্যস্থান হইতে আসে)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথমে এখানে শুমেরিয়ানরাই সহর স্থাপন করে। পরে সেমিটিক-জাতীয় লোকেরা আসিয়া প্রাধান্য স্থাপন করে।

সে যাহাই হউক, অ্যাসিরিয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা যে মূলতঃ ব্যাবিলনীয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহাদের চরিত্রে কিন্তু বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহারা অধিকতর সাহসী, কর্ম্মঠ ও দৃঢ়চেতা। তাহাদের স্বভাবেও এমন একটা হিংস্রভাব দেখা যায় যাহা ব্যাবিলনীয়দের স্বভাবের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। পোষাক-পরিচ্ছদ ও চেহারায়ও অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

অস্থর সহরই ভবিষ্যৎ অ্যাসিরিয়া রাজ্যের প্রথম কেন্দ্র ও রাজধানী। এখানকার দেবতার নামও অস্থর। ইহাদের নাম হইতেই সমগ্র দেশের ও দেশবাসীর নাম হয় অস্থর (অ্যাসিরিয়া)। ধীরে ধীরে অ্যাসিরিয়েরা

অ্যাসিরিয়া দেশ



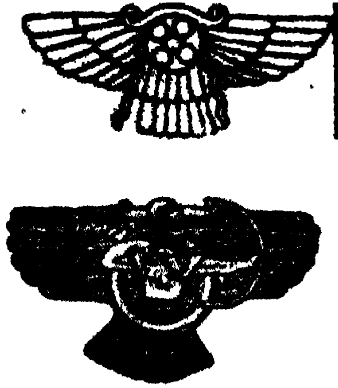
অস্থর (অ্যাসিরিয়ার প্রধান্ দেবতা)

উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া টাইগ্রিস্ নদের পূর্ব্বতীরস্থ দেশ অধিকার করিয়া বসে। এই দেশের চারিটি

প্রধান সহর—অসুর, কালা (Kalah), নিনেভ (Nineveh) ও আরবেলা (Arbela)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অ্যাসিরিয়েরা শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও কর্ম্মপটুতায় ব্যাবিলনীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। যোদ্ধা হিসাবে এই সময়ে কেহই তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। ইহার কারণ, অনেকটা দেশের আবহাওয়া ও জমির

প্রাকৃতিক অবস্থা



অসুর দেবতাগণের চিহ্ন—পাখা

আপেক্ষিক অনুর্ব্বরতা। নদীমাতৃক ব্যাবিলনিয়া সমতলভূমি, অ্যাসিরিয়া কিন্তু অনেকটা আমাদের দেশের ছোটনাগপুর বিভাগের মত মালভূমি। জলের সুবিধা বিশেষ না থাকাতে নদীর উপকণ্ঠ ছাড়া চাষবাসের উপযোগী জমিও বিশেষ ছিল না। কাজেই, আহার সংস্থানের জন্য অ্যাসিরিয়েরা অনেকটা শিকারের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। আর সেকালে এদেশে সিংহ, বন্য ষাঁড় প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব থাকাতে, ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইত। সুতরাং আমাদের দেশের পাহাড়িয়া জাতিদের মত তাহারা চিরদিনই পরিশ্রমী ও সাহসী ছিল। গুর্খা, ভুটিয়াদের মত হিংস্র স্বভাবও তাহারা পাইয়াছিল।

অ্যাসিরিয়ার অভ্যুত্থান

ব্যাবিলনীয়দের মত প্রথমে অ্যাসিরিয় রাজাদের প্যাটেসি (Patesi) অথবা পুরোহিতরাজ বলা হইত। তাঁহারা ছিলেন অসুর-দেবের পুরোহিত। কখন্ যে তাঁহারা প্রথম সাবু (Sabu) রাজা উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা বলা কঠিন। অসুর রাজ্যের প্রথম পুরোহিতরাজদের মধ্যে 'উস্‌পিয়া'র (Ushpia) নাম জানা গিয়াছে। নাম দেখিয়া মনে হয়, তিনি বোধ হয় সেমিটিকজাতীয় ছিলেন না। তাঁহার পর কিকিয়া (Kikia) প্যাটেসি হইয়া নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিকিয়ার পর আরও অনেক ভিন্নজাতীয় প্যাটেসি রাজ্য শাসন করেন। প্রথম সেমিটিক্ রাজা বোধ হয় 'সালিম্-আখুম্' (Shalim-Akhum)। তাঁহার পুত্র 'ইলু-সুমা (Ilu-Shuma ব্যাবিলনের হাম্মুরাবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুমু-আবুর (Sumu-Abu) সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ইলু-সুমার পুত্র ইরু-সুম্ (Iru-Shum) রাজা হইয়া অসুর সহরে একটি খাল কাটিয়া পানীয় জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করেন। ধর্ম্মেও তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সহরে তিনি আদাব দেবের (Adab) মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই অ্যাসিরিয়া রাজ্যের প্রথম লিখিত ইতিহাস বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথম প্যাটেসি রাজারা

হাম্মুরাবির সময় অসুরের রাজা ছিলেন প্রথম সাম্‌সি-আদাদ্ (Shamsi-Adad I)। তিনি এন্‌লিল্ দেবের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নিজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজারা তাঁহাকে নিয়মিতরূপে কর দিতেন। তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া জয় করিয়াছিলেন এবং ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানে নাকি নিজের বিজয়স্তম্ভ স্থাপনা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, নিজে কিন্তু তিনি হাম্মুরাবির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, এবং তাঁহার রাজধানীতে একদল ব্যাবিলনীয় সৈন্য ছিল।

প্রথম সাম্‌সি আদাদ

ইহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত অ্যাসিরিয়ার ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। যখন কাস্‌সি-(ব্যাবিলনীয়রা কাস্‌সু বলিত) বংশীয় রাজা কারা-ইন্দাস্ (Karaindash) ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করিতে-

স্বাধীন অ্যাসিরিয়া

ছিলেন তখন অ্যাসিরিয়ার রাজা ছিলেন অসিরবেল্‌নিসেস্থ (Asirbelnisheshu)। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সন্ধি হয়। ইহাতে বোঝা যায় যে, অ্যাসিরিয়া আর ব্যাবিলনিয়ার অধীন নয়—সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অ্যাসিরিয়া ও মিশরসম্রাট থথ্‌মোস

ইহার পরের ২০০ বৎসরের ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার পরেই দেখিতে পাই মিশরের অদ্বিতীয় যোদ্ধা তৃতীয় থথ্‌মোসের বিজয় সৈন্যদলের পদভারে পশ্চিম এশিয়া টলমল্ (১৪৮০ পূঃ খৃঃ)। মেগিড্ডোর যুদ্ধে সিরিয়া-প্যালেষ্টাইনের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ফলে সমগ্র দেশ বিজয়ী ফ্যারাওর পদানত হয়। গতিক দেখিয়া সন্ত্রস্ত রাজন্যবৃন্দ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং নিয়মিতরূপে কর দিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন। অ্যাসিরিয়ার রাজাও বোধ হয় ('অসুর-নাদিন্-আখি') তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন।

মিতান্নির আধিপত্য

এইরূপে থথ্‌মোসের হাত হইতে রেহাই পাইলেও এই সময়ে অ্যারিরিয়ার ভাগ্যে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। কারণ ইতিমধ্যে উত্তরদিক হইতে একদল আর্য্যজাতি আসিয়া উত্তর মেসোপটেমিয়ায় মিতান্নিরাজ্য (Mitanni) স্থাপন করে এবং অ্যাসিরিয়া রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়া বসে। এমন কি, শৌসত্তর (Shaushatar) নামে তাহাদের একজন রাজা "অর" দখল করিয়া সেখানকার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। তারপর রাজা প্রথম সুতর্ণ (Sutarna I) নিনেভ অধিকার করেন এবং সেখানকার দেবী ইষ্টারকে (ইস্তার?) মিশরের রাজা তৃতীয় অ্যামেনহোটেপের নিকট পাঠান। রাজা দুশ্রত্তের (Dushratta = দশরথ?) সময়ও ইষ্টার দেবীকে আর একবার মিশরে যাইতে হয়।

অসুর-উবাল্লিৎ

ইহার অল্পদিন পরে দ্বিতীয় অসুরউবাল্লিৎ (Ashur-uballit) অ্যাসিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ব্যাবিলনিয়ার রাজা দ্বিতীয় কারা-ইণ্ডাসের সঙ্গে তাঁহার কন্যা 'মুবাল্লিতাৎ-সেরুয়' বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র দ্বিতীয় কাদাস্মান্ খার্ব্বের (Kadeshman Kharbe II) সিংহাসন-আরোহণের পরেই প্রজারা বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া

তখন অসুর-উবাল্লিৎ ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া জয় করেন এবং দ্বিতীয় কুরিগল্‌জু (Kurigalzu II) নামে তাঁহার আর এক দৌহিত্রকে ব্যাবিলনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাবিলনিয়া অনেকটা অ্যাসিরিয়ার অধীন হইল।

যুদ্ধের দেবী—ইস্তার

মিতান্নির পরাভব

এদিকে প্রজাবিদ্রোহের ফলে মিতান্নির রাজা দুশ্রত্তের মৃত্যু হইলে ঐ দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে অসুর উবাল্লিৎ মিতান্নির শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করেন। তিনি মিশরের রাজা চতুর্থ অ্যামেনহোটেপের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং পত্র বিনিময় করেন।

তাঁহার পুত্র এল্লিল্ নিরারি রাজা হইয়া ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় কুরিগল্‌জুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দেন। ইহার ফলে দুই দেশের সীমানার পুনর্নির্ণয় হয়।

প্রথম অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্য

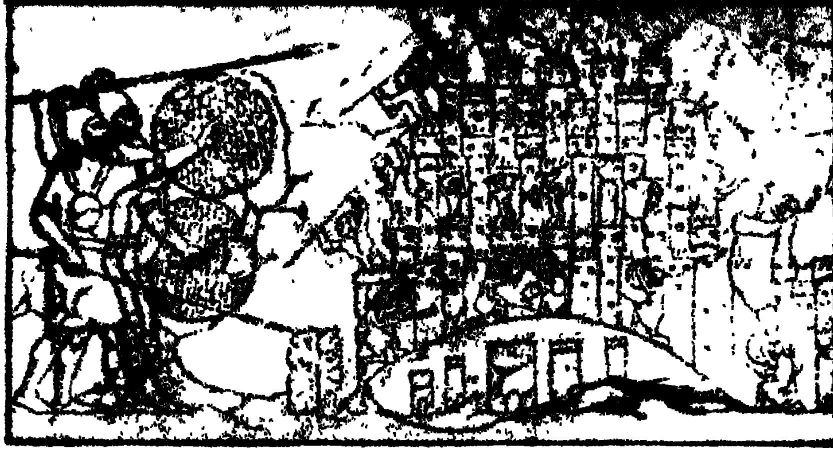
এল্লিল্ নিরারির পৌত্র প্রথম আদাদ্ নিরারি (Adad Nirari I) যখন রাজা হন, তখন হইতে



অ্যাসিরিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। তিনি চারিপার্শ্বের রাজ্য জয় করেন।

প্রথম আদাদ নিরারি

ব্যাবিলনের রাজা তৃতীয় কুরিগল্‌জু এবং পরে নাজি-মরুত্তাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই পরাস্ত করেন।



অসুর দেশের সৈন্যগণ দুর্গ আক্রমণ করিতেছে

তাঁহার পুত্র প্রথম শালমানেসার (Shalmaneser I) পিতার মতই বীর ছিলেন। তিনি ইউফ্রেটিস্ নদী পার হইয়া সিরিয়াদেশের উত্তরস্থিত মুস্‌রি দেশ অধীন করেন। তবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি মিতান্নি রাজ্য জয়। শালমানেসার শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না; রাজ্য-শাসনেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার রাজধানী, অসুর হইতে নবনির্ম্মিত কালাসহরে (Kalah) স্থানান্তরিত করেন।

প্রথম শালমানেসার

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম টুকুল্‌টি নিনিব্ (Tukulti Ninib I) রাজা হন। এই রাজার রাজত্বকালে অ্যাসিরিয়া রাজ্যের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। টুকুল্‌টি নিনিব্ উত্তর ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার এই অভিযানের ফলে আর্ম্মেনিয়া দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুদূর নাইরিদেশের (Lands of Nairi) ৪০ জন রাজা রাজ্যচ্যুত হন।

প্রথম টুকুল্‌টি নিনিব

ইহার পর তিনি ব্যাবিলনিয়া বিজয়ে মন দেন। ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় কাস্‌টিলিয়াস্‌কে পরাজিত করিয়া টুকুলটি নিনিব্ রাজধানী অধিকার করেন। নগরের প্রাচীর তিনি ভগ্ন করেন ও অনেক নাগরিককে হত্যা করেন। তারপর এখানকার মার্ডুকের মন্দির লুঠ করিয়া দেবমূর্ত্তি সহ নিজের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজ্যশাসনের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়ায় তিনি অ্যাসিরিয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। নিজে "সুমের ও আক্কাডের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। সাত বৎসর পরে ব্যাবিলনীয়েরা বিদ্রোহ করে ও টুকুল্‌টি নিনিবকে তাড়াইয়া দেয়। এদিকে অ্যাসিরিয়ায় তাঁহার পুত্র অসুর

ব্যাবিলন বিজয়



রাজ-অনুচরেরা সিংহাসন বহিয়া লইয়া যাইতেছে

নাজিরপাল বিদ্রোহ করে। ইহার ফলে টুকুল্‌টি নিনিব্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।



F. 5

টুকুল্‌টি নিনিব্‌ যেমন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন রাজাও তিনি তেমনই বড় ছিলেন। অসুর সহরে তিনি একটি বিশাল মন্দির ও সৌধ নির্ম্মাণ করেন।



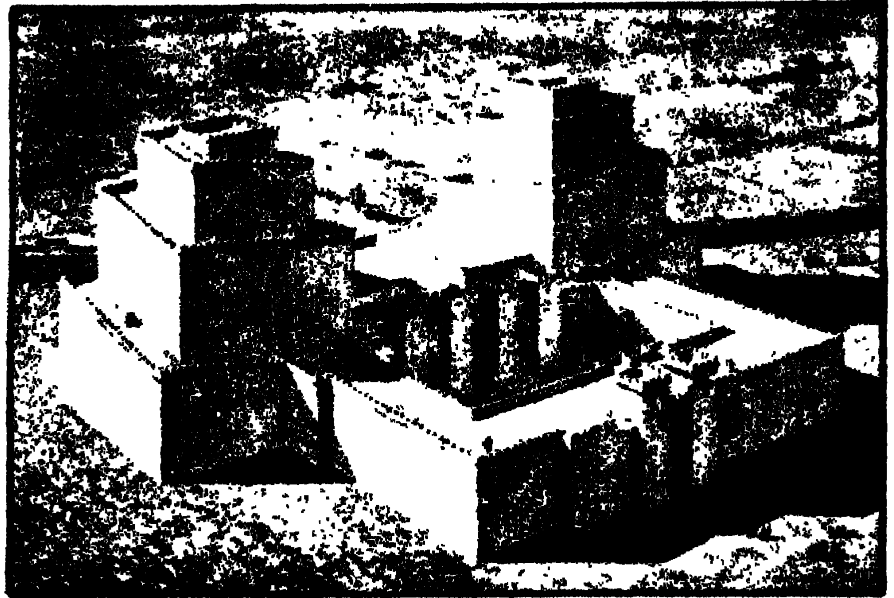
ব্যাবিলনের মার্ডক দেবতা

অসুর-রিশি-ঈশী (Ashur-rishi-ishi) রাজা হন। অসুর-রিশি-ঈশী একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে লুলুমলি ও কুতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহার পর তিনি ব্যাবিলনরাজ প্রথম নেবুকাদ্‌নেজ্জারের (Nebuchadnezzar I) সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দেন ও মেসোপটেমিয়া পুনরুদ্ধার করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সজাগ ছিলেন। রাজধানী অসুরে তিনি অনু ও আদাদ্‌ দেবের জন্য একটি বিশাল যুগ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মন্দিরটি শেষ করেন তাঁহার পুত্র প্রথম টিগলাথ পিলেসার (Tiglath Pileser I=Tukulti-pal-esharra)।

প্রথম টিগলাথ্‌ পিলেসারের সময় হইতে অ্যাসিরিয়ার ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগের আরম্ভ হয়। ব্যাবিলন আজ হীনবল। মিশরের গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত। দুর্দ্ধর্ষ খেতার (Khata=Hilfites) দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এদিকে নবীন অ্যাসিরিয়া আজ যৌবন-বলে বলীয়ান্‌। শুধু চাই একজন উপযুক্ত নেতা এই অদম্য শক্তিকে চালিত করিবার জন্য। ঠিক সেই সময়েই অক্লান্তকর্ম্মী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

প্রথম টিগ লাথ পিলেসার। খৃঃ পূঃ ১১০০,

টুকুল্‌টি নিনিবের মৃত্যুর পর কতকগুলি অপদার্থ রাজা অসুরের সিংহাসনে বসে। তাহাদের সময় অ্যাসিরিয়া রাজশক্তির দ্রুত পতন হইতে থাকে। এই সুযোগে ব্যাবিলনিয়া আস্তে আস্তে অ্যাসিরিয়ার অনেকাংশ জয় করে। রাজা অসুরদানের সময় (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১১৬৭) হইতে আবার অ্যাসিরিয়ার রাজশক্তির পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। তাঁহার পুত্র মুতাক্কিলনুস্কুর পরে তাঁহার পৌত্র



অসুর দেবতাদের যুগ্ম মন্দির



টিগ্‌লাথ্‌ পিলেসার অ্যাসিরিয়ার কর্ণধার হইলেন। তিনি প্রথমে মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কতকগুলি হিটাইট্ রাজ্য জয় করেন। তারপর আর্মেনিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে অগ্রসর হন।

এই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের অশেষ বাধা অতিক্রম করিয়া একে একে তিনি অনেকগুলি রাজ্য-

আর্মেনিয়া

জয় করেন। যাহারা বাধা দিতে চেষ্টা করিল, তাহাদের রক্তে পার্ব্বত্য নদী লাল হইয়া গেল। স্থানে স্থানে মৃতদেহের পাহাড় জমিতে লাগিল। গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া, বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া লোকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে করিতে বিজয়ী বীর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহারা আত্মসমর্পণ করিল তাহাদের বন্দী করিয়া অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হইল। যে রাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল তাহাদের নিকট হইতে কর ও উপঢৌকন আদায় করা হইল। এইভাবে তিনি প্রায় সমগ্র নাইরি দেশ (Lands of Nairi) জয় করিলেন। তারপর তাঁহার বিজয়-কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য টাইগ্রিস্ নদের একটি উৎসের মুখে পাহাড়ের গায়ে তিনি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও বিজয়-কাহিনী খোদিত করেন।

এই সময়ে কয়েকদল অ্যারামীয় সেমিটিক লোক (Aramæau) ইউফ্রেটিস্ নদীর পূর্ব পার দখল

সিরিয়া ও ফিনিশিয়া বিজয়

করিয়া বসিয়াছিল। টিগ্‌লাথ্‌ পিলেসার তাহাদিগকে বাধা দেন এবং কতকদলকে নদীর অন্য পারে তাড়াইয়া দেন। তারপর ইউফ্রেটিস্ পার হইয়া মুস্‌রি (Musri) ও পিট্রু দেশ(Pitru)জয় করেন। এখানে তিনি অ্যাসিরীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহাতেও তাঁহার বিজয়লিপ্সা পরিতৃপ্ত হইল না। ওরন্টিস্ (Orontes) নদী পার হইয়া অবশেষে তিনি ফিনিশিয়া দেশে উপস্থিত হইলেন। আর্ভাদ (Arvad) সহরে পোতারোহণ করিয়া তিনি ভূমধ্য-সাগরে একটি প্রকাণ্ড জলজন্তু শিকার করেন। এখানে তাঁহার কাছে মিশরের ফ্যারাওর দূত উপঢৌকন লইয়া আসে। ফ্যারাও নাকি তাঁহাকে একটি কুমীর ও জলহস্তী পাঠাইয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া এবার তিনি ব্যাবিলনিয়া বিজয়ে মন দেন। প্রথমবার তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হয়, ও পরাজিত হইয়া তাঁহাকে হটিয়া আসিতে হয়।

অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া

ব্যাবিলনরাজ মার্ডুক-নাদিন-আখি (Marduk-nadin-akhi) অ্যাসিরিয়া আক্রমণ করিয়া আদাদ ও সালা (Shala) দেবতার মূর্ত্তি ব্যাবিলনে লইয়া যান। ইহাতে না দমিয়া টিগলাথ্‌ পিলেসার আবার ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করেন। এবার তাঁহার কাছে ব্যাবিলনরাজ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ব্যাবিলন, ওপিস্, সিপ্পার প্রভৃতি প্রধান সহরগুলি তিনি অধিকার করেন। রাজধানীর দুর্গপ্রাকার ভূমিসাৎ করিয়া তবে তিনি দেশে ফিরেন।

এই যোদ্ধা রাজার দৃষ্টি সব দিকেই ছিল। তিনি তাঁহার রাজধানী পুনরায় কালা হইতে অসুরে লইয়া আসেন এবং পুরাতন সহরটি আবার নূতন করিয়া গড়েন। ইষ্টার, আদাদ ও বেলের মন্দিরের

রাজ্যশাসন

তিনি সংস্কার করেন। পুরাতন প্রাসাদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করেন। বিদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর গাছ আনিয়া রাজধানীতে মনোরম উদ্যান রচনা করেন। এইভাবে সহরের সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। দেশের স্থানে স্থানে তিনি শস্যাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। দূরদেশ হইতে ছাগল; ভেড়া হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু আনিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাঁহার নজর ছিল।

টিগলাথ্‌ পিলেসার খুব শিকার করিতে ভালবাসিতেন। নিজের হাতে তিনি অসংখ্য সিংহ, হস্তী ও অন্যান্য বন্যজন্তু শিকার করিয়াছিলেন।

টিগলাথ্‌ পিলেসারের পরে তাঁহার পুত্র অসুর-বেল্‌কলা রাজা হন। অসুর বেল্‌কলা রাজধানী

অ্যাসিরিয়ার শক্তিহ্রাস

নিনেভ সহরে লইয়া যান। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা টিগলাথ্‌ পিলেসারের অযোগ্য বংশধর। তাঁহাদের সময় অ্যাসিরিয়া রাজশক্তির আবার দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। বিদেশী শত্রুরা একে একে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করিতে লাগিল। মনে হইল যেন অ্যাসিরিয়ার গৌরবের দিন শেষ হইয়া গেল।

আবার অ্যাসিরিয়ার পূর্ব্বশক্তির প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল, তৃতীয় আদাদ নিরারির সময় (৯১১—৮৮৯) হইতে। আবার সে ইতস্ততঃ চারিদিকে

দৃষ্টি সঞ্চালন কবিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহার নজর পড়িল দক্ষিণ দিকে। আদাদ নিরারি ব্যাবিলনবাজ সামাস-মুদাম্মিক্‌কে (Shamash-mudammick)সম্পূর্ণরূপে পবাস্ত করেন। সামাসের

পুনরভ্যুত্থান

পববর্ত্তী রাজা নবু-সুম্-ইস্কুন্‌ও (Nabu-Shum-Ishkun) তাঁহার সহিত যুদ্ধ কবেন। তিনিও ভীষণভাবে পরাজিত

অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া

হন এবং কয়েকটি সহর অ্যাসিরিয়া রাজের হাতে সমর্পণ করিয়া সন্ধি কবেন। আদাদ্ নিরারির পুত্র দ্বিতীয় টুকুল্‌টি নিনিব্ পশ্চিম ও উত্তরদিকে

আর্শ্মেনিয়া বিজয়

অভিযান করেন। আর্শ্মেণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্যান হ্রদের (L. Van) পার্শ্ববর্ত্তী উরার্ট্‌ (Urartu) দেশের



অসুর নাজিরপাল

সীমানা পর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হন। তাহার পুত্র

তৃতীয় অসুর নাজির পাল

তৃতীয় অসুর নাজিরপালও খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রথমে উত্তর ও পূর্ব্বদিকে অভিযান করেন। আর্শ্মেণীয় পার্ব্বত্য দেশে তিনি নাকি অনেক রাজ্য ও জাতি জয় করেন এবং তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও টিগলাথ্ পিলেসারের মূর্ত্তির নিকট নিজের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করান। দুঃখের বিষয় নৃশংসতাও তিনি বড কম যাইতেন না। যেখানেই তিনি গিয়াছেন বাড়ী-ঘর লুঠপাট করিয়া জ্বালাইয়া পোডাইয়া নির্ব্বিচারে স্ত্রী-পুরুষ নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া, লোকালয় শ্মশানে পরিণত কবিয়া মানুষেব মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের জীবনের কোন মূল্য তাঁহার কাছে ছিল না। উৎপীডিতেব ক্রন্দন-



রাজা ইসাবডান

রোল কোনদিন তাঁহার কানে পশে নাই। গৃহ-

হারার চোখের জল তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। নির্য্যাতিতের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা তাঁহার বীর হৃদয়ে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে পারে নাই।

সিরিয়া ও ফিনিশিয়া

তা যাক—উত্তর ও পূর্ব্ব বিজয়ের পর তিনি পশ্চিমদিকে অভিযান করেন। প্রথমে তিনি মেসোপটেমিয়ার আরামীয় রাজ্যগুলি জয় করেন। পরে ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া উত্তর সিরিয়া জয় করিয়া লেবানন পর্ব্বত অতিক্রম করেন। এখানে তিনি টায়ার সিডন আর্ভাদ প্রভৃতি ফিনিশীয় রাজ্যসমূহের রাজাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন।

রাজ্যশাসন

এই বিশাল সাম্রাজ্যশাসনের পক্ষে রাজধানী অসুর মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। কাজেই, অসুর নাজিরপাল অধিকাংশ সময় কালা সহরেই অবস্থান করিতেন। এই সহরের উন্নতিসাধন ও সৌন্দর্য্যসম্পাদনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। পুরাতন মন্দির ও প্রাসাদের তিনি সংস্কার করেন। সহরে পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি খাল কাটান। রাজপথের পার্শ্বে নানাবিধ মূর্ত্তি ও প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনা করেন। তাহা ছাড়া নিজের বাসের জন্য একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাসাদের রিলিফ্ চিত্রাবলী (বিশেষতঃ শিকারের ছবিগুলি) খুবই সুন্দর।



শিকারের চিত্র

তৃতীয় শালমানেসার

অসুর নাজিরপালের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় শালমানেসার রাজা হন। তিনি দীর্ঘকাল (খৃঃ পূঃ ৮৫৮—৮২৪) রাজত্ব করেন। শালমানেসার পিতার মতই বীর যোদ্ধা ছিলেন, এবং তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যুদ্ধই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিশ্রাম বা শান্তি কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তিনি নাকি ইউফ্রেটিস্ নদীর অপর পারে ২৪ বার অভিযান করেন।



শিকারের চিত্র

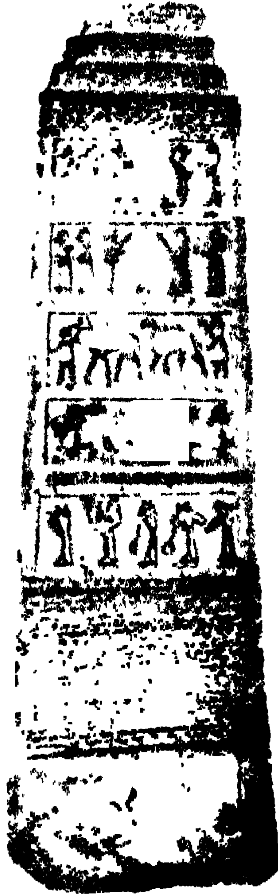
সিরিয়া-প্যালেষ্টাইন অভিযান

কারখেমিসের হিটাইট রাজার নিকট হইতে তিনি কর আদায় করেন। তারপর ওরণ্টিস্ নদী পার হইয়া এশিয়া মাইনরে সাইলিসিয়া আক্রমণ করেন। পরবৎসর তিনি সিরিয়া আক্রমণ করিয়া সিরিয়া প্যালেষ্টাইনের রাজাদের সম্মিলিত বাহিনী কর্‌করের যুদ্ধে (Karkar) পরাস্ত করেন। এই রাজাদের মধ্যে ডামাস্কাসের (Damascus) রাজা দ্বিতীয় বেন্-হাদাদ্ ও ইস্রেলের রাজা আহাবের (Ahab of Israel) নাম উল্লেখযোগ্য। মিশরের ফ্যারাওও তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এখানে বাধা পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।



শিকারের চিত্র

এইবার তিনি উত্তরদিকে অভিযান করেন। নাইবিদেশ জয় করিয়া টাইগ্রিসের উৎপত্তি-স্থলে পিতা-পিতামহের মত নিজের মূর্ত্তি খোদিত করান। দক্ষিণদিকে ব্যাবিলন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এমন কি, পারস্য উপসাগরের তীরস্থ ক্যাল্‌ডিয়া (Chaldea) প্রদেশের শক্তিশালী সামন্ত রাজাদের নিকট হইতেও কর আদায় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে জ্যাগ্রস পর্ব্বতেও তিনি অভিযান করেন।



শালমানেসারের খোদিত

পাঁচ বৎসর পরে সিরিয়ায় গমন করেন এবং হামাৎ (Hamath) আক্রমণ করেন। এবারও তিনি বেন্‌হাদাদ্‌ ও অন্যান্য রাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে বাধা পান। তৃতীয় বার অভিযান করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে ডামাস্কাস্‌ রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। হাজেল (Hazael) নামে একজন রাজকর্ম্মচারী বেন্‌হাদাদকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কাজেই, সিরিয়া প্যালেষ্টাইনের রাজাদের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া যায়। এতদিন শক্তিশালী ডামাস্কাস্‌-রাজ্যই অ্যাসিরিয়ার অগ্রসরে বাধা দিয়াছে। এবার যখন চতুর্থ বার সিরিয়া আক্রমণ করিয়া শালমানেসার ডামাস্কাসের রাজা খাজিলুকে (Khazailu) পরাস্ত করেন (তিনি কিন্তু রাজধানী অধিকার করিতে পারেন নাই) তখন তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই রহিল না। সুতরাং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি টায়ার, সিডন্‌ প্রভৃতি ফিনিশীয় রাজ্যের রাজাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। ইস্রেলে নূতন রাজা জেহু (Jehu) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন দেন।

জীবনের শেষ কয় বৎসর শালমানেসার রাজধানী কালার মন্দির সংস্কারে ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে অতিবাহিত করেন।

শালমানেসারের পর তাঁহার পুত্র পঞ্চম সাম্‌সি আদাদ্‌ ও তাঁহার পৌত্র চতুর্থ আদাদ্‌ নিরারি রাজা হন (৮১০-৭৮১)। আদাদ্‌ নিরারিও খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ডামাস্কাস্‌ অধিকার করিয়া তিনি ইহাকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ফিনিশিয়া ও ফিলিষ্টিয়াদেশ (Philistia) তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে ও করপ্রদান করে। দক্ষিণে ব্যবিলন ত তাঁহার অনুগত ছিলই; এমন কি, দুর্দ্ধর্ষ ক্যাল্‌ডীয় রাজারাও তাঁহাকে নিয়মিত কর দিতেন। উত্তরে নাইরি দেশেও তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে জ্যাগ্রস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিনি নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাদের মধ্যে "মাদাই" জাতি (Medes=মীড্‌) উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ আদাদ নিরারি

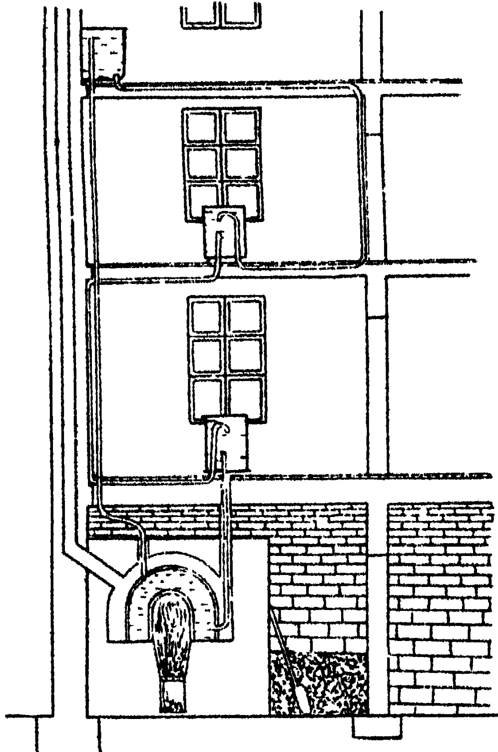
আদাদ্‌ নিরারির পর আবার অ্যাসিরীয় শক্তির পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার বংশধরেরা দুর্ব্বল ও অপদার্থ ছিল।



বায়ু

৪৩০ পৃষ্ঠার পর

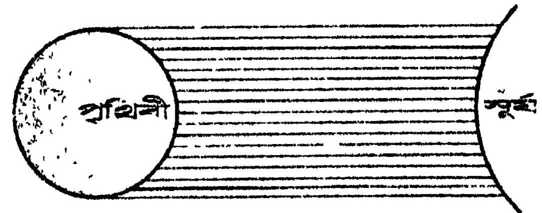
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ছয় মাইল উচ্চ পর্য্যন্ত বাতাসের উত্তাপ ক্রমশঃই কমিতে কমিতে বরফের বহু ডিগ্রি নিম্নে চলিয়া যায়। পরে আরও পনের মাইলে নাকি



নল দিয়া নীচের তলা হইতে উপরে গরম বাতাস চালাইয়া বাড়ী গরম করা হইতেছে

কিছু পরিবর্ত্তন পাওয়া যায় না। পরে উত্তাপের ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ছয় মাইল উপরে মেঘ পাওয়া যায় না। অতি উচ্চে অবস্থিত উত্তপ্ত বায়ুস্তরে নক্ষত্রপিণ্ডগুলি প্রবেশ করিলে জ্বলিয়া উঠে। সেই জ্বলন্ত পিণ্ডকে আমরা উল্কাপিণ্ড বলি।

বাতাসের ভিতর দিয়া আমরা তিন রকমের উত্তাপ পাই। এক পাই গরম বাতাস ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার ফলে, উত্তাপ নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে সঞ্চারিত হয়। শীতের দেশে, নীচের তলায় কোনও ঘরে আগুন জ্বালাইয়া, মেঝে ও প্রাচীরের ভিতর দিয়া নল চালাইয়া এইরূপভাবে দোতলা ও তেতলা বাড়ীগুলি গরম রাখা হয়। দ্বিতীয় উপায়ে পাই, উত্তপ্ত বায়ুকণা—তৎসংলগ্ন অন্য বায়ুকণায়



সূর্য্যের তাপ চারিদিকে সরলরেখায় প্রবাহিত হইতেছে

উত্তাপ প্রবাহিত করিলে। ইহা কণায় কণায় সংস্পর্শে হয়। তৃতীয় পাই, উত্তাপের নিজস্ব গতির ফলে। ইহা সরল রেখায় চলে ও ইহার প্রবাহের জন্য কোনও পদার্থকণার আবশ্যক করে না। বিশাল শূন্যে সূর্য্যের উত্তাপ এই প্রকারেই প্রবাহিত হয়।

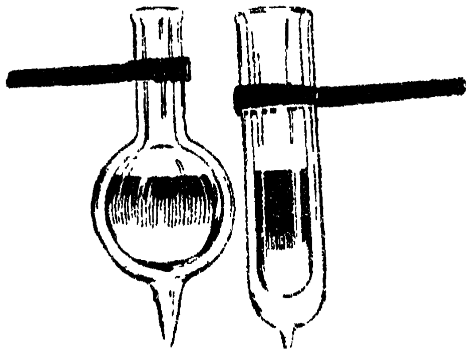
আমাদের ঊর্দ্ধে পুরু বায়ুমণ্ডল থাকায়, সূর্য্যের তীব্র উত্তাপ হইতে আমরা খানিকটা রক্ষিত হই। সূর্য্যের অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধরণী তুষার-শীতল হইয়া পড়ে না, ইহাও এই পুরু গাত্রাবরণের জন্য।

অদৃশ্য বায়ুকে শৈত্য প্রয়োগে দৃশ্যমান্ তরল জলের মত করা হইয়াছে ও তাহা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অবশ্যই দেখিতে দেখিতে উবিয়া যায়। তরল বায়ু কত ঠাণ্ডা, আন্দাজ করিতে পার কি? জল তাপমান যন্ত্রের শূন্য অঙ্কে বরফ হয় ও সেণ্টিগ্রেড তাপমানে ১০০ অঙ্কে ফুটিতে থাকে। ফুটন্ত জলের তাপ হইতে বরফে নামিতে যতটা ঠাণ্ডার প্রয়োজন, প্রায় তার ডবল শৈত্যে বায়ু তরলীভূত হয়।

বায়ুকে তরলীভূত করা

তোমরা অনেকেই থার্ম্মোস ফ্লাস্ক (Thermos flask) দেখিয়া থাকিবে। এই বোতলগুলির কাচের ডবল দেওয়াল। আর, দেওয়াল দুইটির মাঝের ফাঁক বায়ুশূন্য। বায়ুশূন্য স্থানে ও কাচের ডবল প্রাচীরে উত্তাপের চলাচলের প্রতিরোধ হয়। ভিতরের প্রাচীরে যদি রূপার

থার্ম্মোস বোতল



থার্ম্মোস বোতল

প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আরও সুন্দরভাবে ভিতরে উত্তাপের প্রবেশ বন্ধ করা হয়। রূপার প্রলেপের আয়নায় পড়া আলোর মত উত্তাপ ঠিকরিয়া বাহির হইয়া যায়। এইরূপ হওয়ায়, এই রকম বোতলে শীতল পদার্থ বহু ঘণ্টা অবধি শীতল বা উষ্ণ পদার্থ ঘণ্টা অবধি উষ্ণ থাকিতে পারে। এইরূপ বোতলে তরলীভূত বায়ু কিছুক্ষণ অবধি রাখিতে পারা যায়। অন্য কোনও পাত্রে রাখা যায় না।

নীলাকাশ কবির আনন্দের বস্তু। আকাশের ঐ সুন্দর নীলিমা আমাদের এই বায়ুর জন্যই। বায়ু সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ নহে। সূর্য্যালোকের নীলাংশ বায়ুকণায় বেশী পরিমাণে চারিধারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ায় আমরা বায়ুর বিশাল সমুদ্রকে নীলাভ দেখি।

"বায়ুর" পূর্ব্ব-সংখ্যায় তোমরা যে সাইফন কথাটি পড়িয়াছ, তাহার একটি উদাহরণ পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেওয়া গেল। একটি রবারের নল জলপূর্ণ করিয়া তাহার দুইটি মুখ চাপিয়া, একটি মুখ কোনও পাত্রে জলের নীচে ভাল করিয়া ডুবাইয়া খুলিয়া দাও। তাহার অন্য মুখটি পূর্ব্ব মুখের নীচে ঝুলিয়া পড়িলে, সেই মুখটি খুলিয়া দাও। দেখিবে পাত্রের জল নলের ভিতর দিয়া বাহিরে পড়িতে থাকিবে। পড়িবার পূর্ব্বে পাত্রের জল নল বাহিয়া উপরে উঠিতেছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে কি? এই আশ্চর্য্য ব্যাপার, নলটির দুইটি মুখে বায়ুর বিভিন্ন চাপের জন্য হয়। বড় হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠে ইহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। এইরূপে পাত্রের গাত্রে নল না বসাইয়া সাইফন সংযোগে তাহার ভিতরকার সমস্ত বা উপরিস্থিত খানিকটা পাত্রে স্থিত তরল পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়।

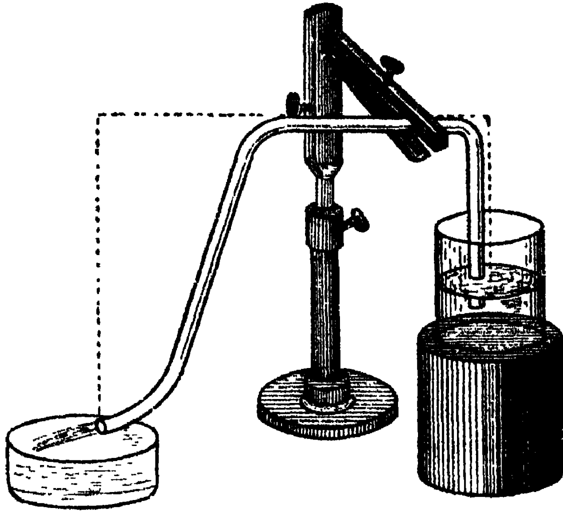
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। অর্থাৎ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিলিয়া এমন একটি তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব করে নাই, যাহার গুণাবলী অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হইতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ যে সমস্ত বিশিষ্টতা থাকা প্রয়োজন, বায়ুতে তাহা নাই। ইহাতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণে, অবস্থানুযায়ী অল্পাধিক তারতম্য সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। যৌগিক পদার্থ হইলে তাহা হইত না।

বায়ুর মিশ্র পদার্থের স্বভাব

মনীষী শীল (Scheele) ১৭৭২ সালে বায়ুতে এই দুইটি গ্যাসের অস্তিত্ব প্রথমে উপলব্ধি করেন। তাহার পর ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) প্রিষ্টলি (Priestley) ও ল্যাভয়সিয়ের (Lavoisier) নানাদিক হইতে ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ল্যাভয়সিয়েরই ফ্লোজিষ্টনতত্ত্ব উল্টাইয়া দাহক্রিয়ার প্রকৃত তথ্য বাহির করেন। ক্রমান্বয়ে পরীক্ষায় ১৮৪৬ সালে মনীষি বুনসেন

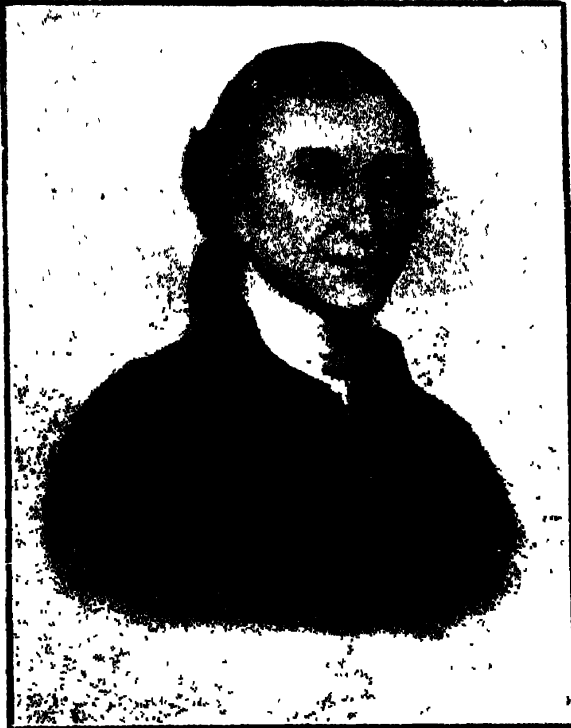
শীলপ্রমুখ মনীষীগণ

(Bunsen)-কর্তৃক বায়ুমিশ্র পদার্থ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

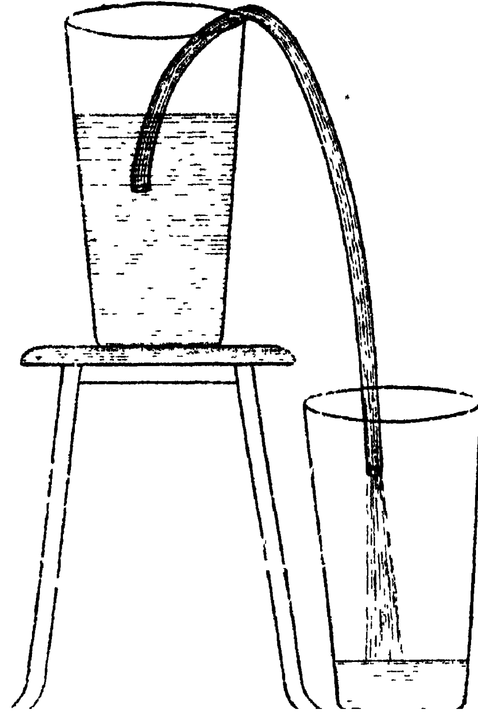


জলপূর্ণ নলের অন্য মুখ দিয়া জল বাহির হইতেছে

পূর্ব্বে অক্সিজেনের অস্তিত্ব না জানা থাকায় দহন ক্রিয়ার সত্য তথ্য জানা ছিল না। বয়েল (Boyle),



ষ্টাল (Stahl) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভাবিতেন যে, দহ্যে পদার্থে ফ্লোজিষ্টন (Phlogiston) নামক দহনশীল বস্তু আছে। কাষ্ঠাদির দাহে বা ধাতু প্রভৃতির



জলপূর্ণ নলের অন্য মুখ দিয়া জল বাহির হইতেছে।

ভস্মীকরণে তাহারই নির্গমন হয়, ইহাই সেকালের ফ্লোজিষ্টন-তত্ত্ব।

তোমরা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে বাতাস হইতে কি করিয়া পৃথক করিতে পারা যায়, ইহা জানিতে নিশ্চয়ই



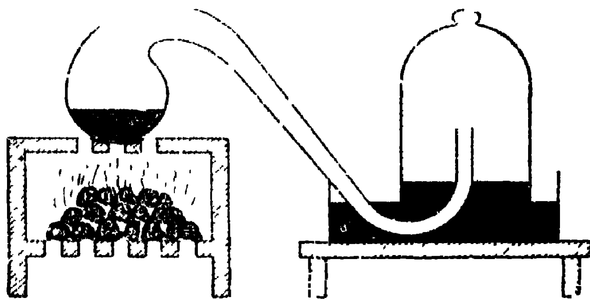
ব্যারণ বুন্‌সেন্



ক্যাভেণ্ডিশ

কৌতূহল বোধ করিতেছ। আতসীকাচের দ্বারা

সূর্য্যতাপ কেন্দ্রীভূত করিয়া, তাহাতে পারদভস্ম প্রবলভাবে গরম করিয়া মনীষী প্রিষ্টলী তাহা হইতে অক্সিজেন নির্গত করান। ল্যাভয়সিয়ে তাঁহার নিজের পরীক্ষায়, একটি বক্রগ্রীব বোতলে (retort) পারদ গরম করেন। বোতলের গলদেশ হাতীর শুঁড়ের ন্যায়; সেই বক্র গলদেশের খানিকটা আর একটি পারদপূর্ণ বাটিতে ডুবাইয়া মুখটি পারদের উপর জাগাইয়া রাখা হয়। ইহার মুখের উপর, আর একটি একমুখবদ্ধ বাতাসপূর্ণ পাত্র উবুড় করিয়া সেই বড় বাটির পারার ভিতর খানিকটা ডুবাইয়া রাখা হয়; চারিদিকে পারা থাকায় বাহির হইতে ভিতরে বা ভিতর হইতে বাহিরে চলাচল রহিত হয়। ছবিতে ব্যবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। এখন বক্রগ্রীব বোতলটি উত্তপ্ত করিতে থাকিলে, তাহার ভিতরের পারদ ধীরে ধীরে বোতলের ভিতরে ও সেই উবুড়-করা পাত্রটির ভিতরের বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইতে থাকে ও পারদ ভস্মে পরিণত হয়। ফলে অক্সিজেনের অন্তর্ধানে ভিতরের বাতাসের চাপ কম হইতে থাকায়, সেই উবুড়-করা পাত্রের ভিতর বাহির হইতে পারদ প্রবেশ করিতে থাকে। তাহার ভিতর কতখানি পারদ উঠিল তাহা হইতে ভিতরে কতখানি অক্সিজেন অন্তর্হিত হইল, বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে দিবারাত্রিব্যাপী পরিশ্রমে সস্ত্রীক মনীষী ল্যাভয়সিয়ে কিছু পারদ-ভস্ম প্রস্তুত করেন ও উপরিউক্তভাবে কতখানি অক্সিজেন অন্তর্হিত হইল, তাহা জানিয়া লন। এখন সেই



বোতলটি উত্তপ্ত করিতে থাকিলে
পারদ-ভস্ম ভগ্ন হইতে থাকে

পারদ ভস্ম আবার একটি অনুরূপ বক্রগ্রীব বোতলে বা শুণ্ডবৎ নল সংযুক্ত একটি পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। এইবার ইহার মুখ অন্য একটি পাত্রে পারদে ডুবাইয়া রাখা হয় ও একটি একমুখবদ্ধ নল পারদে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ বাটির পারদে ডুবাইয়া সেই বক্রগ্রীব বোতলের মুখের উপর সংযুক্ত করিয়া, নলটিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা হয়। বোতলটি উত্তপ্ত করিতে থাকিলে পারদ-ভস্ম ভগ্ন হইতে থাকে। মনীষী ল্যাভয়সিয়ে দেখিলেন যে, বাটির ও নলের পারদের ভিতর দিয়া বুদ্বুদ কাটিয়া যে বায়বীয় পদার্থ নলটিতে আসিয়া জমা হইল, তাহা অক্সিজেন ও আয়তনে যে পরিমাণ অক্সিজেন পারদ ভস্মীকরণে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই ভস্মের বিশ্লেষণে, ঠিক সেই পরিমাণই বাহির হইয়া আসিল। এইরূপ প্রক্রিয়ায়, বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে ও কাহার কত পরিমাণ তাহা মনীষী ল্যাভয়সিয়ে বাহির করেন ও কাহার সংযোগে ভস্ম উৎপাদিত হয়, সেই মূলতত্ত্বের সন্ধান পান।

বাতাসে পারদ ভস্ম করিয়া তাহা হইতে বা বেরিয়ম অক্সাইড নামক পদার্থ উত্তপ্ত করিয়া বাতাসের অক্সিজেনে বেরিয়ম পেরোক্সাইড নামক পদার্থে পরিণত করিয়া, সেই পদার্থ লঘুচাপবিশিষ্ট বাতাসে বা প্রবলভাবে সাধারণ বাতাসে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া বা এবংবিধ কয়েকটি উপায়ে, যদি বাতাসের অক্সিজেন স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় তবে অন্যান্য অনেক পদার্থ হইতে আরও সহজভাবে অক্সিজেন পাওয়া যায়। তরলীভূত বায়ু হইতে অতি সাবধানে তাপ প্রয়োগে প্রথমে নাইট্রোজেন ও পরে অক্সিজেন নির্গত করা যায়।

বাতাস হইতে অক্সিজেন উপরি উক্ত বা অন্য কোনও উপযোগী প্রক্রিয়া দ্বারা বাহির করিয়া লইলে মোটামুটি নাইট্রোজেন থাকিয়া যায়। নিম্নলিখিতভাবে ইহা তোমাদিগকে দেখান যাইতে পারে। একটি একমুখবদ্ধ নল, একটি বাটিতে পারদের ভিতর মুখ ডুবাইয়া দণ্ডায়মান করাও। একটি বক্র নলের মুখ পারদের নীচে ডুবাইয়া উপরি উক্ত নলের মুখের নীচে ধর ও কৌশলে বক্র নলের ভিতর দিয়া উপরি উক্ত নলের ভিতর খানিকটা পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড ও কষ্টিক সোডা প্রবিষ্ট করাও। এখন বক্র নলটি সরাইয়া লইয়া পারদের ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া, উপরি উক্ত মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে বাহিরে আন ও সেই নলটির অবস্থায় আলোড়ন করিয়া তাহার ভিতরের বায়ুর সহিত ঐ দুইটি দ্রব্যের মিশ্রণ করাও। পরে আবার পারদে মুখ ডুবাইয়া পূর্ব্বানুরূপ দণ্ডায়মান

করাও। এখন দেখিবে, বাহির হইতে খানিকটা পারদ এই নলটির ভিতর উঠিয়া পড়িবে। নলটির অক্সিজেন ঐ রাসায়নিক দ্রব্যগুলির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ভিতরের চাপ কম হয় ও সেই কারণে বাহির হইতে পারদ ভিতরে প্রবেশ করে। পারদ ভিতরে আসায়, এখন নলের ভিতর পূর্ব্ব আয়তনের মাত্র চার-পঞ্চমাংশ বায়বীয় পদার্থ রহিয়াছে, দেখা যায়। ইহা নাইট্রোজেন। এই পরীক্ষায় তোমরা দেখিলে, বাতাসে মোটামুটি চার পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন ও এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন আছে।

কেমন, পরীক্ষাগুলি কৌতূহল উদ্দীপক নহে কি? বড় হইয়া রসায়নশাস্ত্র-পাঠে তোমরা এই বিষয়ে ও বহুবিধ বিষয়ে অনেক কথা শিখিতে পারিবে। বিজ্ঞান পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা জানিয়া লও।

বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ

পাঁচ ছয় মাইল পর্য্যন্ত বাতাসে নিম্নলিখিত বায়বীয় পদার্থসমূহ, প্রায় নিম্নলিখিত শতকরা পরিমাণে পাওয়া যায়—নাইট্রোজেন ৭৭·১, অক্সিজেন ২০·৭, আর্গন ০·৯, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ০·০৩, জলীয় বাষ্প ১·২ ও বাকীটুকু হিলিয়ম ইত্যাদি অন্যান্য গ্যাস। ইহা একটি মোটামুটি হিসাব। জলীয় বাষ্পের পরিমাণে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আরও ঊর্দ্ধে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিতে ও ওজোন, হিলিয়ম ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

অমিশ্রিত অক্সিজেনের গুণ

অমিশ্রিত অক্সিজেনে দাহ্য-পদার্থের দাহ ভীষণ দ্রুতবেগে হয়। হইবারই কথা। যদি বায়ু সহসা অমিশ্রিত অক্সিজেন হইয়া যায়, তাহা হইলে অতি দ্রুতবেগে আমাদের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইবে, ক্ষুদ্রতম অগ্নিকণিকায় সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাই বায়ু আমাদের পরম ভাগ্যে কেবলই অক্সিজেন নহে।

জলে বাতাস কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া থাকায় জলচর প্রাণীরাও জলের ভিতর তাহাদের প্রয়োজনমত বাতাস পায়। গাছপালাও নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে।

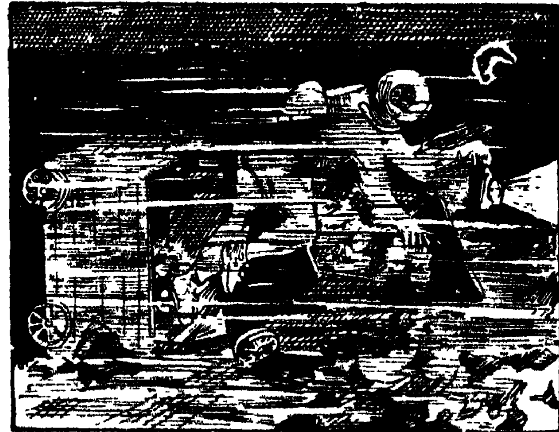
নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেন

আজকাল ডুবুরিয়া যাহাতে জলে বেশীক্ষণ কাজ করিতে পারে, সেইজন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সৌকর্য্যার্থে অক্সিজেনের থলি তাহাদের পোষাকের ভিতর লইয়া যায়। উচ্চে বায়ু হাল্কাভাবে থাকায় ও নিশ্বাসে প্রচুর পরিমাণে বায়ুর প্রয়োজন হয় বলিয়া অতি উচ্চ পর্ব্বত আরোহণকারীরা সঙ্গে অক্সিজেন



পর্ব্বত আরোহণকারীরা সঙ্গে অক্সিজেন লইয়া যায়

লইয়া যায়। ডুব-নৌকায় (submarine) প্রচুর পরিমাণে এমন রাসায়নিক পদার্থ লওয়া হয় যাহাতে ক্রমান্বয়ে অক্সিজেন জন্মিতে ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ধ্বংস হইতে পারে।



ডুবুরিদের শরীরের ভিতর অক্সিজেন-পূর্ণ থলি থাকে

বিকৃত বায়ু

অক্সিজেন আমাদের জীবনস্বরূপ। আমরা খাদ্যাখাদ্যে এত বাছ-বিচার করি, মন্দ জিনিষ বিষবৎ পরিত্যাগ করি, কিন্তু খাদ্যের যাহা শিরোমণি, সেই বাতাসের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরা কেন না সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি?

ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলে বা বহু লোকের একত্র বাসে বা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া



দরজাজানালাবন্ধ ঘরে থাকিলে অনেক সময় মরিয়া যাইতে হয়

রাখিলে অতি শীঘ্রই বায়ু বিকৃত হইয়া উঠে। অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ও বহুবিধ অহিতকারী জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে। যদি বাতাসে ২১ ভাগ অক্সিজেন ও •'০৩ ভাগ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড আছে ধরা হয় তাহা হইলে নিশ্বাসে নিগত বাতাসে ১৬ ভাগ অক্সিজেন ৪'৫ ভাগ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয়-বাষ্প ভরপূর পাওয়া যায়। উপরি উক্ত নানাবিধ কারণে ও বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ইহা জীবনরক্ষার অনুপযোগী হয়। প্রতি মিনিটে প্রতি লোকের জন্য ৩০ ঘনফুট পরিষ্কার বায়ুর প্রয়োজন।

কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চূর্ণের জলে প্রবিষ্ট করাইলে খড়ি উৎপন্ন হয়। পরিষ্কার চূণের জল বাতাসে রাখিলে যে সর পড়ে তাহা খড়ির পাতলা সর ও বাতাসের কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্য হয়। নল দিয়া চূণের জলের ভিতর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্বাসে যে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড আছে তাহা দেখান যায়। থিয়েটার প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ বদ্ধ স্থানের বায়ু অতি অহিতকারী। জনসমাকীর্ণতায় ও কলকারখানার ধূমে নগরবায়ু গ্রামবায়ু অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর।

পরিশ্রম করিলে আমাদের শরীরের যে অঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহার কণাসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে দাহ করিয়া বাহির করিয়া দিতে অধিক পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আমাদের সেই অক্সিজেন-ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করি।

রোগীর অন্তিমকালে, শ্বাস-প্রশ্বাসের যখন কষ্ট দেখা যায়, অনেক সময় শ্বাসের সুবিধার জন্য তাহাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

আমাদের খাদ্য পরিপাক হওয়া ও শরীরে রক্তে পরিণত হওয়াও অক্সিজেনের ক্রিয়া। যদি কোনও কারণে সেই ক্রিয়া সম্যকরূপে না চলে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্য, বাত বহুমূত্রাদি রোগ জন্মিয়া যায়। এই সমস্ত রোগে অধুনাতন চিকিৎসকেরা এমন সকল ঔষধাদির প্রয়োগ করিতেছেন, যাহা উপরি উক্ত অক্সিজেনের ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করিতে পারে।

অক্সিজেন ও সূর্য্যালোকে, মূত্র পুরীষ ও ক্লেদাদি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, বিষের সৃষ্টি করিতেছে না।

দাহ অক্সিজেন সংযোগ। অনেক সময় তৈলাক্ত ন্যাকড়ার স্তূপে আপনা হইতে আগুন লাগিয়া যায়।

আপনা হইতে আগুন লাগা

তৈল প্রসারিত হইয়া থাকায় অনেকখানি তৈলের উপর একসঙ্গে অক্সিজেন-ক্রিয়া হইতে থাকে। ফলে, একসঙ্গে অনেকখানি তাপ উদ্ভূত হইতে থাকে। ন্যাকড়ার স্তূপের ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে না পারায়, ক্রমে সেই তাপ এত জমা হইয়া পড়ে যে, পরিশেষে তাহা অগ্নিরূপে প্রকাশিত হইয়া সম্মিলন-ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

পেট্রোল যেখানে রাখা হয় তথায় অগ্নি লইয়া প্রবেশ করিতে নাই। কারণ, পেট্রোল গ্যাস

পেট্রোলে আগুন লাগা

অত্যন্ত দহনশীল পদার্থ হওয়ায় ও পেট্রোল হইতে উত্থিত পেট্রোল-গ্যাস ও অক্সিজেন দুইই সেই স্থানে মিশ্রিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকায়, ক্ষুদ্রতম অগ্নিকণায় সমস্তটা তৎক্ষণাৎ ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে। তোমরা দহনশীল পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।

বাতি জ্বালিয়া তাহা একটি গ্লাস দিয়া ঢাকিয়া দিলে নিভিয়া যায়। ভিতরের বায়ুর অক্সিজেন পুড়িয়া যাওয়া তাহার কারণ।

নলের ভিতর বা কূপে অবতরণ

অব্যবহৃতরূপে বা গভীর নলের ভিতর কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও বহুবিধ পচা গ্যাস জমা হইতে থাকে। মানুষ নামাইলে অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এইজন্য তাহাতে যথেষ্ট অক্সিজেন আছে কি না তাহা, বাতি নামাইয়া পূর্ব্বেই দেখিয়া লওয়া হয়।



ভিস্থবিয়স — ইটালি



এটনা — সিসিলি দ্বীপ



হেক্লা — আইসল্যাণ্ড



কিলানিয়া — হাউই দ্বীপ



পেলি — ক্যারিব সাগর



পোপোকাটাপেটল — মেক্সিকো



ভারতবর্ষ

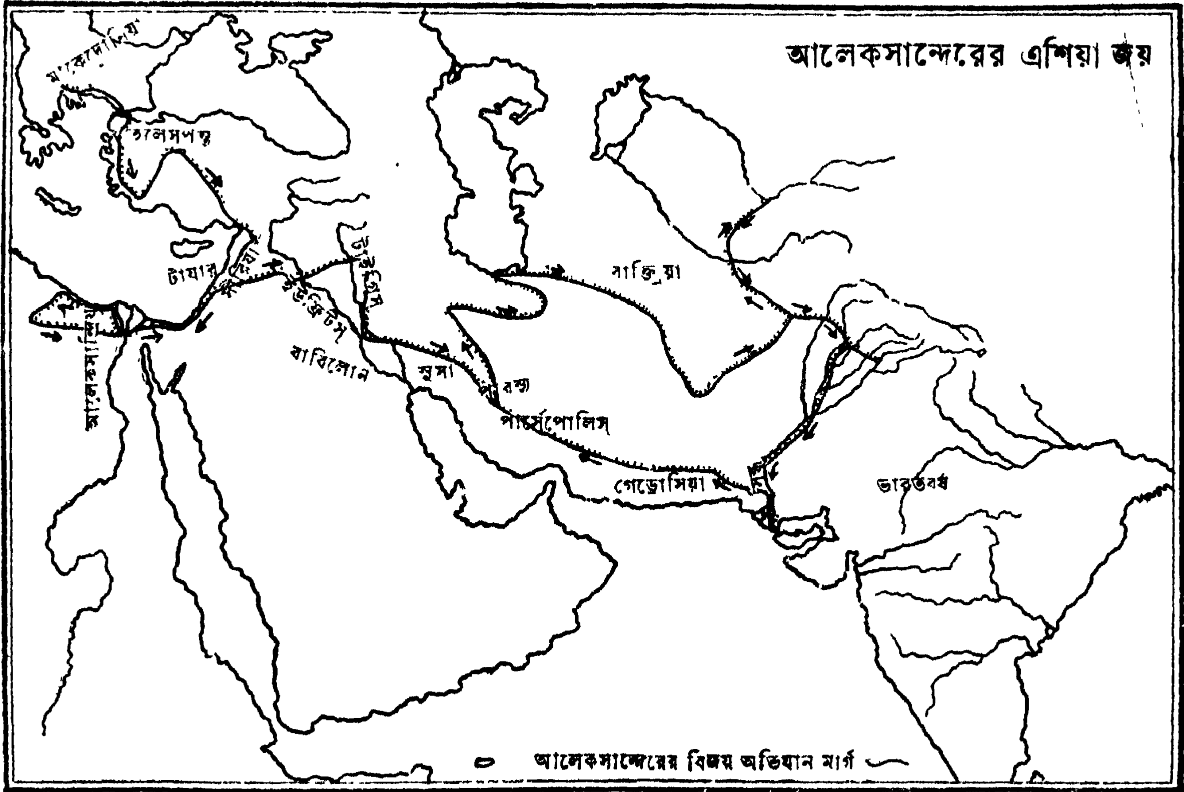
আলেক্‌সান্দেরের জয়যাত্রা

ইউরোপের একখানি মানচিত্র খুলিলে দেখিতে পাইবে যে, দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এক উপদ্বীপ আছে, তাহার নাম গ্রীস। প্রাচীন-কালে যখন ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের লোকেরা সভ্যতার কিছুই জানিত না, তখন গ্রীস্‌দেশের লোকেরাই ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় গ্রীক্‌প্রভাব খুব বেশী।

এই গ্রীসের অন্তর্গত মাকেদোনিয়া (Makedonia বা Macedonia) নামক দেশে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫৬ অব্দে আলেক্‌সান্দের (Alexander) নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ছিলেন মাকেদোনিয়ার রাজা ফিলিপ্‌। বাল্যকালে প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ দার্শনিক আরিস্ততল্‌ (Aristotle) ইঁহার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হন। লেখাপড়ায় খুব উন্নতি না হইলেও কৈশোর হইতেই আলেক্‌সান্দারের বীরত্ব লক্ষিত হয়। ইঁহার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন ইঁহার পিতাকে কেহ হত্যা করে এবং ইনি সৈনিকদের সাহায্যে সিংহাসনে-আরোহণ করেন।

রাজা হইবার মাত্র দুই বৎসর পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৪ অব্দে বাইশ বৎসরের যুবক আলেক্‌সান্দের বিজয়-অভিযানে বাহির হইলেন। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি সমুদ্র - পার হইয়া এশিয়া-মাইনর নামক দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান-কার গ্রীক্‌ সহরগুলিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সেখান হইতে তিনি সিরিয়া (Syria) ও ফিনিসিয়া (Phoenicia) দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সকল দেশ সে সময় দারয়বুষ্‌ (গ্রীক্‌ Darius) নামক পারস্য সম্রাটের অধীন ছিল। সম্রাট ভীত হইয়া সাম্রাজ্যের অনেকখানি অংশ আলেক-সান্দেরকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আলেক্‌সান্দের অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না; তিনি কোনও প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফিনিশিয়ার টায়ার (Tyre) নামক স্থান জয় করিতে গ্রীক্‌গণকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখানকার অধিবাসিগণ সহরের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আলেক্‌-সান্দারকে সহরের বাহিরে প্রায় সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে গ্রীক্‌গণ সহরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল এবং

৩০,০০০ লোককে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিল। এইরূপে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জয় করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩২-১ অব্দে আলেক্‌সান্দের মিশরদেশে (Egypt) প্রস্থান করিলেন এবং অল্প সময়েই ঐ দেশ জয় করিয়া লইলেন। মিশরদেশের উত্তর উপকূলে তিনি আলেক্‌সান্দ্রিয়া (Alexandria) নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে। পারস্য-সম্রাট দারয়ব্যুষ্‌ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। বাবিলন প্রভৃতি নগর অধিকৃত হইল। গ্রীক্‌সেনা এখন অবাধে পারস্যদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পের্সেপোলিস্‌ (Persepolis) নামে মনোহর মহানগরটি ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পারস্য সম্রাটের ধনরত্ন আলেক্‌সান্দেরের হস্তগত হইল। সুন্দর রাজপ্রাসাদটিতে



করিলেন। এই নগর কালে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং ভূমধ্যসাগরের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

সারিয়াদেশের মধ্য দিয়া আলেক্‌সান্দের মিশর হইতে ফিরিয়া আসেন। ৩৩১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করিয়া গ্রীক্‌সেনা পারস্য-সম্রাটের সম্মুখীন হয় এবং অনতিবিলম্বে জয়লাভ আগুন লাগাইয়া দিয়া আলেক্‌সান্দের আপনার ধ্বংসপিপাসা মিটাইলেন।

পারস্য হইতে আলেকসান্দের বাক্ট্রিয়ার (Bakria বা Bactria)প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ধীরে ধীরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি জিত হইল। এইগুলির

মধ্যে প্রধান ছিল অশ্মক—গ্রীক্‌গণ যাহাকে বলিত অস্‌কেনস্‌। এই দেশের রাজধানীর গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকগণ নাম দিয়েছেন মস্‌সগ (Massaga); ইহার ভারতীয় নাম কি ছিল বলা যায় না। ইহার দুর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু আলেক্‌সান্দের নয়দিনে ইহা অধিকার করিয়া লন। দুর্গ জয়ের পর আলেক্‌সান্দের ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য এই ৭,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে নিজের দলভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু সৈন্যগণ বিদেশীকে ভারত জয়ে সাহায্য



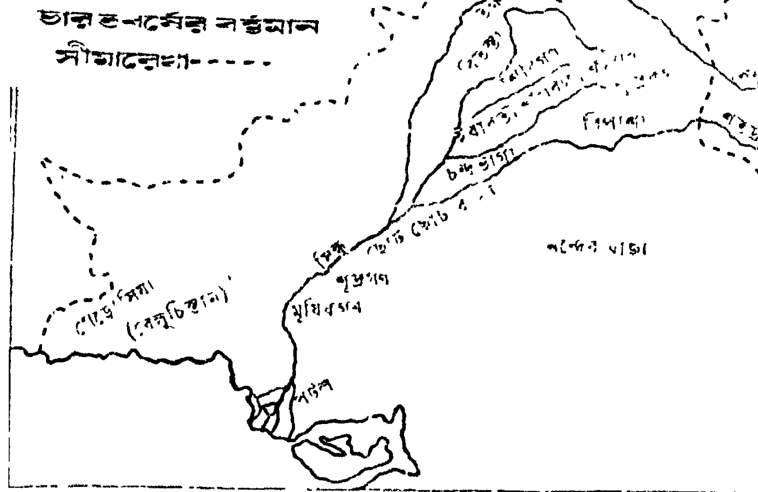
আলেকসান্দের

করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। আলেক্‌সান্দের এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সহসা সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু আলেকসান্দেরের বিরাট্‌ সৈন্যদলের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। অবশেষে তাহারা দেশের সম্মানের জন্য বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে আলেক্‌সান্দেরকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিন্দা করিয়াছেন।

অশ্মকরাজ্য হইতে বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া গ্রীক্‌দল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দের জানুয়ারী মাসে সিন্ধুনদের তীরে বর্ত্তমান আটকের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রীক্‌গণ সিন্ধুনদ পার হইতে না হইতেই তক্ষশিলার রাজা আম্ভি আলেক্‌-সান্দেরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দূত পাঠাইলেন। আম্ভির ব্যবহার দেখিয়া আলেক্‌সান্দের ভাবিলেন যে ভারতবর্ষের সকল রাজাই বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবে। এই মনে করিয়া তিনি ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের শাসকের নিকট দূত পাঠাইলেন যেন তিনি শীঘ্র উপঢৌকন লইয়া আলেকসান্দেরের সহিত দেখা করেন। পুরু (গ্রীক্‌ Poros) নামে এক ক্ষত্রিয়বীর তখন ঐ প্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি উত্তর পাঠাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য আলেক্‌সান্দেরের সহিত দেখা করিতে আসিবেন।

আলেক্‌সান্দেরের ঝিলাম (গ্রীক্‌ Hydaspes) নদীর তীরে আসিয়া দেখিলেন যে, পুরু নদীর অপর পারে সৈন্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন বর্ষাকাল, নদীতে খুব বন্যা আসিয়াছে। আলেকসান্দের অনেক ভেলা ও নৌকা প্রস্তুত করাইয়া অতি কষ্টে নদী পার হইয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দের জুলাই মাসে পুরুর সম্মুখীন হইলেন। পুরুর পদাতিকগণের অস্ত্র ছিল বর্ষা ও ধনুর্ব্বাণ। ধনুকগুলি ৫।৬ ফুট ও তীর এক একটি ৩ গজ করিয়া লম্বা ছিল। গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় তীরন্দাজদের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল এবং তাহাদের তীর ঢাল বা বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিত। পদাতিক ছাড়া পুরুর সৈন্যে ছিল অশ্বারোহী রণ-হস্তী ও রথ। সমস্ত দিন ধরিয়া গ্রীক্‌ ও

ভারতীয়দের মধ্যে যুদ্ধ হইল; ভারতীয় সৈন্যগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভ করিতে পারিল না। ৩,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাতিক নিহত হইল, এবং প্রায় ১০,০০০ বন্দী হইল। পুরু স্বয়ং



যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন ও অজ্ঞান অবস্থায় গ্রীক্ হস্তে বন্দী হইলেন। পরে আলেক্‌সান্দের তাহার সুদীর্ঘ, বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কিরূপ ব্যবহার চাও?' পুরু সদর্পে উত্তর দিলেন, 'রাজার মত'। আলেক্‌সান্দের বীরের আদর করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

আলেক্‌সান্দের অতঃপর প্রায় বিনা বাধায় চেনাব (Akesines) ও রাভী (Hydraotes) অতিক্রম করিয়া রাভী-বিয়াস দোআবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রদেশে কতকগুলি গণরাজ্য অবস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল কঠগণ (Kathaioi)। গণরাজ্যগুলি একত্র হইয়া আলেক্‌সান্দেরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; কিন্তু কিছুই ফল হইল না। আলেক্‌সান্দের সঙ্গল (Sangala) নামক স্থানে অবস্থিত কঠগণের দুর্গ একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিয়াস (Hyphasis) নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আলেক্‌সান্দের শুনিতে পাইলেন যে, পূর্ব্ব দিকে মগধ সম্রাট নন্দ বলসামন্ত লইয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আলেক্‌সান্দের বিয়াস পার হইতে ব্যস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। আলেক্‌সান্দের




আলেকসান্দেরের মুদ্রা

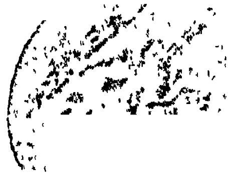
তাহাদিগকে অনেক ধনরত্নের লোভ দেখাইলেন, যশের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না।

অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া পূর্ব্বেকার পথ



[illegible]

দিয়াই আলেক্‌সান্দের ফিরিতে করিলেন। পথে তিনি শিবি (Siboi), ক্ষুদ্রক (Oxydrakai) প্রভৃতি ছোট ছোট গণরাজ্য জয় করিয়া মালব (Malloi) নামে একটি গণরাজ্য আক্রমণ করিলেন। মালবগণ তখন যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; আলেক্‌সান্দের হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বহু সহস্র লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন এবং অনেককে বন্দী করিলেন। পরে সিন্ধুনদ ধরিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইবার পথে শাম্ব (Sambos) মূষিক, (Mousikenos) প্রভৃতি রাজ্য জয় করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি জাহাজে করিয়া একদল সৈন্যকে সমুদ্রপথে পাঠাইয়া দিলেন এবং বাকী সৈন্য লইয়া স্বয়ং বেলুচিস্তান ও পারস্যের মধ্য দিয়া বাবিলন নগরে উপস্থিত

আলেক্‌সান্দেরের মুদ্রা

হইলেন। সেখানে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁহার অসুখ হয় এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৩ অব্দে জুনমাসে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেক্‌সান্দের যে বীর ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীস হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সকল দেশ পরাজিত করিয়া এতবড় সাম্রাজ্যসৃষ্টি এ পর্য্যন্ত আর কেহই করেন নাই। বহুবার তিনি সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিপদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক সকল ঐতিহাসিকই তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার পাঞ্জাব-জয়ে বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নাই; কারণ পাঞ্জাবে ঐ সময় কোনও বড়-রাজ্য ছিল না। মগধসম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার ভারত-জয় গরিমাময় হইত। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল মগধরাজ্যের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হইতে অসম্মত হওয়ায় তিনি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ইউরোপে আলেক্‌সান্দেরের নাম অতি আদরের সামগ্রী। প্রাচীনকাল হইতে তাঁহার নামে অনেক কাহিনী, কবিতা ও ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যের লোকে তাঁহার বিজয়-অভিযান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। পারস্যে তিনি মাত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ-দাহী রূপে পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষের কোনও গ্রন্থে বা গল্পে তাঁহার নামগন্ধও নাই। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার সাম্রাজ্য একেবারেই স্থায়ী ছিল না। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই পাঞ্জাব তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। আলেক্‌সান্দেরের যুগে ভারতবাসীরা গ্রীক্‌দের নিকট হইতে কিছুই শেখে নাই।

আলেক্‌সান্দেরের অভিযান নিষ্ঠুর ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁহার গতিতে বিন্দুমাত্র বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না; এই জন্য যে দেশ তাঁহাকে বিনাযুদ্ধে পথ ছাড়িয়া দিত, তাহাদের তিনি কোনও অপকার করিতেন না। কিন্তু যে সকল দেশ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিত, তাহাদের আর রক্ষা ছিল না। নগর পোড়াইয়া দেওয়া, অধিবাসীদের বন্দী করা, দাসরূপে বিক্রয় করা, বালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে লোক হত্যা করা, এই সকল কাহিনীতে তাঁহার বিজয়-যাত্রার বিবরণ পরিপূর্ণ। ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্য যে এরূপ নিষ্ঠুর বিজেতৃগণের হস্তে তাহাদের বার বার পড়িতে হইয়াছে।



নয়নদেব



দাক্ষিণাত্যে দণ্ডীর বন। দণ্ডীর বনে জন্নুদেব এবং সত্যবতী নামে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। তাঁহাদের ছেলে পুণ্ডলীক পিতামাতার প্রতি একেবারেই ভাল ব্যবহার করিতেন না। পুণ্ডলীকের স্ত্রীও স্বামীর মত, বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পুত্র ও পুত্রবধূর অন্যায় ব্যবহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তীর্থ ভ্রমণে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। পুণ্ডলীকের স্ত্রীও স্বামীকে বলিলেন চল, আমরাও তীর্থভ্রমণ করিয়া আসি। পুণ্ডলীক ও তাঁহার স্ত্রী চলিলেন ঘোড়ায় চড়িয়া আর জন্নুদেব ও সত্যবতী চলিলেন পায়ে হাটিয়া। সারাদিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় এই তীর্থযাত্রীর দল গাছের তলায় বা কোনও কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বৃদ্ধ জন্নুদেব ও সত্যবতীকে পুত্র ও পুত্রবধূর ঘোড়ার সেবা করিতে হইত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ভাবিলেন : এইরূপ তীর্থযাত্রা অপেক্ষা দণ্ডীর বনে থাকাই যে ছিল ভালো। কিন্তু দৈবক্রমে বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

সেকালে কুকুট স্বামী নামে একজন সাধু ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় এই যাত্রীর দল তাঁহার কুটীরের পাশে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। নিবিড় বনের মধ্যে পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট কুটীরে সাধু কুকুট স্বামী ধ্যানমগ্ন। গাছের তলায় জন্নুদেব, সত্যবতী এবং পুণ্ডলীকের স্ত্রী ঘুমাইয়া আছেন। একা পুণ্ডলীক জাগিয়া আছেন। এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। পুণ্ডলীক দেখিলেন, কোথা হইতে সাতটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া ঝাড়ু ও জল দিয়া কুকুট স্বামীর কুটীরের চারিদিক ও তাহার আশে পাশের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিতে অতি সুন্দরী হইলেও তাঁহাদের সকলেরই পরিবার কাপড়-চোপড় অত্যন্ত মলিন। ঐ সাতটি স্ত্রীলোক বাহিরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার পর পর কুকুটস্বামীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল পরেই আবার ফিরিয়া আসিলেন এইবার পুণ্ডলীক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, সাতটি রমণীর বসন ভূষণ অতি শুভ্র ও নির্ম্মল।

পুণ্ডলীক ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া ঐ স্ত্রীলোক কয়টির পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন?—তাঁহারা বলিলেন, —আমরা গঙ্গা, যমুনা সরস্বতী প্রভৃতি সাতটি নদী। প্রতিদিন শত শত পাপী আমাদের জলে স্নান করিয়া আমাদিগকে অপবিত্র করে; সেইজন্য

আমাদের দেহে মলিন বসন দেখিয়াছ। কুকুট স্বামীর পুণ্যস্পর্শে, আমাদের দেহ হইতে পাপের মলিনতা দূর হইয়াছে। তারপর বলিলেন, পুণ্ডলীক, তোমার মত পাপী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই, তুমি তোমার পিতামাতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছ, এ পাপের আর প্রতিকার নাই; সাধ্য নাই যে, আমাদের এই সপ্ত নদীর পুণ্য জলেও সেই পাপ ধুইয়া ফেলিতে পারে। সেদিন হইতে পুণ্ডলীকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল; পিতামাতার সেবায় সে আত্মসমর্পণ করিল। পিতামাতার প্রতি পুণ্ডলীকের অলৌকিক ভক্তির কথা ক্রমে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেবতার আসন টলিল। দ্বারকা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডলীকের পিতৃমাতৃভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কুটীরে আসিলেন। কৃষ্ণ বাহির হইতে ডাকিলেন, পুণ্ডলীক! আমি আসিয়াছি, একবার বাহিরে এস, তোমার সহিত আমার কয়েকটা কথা আছে।

পুণ্ডলীক তখন পিতামাতার চরণ সেবা করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি একখানা ইট বাহিরে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—আপনি ওখানে দাঁড়ান। আমি একটু পরেই আসিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সেই ইটখানার উপর দাড়াইয়া রহিলেন।

পিতামাতার সেবা শেষ করিয়া পুণ্ডলীক বাহিরে আসিয়া কহিলেন, প্রভু আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন বৎস! আমি তোমার এই অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, আজ হইতে আমি এখানেই থাকিব। আমাকে তুমি বিঠোভা নামে অর্চ্চনা করিও। এই পুণ্যস্থানে মহাপুরুষ নয়নদেব বাস করিতেন। নয়নদেব দক্ষিণভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। নয়নদেবের পিতার নাম বিঠোভা এবং মাতার নাম রাণ্‌মাই। বিঠোভা সংসার ত্যাগ করিয়া একবার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন, পরে আসিয়া আবার ঘর-গৃহস্থালী করিতে আরম্ভ করায় তাঁহার জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণগণ বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। এমন কি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিব্রত্তির উপনয়নে আসিয়াও তাঁহারা যোগ দেন নাই। সমাজচ্যুত বিঠোভা ইন্দ্রিয়াণি নদীর ধারে একটি নির্জ্জন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পুত্রেরা আলন্দি গ্রামেই পড়িয়া রহিলেন। নিব্রত্তি ব্রাহ্মণদের কাছে বলিলেন—আপনারা আমাদিগকে সমাজে গ্রহণ করুন, উপনয়ন ও দীক্ষা দিন্। আলন্দির ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, তোমার যদি পৈঠান গ্রামের ব্রাহ্মণদের কাছ হইতে অনুমতি-পত্র আনিতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে দীক্ষা দিব এবং সমাজে গ্রহণ করিব। বড় ভাই নিব্রত্তি ছোট ভাই নয়নদেব এবং ভগিনী মুক্তাবাঈকে সঙ্গে লইয়া পৈঠানে আসিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং পথের কুকুর, শূয়ার, গরু, বিড়াল সকলের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। এমন সময় একটা মহিষ সে পথ দিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণেরা বিদ্রূপ করিয়া মহিসটাকে নয়নদেব (জ্ঞান দেবতা) নাম দিলেন এবং বলিলেন যে, আলন্দির এই ছেলেটিও নয়নদেব। নয়নদেব ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, হাঁ, আমি নয়নদেব, আর মহিষও নয়নদেব। এই বলিয়া নয়নদেব যেমন মহিষের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন অমনি মহিষের মুখ হইতে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইল! এই আশ্চর্য্য ঘটনায় বিস্মিত হইয়া পৈঠান গ্রামের ব্রাহ্মণেরা আলন্দির ব্রাহ্মণদের নিকট ইহাদের নানারূপ সুখ্যাতি করিয়া ইহাদের পবিত্রতা সম্বন্ধে পত্র দিলেন। আলন্দির ব্রাহ্মণেরা এইবার নিব্রত্তি নয়নদেব প্রভৃতি সকলকে উপনয়ন ও দীক্ষা দিয়া সমাজে গ্রহণ করিলেন।

নয়নদেব এই ঘটনার পর হইতে সম্পূর্ণভাবে ধ্যান ও ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তিও ছিল অসাধারণ। মারাঠি ভাষায় তিনি গীতার এক অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপনিষদের অনেক অংশও নয়নদেব মারাঠিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কবি, ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষ বলিয়া দেশে দেশে নয়নদেবের নাম প্রচারিত হইয়াছিল।

নয়নদেব যেমন কবিতা রচনা করিতেন, তেমনি তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাঈও আভঙ্গ বা ছোট ছোট পদ্য রচনা করিতেন। একবার নয়নদেব রাগ করিয়া ভগিনী মুক্তাবাঈকে, তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। মুক্তাবাঈ একখানি কাগজে কয়েকটি আভঙ্গ লিখিয়া নয়নদেবের কুটীরে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

আমাকে ক্ষমা কর নয়নদেব,—দরজা খোল। সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা তারা কি কাহারো কথায় রাগ করিতে পারেন? যার অহঙ্কার নাই তিনিই মহৎ! যেখানে মহত্ব সেখানেই দয়ার বাস! মানুষ কাহার উপর রাগ করিবে? সকলেই যে দেবতার অংশ! পৃথিবীতে যদি অগ্নিবৃষ্টি হয়, সাধুর মুখের বাণীই যে সেই আগুন নিবাইতে পারে। পৃথিবী যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান! ভাই নয়নদেব! রাগ বর্জ্জন কর, দরজা খোল। নয়নদেবের রাগ কমিল, তিনি দরজা খুলিলেন। নয়নদেব এবং তাঁহার ভাইবোনেরা সকলেই অতি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুও ঘটিয়াছিল অতি অদ্ভুত ধরণে। এ মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু। আলন্দি গ্রামে বিঠোভা দেবের মন্দিরের নিকট একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে নয়নদেব প্রবেশ করিলেন। শিষ্যেরা সেই গর্ত্তের উপরে মাটি চাপা দিল।

তাহার এই সমাধির উপর পরে সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে সেখানে এক মেলা বসে এবং নানাদেশের যাত্রীরা আসিয়া নয়নদেবের মূর্ত্তি পূজা করেন। কবি নামদেব নয়নদেবের এই ইচ্ছামৃত্যুর করুণ কাহিনীটি অতি সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মহাপুরুষ-গণের মধ্যে নয়নদেবের নাম চির স্মরণীয় হইয়া আছে।

নয়নদেবের বাণী

বন্ধু! কে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিল, সে-কথা লইয়া বিচার করিতেছ কেন? মানুষকে মানুষ বলিয়াই চিনিও।

ঈশ্বরে যার ভক্তি নাই, সে কি মানুষ?

*   *   *

শস্যহীন মাঠ, জনহীন নগর, শুষ্ক হ্রদ, ফুল ফল-হীন তরু যেমন, তেমনি যে মানুষ মনের মধ্যে সদ্‌ভাব ও সৎচিন্তা পরিপোষণ না করে, তাহার জীবনও তেমনি বৃথা।

ক্ষমা করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন কর। মানুষ মাত্রের মধ্যেই দেবতা আছেন, এই-রূপ জ্ঞান করিয়া মানুষের প্রতি দরদী হইয়া মানুষের দুর্ব্বলতাকে চিরদিন ক্ষমা করিবে।



বেহাগ খাম্বাজ--একতালা

ধন-ধান্যে-পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তারি মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা।
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,
ধুয়া: সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে,
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে, উঠি পাখীর ডাকে জেগে।
(ধুয়া)



এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
(ধুয়া)

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
(ধুয়া)



ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।
(ধুয়া)

১´	২	০	৩ ‖	১´
II { সা সা-া	মা-া মা	মা-া মা	মা মা -া I	মা মা-া
ধ ন ০	ধা ০ না	পু ০ ষ্প	ভ রা ০	আ মা ০
২	০	৩	১	১
মা গমা -পা	পা পা -া	পা পা-া }	{মা গা -া	মা ধা -া
দের এই ০	ব সুন্ ০	ধ রা ০	তা রি ০	মা ঝে ০
০	৩	১	২	০
পা পধা -ণা	ধা পমা -গা	মা ধা ধা-া	পা পর্সা ণা -া	ণা ধা-া
আ ছে০ ০	দেশ এ০ ক	স কল ০	দে শের০ ০	সে রা ০
৩	৩	১´	১	০
(-া-া-পা) } I	{ া ধা ধা I	ধর্সা-াসা	ণা ণা-ধা	পধা া পা
০ ০ ০	০ সে যে	স্ব ০ প্ন	দি য়ে ০	তৈ ০ রি
৩	১´	২	০	৩
মা গা -া	সা গা -া—	মা পা -ধপা	মগা মা -া }	-া-া-া I
সে দেশ্ ০	স্মৃ তি ০	দি য়ে ০ ০	ঘে ০ রা ০	০ ০ ০
১´	২	০	৩	১´
ধ্রু* I { র্সা র্সা-া—	র্সা-া র্সা-া	র্সর্রা র্সা-া	ণা ধা-া I	পধা ধা-া
এ মন ০	দেশ ০ টি	কো থা ও	খুঁ জে ০	পা বে ০
২	০	৩	১´	২
পা পধা-ণা	ণা ণা -া	-া-া-া } I	ণর্সা র্সা-া-	ণা ধা-া
না কো০ ০	ভূ মি ০	০ ০ ০	স কল ০	দে শের ০
০	৩	১´	২	০
পধা পা-া	মা গা-া I	মা মা-া	মা-র্রা র্রা	র্রা র্রা-
রা ণী ০	সে যে ০	আ মা র	জ ০ ন্ম	ভূমি ০
৩	১´	২	০	৩
‖ র্রা র্রা া I	র্সা র্সা-া	ণা-া ণা	রা রা -া	রা গা-রা I
সে যে ০	আ মার ০	জ ০ ন্ম	ভূ মি ০	সে যে ০
১´	২	০	৩	
I সা গা-া	রগা -মা মা	মা মা -া	-া-া-া II	
আ মার ০	জ০ ০ ন্ম	ভূ মি ০	০ ০ ০	

* এই ধুয়া গানের পাঁচ কলির প্রত্যেকটির পরে গীত হইবে।

	২		৩	১'
II { সা -া সা	মা - মা	মা মা -া	মা মা -া I	মা মা া
(১) চ ০ ন্দ্র	সূ ০ র্য্য	গ্র হ ০	তা রা ০	কো থায় ০
(২) এ মন ০	স্নি ০ গ্ধ	ন দী ০	কা হা র	কো থায় ০
(৩) পু ০ ষ্পে	পু ০ ষ্পে	ভ রা ০	শা খী ০	কু ০ ঞ্জে
(৪) ভা য়ের ০	মা য়ের ০	এ মন ০	স্নে হ ০	কো থায় ০

		৩	১	২
মা গমা -পা	পা পা -া	পা পা -া }	{ মা মা -া	ধা ধা -া
(১) উ জ্জ০ ল্	এ মন ০	ধা রা ০	কো থায় ০	এ মন ০
(২) এ ম০ ন্	ধূ ০ ম্র	পা হাড় ০	কো থায় ০	এ মন ০
(৩) কু ০০ ঞ্জে	গা হে ০	পা খী ০	গু ০ ০ ঞ্জ	রি য়া ০
(৪) গে লে০ ০	পা বে ০	কে হ ০	ও মা ০	তো মার ০

	৩	১'		
ধর্সা ণা -া	ধা পমা -গা I	মা ধা -া	পা পর্সা -ণা	ণা ধা -া
(১) খে০ লে০	ত ড়িৎ ০	এ মন ০	কা লো০ ০	মে ঘে ০
(২) ঝ০ রিৎ ০	ক্ষে ০০ ত্রে	আ কাশ ০	ত লে ০ ০	মে শে ০
(৩) আ০ সে ০	অ লি০ ০	পুঞ্জে০ ০	পু ০ ০ ঞ্জে	খে য়ে ০
(৪) চ০ রণ ০	দু টি০ ০	ব ০ ০ ক্ষে	আ মার ০	ধ রি ০

	৩			
(-া -া -া) } I	-া ধা ধা I	ধর্সা র্সা -া I	ণা ণা -ধা I	পধা ধা পা
(১) ০ ০ ০	০ সে থা	পা খীর ০	ডা কে ০	ঘু মি য়ে
(২) ০ ০ ০	০ এ মন	ধা নের ০	উ পর ০	ঢে উ খে
(৩) ০ ০ ০	০ তা রা	ফু লের	উ পর ০	ঘু মি য়ে
(৪) ০ ০ ০	০ আ মার	এই ০ ০ দে	শে তে০ ০	জ ০ ন্ম

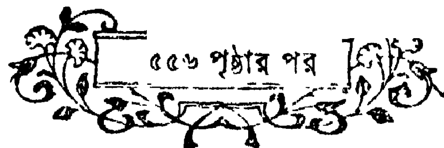
৩	১'			
মা গা -া I	সা গা -া	মা পা -ধপা	মগা মা -া	(-া পা পা পা) I
(১) উ ঠি ০	পা খীর ০	ডা কে ০ ০	জে ০ গে ০	০ সে থা
(২) লে যায় ০	বা তাস ০	কা হার ০ ০	দে ০ শে ০	০ এ মন
(৩) প ড়ে ০	ফু লের ০	ম ধু ০ ০	খে ০ য়ে ০	০ তা রা
(৪) যে ন ০	এই ০ দে	শে তে ০ ০	ম ০ রি ০	০ আ ম রা

I -া -া -া II II ধ্রু
(১) ০ ০ ০ ধ্রু
(২) ০ ০ ০ ধ্রু
(৩) ০ ০ ০
(৪) ০ ০ ০

দেশ-বিদেশের কথা



তিব্বত



তিব্বতের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে খুব ভালবাসে। এজন্য প্রতি বৎসর তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষ, চীন ও মঙ্গোলিয়াতে যাতায়াত করে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে একটি বাণিজ্য-পথ লাডক হইতে দক্ষিণ তিব্বতের শিগাৎসি হইয়া লাসায় গিয়াছে। এইভাবে নানা দিক দিয়া অজানা গিরিপথে অনেক বাণিজ্যপথ বাহির হইয়াছে। ফারিজোঙ্গ (Phari Jong) নামক স্থানে ভুটান, সিকিম এবং তিব্বতের পথ আসিয়া মিলিয়াছে। এখান হইতে বণিকেরা নানাপথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া অগ্রসর হয়। তিব্বতীয়েরা ভেড়ার লোমের বিনিময়ে চীনাদের নিকট হইতে চা সংগ্রহ করে। ইহাদের চা খাইবার রীতি অদ্ভুত রকমের। তাহারা আমাদের মত চায়ের সহিত দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা খায় না। তাহারা চায়ের সহিত মাখন ও সোডা মিশাইয়া চা খায়। লাসা হইতে মঙ্গোলিয়ার দিকে যে পথটি গিয়াছে, সেই পথ চাঙ্গ-তাঙ্গ (Chang Tang) দিয়া মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গাতে (Urga) যাইয়া পৌছিয়াছে।



খচ্চরের পিঠে ভেড়ার লোমের বোঝা

এইভাবে তিব্বতে দুরারোহ পার্ব্বত্য প্রদেশের সহিত সাইবেরিয়ার সমতল ভূমির সংযোগ সাধিত হইয়াছে। ভারতের দিকে, চীনের দিকে ও

মঙ্গোলিয়ার দিকে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা খচ্চর ও গরুর পিঠে ভেড়ার লোমের বোঝা চাপাইয়া যাতায়াত করে। কোকোনোরে হ্রদের পারে বণিকেরা তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে রওনা হয়। কোকোনোর (Kokonor) হ্রদকে পূর্ব্বে চীনারা পশ্চিম সাগর নাম দিয়াছিল। এখন ইহার নাম নীল সাগর। ইহার জল লোনা। দস্যু তস্করাদির ভয়ে তিব্বতীয় বণিকেরা এক সঙ্গে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া পথ চলাচল করে। শিমলা পাহাড় হইতেও তিব্বতের দিকে পথ গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-পথ কালিম্পোং। সিকিমের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের পথে চুম্বি উপত্যকায় পৌছিতে হয়, সেখান হইতে ফারি (Phari), তারপর ধীরে ধীরে লাসার দিকে পথ চলিয়াছে। তিব্বত ও ভারতের বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য এই লাসা কালিম্পোংএর পথেই হয়। ভবিষ্যতে আসামের দিক দিয়া একটি সহজ পথে তিব্বতের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসা চলিতে পারে। ঘোড়ায় চড়িতে ও পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতে তিব্বতীয়েরা খুব পটু। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে,—



য়াকের (তিব্বতী গরুর) পিঠে পশম বোঝাই দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছে



লাসার সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা—সিকিমের রাণীর চিত্র

পিঠে বোঝা লয়ে উঠে পাহাড়ের গায়
ঘোড়া বলি তায়!
চড়াই উৎরাই ভাঙ্গছে তিনি উচু পাহাড় গায়
মানুষ বলি তায়!

তোমরা মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ পড়িতে যাইয়া পণ্ডিত ডারউইনের নাম শুনিয়াছ। তিনি মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিল একথা বলিয়াছিলেন। তিব্বতীয়েরা তাহার একথার সাক্ষী দেয়। তাহারা বলে যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিল। একথায় তাহারা লজ্জা বোধ করে না। তাহাদের এই কিংবদন্তীমূলক ইতিহাসের কথা বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন—তিব্বতীয়েরা মঙ্গোলিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং অতি প্রাচীন কালে এশিয়ায় বাস করিত। সাধারণতঃ মনে হয় যে, ইহারা কতক আসাম অঞ্চল হইতে এবং কতক ব্রহ্মদেশ হইতে তিব্বতে

আসিয়াছিল। ভাষার দিক্ দিয়া ব্রহ্মদেশবাসীদের সহিত তিব্বতীয়দের বেশ মিল আছে। চেহারার দিক দিয়া তিব্বতীয় ও মঙ্গোলীয়দের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখা যায় না। কেবল কথা বলিলে দুই জাতির পার্থক্য বোঝা যায়। মনে হয়, তিব্বতের প্রাচীন অধিবাসীরা যাযাবর জীবন যাপন করিত। গরু চরাইয়া, চমরী-গরুর পাল রাখিয়া, আজ এখানে, কাল ওখানে, এইরূপভাবে চলাফেরা করিয়া তাহারা দিন কাটাইত। এখনও তিব্বতীয় কৃষকদের মধ্যে এদেশের আদিম অধিবাসীদের অনেকটা চালচলন দেখা যায়।

তিব্বতের অতি প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। তিব্বতীয়দের অনেক লিখিত ইতিহাস আছে, তবে তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্ম-বিষয়-সম্পর্কিত। 'নীলখাতা' বা তেপ-তার গোন্ পো (Tep-Ter Ngon-po) নামে তিব্বতীয়দের প্রাচীন ইতিহাসে একটি গল্প আছে যে, ভারতবর্ষ হইতে যখন একজন সন্ন্যাসী- সে অতি আদি যুগে তিব্বতে আসেন, তখন তিনি তিব্বতকে জলে নিমজ্জিত দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার আসিয়া দেখিলেন, অনেক পাহাড় জলের উপর মাথা তুলিয়াছে। এ পুঁথিতে আরও লেখা আছে যে, সেকালে তিব্বত ছোট ছোট কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এ সব পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা সপ্তম শতাব্দীতে সোঙ্গ সেন গাম্-পো (Song tsen Gam Po) নামে একজন রাজার কথা জানিতে পারি। সোঙ্গ সেন গাম্ পো তের বৎসর বয়সে সিংহাসনে বসেন এবং অনেক বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার বিজয়ী সেনা ব্রহ্মদেশের কতকাংশ এবং পশ্চিম চীনদেশ জয় করিয়াছিল। সোঙ্গ সেন্ গাম্ পো চীনদেশের এক রাজকুমারী ও নেপালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। চীনারাজকুমারী এবং নেপাল রাজকুমারী ইঁহারা দুইজনেই বৌদ্ধমতলম্বী ছিলেন, কাজেই তাঁহারা রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ আনীত হয়। তিব্বতে তখন কোন লিখিত ভাষা ছিল না। ভারতীয় অক্ষরের আদর্শে এসময়ে অক্ষরের ব্যবহার ও লিখিত ভাষার প্রচলন হইল। এই রাজাই নানা স্থানে বৌদ্ধ বিহার নিম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। রাজা সোঙ্গ-সেন্ পো রাজ্য মধ্যে অনেক বিধিব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁহার শাসন-গুণে রাজ্য মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন হইল, চোর-ডাকাতের প্রতি শাস্তির বিধান হইল, ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা আরম্ভ হইল। এক কথায় তিনিই প্রথমে তিব্বতে নানাভাবে ব্যবস্থা ও বিধানের প্রবর্ত্তন করেন।

প্রাচীন ইতিহাস

সেকালে নেপাল, চীন কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকেরা তিব্বতে আসিতেন। রাজা গাম্-পো, রাজধানী লাসায় লাল পাহাড়ের গায়ে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে দালাই লামার পোটোলা নামক বাসভবন সেইখানেই অবস্থিত। তিব্বতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নৃপতি সোঙ্গ সেন্ গাম্ পোর নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। তিব্বতে সোঙ্গ-সেন-গাম্ পো ইঁহার পূজা হয়। নৃপতি গাম্ পোর পৌত্র চীনদেশ হইতে তিব্বতে চায়ের প্রচলন করেন। তিব্বতের লোকেরা প্রতিদিন ত্রিশ হইতে সত্তর পেয়ালা পর্য্যন্ত চা পান করে। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষা হইতে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, নেপাল ও কাশ্মীর হইতেই তিব্বতে শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। তিব্বতের রাজাদের মধ্যে সোঙ্গ-সেন্ গাম্-পো, তি সঙ্গে দিৎসেন্ (Ti Song De tesu), রাল-পা-চান (Rul pa-chan) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা তি সোঙ্গ দিৎসেন্ তান্ত্রিক পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

ভারতের যে সকল পণ্ডিত তিব্বতে যান, তাঁদের মধ্যে দীপঙ্কর, অতীশ বা শ্রীজ্ঞান ছিলেন, প্রধান। অতীশের বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে। অতীশ লাসা হইতে ষোল মাইল দূরে পাহাড়ের একটি গুহায় বাস করিতেন। তাঁহার সেই গুহাটি আজও সুরক্ষিত আছে। চারিদিক সূর্য্যকিরণে ঝলমল, বরফে ঢাকা, উঁচু পর্ব্বতশিখর, বন, গোলাপের ঝোপ-ঝাড়। এই স্থানটি সত্য সত্যই মুনিদের আশ্রমের উপযোগী। তিব্বতীয়দের উপর ভারতীয় পণ্ডিতগণের ধর্ম্মের প্রভাব এখনও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দীপঙ্কর, অতীশ বা শ্রীজ্ঞান

তিব্বতের রাজাদের প্রভাব লুপ্ত হইবার পর দালাই লামা বা পুরোহিত রাজাদের প্রভাব আরম্ভ হয়। সেকালে লামাদের মধ্যে সো-নাম-গিয়াৎসু (So-nam-Gyatso) তিব্বতে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। সো-নাম গিয়াৎসু শব্দের অর্থ হইতেছে 'জ্ঞান-সমুদ্রের রথ'। ইনি তিব্বতের সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন।

পঞ্চম দালাই লামার সময় আনুমানিক ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইউরোপীয় পর্য্যটক তিব্বতে গমন করেন। এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নাম ফাদার এন্টোনিয়ো দি আনড্রাডা (Father Antonion die Andrada)। ইনি একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক এবং জাতিতে পর্ত্তুগীজ ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি লাসা কিংবা গিয়াংসিতে যাইতে পারেন নাই।



ভেন্ হেডিন্

মার্কোপোলো পামির পর্ব্বত পার হইয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতে যান নাই। ইউরোপীয়দের মধ্যে অষ্ট্রীয়ার অধিবাসী জোহান্ গ্রুবার Johan Gruerber) এবং বেলজিয়মের অধিবাসী আলবার্ট ডরভিল (Albertd orville) ইঁহারা পিকিং হইতে কোকো হ্রদের ধার দিয়া উত্তর



তিব্বতী কুস্তী

তিব্বতের পথে লাসা যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ইহার পর একে একে অনেক ইউরোপীয় পর্য্যটক তিব্বতে আসেন। সে সকলের মধ্যে (Sven Hedin) ভেন্ হেডিনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার লেখা (Trans Himalaya) নামক বই পড়িলে হিমালয়ের নানাস্থানের বিশেষতঃ তিব্বত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

দালাই লামাদের প্রভাব ধর্ম্মের প্রভাব। তাহার ফলে তিব্বতের লোকেরা যুদ্ধ বিদ্যা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। চীনসম্রাট্ ধর্ম্মগুরু দালাই লামার হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ এবং দেশের শাসন বিধান করিতেন। এক সময়ে তিব্বতের উপর চীনাদেরই প্রভাব ছিল।

দালাই লামারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই জীবন কাটান। তাঁহাদের বিবাহ করিতে নাই, বিলাস ব্যসনে জীবন কাটাইতে নাই। এই সব অনেক কিছু নিয়ম আছে। তবে খাওয়া দাওয়ার

সম্বন্ধে তেমন কোনও বাধা নাই। মাংস ইঁহারা খান। কেননা, অত বড় শীতের দেশে শাকসব্জী



তিব্বতের সম্ভ্রান্ত মহিলা

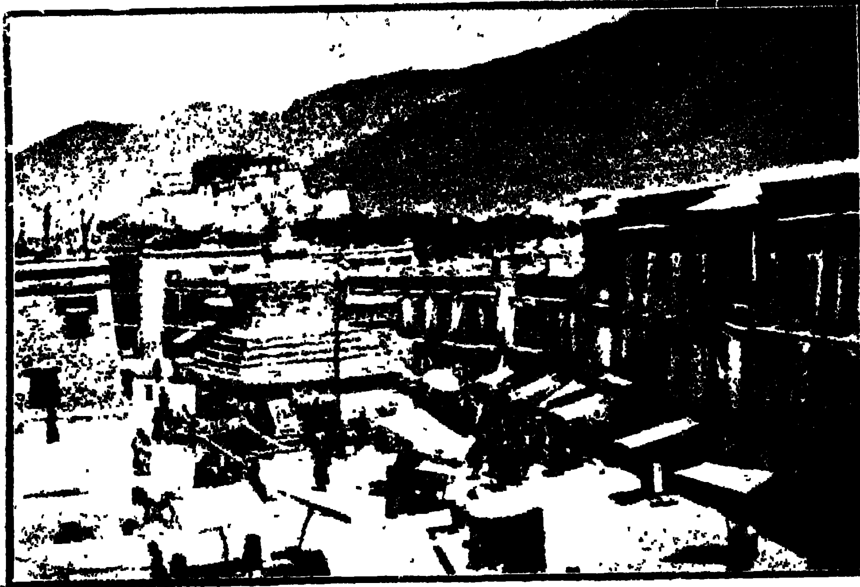
খাইয়া জীবন রক্ষা হয় না। দালাই লামাই দেশের ধর্ম্মগুরু, দেবতা এবং রাজা, এইরূপ বলা যায়।

তিব্বতে স্ত্রীজাতির প্রতি বেশ সম্মান দেখান হয়। সেকালে কোনও অঞ্চলের সর্দ্দারের মৃত্যু



তিব্বতের নরনারী

হইলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী কিংবা কন্যা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দেশের শাসনকার্য্যে স্ত্রীলোক-দেরও বেশ হাত আছে।



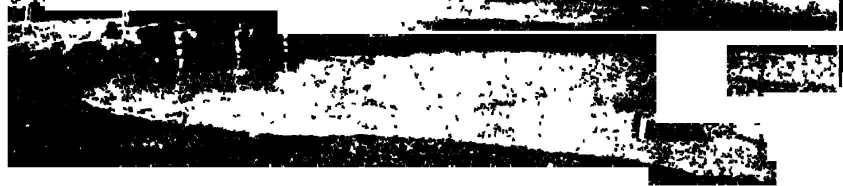
লাসার বাজার

লাসা তিব্বতের রাজধানী। সহরে প্রবেশ করিবার মুখে স্তম্ভের গায়ে তিব্বতী ভাষায় এবং চীনা-ভাষায় খোদিত লিপি আছে। লাসা সহরের এই প্রস্তর স্তম্ভটি প্রায় হাজার বৎসরের পুরাণো কিন্তু এখনও বেশ অটুট অবস্থায় আছে। লাসা সহরের দুই দিকে চীনাদের ও তিব্বতীয়দের দোকানের সারি।

নেপালীদের দোকানের সংখ্যাও বড় কম নাই। সহরে পথঘাট অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। লাসা (Lhassa) তিব্বতীয়দের কাছেই শুধু নহে, সমুদয় বৌদ্ধ জগতের লোকের কাছেই তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। তাহাদের কাছে লাসা—দেবতাদের বাসভূমি। সহরের চারিদিক ঘিরিয়া খুব পুরাণো গাছের সারি, প্রাচীরের মত ঘিরিয়া আছে। গাছের আড়াল দিয়া দূর হইতেই সাদা সাদা উঁচু উঁচু বাড়ীগুলি চোখে পড়ে। মঠ ও বিহারের চূড়া অতি সুন্দর দেখায়। বুদ্ধল (Budha La) বা বুদ্ধের পাহাড়ের উপর দালাই লামার বিখ্যাত পোটালা প্রাসাদ অবস্থিত।

লাসা সহরের বাড়ীঘরগুলি চার পাঁচ তলা উঁচু। প্রায় সকল বাড়ীই সাদা চূণকাম করা। জানালাগুলি লাল রঙে রঙাইয়া দেয়। বাহির হইতে বাড়ীঘরগুলি বেশ সুন্দর দেখায়। কিন্তু ভিতরের ঘরগুলি নোংরা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ এবং বাসন কোসনে ভরা থাকে। লাসা তেমন বড় সহর নয়। বড় জোর চারিদিক ঘিরিয়া চার পাঁচ মাইল হইতে পারে।





দালাই লামার রাজপ্রাসাদ– পোটালা—লাসা

সহরের বড় রাস্তাটি বেশ চওড়া এবং অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু গলিঘুঁজিগুলি অত্যন্ত নোংরা ঐ সব পথে চলিতে ঘৃণা বোধ হয়। এখানকার বেশীর ভাগ বাড়ীই ইট ও পাথরে গড়া। কতক কতক মাটি দিয়াও তৈয়ারী হয়, কিন্তু বাহিরে এমন করিয়া চূণের প্রলেপ দেওয়া হয় যে মাটি কি ইট-পাথরে গড়া, তাহা বুঝিবার যো থাকে না।

লাসা সহরে প্রায় তিন চারি শত বৌদ্ধ বিহার আছে। সে সকলের মধ্যে সাঙ্গ খাঙ্গ (Tsang khang) নামক প্রধান বৌদ্ধ মন্দির দেখিবার বটে। এই মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের এক অতি বৃহদাকার মূর্ত্তি আছে। কথিত আছে যে এই মূর্ত্তিটি বুদ্ধদেবের জীবিতকালে মগধে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিব্বতীয়েরা এই মূর্ত্তির নাম দিয়াছে যোকোরিপ্রোক্—সোজা কথায় যোকে। এই মূর্ত্তিটি সোনা রূপা, দস্তা, লোহা, তামা, হীরা, পদ্মরাগ, মুক্তা ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মূল্যবান মণি দিয়া প্রস্তুত। লাসায় প্রায় সমুদয় মঠেই নানা শ্রেণীর দেবদেবীর মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঙ্গ খাঙ্গ-মন্দির

তিব্বতীয়েরা চতুর-চালাক, সাহসী ও পরিশ্রমী। নাচ-গান ও আমোদপ্রমোদপ্রিয়। ইহারা দেখিতে বেঁটে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইহাদের কুষ্ঠিতে লেখে নাই। ইহারা মাথার চুল না কামাইয়া পিঠের দিকে বেণী ঝুলাইয়া রাখে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী পরিশ্রমী। চাষবাস ঘর গৃহস্থালী সব ইহাদের হাতে।

তিব্বতীয়দের শাসন বিধান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। চোর যে মূল্যের জিনিষ চুরি করে, তাহার সাত গুণ পরিমাণ দণ্ড দিতে হয়। এক টাকা চুরি করিলে সাত টাকা দিবার রীতি। তেরো বছরের ছেলে-মেয়েরা কোন অপরাধ

করিলে তাহাদের কোন সাজা পাইতে হয় না। কেহ যদি নিজের বাড়ীতে চোরকে লুকাইয়া রাখে তাহা হইলে চোরের চেয়ে বেশী সাজা তাহাকে ভোগ করিতে হয়।। খুনীকে হতব্যক্তির সৎকার ব্যয়, দরবারে অর্থদণ্ড এবং নিহত ব্যক্তির পরিজনের সহিত শান্তিস্থাপনের জন্যও কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়।

তিব্বতিয়েরা সচরাচর মৃতদেহ দাহ করে না। কিংবা কবর দেয় না। তাহারা মৃতদেহ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া উঁচু পাহাড়ের গায়ে ফেলিয়া রাখে। সেখানে শত শত শকুনি গৃধিনী আসিয়া মৃতদেহের মাংস খাইয়া নিঃশেষ করে। সময় সময় লামাদের মৃতদেহ পোড়ান হয়। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত রোগিগণের মৃতদেহ থলিতে পুরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়।

তিব্বতে অনেক রকমের খেলার প্রচলন আছে। মিঙ্গ মাঙ্গ (Ming Mangg) খেলা কতকটা দাবার মত। পাশা খেলা ও অন্যান্য অনেক খেলাও আছে। এ সকল ছাড়া কুস্তি, পোলো, ঘোড়দৌড়, নাচ ও অনেক প্রকারের আমোদ প্রমোদ আছে। লামাদের নাচ দেখিবার মত বটে।

শিক্ষার আদর স্থান

তিব্বতীয়েরা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিতে অত্যন্ত ভালবাসে। পথ চলিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে আর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। তিব্বতের প্রধান প্রধান কয়েকটি মঠ ও বিহারের এখানে নাম করিলাম। গয়াংস্থ, ত্যাশিলাম্পো, ডোঙ্গৎসি, গানদেন

om ma ni Pa ... hum.

(Ganden) এই ডোঙ্গৎসি মঠের এক প্রাচীন লামা বাঙ্গালী ভ্রমণকারী শরৎচন্দ্র দাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শিগাৎসি (Shigatse) তিব্বতের দ্বিতীয় প্রধান সহর। দালাই লামাকে নানাপ্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় কিন্তু তাশিলামা ধর্ম্মানুষ্ঠানেই নিয়ত ব্রতী থাকেন। তাশিলাম্পোর মঠটিও

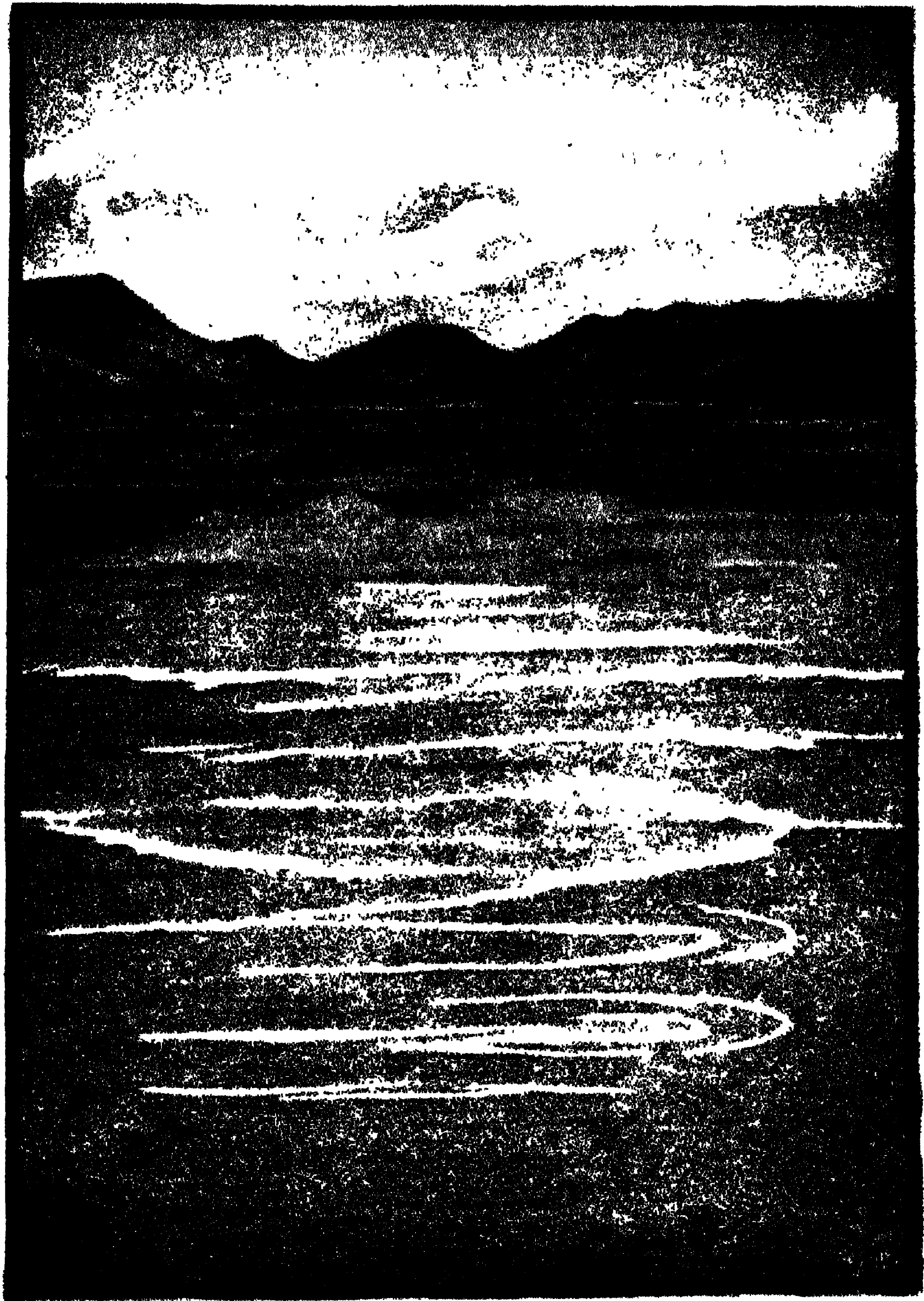


ধর্ম্মচক্র

দেখিবার মত। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মাঝখানে তাশিলাম্পোর মঠ বাড়ীগুলি বিস্তৃত সমতলভূমির উপর শোভা পাইতেছে। এখান হইতে গিয়াংসির দুর্গ বাড়ী দেখা যায়। তাশিলাম্পোতে চার পাঁচ হাজার লোক বাস করে।

তিব্বতের প্রত্যেক মঠের সঙ্গে লাইব্রেরী বা পাঠাগার থাকে এবং সব পুঁথি অতি যত্নের সহিত রাখা হয়।

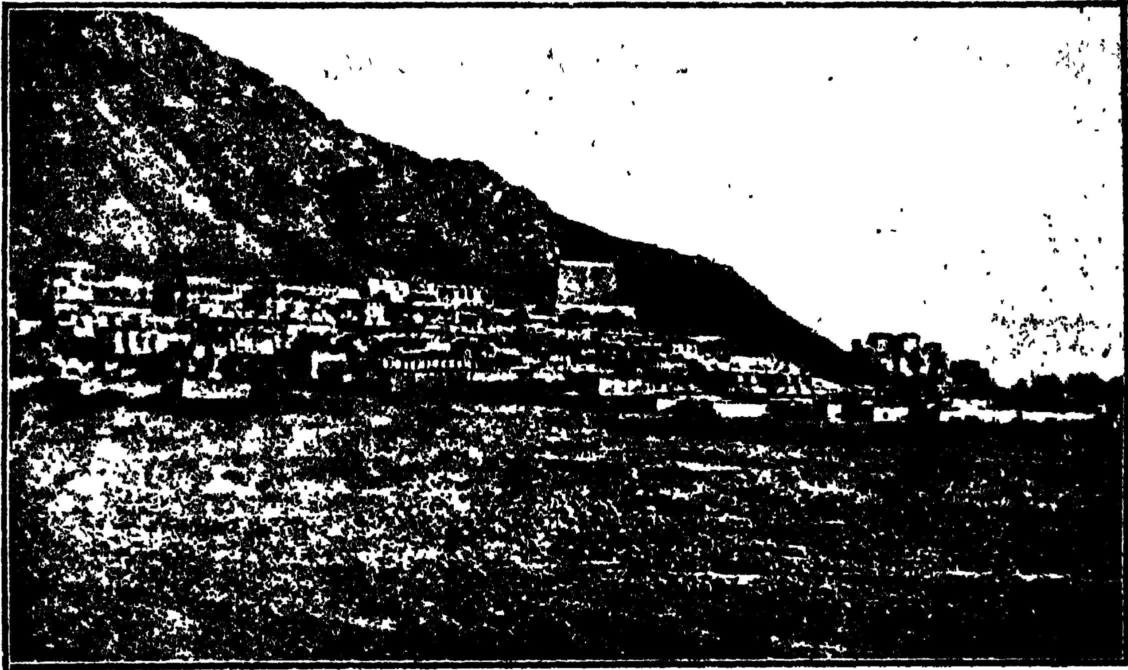
তিব্বতে জ্ঞানীর আদর খুব বেশী। সুপণ্ডিত লামারা দেবতার ন্যায় সম্মানিত। দালাই লামার



মানস সরোবরের বুকে ঢেউয়ের খেলা

সহিত একাসনে বসিতে পারেন। তিব্বতের ধনী ব্যক্তির চেয়েও জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বত্র আদর। তিব্বতের অতি সাধারণ লোকও জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'পণ্ডিত মহাশয়' (Leaumnsin) বলিয়া সম্বোধন করেন।

তোমরা মানস সরোবরের নাম ভূগোলে পড়িয়াছ। কবিরা মানস সরোবরের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর কাছে মানস সরোবর পুণ্যতীর্থ। স্কন্দ পুরাণের 'মানসখণ্ডে' মানস সরোবরের উৎপত্তির কারণ আছে। মানস সরোবরের ধূসর বলিয়া জলের বর্ণ সর্ব্বদাই নীল। বেশী রৌদ্র উঠিলে ঘোর নীল দেখায়। হ্রদটির পরিধি কেহ বলে পঞ্চাশ, কাহারও মতে আশী, আবার অন্যমতে একশত মাইল। কোন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্য্যটকের মতে বর্ত্তমানে ইহার পরিধি আশী মাইল। সরোবরের চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে কয়েকটি মঠ আছে। যথা, লামহুলাং, সারলাং, কোশল বা গোসল, নিরুর 'জু', গোম্বা প্রভৃতি। এখানে রাজহংস নাই, পদ্ম নাই, পত্র নাই—মনোরম বলিয়া কাব্য বা পুরাণে যাহা কিছু ইহার



তাশিলাম্পো মঠ—তিব্বত

সৌন্দর্য্যের তুলনা মিলে না। ভেন্ হেডিন্ তাহার বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনীতে মানস সরোবরের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আজকাল ভারতবর্ষের অনেক ভ্রমণকারী এখানে বেড়াইতে আসেন। চিত্রশিল্পী ও পর্য্যটক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজে মানস সরোবর দেখিয়া মানস সরোবরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—'চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বনস্পতিলতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ হরিদ্বর্ণের সম্পর্কশূন্য মরুভূমির মধ্যে যেমন পর্ব্বতাকার বালির স্তূপ থাকে, এই নীলাভ মানস সরোবরের চারিদিকেই সেইরূপ। বালির স্তূপের বর্ণ লোহিতাভ আনুষঙ্গিক উপাদান বর্ণিত, সে সকল কিছুই নাই। দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল হাঁস সাধারণতঃ যাহাকে বালিহাঁস বলে—কখনও হ্রদের তীরে, কখনও জলে আনাগোনা করিতেছে। আর নিকটে দুই একটি মাছরাঙা পাখী জলের উপর ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে আহার অন্বেষণে উড়িতেছে। জল অতীব স্বচ্ছ।" তিব্বতীয়দের কাছেও মানস সরোবর পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিবেচিত।

তোমাদের কাছে আমরা প্রথমেই বাঙ্গালী পর্য্যটক শরৎচন্দ্র দাসের কথা বলিয়াছি। শরৎচন্দ্র ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ

করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংয়ের ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। সেখানে লামা গিয়েন গিয়াৎসুর নিকট তিব্বতীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন। অবশেষে তাঁহার সাহায্যে তিব্বত রাজসরকার হইতে অনেক পুঁথি-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত তিব্বতীয় ভাষার অভিধান পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদৃত। তিব্বতের লোকেরা তাঁহাকে কা—চি—লামা বা কাশ্মীরী লামা বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি তিব্বতীয় সভ্যতার আদিভূমি ইয়ালুঙ্গ



লামা সন্ন্যাসী

(Yalung) নামক স্থানের নানা মঠ ও বিহার হইতে তিব্বতীয়দের সম্বন্ধে অনেক কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহার সাহস দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া রায়বাহাদুর উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিব্বতে যাইয়া যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত নিজ নিজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার করিয়া তিব্বতকে ভারতের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিয়া ইনি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

তিব্বতের সহরের পথে ও মঠের বাহিরে লামাদের ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। তিব্বতীয়েরা বিনয়ী—কাহাকেও অভিবাদন করিতে হইলে জিহ্বা বাহির করিয়া হাত বুকের দিকে আনিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

ইংরাজ রাজসরকার কয়েকবার তিব্বতে অভিযান প্রেরণ করেন। এখন ইংরাজের সহিত তিব্বত সরকারের মিত্রভাব বিদ্যমান।



তিব্বতী অভ্যর্থনা

তিব্বতের সৈন্যদল নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে, তিব্বতের শিক্ষা দীক্ষাও বাড়িয়া গিয়াছে। রূপকথার রহস্যপুরী তিব্বতের কথা এখন আর গোপন নাই—আমরা প্রতিদিনই নানাভাবে তাহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিতেছি।



দধীচির আত্মত্যাগ

পুবাণেব গল্প)

আমাদেব দেশে সে অতি প্রাচীনকালে দধীচি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহাব মত উদাব ও পবোপকাবী লোক সেকালে অতি কম ছিল। পবের কল্যাণ করাকেই তিনি তাঁহার জীবনেব একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে কবিতেন। এদিকে আবার দধীচি ঋষিব তপোবলও ছিল অসাধারণ। তাঁহাব তপোবল সম্বন্ধে অনেক কিছু গল্প আছে। অথর্ব্ব ঋষি ছিলেন দধীচির পিতা। এই অথর্ব্ব মুনি বেদেব ব্যবহারিক অংশগুলিকে পৃথক কবিয়া প্রচার করেন। এই অংশে শত্রুনাশ করিবার উপযোগী যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্ম্মের বিধান আছে। দধীচি মুনিব মাতা শান্তি ছিলেন কর্দ্দম প্রজাপতি নামে এক মহাঋষির কন্যা।

দধীচি পরম শিবভক্ত ছিলেন। ইঁহার শিষ্য নন্দী শিবের একজন পার্শ্বচররূপে পবিগণিত হইয়াছিলেন। দেবতাবা পর্য্যন্ত বিপদে পডিলে দধীচি মুনির সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

একবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পাত্রমিত্র ইত্যাদির সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র, গুরু বৃহস্পতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইলেন না, এমন কি, তাঁহাকে বসিবার আসন পর্য্যন্ত দিলেন না। বৃহস্পতি ইন্দ্রের এই অহঙ্কার, এই অন্যায় অপমান নীরবে সহ্য করিয়া ইন্দ্রের সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, গুরুকে অপমান করিয়া কাজটা ভাল কবেন নাই। অনুতপ্ত চিত্তে ইন্দ্র বৃহস্পতি দেবেব সন্ধানে বাহিব হইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ মিলিল না।

দেবগুরু যে দেবতাদেব প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, দেবতাদেব শত্রু অসুরদেব একথা জানিতে বিলম্ব হইল না, কাজেই তাহারা সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের গুরু শুক্রাচার্য্যেব পবামর্শে দেবতাদেব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আবম্ভ কবিল। দেবতারা অসুবদের সঙ্গে পাবিয়া উঠিলেন না। পবিশেষে তাঁহাবা ব্রহ্মাব শবণাপন্ন হইলেন।

ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ভৎর্সনা কবিয়া বলিলেন—তোমরা বৃহস্পতি দেবকে অপমান করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছ, কিন্তু অবশেষে দেবতাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে ত্বষ্টা নামক ঋষির পুত্র ত্রিশিবাব শবণাপন্ন হইতে বলিলেন। দেবতাগণেব অনুনয় বিনয়ে ত্রিশিবার দয়া হইল, তিনি তাঁহাদের গুরু হইয়া তাহাদের উপকার করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইবার দেবতাবা গুরু ত্রিশিরার সাহায্যে অসুবদিগকে পবাজিত কবিতে পারিলেন।

ইন্দ্রের অপবাধে দেবতাদের আবার বিপদ ঘটিল। ত্রিশিরা ঋষির মাতা ছিলেন অসুরদের মেয়ে। এজন্য ত্রিশিরা ঋষি মাতামহকুলের লোকদের প্রতি স্নেহবশতঃ গোপনে যজ্ঞশালা হইতে অসুবদিগকে যজ্ঞের ভাগ দিতেন। ত্রিশিরার

ছিল তিনটী মাথা। ত্রিশিরার এইরূপ ব্যবহারে ইন্দ্রদেব একদিন তাঁহার তিনটি মাথাই কাটিয়া ফেলিলেন।

ত্বষ্টা মুনি, পুত্র ত্রিশিরার মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। ইন্দ্রকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারে ভীষণাকার অসুরের উৎপত্তি হইল। এই অসুরের নাম হইল বৃত্র।

বৃত্র স্বর্গে যাইয়া অসাধারণ পরাক্রমের সহিত দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দেবতারা একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন।



ত্বষ্টামুনির যজ্ঞে ভীষণাকার অসুরের জন্ম

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াও জয়ী হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে বৃত্রের কাছে পরাজয় মানিয়া স্বর্গ ছাড়িয়া পাতালে গিয়া থাকিতে হইল। সকল দেবতাই পাতালে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। ত্বষ্টা ঋষির পুত্রহত্যার প্রতিহিংসা এই ভাবে সার্থক হইল।

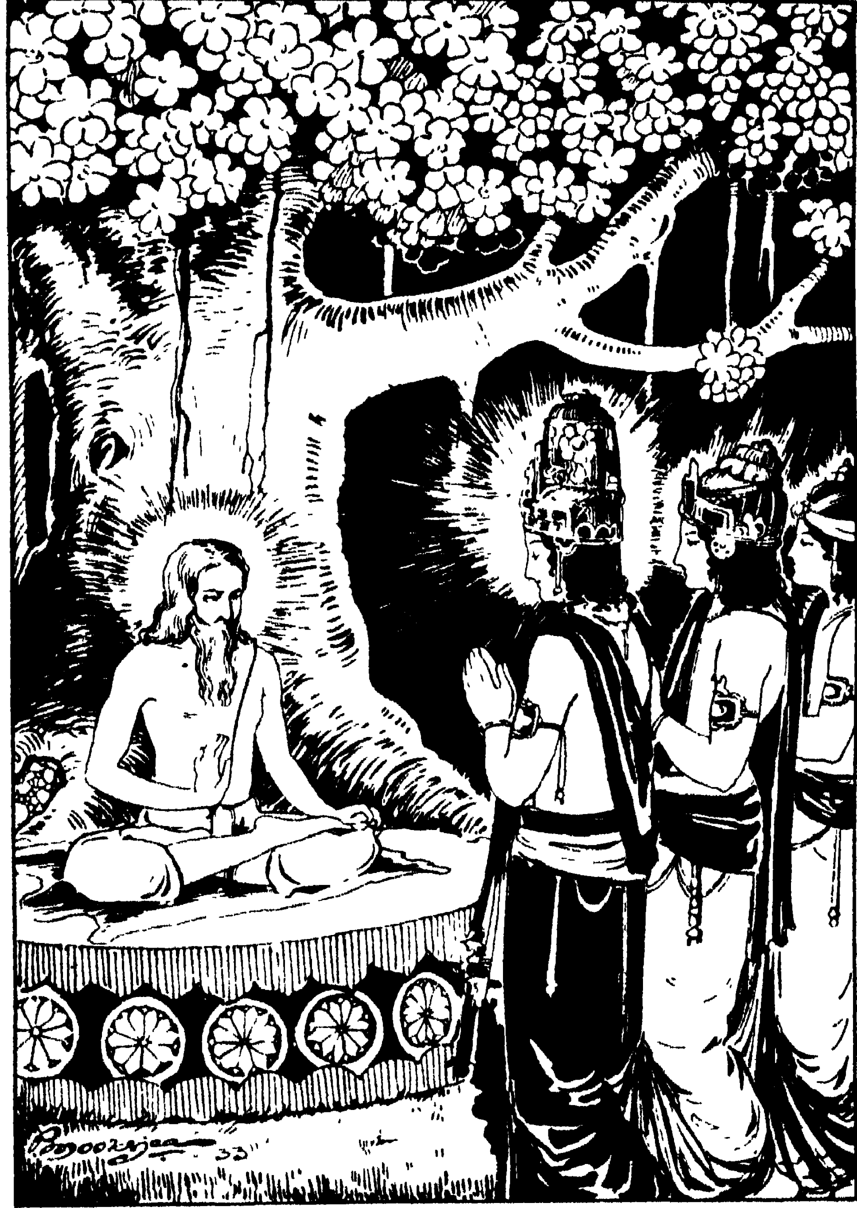
স্বর্গ হইতে পাতালে গিয়া দেবতাদের অতি কষ্টে দিন যাইতে লাগিল। যাঁহারা মন্দাকিনীর কুলু কুলু ধ্বনি শুনিয়া, পারিজাতের মালা গলায় পরিয়া পরম আনন্দে দিনযাপন করিতেন, আজ তাঁহারা কোথায় কোন্ অন্ধকার পুরীতে দিন কাটাইতেছেন! এই ভাবে দীর্ঘ দিন—দীর্ঘ মাস—দীর্ঘ বর্ষ কাটিয়া গেল। পরিশেষে দেবতারা ব্রহ্মার

এইরূপ একজন বীরের উৎপত্তি কামনা করিয়া তিনি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে পর যজ্ঞাগ্নির দক্ষিণ অংশ হইতে এক অতি

সহিত বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুর নিকট যাইয়া কিভাবে বৃত্রাসুরের নিকট পরাজিত হইয়া পাতালে বিতাড়িত হইয়াছেন এবং কিরূপ ক্লেশে তাঁহাদের দিন

কাটিতেছে, সেই সব কথা বলিয়া তাহার প্রতীকার চাহিলেন। বিষ্ণু তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা যদি বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলে সেই বজ্রের প্রহারে বৃত্রাসুরের প্রাণনাশ হইতে পারে।

দেবতারা বৃত্রাসুর বধের উপায় জানিতে পারিয়া দধীচি মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি সুন্দর নির্জ্জন তপোবন। গাছে গাছে, লতায় লতায়, সেই স্থানটিকে ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছে। পাখীরা গান গাহিতেছে। ভ্রমরেরা গুঞ্জরণ-স্তুতি গাহিয়া গাহিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে। হরিণ-হরিণী চঞ্চল নয়নে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া তপোবনের বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ময়ূর ময়ূরী আশ্রম-প্রাঙ্গণে পতিত শস্য খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। অদূরে —তপোবনের প্রান্ত-ভূমি চুম্বন করিয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। ঋষি দধীচি এমনি মধু অপরাহ্ন-কালে আশ্রম-তরুমূলে বসিয়া ছিলেন। সেই সময়ে দেবতারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন। একে একে দেবতারা বলিলেন—হে মহাপ্রাণ ঋষি, আপনার দয়া ভিক্ষা করিবার জন্য আজ আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। দধীচি ফুলের মত শুভ্র নির্ম্মল প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—আপনারা যে জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন তাহা আমি ধ্যান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, একদিন না একদিন এ দেহের বিনাশ হইবেই। আমার এই শরীর দিয়া যদি আপনাদের কোন



আমার এই শরীর দিয়া যদি আপনাদের কোন উপকার করিতে পারি, সে যে আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়

উপকার করিতে পারি, সে যে আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার অস্থিদ্বারা যদি আপনাদের কল্যাণ হয়, তবে তাহাই হউক। এইরূপ বলিয়া দধীচি মুনি যোগাসনে বসিয়া যোগের সাহায্যে দেহত্যাগ করিলেন। তাহার মৃত্যুতে চারিদিকে আনন্দধ্বনি জাগিয়া উঠিল। দেবতারা সেই পবিত্র দেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এইভাবে পুণ্যবান ঋষি দেহত্যাগ করিলে পর তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মিত হইল। ইন্দ্র সেই বজ্র হাতে করিয়া দেব-সৈন্যদের সহিত বৃত্রাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

দেবতা ও অসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। বৃত্রাসুর দেবতাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইল। দধীচির প্রাণদানের ফলে দেবতারা আবার স্বর্গ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পরের উপকারে দধীচির এই যে প্রাণদান, এই যে আত্মত্যাগ, তাহা ভারতের পৌরাণিক যুগের কাহিনীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। দধীচি দেবতাদের কল্যাণে প্রাণদান করিয়া পৃথিবীর মানুষকে ত্যাগের ভিতর দিয়া দেবতা করিবার সরল সুন্দর এই এক মহৎ আদর্শ দেখাইয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন।

অকৃতজ্ঞ পুত্র

(জাতকের গল্প)

ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীতে রাজত্ব করছিলেন, এ হ'চ্ছে সেই সময়ের কথা। তখন কাশীর কাছেই এক গ্রামে বশিষ্ঠক ব'লে একটি লোক থাকত। সে ছিল তার বাপমায়ের একমাত্র ছেলে। বুড়ো বাপ-মাকে সেই দেখত। কিছুদিন বাদে তার মা মারা গেলেন। বেঁচে রইলেন শুধু বুড়ো বাপ। বশিষ্ঠকের স্ত্রী কিন্তু বুড়ো বাপকে একেবারে দেখতে পারত না! প্রায়ই বশিষ্ঠকের কাছে তার বাপের নামে নানা রকম মিথ্যে নালিশ করত আর বলত "দেখ, এ তো বুড়ো হ'য়ে গিয়েছে, অনেক রকম রোগেও ধরেছে। কিছুতেই আর বেশী দিন বাঁচবে না। তবে আমরা এই বোঝা ব'য়ে মিছে কেন আর কষ্ট করি? তার চেয়ে তুমি একে মেরে ফেল,—সব রকমে সুবিধা হবে। নইলে সারাক্ষণ বুড়ো শুধু বসে বসে খাবে, বুঝলে ত?" (চিত্র—১) এই একই কথা শুনতে শুনতে শেষে বশিষ্ঠকেরও মনে হতে লাগল, "তাইতো, এ তো মন্দ কথা নয়।" সে একদিন স্ত্রীর কথার উত্তরে বলল, "দেখ, বলছ যা সে তো ভাল কথা! কিন্তু একটা মানুষকে মেরে ফেলা ত সহজ নয়! সে কি ক'রে হবে?" তার স্ত্রী বললে "আচ্ছা, উপায় আমি বলে দিচ্ছি! তোমার বাপ তো কাণে শোনেন না! তাঁর সামনে যেয়ে সবাই যাতে শুনতে পায় এমনি জোরে চেঁচিয়ে বল যে, তাঁর কাছ থেকে একজন যে টাকা ধার নিয়েছিল, তা সে কিছুতেই দিচ্ছে



চিত্র ১—বুড়ো শুধু বসে বসে খায়

না, তাই তাঁকেও সঙ্গে যেতে হবে! পরদিন ভোরে উঠে দুজন মিলে গাড়ীতে চলে যাবে। শ্মশানে গিয়ে তোমার বাপকে মেরে মাটিতে পুঁতে

রেখো। তারপরে এমন ভাবে বাড়ী ফিরে আসবে যেন ডাকাতে তোমার বাপকে মেরে তোমাদের সব লুটে নিয়েছে।" (চিত্র—২) বশিষ্ঠক শুনে বল্‌লে, "হাঁ, এ খুব ভাল উপায় বটে!" এই বলে সে যাবার আযোজন শুরু কর্‌লে।

বশিষ্ঠকের একটি ছেলে ছিল। বয়স তার দশ এগার বৎসর। কিন্তু জ্ঞানে আর বুদ্ধিতে সে ছিল খুবই বড়। সে এসব পরামর্শ শুন্‌তে পেলে। শুনে ভাব্‌লে, আমার মার বুদ্ধিতে আমার বাবা এত বড় পাপ কর্‌তে যাচ্ছেন, আমি তাঁকে বাধা দিব। এই ঠিক করে সে গিয়ে তার ঠাকুর দাদার পাশে বসে রইল। (চিত্র—৩) যাবার যখন সময় এল তখন সবার আগে সে গিয়ে গাড়ীতে বসে রইল। তার বাপ কিছুতেই আর তাকে নামাতে পারলে না। কি আর করে,



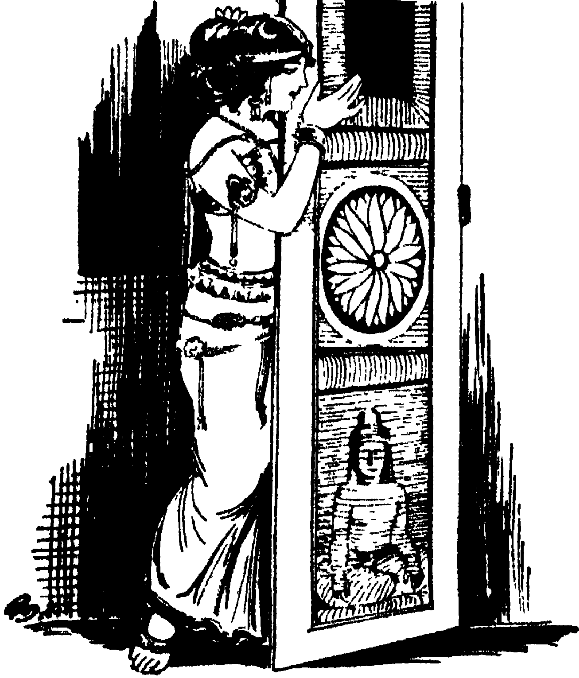
চিত্র ২—তোমার বাপকে মেরে মাটিতে পুঁতে রেখো



চিত্র ৩—ঠাকুর দাদার পাশে বসে রইল

ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে সে চল্‌ল। বশিষ্ঠকের স্ত্রী জানালা দিয়ে হাসিমুখে দেখ্‌তে লাগ্‌লো গরুর গাড়ী বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে শ্মশানের দিকে চলে যাচ্ছে। (চিত্র—৪) এদিকে শ্মশানে নেমে বশিষ্ঠক যখন গর্ত্ত খুঁড়ছে, তখন ছেলে যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব করে গিয়ে বাপকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা এখানে গর্ত্ত কেন খুঁড়ছ?" তখন বাবা, বল্‌লে, "তোমার ঠাকুর্দ্দা কি না বুড়ো হয়েছেন, কাজও করতে পারেন না, দিনরাত অসুখে ভোগেন, এত কষ্ট সয়ে বেঁচে থেকে তো কোনো লাভ নেই, তাই ভাবছি যে তাঁকে এখানে পুঁতে রেখে যাব।" কথা শুনে ছেলেটি আর

কোনো কথা না বলে বাপের হাত থেকে মাটি খুঁড়বার যন্ত্রটি নিয়ে পাশেই আর একটা গর্ত্ত করতে



চিত্র ৪—জানালা দিয়ে হাসিমুখে দেখতে লাগ্‌লো

আরম্ভ করলে। বাপ যখন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি গর্ত্ত কেন করছ?" (চিত্র—৫) তখন বল্‌লে, "বাবা



চিত্র ৬—এমন সময় দেখতে পেলে সে তিনজনেই ফিরে আস্‌চে

তোমার দেখে শিখছি। আমার বাপ যখন বুড়ো হবেন, তখন তাঁকে এই গর্ত্তের মধ্যে পুঁতে রাখব।" একথা শুনে বশিষ্ঠকের চেতনা হ'ল; ছেলের ব্যবহারে দুঃখও যে একটু না হ'ল তা নয়। বল্লে, "বাছা তুমি আমায় উপযুক্ত রকমে তিরস্কার করেছ বটে! কিন্তু আমি তোমার বাপ, সবার চেয়ে তোমার আপন, আমাকে তুমি এমনি নিষ্ঠুরের মত কথা বল্‌তে পারলে?"

তখন সেই জ্ঞানী ছেলেটি বাপকে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাবা আমি নিষ্ঠুর নই! তুমি যে পাপ করতে যাচ্ছিলে, তা একবার করা হয়ে গেলে আর ফেরবার পথ থাকৃত না। তাই বন্ধুর মতই আমি তোমায় এই পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছি। নির্দ্দোষী বাপ-মাকে যে অনর্থক ব্যথা দেয়, মৃত্যুর পরে সে নরক ভোগ করে। বাপ-মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ নিশ্চিত।"

এই সব কথা শুনে বশিষ্ঠক নিজের দুর্ব্বুদ্ধির কথা মনে করে বড় লজ্জিত হ'ল। বল্‌লে "বাবা, তোমার মার বুদ্ধিতেই আমি এ রকম খারাপ কাজ করতে যাচ্ছিলাম।" ছেলে বল্লে, "বাবা, মার পরামর্শেই তুমি এমন খারাপ কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলে। যেদিন মা তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন আমি দোরের আড়ালে থেকে তার সব শুনেছিলাম। যাই হোক ভগবানের কৃপায় তোমার চৈতন্য ফিরিয়ে এনে তোমাকে



চিত্র ৮—মাকে দুঃখ দিয়ে কিছু শিক্ষা দিতে হবে

অপকর্ম্ম হতে রক্ষা করতে পেরেছি! এখন বাবা, মাকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে তিনি এ রকম কাজ কখনো না করেন। নয়তো

আজ যিনি একজনের অনিষ্ট কর্‌তে যাচ্ছেন, কাল যে তিনি তোমার অনিষ্ট করবেন না, তা কে বল্‌তে পারে?" শুনে বশিষ্টক সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে, "সে কথা ঠিক।" তারপর তিনজন মিলে বাড়ী ফিরে এল। বশিষ্ঠকের স্ত্রী দেখে জ্বলে পুড়তে লাগ্‌লো। (চিত্র—৬)

এদিকে বশিষ্ঠকের স্ত্রীর মনে আনন্দ আর ধরে না। সে ঘর দোর ধুয়ে মুছে পায়েস রেঁধে দোরের কাছে বসে আছে। স্বামী আর ছেলে ফিরে এলে খেতে দেবে। এমন সময় দেখলে যে, তিন জনই আবার বাড়ী ফিরে আসছে। দেখেই তো সে ভয়ানক চটে গেল। তারা এসে বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছতেই বশিষ্ঠককে ধরে খুব বকুনি দিতে আরম্ভ করলে। বশিষ্ঠক কোনো কথা না বলে গাড়ী থেকে নাম্‌লে। তারপর স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে বল্লে, আর কখনো আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।" (চিত্র—৭ তারপর তিন জন ফিরে এসে স্নান ক'রে পায়েস খেলে। তার স্ত্রী এক প্রতিবেশীর বাড়ী রইলো।



চিত্র ৫—তুমি গর্ত্ত কেন করছ?

এমনি ক'রে দিন যায়। একদিন বশিষ্ঠকের ছেলে বাপকে বলে, "বাবা, এম্‌নি করে তো মার কিছু শিক্ষা হচ্ছে না, তাঁকে দুঃখ দিয়ে শেখাতে হবে।" (চিত্র—৮) তখন দুজনে মিলে বুদ্ধি করে সমস্ত গাঁয়ে রটিয়ে দিলে যে বশিষ্ঠকের বিয়ে। সেও ফুলের মালায় চন্দনে সেজে সারা গাঁ ঘুরে এল যেন সত্যি সত্যি বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছে। পাড়ার মেয়েরা বশিষ্ঠকের বিয়ের কথা নানা রকম রং ফলিয়ে এসে তার স্ত্রীকে বল্‌তে লাগলো। (চিত্র—৯)

এই পৃথিবীতে 'সতীন কাঁটা' বলে একটা কথা আছে। মেয়েদের পক্ষে সে একটা অসহ্য বেদনা। তারা সব সহ্য করতে পারে কিন্তু সতীনের বেদনা তাদের কাছে অসহ্য। বশিষ্ঠক আবার বিবাহ করছেন শুনে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত বেদনা বোধ করলে। কি উপায় করলে সে তার স্বামীর এই বিবাহ বন্ধ করতে পারে এই চিন্তা করতে লাগলো। শেষে সে বেশ বুঝতে পারলে যে, তারই দোষে এইরূপ অঘটন ঘট্‌তে বসেছে। তখন সে তার জীবনের ইতিহাস খুলে তার কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করতে লাগলো। শেষে অনুতাপের অসহ্য বেদনায় সে আর স্থির থাকতে পারলো না। ছুটে এসে ছেলের কাছে দু-হাত জোড় করে বল্লে, "বাবা, এবার আমাকে ক্ষমা কর। আর কখনও এমন পাপ কাজ আমি করব না।" (চিত্র—১০) তখন ছেলে বাবাকে ব'লে আবার মাকে ঘরে আনালে। সে শ্বশুর ও স্বামী সকলের কাছে নতজানু হয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাইলো। (চিত্র—১১) সেই থেকে বশিষ্ঠকের



চিত্র ৯—পাড়ার মেয়েরা রং ফলিয়ে বল্‌তে লাগলো



চিত্র ১০—বাবা, এবার আমাকে ক্ষমা কর



চিত্র ৭—বশিষ্ঠক তার স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে

স্ত্রীর স্বভাব ফিরে গেল। এতদিন মোহের ঘোরে এই দুনিয়ার মাঝে তাদের আপনাদেরই স্থান মাত্র দেখে এত বড় বিশাল পৃথিবীটাকে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিল! আজ তার শিশু সন্তানের কৌশলে তার মোহের ঘোর কেটে গেল! আজ সে দেখতে পেলে এই সুন্দর ধরণী লক্ষ লক্ষ জীবের বাসভূমি। এখানে প্রত্যেক মানুষের পাশে আরও কিছু স্থান খালি আছে। এই খালি স্থান টুকুকে আপন জনের জন্যে না রেখে যদি পরের জন্যে ছেড়ে দেওয়া যায়—আপনার ছেলের জন্য জোগাড়-করা অন্নমুষ্টি যদি অন্যের মুখে তুলে দেওয়া যায়—তা হ'লে প্রাণের মাঝে যে সন্তোষ জেগে ওঠে—এই জগতে বুঝি সে সন্তোষের তুলনা মেলে না। সেদিন প্রাণে যেন নূতন সুরে বিধাতার রাজ্যের প্রেমের গান বেজে ওঠে। এই সুন্দর ধরণী যেন ফুলে ফুলে ভরে উঠে স্বর্গের শোভা ছড়িয়ে দেয়। সমীরণ যেন সুখ ও স্বাস্থ্য ব'য়ে এনে মানুষের প্রাণকে সজীব করে' তোলে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নূতন আলোক ছড়িয়ে মানুষকে যেন সুস্থ ও সবল করে' তোলে। আজ এগারো বছরের ছেলের কৌশলে বশিষ্ঠকের স্ত্রী যেন নূতন জীবন ফিরে পেলে। ছেলের উপদেশ অনুসারে বশিষ্ঠক আর তার স্ত্রী অনেক সৎকাজ করতে লাগ্‌লো। দেশে দেশে তাদের ধর্ম্মের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।



চিত্র ১১—বশিষ্ঠকের স্ত্রী নতজানু হয়ে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলো।



বেদের কথা

ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র



(১) অগ্নিস্তুতি (১ম মণ্ডল। ১ম সূক্ত)

১। যজ্ঞের আহ্বানকারী দেব পুরোহিত অগ্নির স্তুতি করি, যিনি সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ দাতা।

২। প্রাচীনকালের ঋষিরা অগ্নির স্তুতি করিতেন, আধুনিক ঋষিরাও তাঁহার স্তব করেন, তিনি অন্য দেবতাগণকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিয়া আনুন।

৩। অগ্নির কৃপায় মানুষ প্রত্যহ ধন এবং যশ ও পুত্রের সহিত সমৃদ্ধি পাইতে পারে।

৪। হে অগ্নি, আপনি যে যজ্ঞে বা পূজায় চারিদিকে ব্যাপিয়া থাকেন, সে যজ্ঞ দেবতাদের নিকট পৌঁছায়।

৫। অগ্নি দেবতাদের আহ্বানকারী এবং তিনি অতিশয় জ্ঞানী; তিনি সত্য এবং তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র যশ। এই দেব অগ্নি অন্য দেবতাদের লইয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। হে অগ্নি, আপনি আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞকারীদের যে কল্যাণ করিতে চাহেন; হে দেবদূত, তাহা আপনিই সত্য করিতে পারেন।

৭।৮। হে অন্ধকার-নিবারক অগ্নি, আমরা মনে ভক্তির উপহার লইয়া প্রত্যহ আপনার নিকটে আসি, যেহেতু আপনি যজ্ঞের রাজা ও ধর্ম্মের দীপ্তিমান্ রক্ষকরূপে নিজ কুণ্ডে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

৯। হে অগ্নি, পিতার নিকটে পুত্র যেমন অনায়াসে যাইতে পারে, সেইরূপ আপনার নিকটও যেন আমরা অসঙ্কোচে আসিতে পারি; আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের নিকটে থাকুন।

(২) সূর্য্যের স্তুতি (১মঃ। ৫০ সূঃ)

১। যে সূর্য্যদেব সকল প্রাণীকে জানেন তাঁহার কিরণগুলি তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিতেছে, যাহাতে সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায়।

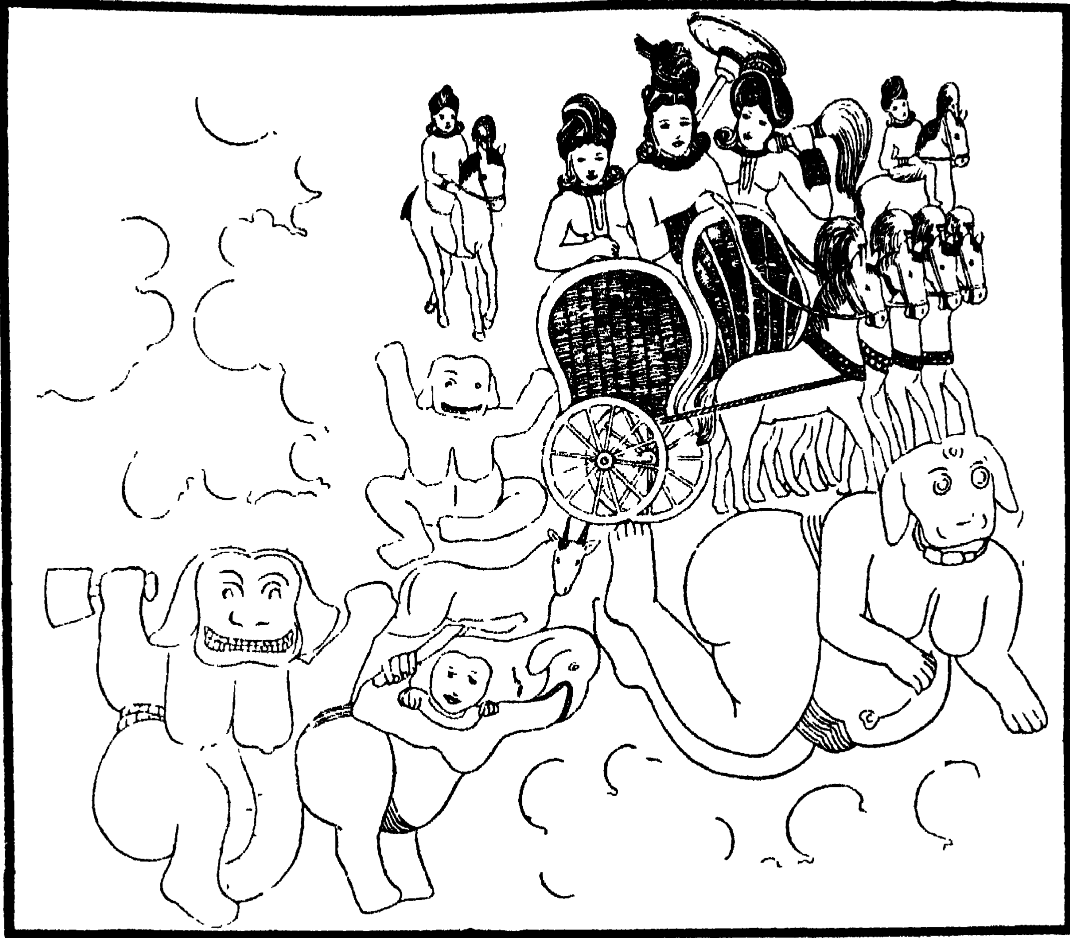
২। যে সূর্য্যদেব সকলকে দেখেন, তাঁহার আগমনে নক্ষত্র এবং কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি-গুলি চোরের মত পলাইয়া যায়।

৩। সূর্য্যদেবের অগ্নিতুল্য কিরণগুলি সকল মানুষের কাছে দেখা দিয়াছে।

৪। সূর্য্যদেব, আপনি খুব শীঘ্রগতি, সকলেই আপনাকে দেখিতে পায়, আপনি আলোক আনিয়া দেন, সমস্ত জগৎকে আপনি আলোকিত করেন।

৬। হে দীপ্তিশালী বরুণদেব, এই সূর্য্য-রূপ চক্ষুদ্বারা আপনি গতিশীল প্রাণীদের ও মনুষ্যদের কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন।

৭। সূর্য্যদেব, সকল প্রাণীকে দেখিতে দেখিতে আপনি বিশাল আকাশে উদিত হন এবং দিন ও রাত্রির বিভাগ করিয়া দেন।



পুণার নিকটবর্ত্তী ভাজা নামক স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি অবলম্বনে শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সাহা কর্ত্তৃক অঙ্কিত। সূর্য্যদেব ৪ অশ্বের রথে চলিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে তাঁহার দুই পত্নী, সংজ্ঞা ও ছায়া। অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বপৃষ্ঠে আগে আগে চলিয়াছেন। নিম্নে অন্ধকারের দানব-দানবীরা চাপা পড়িয়াছে। চিত্রের অর্থ—সূর্য্যদেব অন্ধকার দূর করিয়া জগতে আলোক আনিয়া দিতেছেন।

৫। আপনি দেবতাদের, মনুষ্যদের, সকলেরই সম্মুখে উদিত হন, যাহাতে সকলে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিতে পায়।

৮। সর্ব্বদর্শী আলোকের শিখাযুক্ত সূর্য্যদেব! সাতটি কপিলবর্ণ অশ্বা আপনার রথ টানিয়া আনিতেছে।

৯। সূর্য্যদেব তাঁহার রথে, রথেরই কন্যার মত, সাতটি উজ্জ্বল অশ্বা যোজনা করিয়াছেন। তাহারা নিজে নিজেই রথে যুক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক কাহাকেও রথে যুতিয়া দিতে হয় নাই। সেই অশ্বাগুলি সূর্য্যদেবকে টানিয়া আনিয়াছে।

১০। যে উপরের জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য অন্ধকারকে ঢাকিয়া আলোক আনিয়া দিয়াছেন, দেবতাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ দেবকে দেখিতে দেখিতে আমরা সকলের উপরের জ্যোতির্লোকে আসিয়াছি।

১১। হে মঙ্গলজ্যোতিঃ সূর্য্যদেব, আজ উদিত হইয়া আকাশের উপরে উঠিয়া আমার হৃদ্‌রোগ * এবং পাণ্ডুরোগ † দূর করিয়া দিন্।

১২। আমার শরীরের পীত বর্ণ শুক, সারিকা ও হারিদ্রা পাখীর উপরে সরাইয়া দিতেছি।

১৩। এই আদিত্য (সূর্য্য) তাঁহার সকল বল লইয়া উদিত হইয়াছেন। আমার শত্রুকে ইনি আমার বশে আনিয়া দিয়াছেন, আমি যেন আমার শত্রুর বশে না পড়ি।

(৩) মরুৎদেব স্তুতি (১মঃ। ৮৫ সূঃ)

১। যে অশ্বের ন্যায় শীঘ্রগতি, বিচিত্র-কর্ম্মা, রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ চলিবার সময় স্ত্রীলোকের মত অঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করেন, তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবী বিস্তার করিয়াছেন; এই বীরগণ যজ্ঞে উৎসাহের সহিত সোমপান করেন।

২। তাঁহারা বলবান্ হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছেন, রুদ্রপুত্রগণ স্বর্গে স্থান অধিকার করিয়াছেন; নানাবর্ণের গাভীর (পৃথিবীর) এই সন্তানগুলি গান গাহিতে গাহিতে, ইন্দ্রের শক্তি উৎপাদন করিতে করিতে বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন।

৩। যখন গাভীর সন্তান মরুদ্‌গণ অলঙ্কারে শোভিত হন, তখন তাঁহারা শরীরে দীপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহারা সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করিয়া দেন এবং ইঁহাদের পথের পিছনে পিছনে ঘৃতধারা (অর্থাৎ পুষ্টিকর বৃষ্টির ধারা) বহিতে থাকে।

৪।৫ যে বিশিষ্ট যোদ্ধাগুলি, স্বীয় বলে অচল বস্তুকেও বিচালিত করিতে করিতে তাঁহাদের দীপ্ত বল্লমের দ্বারা শোভা পান, মনের মত শীঘ্রগতি সেই বৃষযূথের মত মরুদ্‌গণ যখন তাঁহাদের রথে বিচিত্রগাত্র অশ্বা যোজনা করিয়া যুদ্ধে পর্ব্বত চালনা করেন, তখন সূর্য্যালোক হইতে বৃষ্টির ধারা পতিত হয় এবং তাঁহারা জলের মশকের মত পৃথিবী জলে ভিজাইয়া দেন।

৬। হে শীঘ্রগামী মরুদ্‌গণ, আপনাদের শীঘ্রগামী অশ্বাগুলি আপনাদিগকে এখানে লইয়া আসুক। আপনারা বাহু মেলিয়া আসুন। এই কুশের উপর বসুন, আপনাদের জন্য বিস্তৃত আসন বিছাইয়াছি। মরুদ্‌গণ, মধুর সোমরস পান করিয়া মত্ত হইল।

৭। নিজ বলে বলী সেই মরুদ্‌গণ নিজ মহিমায় স্বর্গ আরোহণ করিয়াছেন, নিজেদের জন্য অতি বিস্তৃত স্থান করিয়া লইয়াছেন। যখন বিষ্ণু সোমপানে মত্ত বলবান্ ইন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন কার্য্য শেষ হওয়ায় মরুদ্‌গণ পাখীর

* বুকের অসুখ, বুকধড়ফড়ানি। † যকৃতের দোষ "ন্যাবা"। এই রোগে চোখ ও শরীরের অন্যান্য ভাগ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়।

মত উড়িয়া আসিয়া প্রিয় কুশাসনে বসিলেন।

৮। বীরের ন্যায়, বেগযুক্ত যোদ্ধার ন্যায়, যশের আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টাশীল ব্যক্তির ন্যায়, মরুদ্‌গণ যুদ্ধে খুব যুঝিয়াছেন। সকল প্রাণী মরুৎদের ভয়ে ভীত হয়, কারণ এই বীরগণের মূর্ত্তিতে রাজার ন্যায় দীপ্তি আছে।

৯। ত্বষ্টা সহস্রধারাযুক্ত স্বর্ণময় সুন্দর ভাবে করা বজ্র যখন গড়িলেন, ইন্দ্র বলবান্ বৃত্রের উপর প্রহার করিবার জন্য উহা ধারণ করিলেন এবং তাহার দ্বারা বৃত্রের সংহার করিয়া আবদ্ধ জলের (বৃষ্টির) স্রোত ছাড়িয়া দিলেন।

১০। দানশীল মরুদ্‌গণ সেই জলের ফোয়ারা জোরের সহিত তুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন, অতি দৃঢ় পর্ব্বত (মেঘ) গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহারা সোমের নেশায় মত্ত হইয়া বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন।

১১। তাঁহারা জলের ফোয়ারা কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য —তৃষ্ণার্ত্ত গোতম ঋষির জন্য—সেই জলধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত মরুদ্‌গণ আসিয়া কবির সাহায্য করিতেছেন —নিজেদের মহিমায় আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন।

১২। হে মরুদ্‌গণ, যে লোক আপনাদের সেবায় খুব পরিশ্রম করে, তাহার জন্য স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, এই তিন জগতের যে আশ্রয় ও সম্পদ্ আপনারা দিয়া থাকেন, তাহা আপনাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞকারীকে দিন্, তাহা আমাদিগকে দিন্। হে বীরগণ, বীরপুত্রযুক্ত ধনে আমাদের ধনী করুন।

(৪) বিষ্ণুর স্তুতি (১মঃ। ১৫৪ সূঃ)

১। বিষ্ণু খুব দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া এবং তিন রকমে পা ফেলিয়া পৃথিবীর সকল স্থান মাপিয়া লইয়াছেন এবং উপরে যেখানে দেবতারা বাস করেন সেই স্বর্গকেও থাম দিয়া সোজা করিয়া দিয়াছেন। এই বিষ্ণুর শক্তির পরিচয় দিব।

২। পর্ব্বতবাসী, সকল স্থানে গতিশীল, ভয়ানক জন্তুর (বাঘের) মত শক্তিশালী বিষ্ণুর শক্তির জন্য লোকে তাঁহার প্রশংসা করে। যেখানে তিনি তাঁহার বড় বড় পা ফেলিয়াছেন, সেই তিন স্থানে সকল প্রাণীই বাস করে।

৩।৪। পর্ব্বত, উচ্চস্থাননিবাসী, দূর পর্য্যন্ত বিচরণশীল, বলবান্ বিষ্ণুর কাছে এই আবেগযুক্ত স্তুতি পৌঁছাইতে চাই, যিনি একা তিনবার পা ফেলিয়া এই বিস্তৃত জগৎ মাপিয়া লইয়াছেন, যাঁহার মধুময় ক্ষয়হীন তিন পা নিজ শক্তিতে ভরপুর হইয়া আছে, যিনি একা পৃথিবীকে, স্বর্গকে এবং সকল প্রাণীকে তিন ভাবে ধারণ করিয়াছেন।

৫। সেই দূর পর্য্যন্ত গতিশীল বিষ্ণুর প্রিয় স্থানে যাইতে চাই, যেখানে দেবতাদের ভক্তেরা গিয়া আনন্দ অনুভব করেন, যে পরম পদে (সর্ব্বোচ্চ স্থানে) বিষ্ণুর নিজের মত মধুর ফোয়ারা আছে।

৬। ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর সেই সেই লোকে যাইতে চাই, যেখানে বড় বড় শিংওয়ালা চঞ্চল গরুগুলি আছে। সেই বিশালগতি বলবান্ বিষ্ণুর পরমপদ নীচের দিকে দীপ্তি পাঠাইয়া দিতেছে।

কি ও কেন

আগুন উত্তপ্ত হবার কারণ কি ?



খাবার তৈরী করবেন ব'লে তোমার মার আগুনের দরকার হ'ল। তিনি করলেন কি? কিছু কাঠ বা কয়লা সংগ্রহ করলেন, তাতে একটু কেরোসিন তেল ঢেলে দিলেন আর তারপর তাতে দেশলাইএর কাঠি জ্বেলে আগুন লাগিয়ে দিলেন। কাঠ বা কয়লার উপরের তেলটা প্রথমে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল, তারপর আগুনটা কাঠ বা কয়লাতে গিয়ে লাগল, আর নিভিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত জ্বলতেই রইল। এই আগুনের কাছে তুমি যাও—খুব নিকটে নয়, তাহ'লে বিপদ ঘটবে—তোমার দেহের অনাবৃত স্থানগুলিতে এক বিশেষ রকম অতৃপ্তিজনক অনুভূতি পাবে। আগুনের কাছে গেলে এইরূপ অনুভূতি হওয়ার নাম উত্তাপ লাগা।

এইখানে তোমাদিগকে একটা বিষয় বুঝিয়ে বলি। বিষয়টা সূক্ষ্ম, তোমরা তাই বেশ মনোযোগ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা কোরো। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করি, প্রকৃতির মধ্যে ঠিক সেইরূপ জিনিষ ঘটে না। প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটে, তা এক ব্যাপার, আর আমাদের সেই বিষয়ের অনুভূতি হওয়া এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। মনে কর, তোমার এক বন্ধু আছে—তার নাম অমল। তাকে পথে দেখতে পেয়ে তুমি ডাকলে "অমল"। সে তোমার দিকে ফিরল। ব্যাপার ঘটল এই যে, তুমি তোমার চতুর্দ্দিকের বাতাসে কতকগুলো তরঙ্গ ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু অমল কি সে সব তরঙ্গের কোনও খোঁজ পেল? মোটেই না। যদিও তার কাণের পর্দ্দায় বায়ুমণ্ডলে উত্থিত কতকগুলো তরঙ্গ গিয়ে আঘাত দিল, কিন্তু সে তার পরিবর্ত্তে কতকগুলো শব্দ শুনতে পেল। সে জানে যে, কেউ যদি তাকে ডাকে তবে সে ঐরূপ শব্দ করে—তাই সে ফিরে দাঁড়াল। শব্দটা একটা অনুভূতি, তাই একে পেতে হ'লে আমাদের অন্ততঃ একটা কাণ থাকা দরকার। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ জন্ম পেয়ে আমাদের কাণে শব্দের অনুভূতি দিল—তার জন্যে আমার দিক থেকে কিছুরই আবশ্যক নেই, এক্ষেত্রে আমার কাণ কেন, আমি না থাকলেও তা বিদ্যমান থাকতো।

এইসব চিন্তা ক'রে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার দুইটা দিক আছে। একটা হ'ল যা বাস্তবিক ঘটে সেইটা, ও অপরটা হ'ল যা ঘটে তার অনুভূতি হওয়া। আগুনের সম্পর্কে এই তত্ত্বটা বিশেষ ভাবে খাটে। আগুনের যেটা অনুভূতির দিক, যাকে আমরা তাপ লাগা বলি, সে বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলব না। তাপ লাগার অনুভূতি তোমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু যেটা অনুভূতির ব্যাপার নয়—যা বহির্জগতে প্রকৃতির মধ্যে ঘটে, সেখানে আগুন বলতে কি বোঝায়, আর এই দিক দিয়ে শীতলতা বা উষ্ণতার কি অর্থ, তা আমি এখানে তোমাদিগকে পরিষ্কার ক'রেই বলব।

জগতের মধ্যে কোনও জিনিষই স্থির নেই। তোমরা যদি জগতের যে কোনও বস্তুর সূক্ষ্মতম কণার (molecule) প্রতি লক্ষ্য কর, তাহ'লে এই কণাগুলিকে অসম্ভব অস্থির অবস্থায় দেখতে পাবে। কণাগুলার এই স্বাভাবিক অস্থিরতা বা আন্দোলনই প্রকারান্তরে আগুন নামে অভিহিত হয়। এই আন্দোলন বেশী হ'লে আগুন বেশী হয় আর কম হ'লে আগুনও কম হয়। কিন্তু আন্দোলনহীন অবস্থা কখনও হয় না। তোমরা বলতে পার যে, তবে কি সব জিনিষই গরম? তার উত্তর এই যে, উষ্ণ হওয়াটা তোমার অনুভূতির বিষয়—সেটা তোমার নিজের বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই ব্যক্তিগত অবস্থাটা (Personal factor) বাদ দাও, তখন দেখবে যে, সব জিনিষই সব সময়েই অগ্নিভাবাপন্ন। সাধারণ ভাষায় একেই বলে থাকে সব জিনিষেই আগুন আছে।

তবে শীতলতা ও উষ্ণতার কারণ কি? আমাদের শরীরের বা ত্বকের উপরকার কণাগুলিও স্থির হ'য়ে নেই। যে বস্তুর শীতলতা বা উষ্ণতা পরীক্ষা ক'রছ, যদি তার কণাগুলির আন্দোলন তোমার ত্বকের কণাগুলির আন্দোলনের সমভাবের হয়, তবে সে জিনিষটা তোমার কাছে শীতল বা উষ্ণ কিছুই বোধ হবে না। কিন্তু যদি তার আন্দোলন তোমার ত্বকের কণাগুলির আন্দোলনের তুলনায় কম হয়, তাকে আমরা বলি শীতল বস্তু, আর যদি বেশী হয় তবে তা হয় উষ্ণ। বরফ শীতল, তার কারণ, বরফের কণাগুলির আন্দোলন, আমাদের হাতের কণাগুলির আন্দোলনের চেয়ে অনেক অল্প পরিমাণের, অপর পক্ষে ফুটন্ত জল উষ্ণ, অর্থাৎ জলের এই অবস্থায় তার কণাগুলির আন্দোলনের বেগ আমাদের হাতের কণাগুলির স্বাভাবিক আন্দোলনের বেগের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব শীতলতা বা উষ্ণতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। আগুনের সত্যকার কারণ (শীতলতা বা উষ্ণতার নয়) যা তোমাদিগকে গোড়াতেই বলেছি, বস্তু-মাত্রের কণাগুলির অবিশ্রান্ত আন্দোলন।

সাধারণ অবস্থায় কণাগুলির আন্দোলনের একটা সাম্য অবস্থা থাকে। যদি কখনও কোনও কারণে এই সাম্য অবস্থা থেকে বস্তুটা চ্যুত হয়, তবে সেই বাহ্য কারণটা সরে গেলে বস্তুটা নিজে নিজেই আবার সাম্য অবস্থায় ফিরে আসে। একটা লোহার টুকরাকে গরম কর, অর্থাৎ আগুন দিয়ে তার কণাগুলাকে উত্তেজিত কর। কিছুক্ষণ পরে দেখবে যে, সমস্ত লোহার টুক্‌রাটা লাল হ'য়ে উঠেছে। এখন এই উত্তেজনার কারণটাকে দূর কর, অর্থাৎ আগুন থেকে লোহার টুক্‌রাটাকে সরিয়ে দাও। দেখবে, আবার যেমন সাধারণ লোহা, তেমনি আছে।

কিন্তু তোমরা কাঠ বা কয়লার কথা তুলে বলতে পার—তখন কি হয়? আগুন নিভে গেলে তখন ত আর পূর্ব্বেকার কাঠ বা কয়লা ফিরে পাওয়া যায় না। শুধু কতকগুলো ছাই পড়ে থাকে। এর উত্তর এই। আগুনে দিলে সব জিনিষের মতই কাঠ বা কয়লার কণাগুলোর আন্দোলন বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছায় যখন বাতাসের অম্লজান (oxygen)-এর সঙ্গে মিশে এই কণাগুলির কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডে (carbon-di-oxide) পরিণত হবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। কাঠ বা কয়লার অম্লজানের (oxygen) কণার সঙ্গে মিশে যৌগিক তৈরী হবার সময় কয়লার আভ্যন্তরিক শক্তি (internal energy) খুব কতকটা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়ে এসে নিকটস্থ কণাগুলিকে এতটা উত্তেজিত ক'রে দেয় যে, তা আবার অন্য অম্লজানের কণার সঙ্গে মিশে যায়। এমনভাবে অনবরত নতুন শক্তি (energy) কয়লা থেকে বের হ'য়ে এসে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাঠ বা কয়লাকে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডে (carbon-di-oxide) পরিণত ক'রে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত কাঠ বা কয়লার মধ্যে অঙ্গার (carbon) ছাড়া অন্য যে সব অজৈব (inorganic) পদার্থ থাকে, সেইগুলো ছাই আকারে অবশিষ্ট থেকে যায়। এইভাবে একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার মেশাকে রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action) বলে। কাঠ বা কয়লার কণাগুলির উত্তেজিত হবার সময় এই রাসায়নিক ক্রিয়া যদি কোনও উপায়ে নিরোধ করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত লোহার টুক্‌রাটার মতই কাঠ বা কয়লার সবটাই ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

ফলে আঁঠি হয় কেন?

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'য়ে প্রকৃতির মধ্যে যে সব ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় তার মধ্যে গভীর

উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। খামখেয়ালীভাবে কিছুই হয় না। ফলের মধ্যে যে অংশটা শক্ত আকারে থাকে, যাকে সাধারণতঃ ফলের আঁঠি বলা হয় সে সম্বন্ধেও ঐ কথাটা পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির কাছে ফলের আঁঠি অংশটার মূল্য তার অন্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সেজন্য সে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করল। সে সূক্ষ্ম-রূপ ধারণ ক'রে নিজের চতুর্দ্দিকে একটা কঠিন আবরণ গড়ে নিল। এই আবরণের ভিতরে থেকে সে যতদিন ইচ্ছা নিজেকে মৃত্যু থেকে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হ'ল—সে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেল। এইরূপ উপায় উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্য এই যে, যখন আবার সুবিধা হবে আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় পত্র-পুষ্প-শোভিত হ'য়ে উঠবে। মিশর দেশের কবরে প্রাপ্ত ধানের গল্প তোমরা শুনেছ। এই ধানগুলি ৫০০০ হাজার বৎসর ধরে নিজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে জীবনকে বহন ক'রে এসেছিল, যখন তারা আবার উপযুক্ত পরিমণ্ডল পেল, নিজেকে গাছরূপে প্রকাশ ক'রে দিল। এইজন্যই গাছের কাছে ফলের আঁঠিটার যত মূল্য, তার অন্য অংশের ততটা নয়। আঁঠিটাই ত তাকে অনাদি কাল ধরে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে, আর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

গাছের স্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবার শক্তি নাই। অথচ তাকে তার বীজকে দূরে পাঠাতে হবে। সে আর এক উপায় উদ্ভাবন ক'রল। সে নিজের বীজ অংশটা—যেটাকে সে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে দূরে রাখবার জন্যে কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে—তার চতুর্দ্দিকে সুমিষ্ট আবরণ গড়ে নিল। পাখী, পশু, মানুষ ইত্যাদি—যাদের গমনাগমনের শক্তি আছে তারা এই মিষ্ট অংশটার লোভে আকৃষ্ট হ'য়ে ফলটা পেড়ে আহার করল, আর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন অংশটাকে দূরে নিয়ে গেল—গাছের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। এখন তোমরা বোধ হয় স্পষ্টই বুঝতেই পারছ যে, ফলের মিষ্ট অংশটা শুধু অন্যকে লোভ দেখাবার উদ্দেশ্যেই গাছ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এই-ভাবে প্রতিনিয়তই চলছে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা মৃত্যুকেই জয়ী হ'তে দেখি। কিন্তু ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে, জীবনের মত কৌশলী এমন আর নেই, মৃত্যুর মত সর্ব্বগ্রাসী শক্তিকেও সে অনবরত নানান্ কৌশলে বিচিত্র-ভাবে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে—আর প্রতি-বারেই সে তার এই চেষ্টায় সফল হচ্ছে। জীবন ও মৃত্যুর এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে জীবন যে সব কৌশল আবিষ্কার করেছে এই আঁঠির আবিষ্কার তাদের মধ্যে একটি অতি প্রধান বলা যেতে পারে।

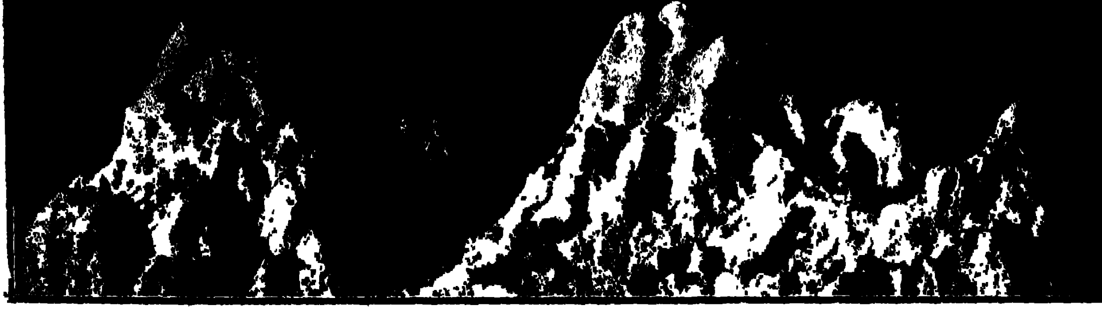
পদ্মপাতার আকার গোল কেন ?

যে পরিমণ্ডলের মধ্যে গাছ জন্ম নেয়, তার নিজের আকার ও আচরণের উপর সেই পরিমণ্ডলের অত্যন্ত প্রভাব পড়ে। পদ্মপাতার বৃত্তাকার আকার পাবার মূলেও তার পরিবেষ্টনের প্রভাব বর্ত্তমান। পুকুর কিম্বা বদ্ধ জলেই পদ্ম জন্মাতে দেখা যায়। পুকুরে যে জল থাকে তার স্রোত হয় না। পুকুরের জলের কোনও বিশেষ দিকে গতি নেই—সব দিকে সমানভাবে তার চলা ফেরা সম্ভব। এই অবস্থায় এই রকম জলের ওপরে যে সব পাতা জন্মায় তার কোনও বিশেষ দিকে বাড়বার চেষ্টা থাকে না। তাই দেখা গিয়েছে যে, এই সব পাতার সব দিকে সমান ভাবে জলের প্রভাব পড়ে এবং সেইজন্য এরা সব দিকে সমান ভাবেই বাড়তে থাকে। কোনও জিনিষ যদি সব দিকে সমানভাবে বাড়তে পায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত তা বৃত্তাকারই হ'য়ে দাঁড়ায়। এখন বুঝতে পারছ, কি কারণে পদ্মপাতা গোলাকার আকৃতি পেয়ে থাকে। তোমরা যদি একবার লক্ষ্য কর, তবে দেখবে যে, যে সব উদ্ভিদ্ বদ্ধ জলে জন্মায়, তাদের সকলকার পাতা সাধারণতঃ গোলাকার হয়। অপর পক্ষে যে সব উদ্ভিদ্ স্রোতের জলে জন্মায়, তা সব সময়েই লম্বাটে ধরণের আকার পাইয়া থাকে।

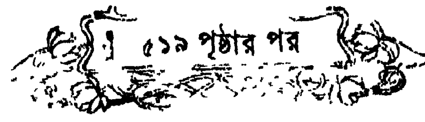


মঙ্গলগ্রহ

Indian Press Ltd., Calcutta



মঙ্গল গ্রহ

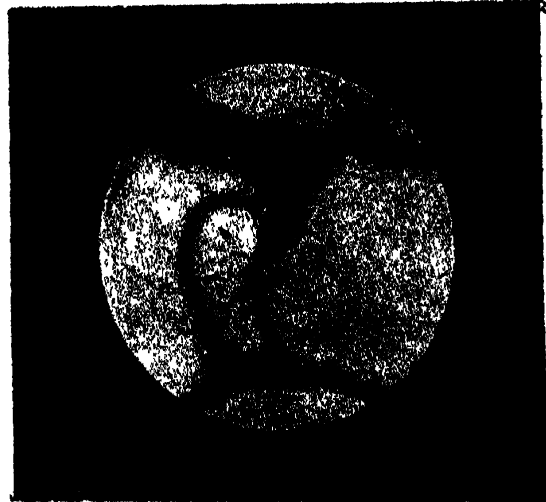

৫১৯ পৃষ্ঠার পর



গত শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বিদেরা কেবল দূরবীনের সাহায্যেই মঙ্গলকে পরীক্ষা করিতেন এবং মঙ্গলের উপরিভাগে যাহা যাহা দেখিতেন তাহা লিখিয়া কিংবা আঁকিয়া রাখিতেন। চক্ষু দিয়া যাহা দেখা যায় তাহা ব্যক্তিবিশেষের তীক্ষ্ণতার উপর নির্ভর করে। ইহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদের আঁকা ছবিগুলিতে সামঞ্জস্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে মঙ্গলের আলোকচিত্র (photograph) লওয়া হইতেছে। আলোকচিত্র ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন প্রকৃতি কিংবা দৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। আলোকচিত্র হইতে যতটুকু খবর জানা যায়, তাহা, মনে হয়, অনেকটা ভ্রমপ্রমাদ শূন্য। ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদেরা



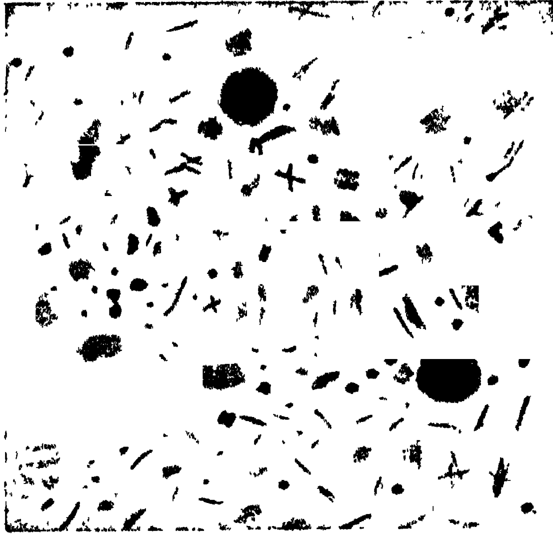
১৯২৮ খৃঃ ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলগ্রহকে যেরূপ দেখা গিয়াছিল



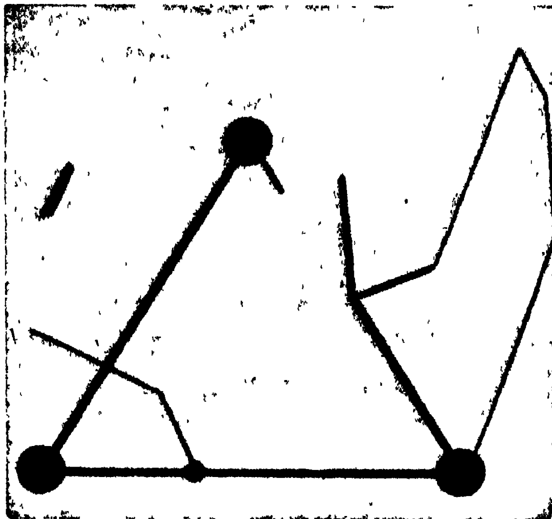
১৯৩১ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলকে যেমন দেখা গিয়াছিল

বিভিন্ন আয়তনের দূরবীন দিয়া মঙ্গলকে দেখিয়াছেন। যে দূরবীনের বর্দ্ধনশক্তি (magnifying power) একশত গুণ, তাহা দিয়া দেখিলে মঙ্গলকে পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে কিছু বড় দেখায়।

এবার মঙ্গলগ্রহের খালের কথা কিছু বিশদভাবে বলিব। আগেই বলিয়াছি যে,

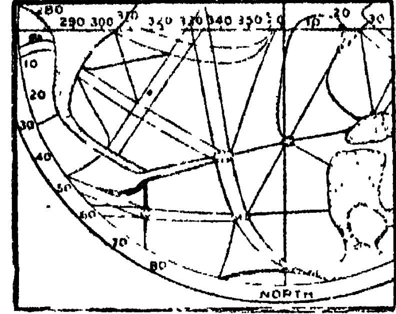


মঙ্গলে খালের চিহ্ন



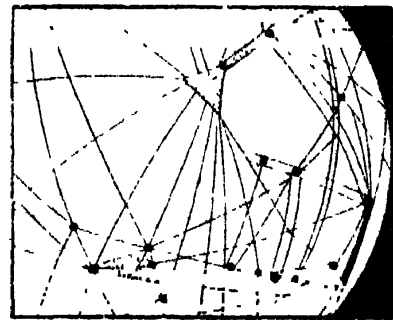
মঙ্গলে খালের চিহ্ন

জ্যোতির্বিবদ শিয়াপারেলী সর্ব্বপ্রথমে খালগুলি দেখিতে পান। পরে পিকারিং, লাওয়েল ইত্যাদি জ্যোতিষীরা অনেকগুলি খাল দেখিতে পান। কোন একটি খাল যে 'দুপুরু' তাহাও কয়েকজন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খালগুলি মঙ্গলের মলিন-অংশ ও বালুকাময় ভূখণ্ড—এই উভয়ের উপর দিয়া গিয়াছে। কোন কোন খাল তিন-চারি হাজার মাইল লম্বা। ঋতু-



শিয়াপারেলীর অঙ্কিত মঙ্গলের নক্সা

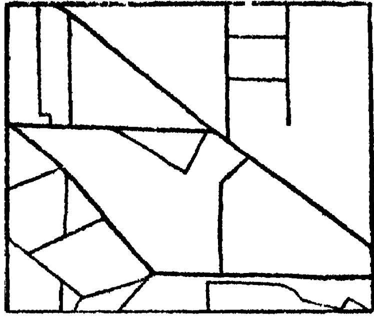
পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে খালগুলির রঙ্‌ও বদলাইয়া যায়। প্রথমে লাওয়েল সাহেব খালের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই বলিব। তাঁহার মতে খালগুলি খুব সরু ও সরল রেখার মত সোজা। খালগুলি লম্বা ও



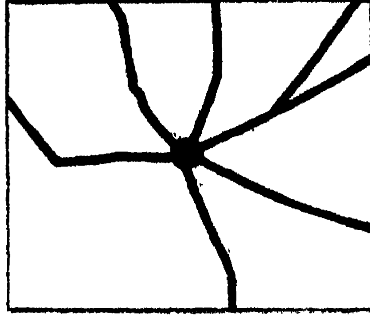
লাওয়েল অঙ্কিত মঙ্গল

অবিচ্ছিন্ন (continuous)। প্রত্যেক খালের সব জায়গা সমানভাবে চওড়া। খালগুলি ২০ মাইলের বেশি চওড়া হইবে না। খালগুলি কখনও কখনও গাঢ় সবুজ রঙের হয়, কখনও বা বিবর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট ছায়াময় ক্ষেত্র

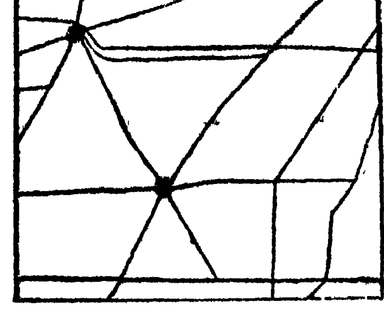
দেখিতে পাওয়া যায়—যে-গুলির ব্যাস ১০০ মাইলের বেশি হইবে না। লাওয়েল



আরিজোনার (আমেরিকা) জল সেচনের খাল

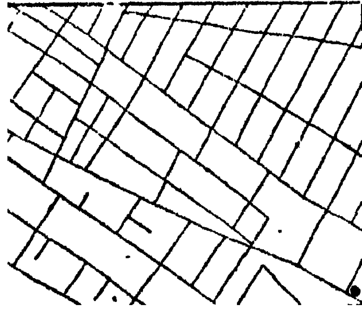


গ্রনিনজেনের খাল—হল্যাণ্ড



ইলিয়নয়েস (আমেরিকা) এর রেল রাস্তা

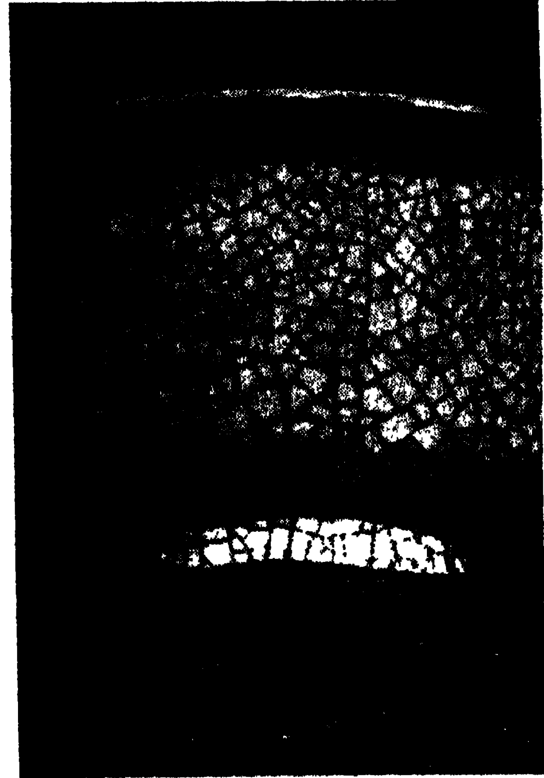
সাহেব এইগুলির নাম "মরূদ্যান" (oasis) দিয়াছিলেন। প্রত্যেক মরূদ্যানে কয়েকটি



মন্ট্রিলের রাস্তা

করিয়া খাল মিশিয়াছে। লাওয়েল সাহেব প্রায় ৪০০ খাল ও ২০০ মরূদ্যান দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৪০০ খালের মধ্যে ৫০টি খাল 'দুপুরু'। প্রত্যেক দুপুরু খালের দুইটি রেখা সমান্তরভাবে গিয়াছে এবং এই দুই রেখার মধ্যে ব্যবধান ১০০ হইতে ২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইবে। অন্যান্য ছায়াময় অংশের ন্যায় ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে খালগুলির ও মরূদ্যানগুলির রঙ্ বদলাইয়া যায়। লাওয়েল সাহেবের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, খালগুলি জ্যামিতির সরল রেখার মত সোজা ও সমান। তিনি বলিতেন যে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণে খালগুলি এত সোজা ও সমান হইতে পারে না।

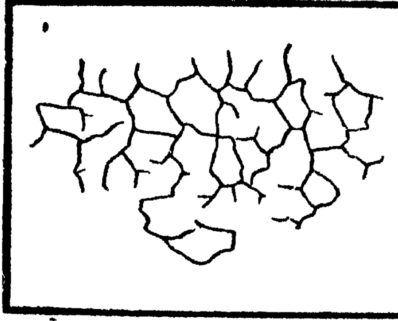
তিনি মনে করিতেন যে, একপ্রকার অতি বুদ্ধিমান জীব মঙ্গলে বাস করে। তাহারাই এই খালগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন ফাটগুলি (cracks) দেখিতে

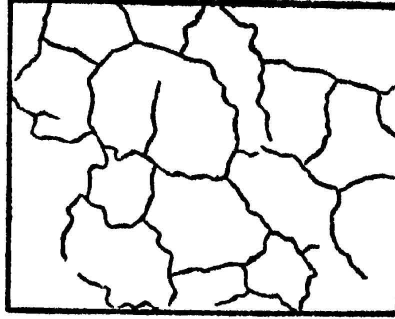


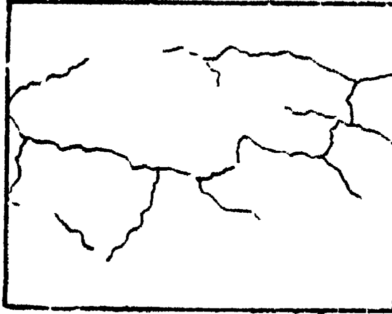
চীনামাটির বাটীর উপরে ফাটার চিহ্ন

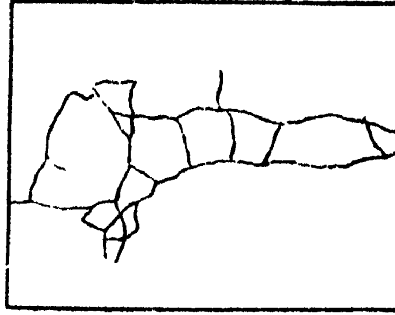
আঁকাবাঁকা হয়। সাগরতটে বা নদীর পাড়ে যে চিড়গুলি (clefts) দেখিতে পাওয়া যায়, সে-গুলির সবই আঁকাবাঁকা। তোমরা অনেকেই চীনামাটির পাত্র ব্যবহার

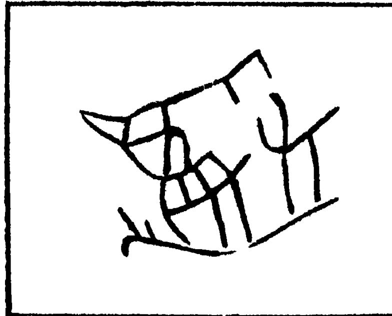
করিয়াছে। যদি কোনও কারণে পাত্রটি ফাটিয়া যায়, তখন তাহার গায়ে আঁকাবাঁকা দাগই দেখিতে পাইবে। সহরের রাস্তাগুলি মানুষের তৈয়ারী। বেলুনে উঠিয়া অনেক উঁচু হইতে নয়াদিল্লী বা কলিকাতার রাস্তা-গুলি দেখিবার যদি তোমার সুযোগ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই রাস্তা-গুলি জ্যামিতির সরল রেখার মতই সোজা।

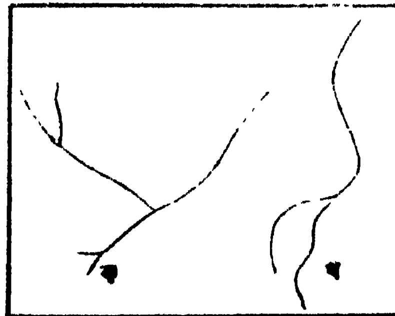

চীনামাটির বাসনের ফাট


কাদা মাটির ফাট


য়্যাসফাল্টের ফাট


মাটির ফাট


চন্দ্রের ফাট



(ক) চন্দ্র (খ) আফ্রিকা
স্বাভাবিক ফাট

লাওয়েল সাহেব সেইজন্যই মনে করিতেন যে, কোন বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান প্রাণীই খালগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই খালগুলি তৈয়ার করিবার কি প্রয়োজন ছিল সে-বিষয়ে লাওয়েল সাহেব এক চমৎকার উত্তর দিয়াছেন। মঙ্গলের অধিকাংশ স্থানে জলকষ্ট বলিয়া মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বড় বড় খাল তৈয়ার করা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে মেরুর বরফ যখন গলিয়া যায়, তখন বরফ গলা জল খালের ভিতর দিয়া আসিয়া দুই পাশের জমিকে চাষবাসের উপযোগী করে। এই সময় খাল-গুলির দুই ধারে শস্য জন্মায় বলিয়াই ইহাদের রঙ গাঢ় সবুজ দেখায়, পরে শীতকালে এইগুলি আবার বিবর্ণ হইয়া যায়। আগেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক মরূদ্যানে কয়েকটি করিয়া খাল মিশিয়াছে; সেইজন্যই মরূদ্যানের ক্ষেত্রগুলি খুবই উর্ব্বর এবং এই সকল স্থলে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মায়। খালগুলি দিয়া জল চালাইবার জন্য দমকল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির নিশ্চয়ই আবশ্যক হয়।

যদি লাওয়েল সাহেবের অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে যে প্রাণী এতগুলি লম্বা

খাল তৈয়ার করিয়াছে এবং দমকল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছে,

কলিকাতার রাস্তা এরোপ্লেন হইতে যেমন দেখায়

তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা খুবই উচ্চদরের এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে সে পৃথিবীর মানুষের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন হইতে পারে না।

মাঝে মাঝে মঙ্গলের গ্রীষ্মমণ্ডলের (Tropics) উপর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শাদা "ছোপ" (patch) দেখিতে পাওয়া যায়। কোন

এরোপ্লেন হইতে গৃহীত হাইডপার্ক ও তাহার গলি রাস্তাগুলি যেমন দেখায়

কোনটি ছোপের ব্যাস ১০০ মাইলের বেশি হয়। দুই তিন মাস ধরিয়া এই ছোপগুলিকে একস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরে এইগুলি মিলাইয়া যায়। একস্থানে দুই তিন মাস থাকে বলিয়া এই ছোপগুলি মেঘ হইতে পারে না। কারণ, মেঘ ভাসিয়া বেড়ায় এবং একস্থলে বেশিক্ষণ স্থিরভাবে থাকিতে পারে না।

বহু উর্দ্ধ হইতে হাইডপার্ক ও সার্পেণ্টাইন যেমন দেখায়

অনেক সময় গ্রীষ্মকালেই গ্রীষ্মমণ্ডলে এই দাগগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই ছোপগুলি উচ্চ পর্ব্বত শিখরের বরফ ভিন্ন আর কিছুই নয়। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই দাগগুলি উচ্চে অবস্থিত নহে, বরফ মঙ্গলের গায়ে সমতলভূমির সঙ্গেই সংলগ্ন। সেইজন্য এই দাগগুলি বরফ হইতে পারে না। তোমরা প্রশ্ন করিতে পার, তবে এই ছোপগুলি

কি? লাওয়েল্ সাহেব ইহার মজার উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, যে-সকল স্থলে তুলার চাষ কিংবা শাদা কাপড়ে ঢাকা তামাকের চাষ হয় কিংবা ডেজীর (Daisy) ন্যায় কোন শাদা ফুলের বাগান আছে সেই সব জায়গা উপর হইতে শাদা দেখায়। মঙ্গলবাসীরা বোধ হয় তুলার চাষ কিংবা শাদা ফুলের বাগান করে। ফুল ঝরিয়া গেলে কিংবা তুলার চাষ হইয়া গেলে এই ছোপগুলি মিলাইয়া যায়। লাওয়েল সাহেবের অনুমানটি উপরে দিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই "নানা মুনির নানা মত" এই প্রবাদ বাক্যটি শুনিয়া থাকিবে। জ্যোতিষীদের মধ্যে এই বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাওয়েল সাহেবের অনুমানটি বাতুলের কল্পনা মাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদ লাওয়েলের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে এই অনুমানের স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে কোনও অকাট্য প্রমাণ না পাইয়া এ বিষয়ে কোনও অভিমত দিতে অনিচ্ছুক।

পারিসের মিউডন্ মানমন্দিরের (Meudon Observatory) জ্যোতির্ব্বিদ্ আন্তনিয়াদি (Antoniadi) সাহেব বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে খালগুলি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখা নয়—এক একটি খাল কতকগুলি অস্পষ্ট, অসমান ও পৃথক দাগের সমষ্টি মাত্র। দূর হইতে দাগগুলির মধ্যে ফাঁক স্পষ্ট দেখা যায় না বলিয়া দাগগুলি মিলিয়া অনেকটা অবিচ্ছিন্ন রেখার মত দেখায়। উত্তর আমেরিকার ইয়র্কস (Yerkes) মানমন্দিরের জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক বার্ণাডেরও মত তাহাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ আন্তানিয়াদির মতাবলম্বী ছিলেন, কেহ কেহ বা লাওয়েল-মতই সমর্থন করিতেন। অধ্যাপক পিকারিং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা মধ্য পথাবলম্বী ছিলেন। পিকারিং সাহেব বলিতেন যে, যে সকল খাল অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেগুলি অনেকটা সোজা ও অবিচ্ছিন্ন। তাঁহার মতে কোন কোন খাল প্রায় ১৫০ মাইল চওড়া। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে খালগুলি খুব লম্বা, সেগুলি শেষকালে বাঁকিয়া গিয়াছে। আন্তনিয়াদি সাহেব বলিতেন যে, তিনি যে দূরবীন ব্যবহার করিতেন, তাহা লাওয়েল সাহেবের

কাপড়ে ঢাকা তামাকের চাষ—পোর্টোরিকো

দূরবীনের চেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট। সেজন্য তিনি মঙ্গলের পিঠ আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে এবং আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিযাছিলেন। লাওয়েলের দূরবীনের ব্যাস ২৪ ইঞ্চ্ এবং আন্তনিয়াদির দূরবীনের ব্যাস ৩১ ইঞ্চ্ ছিল। অধ্যাপক

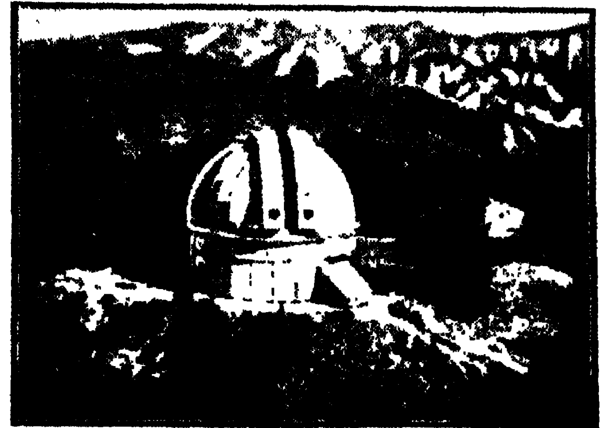


প্রফেসার ই, বার্ণার্ড

বার্ণার্ড যে দূরবীন ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ব্যাস ৪০ ইঞ্চ্ ছিল। আজকাল জ্যোতির্ব্বিদেরা আরও বড় বড় দূরবীন ব্যবহার করেন—ইহাদের মধ্যে একটির ব্যাস ১০০ ইঞ্চ্। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, যদিও খালগুলি অবিচ্ছিন্ন সরল রেখার মত দেখায়, তবুও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, এইগুলি সত্য সত্যই অবিচ্ছিন্ন কি না—কারণ অনেকগুলি ছোট ছোট দাগ কাছাকাছি থাকিলে দূর হইতে অনেকটা অবিচ্ছিন্ন সরল রেখার মত দেখায়। আন্তনিয়াদি সাহেবের মত যে সত্য, তাহাও বলা যায় না। সেজন্য এই খালগুলি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া



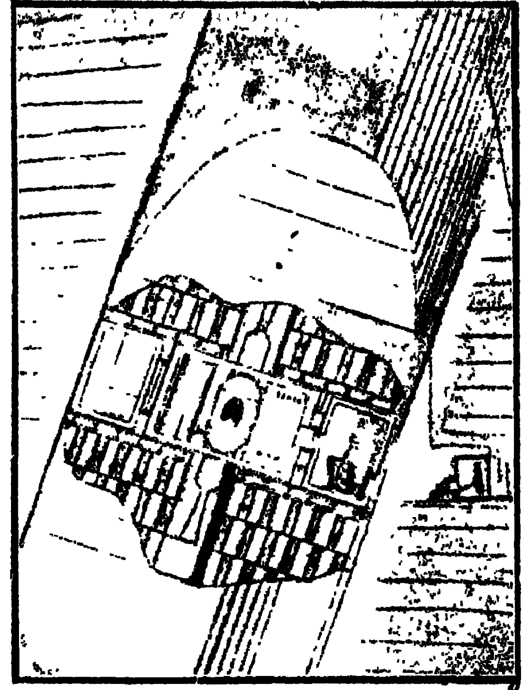
৭২ টেলিস্কোপ ভিক্টোরিয়া



উইলসন পর্ব্বতের উপর মান মন্দির

এখনও কিছু বলা যায় না। আশা করা যায় যে, দূরবীন ও ফোটোগ্রাফির আরও উন্নতি হইলে এ বিষয়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে।

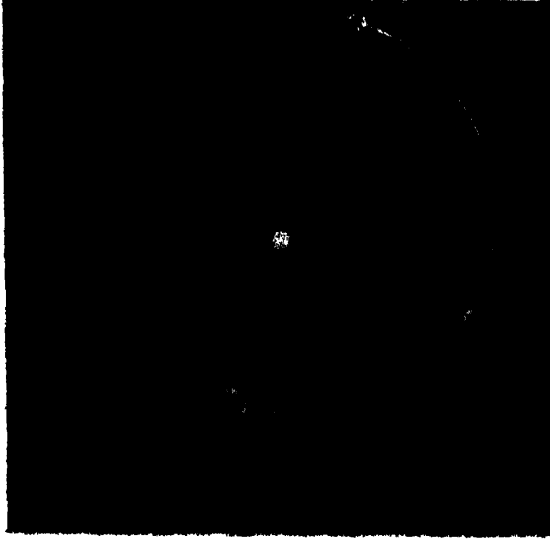
অবশ্য, মঙ্গলের জলবায়ু ও তাপক্রম যে জীবজন্তুবাসের উপযোগী, সে বিষয়ে এখন আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে কোনও জীব কিংবা কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া এখনও কিছু বলা কঠিন। এই জন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তা করিতেছেন যদি কোন উপায় থাকে যাহাতে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়া জানিতে পারে সেখানে সত্য সত্যই কোন বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে কি না, বা পৃথিবীর মত সেদেশে নগর-নগরী ও সৌধমালা আছে কি না। আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে (Clark University) পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক গডার্ড (Goddard) সাহেব চাঁদে একটি দ্রুতগামী রকেট (rocket) পাঠাইবার মনস্থ করিয়াছেন। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক রানডলফ্ (Randolph) সাহেব পৃথিবীর মানুষ যাহাতে মঙ্গলের অতি নিকটে গিয়া ও মঙ্গলকে পরীক্ষা করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার এক অভিনব সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। রানডলফ্ সাহেব বলেন যে, এক অতি দ্রুতগামী রকেট তৈয়ার করিতে হইবে। এমন কৌশলে এই রকেট নির্ম্মিত হইবে যাহাতে শূন্যেও ইহার গতির বেগ ও মুখ অতি সহজেই বদলাইতে পারা যাইবে। খুব বেশি চাপের দ্বারা কতকগুলি গ্যাস (Gas) তরল করিয়া রকেটের এক শক্ত ইস্পাতের কামরার মধ্যে রাখিতে হইবে। তাপ যাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না, এইরূপ কোন পদার্থ দ্বারা ইস্পাতের কামরার চারিধার মুড়িয়া রাখিতে হইবে। ইচ্ছামত যে কোন দিকে কম বেশি যে কোন পরিমাণে গ্যাস বাহির করিবার উপায় রাখিতে হইবে। ধর, তোমার রকেটটি পূর্ব্ব দিকে ছুটিতেছে এবং তুমি ইহার বেগ কিছু কমাইতে চাও। তুমি পূর্ব্বদিকে একটু গ্যাস বাহির করিয়া দাও। গ্যাস পূর্ব্বদিকে বাহির হইবার সময় রকেটের উপর পশ্চিম-মুখো এক ধাক্কা দিয়া যাইবে। ইহাতে রকেটের পূর্ব্বদিকের গতির বেগ কিছু কমিয়া যাইবে। তুমি যদি পূর্ব্বদিকে অনেকটা গ্যাস বাহির



রান্ডল্ফ সাহেবের কল্পিত মঙ্গলের রকেট

করিয়া দাও, তাহা হইলে পূর্ব্বদিক হইতে তুমি রকেটের গতি পশ্চিমদিকে ফিরাইতে পারিবে। এই রকেটটিকে এত বড় তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে দুই তিনজন যাত্রী থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে, এবং দুই বৎসরের জন্য জল রসদ ও নিঃশ্বাস লইবার অম্লজানের ব্যবস্থা থাকিতে পারে। পৃথিবী যাহাতে নিজের আকর্ষণ শক্তি দিয়া রকেটটিকে আর টানিয়া রাখিতে না পারে, সেজন্য রকেটটিকে

অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগ হিসাবে পৃথিবীর পিঠ হইতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। মঙ্গলের কাছাকাছি আসিলে রকেটের গতির বেগ ও মুখ এইভাবে বদ্‌লাইতে হইবে, যাহাতে ইহা মঙ্গলের চাঁদ হইয়া মঙ্গলের চারিধারে ঘুরিতে আরম্ভ করে। মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করিবার



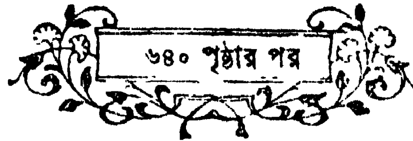
পৃথিবী ও মঙ্গলের পরিভ্রমণ পথ

পর রকেটের গতির বেগ ও মুখ আবার বদ্‌লাইয়া পৃথিবীর দিকে চালাইতে হইবে। রকেট্‌টির সঙ্গে একটি ছোট বেলুনও থাকিবে। যখন রকেটটি পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন আরোহীরা রকেটটিকে ছাড়িয়া বেলুনের উপর উঠিয়া পরে অল্পে অল্পে পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। এদিকে রকেটটি প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগ হিসাবে পৃথিবীতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে। রান্‌ডল্‌ফ সাহেবের কল্পনাটি অতি মনোহর। অধ্যাপক গডার্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, রান্‌ডল্‌ফ সাহেবের সঙ্কল্পটি বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্ভুল। এইরূপ একটি রকেট তৈয়ার করা খুব শক্ত এবং অনেক টাকার আবশ্যক। কতদিনে মানুষ এইরূপ একটি নিখুঁত, ত্রুটিবিহীন রকেট তৈয়ার করিতে পারিবে, বলা যায় না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি এইরূপ একটি রকেটে চড়িয়া মঙ্গলগ্রহের যাত্রী হইতে চাও? ইংলণ্ডের রিডিং (Reading) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক টমসন (Thompson) সাহেব কেমন করিয়া মঙ্গলে তড়িৎ-তরঙ্গ পাঠাইতে পারা যায় সেই বিষয়ে ১৯৩০ খৃঃ সাইন্টিফিক্‌ আমেরিকান (Scientific American) পত্রিকায় এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জানি না, মঙ্গলে এমন কোনও বুদ্ধিমান জীব আছে কি না, যে উপযোগী যন্ত্র দ্বারা এই তড়িৎ-তরঙ্গ-গুলিকে ধরিতে পারিয়া ইহাদের সাঙ্কেতিক অর্থ বুঝিতে পারিবে। ১৯২৮ খৃঃ আন্‌সে পেল তেরি (Ensault-Pel Teri) লাস্ত্রনোমি (L' Astronomie) পত্রিকায় এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব কি না, এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন (La possibilite des voyages inter-planetaire)।



পৃথিবীর ইতিহাস—অ্যাসিরিয়া

অ্যাসিরীয় শক্তির চরম বিকাশ—নূতন সাম্রাজ্য



৭৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে অ্যাসিরিয়ার রাজধানী কালাসহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে পঞ্চম অসুরনিরারি রাজ্যচ্যুত হন, এবং পর বৎসর "পুলু" নামে একজন সাধারণ ব্যক্তি রাজা হন। রাজা হইয়া তিনি টিগলাথ পিলেসার নাম গ্রহণ করেন। এই নূতন রাজা অ্যাসিরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিচক্ষণ নৃপতি। তিনিই প্রকৃত অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের স্রষ্টা। তিনি যেমন অদ্বিতীয় যোদ্ধা ছিলেন রাজ্যশাসনেও তেমনই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

চতুর্থ টিগলাথ পিলেসার ৭৪৫—৭২৭ খৃঃ পূঃ

সাম্রাজ্যশাসন পদ্ধতি

এতদিন পর্য্যন্ত অ্যাসিরিয়ার রাজারা অন্যান্য রাজ্য জয় করিয়া হয় লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন, না হয় রাজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছেন। টিগলাথ পিলেসার কিন্তু রাজ্য জয় করিয়া তাহা অ্যাসিরিয়ার অন্তর্ভূ্ক্ত করিয়াছেন। শাসনের জন্য অ্যাসিরীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। দেশে শাসন শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য সেখানকার দুর্দ্দান্ত লোকদের অ্যাসিরিয়ায়, অথবা সাম্রাজ্যের অন্য প্রান্তে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এবং রাজভক্ত অ্যাসিরীয় দ্বারা তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। অবশ্য, এই পন্থা প্রথম অবলম্বন করেন অসুরনাজিরপাল। তবে সে দুই এক ক্ষেত্রে। চতুর্থ টিগ্‌লাথ পিলেসারই এই উপায় সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া প্রথম প্রকৃত সাম্রাজ্য গঠন করেন।

প্রথমে তিনি ব্যাবিলনিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। ব্যাবিলনরাজ নবনচ্ছার (Nobonassar) সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন, এবং টিগালাথ পিলেসার নিজে "সুমের আক্কাদের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। ক্যাল্‌ডিয়ার (কালডু-পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ) রাজারাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পূর্ব্বদিকে জ্যাগ্রস পর্ব্বতাবলীর পাহাড়ী জাতিদিগকে আক্রমণ করিয়া শক্তিহীন করেন। ইহার পর তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে ভ্যানহ্রদের তীরবর্ত্তী উরার্টু রাজ্য আক্রমণ করেন। অ্যাসিরীয়-শক্তির সাময়িক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া উরার্টু রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উরার্টু রাজ তৃতীয় সার্ডুরিয়াস্ (Sardurius 111) নাইরি দেশের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, উত্তর সিরিয়ায় কোন কোন রাজাও (বিশেষতঃ আর্পাদ্‌রাজ) তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এই মিলিত বাহিনীকে টিগলাথ পিলেসার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন এবং তাঁহাদের সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেন। তারপর তিনি উরার্টু রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করিয়া রাজধানী তুরুস্পের (Turuspa) সম্মুখে উপস্থিত হন। রাজধানী কিন্তু তিনি অধিকার করিতে পারিলেন না। টিগ্‌লাথ পিলেসার তুরুস্পের সম্মুখে নিজের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন

ব্যাবিলন ও উরার্টু বিজয়



সিরিয়া-বিজয়

এইবার তিনি সিরিয়া বিজয়ে মন দেন। প্রথমে তিনি আর্পাদ নগর আক্রমন করেন। তিন বৎসর অবরোধের পর আর্পাদ্ আত্মসমর্পণ করে। তারপর তিনি ওরন্টিস্ নদী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর সিরিয়া জয় করেন এবং আসিরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। এখানকার অনেক লোককে তিনি নাইরি দেশে নির্ব্বাসিত করেন এবং ব্যাবিলনিয়ার অধিবাসী আনিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করেন। এই সময়ে সিরিয়ার অন্যান্য রাজারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন এবং কর দেন। ইহাদের মধ্যে ডামাস্কাস্, হামাথ, কারকেমিস্, টায়ার ও গেবাল রাজ্যের রাজারা উল্লেখযোগ্য। এমন কি, ইস্রেলের রাজা মেনাহিম্(Menahim of Samaria) পর্য্যন্ত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন।

ইহার অল্পদিন পরে মেনাহিমের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রাজা হন। কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ পেকা (Pekah) রাজা হন এবং সিরিয়ার ডামাস্কাসের নুতন রাজা রেজিনের (Rezin) সঙ্গে মিতালি করেন। এবার দুই বন্ধু একযোগে জুডার (Judah) রাজা আহাজকে (Ahaz) আক্রমণ করেন। এডোম ও ফিলিষ্টাইনের রাজারাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। নিরুপায় হইয়া আহাজ টিগ্লাথ পিলেসারের শরণাপন্ন হন ও প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। আসিরিয়া রাজও ত এই চান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পক্ষ অবলম্বন করেন ও ইস্রেল আক্রমন করিয়া পেকাকে পরাস্ত করেন। পেকার প্রজারা তাহাকে হত্যা করিয়া হোসিয়া (Hoshea) বলিয়া একজনকে রাজা করে। হোসিয়া অবিলম্বে টিগ্লাথ পিলেসারের অধীনতা স্বীকার করেন। মোয়াব, এডম্, অ্যামন প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও তাহাকে কর প্রদান করেন।

ইহার পর টিগ্লাথ পিলেসার ডামাস্কাস আক্রমণ করেন ও রেজিনের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। রেজিন পলাইয়া রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। টিগ্লাথ পিলেসার সিরিয়া রাজ্য লুঠপাট করিয়া ডামাস্কাস্ অবরোধ করেন। শীঘ্রই রাজধানী আত্মসমর্পণ করে। সেখানকার অধিবাসীদের অন্যত্র পাঠান হয় এবং রেজিনকে হত্যা করা হয়।

ডামাস্কাস্

টিগ্লাথ পিলেসার তাহার প্রধান সেনাপতিকে টায়ার আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া স্বয়ং ব্যাবিলনিয়ায় গমন করেন। টায়ার বশ্যতা স্বীকার করে এবং প্রচুর ধনরত্ন দিয়া অব্যাহতি পায়। এদিকে ক্যালডিয়ার রাজারা ব্যবিলনিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উকিঞ্জির(Ukinzir) নামে তাহাদের মধ্যে একজন সত্য সত্যই ব্যবিলনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। টিগ্লাথ পিলেসার আসিয়াই তাহাদিগকে ব্যবিলনিয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। এমন কি, তিনি ক্যাল্‌ডিয়া আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেন। এই সময়ে মার্ডুক হাবালিদ্দিন(Marduk-Habal-iddinorMerodach Baladan) নামে ক্যাল্‌ডিয়ার বীট্ ইয়াকিন রাজ্যের (Bit Yakin) রাজা তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন।



অসুর রাজাদের জীবনতরু—পক্ষীরাজ দেবতা

(পঞ্চম শাল্মানেসার ৭২৭—৭২২ খৃঃ পূঃ)

খৃঃ পূঃ ৭২৭ বৎসরে টিগ্লাথ পিলেসারের মৃত্যু হইলে পঞ্চম শাল্মানেসার রাজা হন। তিনি মোটে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় টায়ার ও ইস্রেল বিদ্রোহ করে। এই সময়ে মিশরের রাজা ছিলেন ইথিওপীয় শাবক। শাবক প্যালেষ্টাইনে পুনরায় মিশরের প্রভুত্ব স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

পাইয়া টায়ার ও ইস্রেল অ্যাসিরিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। শাল্‌মানেসার তৎক্ষণাৎ টায়ার আক্রমণ করেন। পাঁচ বৎসর অবরোধের পরে টায়ার বশ্যতা স্বীকার



ব্যাবিলনের গিলগামেশ

করে। এদিকে ইস্রেল-রাজ হোসিয়া যদিও প্রথমে শাল্‌মানেসারের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবু গোপন ভাবে মিশররাজ শাবকের সঙ্গে যোগ দেন। কাজেই, অ্যাসিরিয়ারাজ তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগৃহে নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি ইস্রেলের রাজধানী স্যামারিয়া অবরোধ করেন।

তিন বৎসর অবরোধের পর স্যামারিয়া আত্মসমর্পন করেন কিন্তু শালমানেসারের কাছে নয়—

সার্গন (৭২২—৭০৫) ইস্রেলরাজ্যের অবসান

অ্যাসিরিয়ার নূতন রাজা সার্গনের কাছে। তিনি এখানকার সমস্ত অধিবাসীদের (২৭,২৮০) অ্যাসিরিয়া-রাজ্যের নানাস্থানে নির্বাসিত করেন এবং অন্য স্থানের লোক আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইস্রেলের শাসনের জন্য নিজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।

এখন কথা হইতেছে, এই সার্গন কে? তিনি যেই হউন, রাজবংশের কেহ নন। সে যাহা হউক, সার্গন একজন শক্তিশালী ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তাহার সময় আসিরীয় সাম্রাজ্যের বিশেষ বিস্তার হয়। রাজ্যশাসনেও তিনি তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

বীট্‌ ইয়াকিনের রাজা মার্ডুক হাবালাদ্দিন ইতিমধ্যে ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার

ব্যাবিলনরাজ মার্ডুক হাবালাদ্দিন

প্রধান সহায় ছিলেন এলামরাজ খুম্‌বানিগাস্‌ (Khumbanigash)। দুই বন্ধু মিলিয়া মেসোপটেমিয়া আক্রমন করেন। সার্গন বাধা দিতে আসিলে পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ব্যাবিলনিয়ায় মার্ডুক হাবালাদ্দিনের ক্ষমতা অপ্রতিহত রহিল।

এদিকে আবার মিশররাজ শাবকের চক্রান্তে সিরিয়া প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ডামাস্কাস্‌

সিরিয়া প্যালেষ্টাইন বিদ্রোহ দমন

আর্পাদ, হামাথ, এমন কি স্যামারিয়াতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনরূপ একতা না থাকাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। হামাথের রাজা যৌবিদ্‌কে (Jaubid) সার্গন কর্কর নগরে

মিশর ও অ্যাসিরিয়ার সংঘর্ষ

অবরোধ করেন। কর্কর আত্মসমর্পণ করিলে যৌবিদকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন (জীবন্ত ছাল ছাড়ান হয়) এবং এখানকার অনেক অধিবাসীকে অ্যাসিরিয়ায় স্থানান্তরিত করেন অ্যাসিরীয় প্রজা দ্বারা তাহাদের শূন্য

রাফিয়ার যুদ্ধ

স্থান পূর্ণ করা হয়। তারপর সার্গন মিশররাজশাবকের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দুই সৈন্যদল মিশরের সীমান্তে রাফিয়াতে (Raphia)

পরস্পর সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে শাবক ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন।

এইবার সার্গন উত্তরদিকে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উরার্টুর রাজা প্রথম রুশাস (Rusas I) বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ও সমগ্র নাইরি-দেশে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সার্গন প্রথমে সিরিয়ার রুশাসের পক্ষীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করেন। ৭১৭ খৃঃ পূর্ব্ব তিনি কার্কেমিসের শেষ হিটাইট রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রজাদের সহিত বন্দী করিয়া অ্যাসিরিয়ায় লইয়া আসেন। সিরিয়ার হিটাইট্ রাজ্যের শেষ চিহ্ন লুপ্ত হইল। ইহার পর সার্গন উরার্টু রাজ্য আক্রমণ করেন ও প্রায় সমস্ত দেশ জয় করিয়া ছারখার করেন। রুশাস্ হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করেন। সার্গনের সময়েই অ্যাসিরিয়ার সাম্রাজ্য উত্তর দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার এক সেনাপতি টরাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ফ্রিজিয়ার রাজা মিডাসের (Mita of Muski) সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

উরার্টুর পতন

এইবার সার্গন বীট্ ইয়াকিনের মার্ডুক হাবালাদ্দিনের দিকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন। গত ১২ বৎসর ধরিয়া বীট্ ইয়াকিন-রাজ ব্যাবিলনিয়ায় নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এলাম রাজের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সার্গন তাঁহার সৈন্যবাহিনী দুইভাগ করিয়া একভাগ এলামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং অন্যভাগ লইয়া ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হন। মার্ডুক হাবালাদ্দিন রাজধানী হইতে পলাইয়া বীট ইয়াকিনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যাবিলনের পুরোহিতেরা সাদরে সার্গনকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। ইহার পর সার্গন বীট ইয়াকিন আক্রমণ করিয়া মার্ডুক হাবালাদ্দিনের পৈতৃক রাজ্য অধিকার করেন ও তাঁহার রাজধানী ধূলিসাৎ করেন। মার্ডুক হাবালাদ্দিন পলাইয়া যান।

মার্ডুক-হাবালাদ্দিনের দমন

সার্গনের কীর্ত্তিকাহিনী এইবার দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এমন কি, সুদূর সাইপ্রাস দ্বীপের সাত জন রাজা তাঁহাকে নানাবিধ উপঢৌকন দেন। এতদিন পরে তিনি বিশ্রামলাভের সুযোগ পাইলেন। এই শান্তির অবসরে তিনি দার-সারুকিন্ (DurSharrukin) নামে একটি নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সহরে তিনি নিজের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন সত্যই তাহা অতুলনীয় ছিল। এই বিষয়ে পরে বলা হইবে। ৭০৫ খৃঃ পূঃ কাইমেরিয়ান নামে এক আর্য্য-জাতীয় লোকদের সহিত যুদ্ধে সার্গনের মৃত্যু হয়।



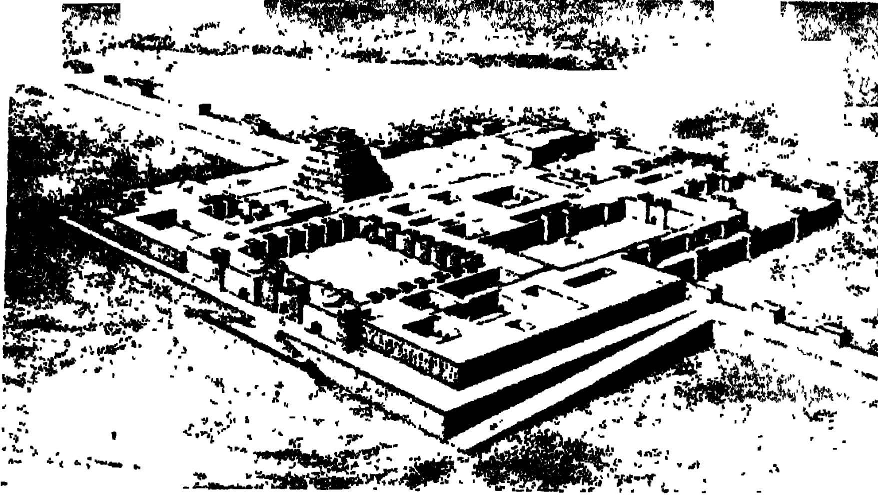
মানুষমুখো বৃষ

সার্গনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেনাকেরিব রাজা হন। তিনি রাজধানী পুনরায় নিনেভে সহরে লইয়া যান এবং সহরটিকে নূতন করিয়া গড়েন। প্রথমেই তাঁহাকে ব্যাবিলনিয়ার বিদ্রোহ দমনে মন দিতে হয়। ব্যাবিলনের পুরোহিতেরা সার্গনের প্রতি অনুরক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেনাকেরিব তাহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। তাহারা মার্ডুক-জাকির-সুম্ নামে একজন ব্যাবিলনীয়কে সিংহাসনে বসান। কিন্তু এই গোলমালের

সেনাকেরিব (৭০৫-৬৮১) (সিন্-আকিরিব)

ব্যাবিলন ও ক্যালডিয়ায় অভিযান

সুযোগে এলামরাজের সহায়তায় মার্ডুক-হাবালাদ্দিন আবার ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। কাজেই, সেনাকেরিব্ ব্যাবিলনিয়ায় অভিযান করেন কিসের (Kish) নিকটে এলাম ও ব্যাবিলনের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই তবে প্রকৃত নেতা ছিলেন জুডার রাজ হেজ্কিয়া (Hezekiah)। বিদ্রোহ প্রথমে উপস্থিত হয় আস্কালন সহরে। সেখানকার অ্যাসিরীয় পক্ষের রাজাকে তাড়াইয়া সিড কা নামে একজন রাজা হয়। আবার এক্রনের (Ekron) লোকেরা তাঁহাদের রাজা পাদিকে (Padi) বন্দী করিয়া হেজ্কিয়ার নিকট পাঠান। এই পাদি ছিলেন সেনাকেরিবের বিশেষ অনুরক্ত ও আশ্রিত। কাজেই, সেনাকেরিব অবিলম্বে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। তিনি প্রথম সিডন আক্রমণ করেন। সেখানকার রাজা পলায়ন করেন। সেনাকেরিব্ তাঁহার এক বিশ্বস্ত লোককে এখানকার রাজা করেন। এইবার



সার্গানের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

যুদ্ধে মার্ডুক-হাবালাদ্দিন পরাজিত হন এবং কাল্ডিয়ায় পলায়ন করেন। সেনাকেরিব্ ব্যাবিলন অধিকার করেন। ইহার পর তিনি কাল্ডিয়া আক্রমণ করিয়া সেখানকার অধিকাংশ সহর অধিকার করেন। ফিরিবার সময় বেল ইবনি নামে একজন ব্যাবিলনীয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইহার পরে সেনাকেরিব্ জ্যাগ্রস পার্ব্বত্য দেশে কাস্সি জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইহাদের

জ্যাগ্রাস্ পর্ব্বত অভিযান

প্রধান সহর অধিকার করিয়া লুঠপাট করেন এবং অ্যাসিরিয়ার অধিবাসী আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন তারপর তিনি জ্যাগ্রস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইল্লিপ (Ellip) রাজ্য আক্রমণ করেন। এখানেও তিনি জয়ী হন। ফিরিবার পথে তিনি মীড্দের(Medes) নিকট হইতে কর আদায় করেন।

ইতিমধ্যে প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বোধ হয়, মার্ডুক-হাবালাদ্দিনের প্ররোচনায় এবং

প্যালেষ্টাইনের বিদ্রোহ দমন

মিশর-রাজ শাবকের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া প্যালেষ্টাইনের অধিকাংশ সহরই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করে। ইহাতে সিডন্ ও টায়ারাও যোগ দেয়।

প্যালেষ্টাইনের অধিকাংশ রাজারা তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর সেনাকেরিব্ অ্যাস্কালন অধিকার করিয়া

মিশরের সহিত সংঘর্ষ

এক্রনের দিকে অগ্রসর হন। এই সহরের সন্নিকটে আল্টাকুতে (Altaku) মিশর বাহিনীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। মিশরীয় সৈন্যেরা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। এক্রন তাঁহার হস্তগত হয়। সেখানকার বিদ্রোহী নেতাদের শাস্তি দিয়া তিনি পাদিকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এবার জুডার বিরুদ্ধে তিনি অগ্রসর হন। একে একে এখানকার সমস্ত সহর তিনি অধিকার করেন। হেজ্কিয়া কিন্তু জেরুজালেমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রথমে কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। কাজেই, সেনাকেরিব্ রাজধানী অবরোধ করেন। বিশেষ কাজের জন্ত তাঁহাকে অ্যাসিরিয়ায় ফিরিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি এক দল সৈন্য এখানে রাখিয়া যান। অবশেষে হেজ্কিয়া তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন এবং বিস্তর উপঢৌকন দিয়া রেহাই পান।

এদিকে সেনাকেরিব্ ত বেল্-ইব্নিকে ব্যাবিলনের রাজা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে ছিল নিতান্ত

অপদার্থ। কাজেই, রাজ্যে নানারকম গোলযোগ উপস্থিত হয়। মার্ডুক-হাবালাদ্দিন আবার বীট্ ইয়াকিনে ফিরিয়া আসিয়া চক্রান্ত আরম্ভ করেন। সুতরাং আবার সেনাকেরিব্‌কে ব্যাবিলনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তিনি তাঁহার পুত্র অসুরদান-সুমকে সসৈন্যে পাঠান। ব্যাবিলনিয়ায় শান্তি স্থাপন করিয়া অসুরদান ক্যাল্‌ডিয়া আক্রমণ করেন। মার্ডুক হাবালাদ্দিন এলামরাজ্যে পলায়ন করেন। বীট্ ইয়াকিনের অধিবাসীদিগকে অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হয়। ক্যাল্‌ডিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেল-ইবনিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অসুরদান ব্যাবিলনিয়ায় রাজা হন।

ব্যাবিলন

কয়েক বৎসর পরে সেনাকেরিব্ দক্ষিণ ইলামে অভিযান করেন। এখানে বীট্ ইয়াকিনের অনেক লোক আশ্রয় লইয়াছিল। নৌ-বাহিনীর সাহায্যে এখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। এদিকে এই সুযোগে এলামরাজ খাল্লুসু অতর্কিত-ভাবে ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া অসুরনাদিন-সুমকে বন্দী করেন এবং নার্গল উসেজিব্ নামে একজন ব্যাবিলনিয়কে রাজা করেন। দক্ষিণ এলাম বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া সেনা-কেরিব্ ব্যাবিলনে ফিরিয়া আসিয়া নার্গল উসেজিব্ ও এলামরাজের সেনাবাহি-নীকে পরাস্ত করেন এবং নার্গল উসেজিবকে অ্যাসি-রিয়া লইয়া যান। মুসেজিব মার্ডুক নামে এক ব্যক্তি ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন।

ইলামে অভিযান

কিছুদিন পরে আবার সেনাকেরিব্ ব্যাবিলন আক্রমণ করেন। মুসেজিব মার্ডুক এলামরাজ উমান মেনানুর সাহায্যে তাঁহাকে বাধা দেন। অ্যাসিরীয় সৈন্যরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই ভাবে মাসের পর মাস যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে হঠাৎ উমান মেনানুর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে মুসেজিব হীনবল হইয়া পড়েন এবং ব্যাবিলন নগরে আশ্রয় লন। সেনাকেরিব তখন রাজধানী অবরোধ করেন এবং কয়েক মাস পরে উহা অধিকার করেন। মুসেজিব মাড়ুককে অ্যাসিরিয়ায় বন্দী করিয়া পাঠান হয়। সেনাকেরিব নিজে 'সুমের ও আক্কাদের' রাজা হন। এইবার তিনি ব্যাবিলনবাসীদের উপর ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কয়েকদিন ধরিয়া অবিরাম লুঠপাট চলে, অনেক লোককে হত্যা করা হয় এবং অনেক মন্দির ও অট্টালিকা ধূলিসাৎ করা হয়, ব্যাবিলন শ্মশানে পরিণত হয়। মার্ডুকদেবের মূর্ত্তি অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার পুত্র এছার-হাড্ডনকে (Essarhaddon) ব্যাবিলনিয়ার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

ব্যাবিলন বিজয় ও ধ্বংস।

সেনাকেরিবের পরিণাম অতীব শোচনীয়। তিনি যখন মন্দিরের উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার দুই পুত্র তাহাকে হত্যা করিয়া উরার্টুতে পলাইয়া যায়।

সেনাকেরিবের রাজধানী ছিল নিনেভে নগরে। তিনি সহরটিকে সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া গড়েন। রাস্তাঘাট,মন্দির-প্রাসাদদুর্গ,প্রাকার সবই তিনি সংস্কার করেন। নূতন মন্দির ও সৌধ তিনি অনেক নির্ম্মাণ করেন। তবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কীর্ত্তি তাঁহার নবনির্ম্মিত প্রাসাদ। এত সুন্দর ও বিশাল প্রাসাদ সমগ্র অ্যাসিরিয়ায় বোধ হয়, আর একটিও ছিল না। ইহার চিত্রাবলী সত্যই মনোমুগ্ধকর।

রাজ্যশাসন

সেনাকেরিবের মৃত্যুর পর তাহার চতুর্থ পুত্র এছারহাড্ডন পিতৃহন্তা ভাইদের পরাজিত করিয়া অ্যাসিরিয়ার সিংহাসন অধিকার (Esarhaddon) করেন। এই নূতন রাজাও খুব বড় যোদ্ধা ও শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন তবে তাঁহার বিশেষত্ব ছিল তাঁহার চরিত্রের কোমলতা ও হিংস্রতার অভাব। অ্যাসিরিয়ার অন্যান্য বীর রাজাদের জীবনী-পাঠে জানা যায়, তাহারা যেন তাহাদের কঠোরতা ও নির্ম্মমতার জন্য গৌরব বোধ করিতেন। যেখানে গিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোককে গৃহহারা করিয়া, গ্রাম নগর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া এই সব বীর রাজারা তাহাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। একমাত্র এছারহাড্ডনেই আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

এছারহাড্ডন (৬৮১-৬৬৮)

রাজা হইয়া তিনি ব্যাবিলনের প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ব্যাবিলন সহর পুনরায় স্থাপিত হয়, ইহার সৌন্দর্য্যও শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, মার্ডুকের মূর্ত্তি আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এছারহাড্ডনকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মিডিয়াদেশে তিনি অভিযান করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি কাইমেরিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া

তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত আরব্দেশেও তিনি অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদিকে ফিনিশিয়া দেশের সিডন রাজা বিদ্রোহ করিলে সেই বিদ্রোহ তিনি সহজেই দমন করেন। সিডন সহর তিনি ধ্বংস করেন এবং সেখানে নূতন একটি সহরের পত্তন করেন।

ইহার পর পশ্চিমের সামন্তরাজারা নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া তাঁহাকে নজর দিতে আসেন। তাহার পুত্র অসুরবানিপালকে (Ashur-banipal) অ্যাসিরিয়ার ও আর এক পুত্রকে (সামাস্ সুমুকিন) ব্যাবিলনিয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সুযোগে ফ্যারাও তাহাকে কিন্তু অ্যাসিরীয় সৈন্যদের তাড়াইয়া সমগ্র মিশরের উপর তাঁহার আবার আধিপত্য স্থাপন করেন। কাজেই, এছারহাড্ডন পুনরায় মিশরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরে তাহার মৃত্যু হইল।



রাজা অসুরবানীপাল ও তাঁহার রাণী

ইহাদের মধ্যে সাইপ্রাস দ্বীপের দশজন রাজা ও টায়ার আর্ভাদ, গাজা ও জুডার রাজাদের নাম উল্লেখযোগ্য

এতদিন সিরিয়া প্যালেষ্টাইনে যত গোলমাল বাধিয়াছে তাহার মূলে ছিল মিশরের রাজাদের চক্রান্ত। এইবার

মিশর বিজয়

এছারহাড্ডন মিশরকে শায়েস্তা করিতে চলিলেন। বিনা আয়াসেই তিনি উত্তর মিশর অধিকার করেন। মিশররাজ তাহার্কা (Tharka) রাজধানী মেম্‌ফিসনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এছারহাড্ডন উহা অবরোধ করেন এবং বিশেষ চেষ্টার পর অধিকার করেন। তাহার্কা কিন্তু পলায়ন করিতে সমর্থ হন এবং থিব্‌স নগরে আশ্রয় লন। এছারহাড্ডন মেম্‌ফিসের রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন অ্যাসিরিয়ায় প্রেরণ করেন। স্থানে স্থানে অ্যাসিরিয় সৈন্যদের ঘাঁটি স্থাপন করেন। কিন্তু শাসনভার সামন্ত রাজাদের হাতেই অর্পণ করেন। তারপর তিনি দেশে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে সেখানে নানারূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। কাজেই, তিনি

এছারহাড্ডনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অসুরবানিপালের উপর তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন

অসুরবানিপাল
(৬৬৮-৬২৬)

করিবার ভার পড়ে। তিনি অতি সহজেই তাহাদিগকে মেম্‌ফিস ও থিবিস হইতে বিতাড়িত করেন এবং পুনরায় মিশরশাসনের ভার স্থানীয় সামন্ত রাজাদের হাতে অর্পণ করেন। ইহাদের একজনের নাম ছিল

মিশর বিজয়

নেকো (মিশরের ভবিষ্যৎ উদ্ধারকর্ত্তা স্যামেটিকের পিতা)। অসুরবানিপাল অ্যাসিরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই আবার তাহারা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তনুতমন থিব্‌স ও মেম্‌ফিস অধিকার করিয়া তথাকার অ্যাসিরিয় সৈন্যদিগকে ধ্বংস করেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া অসুরবানীপালকে পুনরায় মিশরে অভিযান করিতে হয়। তিনি তনুতমনকে যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং থিবস নগর লুণ্ঠন করেন। ইহার পর কিছুদিন মিশর চুপচাপ থাকে।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই অসুরবানিপালকে দক্ষিণদিকে নজর দিতে হয়। তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাস-সুমুকিন (ব্যাবিলনরাজ) বিদ্রোহ

ব্যাবিলন অধিকার

করেন। এই বিদ্রোহে এলামরাজ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। শুধু তাহাই নহে, অ্যাসিরিয়ার অন্যান্য অধীন দেশ হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পান। অসুরবানিপাল সসৈন্যে ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হন এবং অল্প আয়াসেই রাজধানী অধিকার করেন। শ্যামাসসুমুকিনের প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করা হইলে তিনি সেই আগুনে পুড়িয়া মরেন।

এইবার বিজয়ী বীর এলাম্ রাজ্য আক্রমণ করেন। একে একে তিনি এলাম দেশের অনেক নগর অধিকার করেন। অবশেষ রাজধানী সুসা তাঁহার হস্তগত হয়। গত কয়েক বৎসর এলামের রাজারা বার বার তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন, বার বার তিনি তাঁহাদের ক্ষমা করিয়াছেন। এইবার তিনি চির-

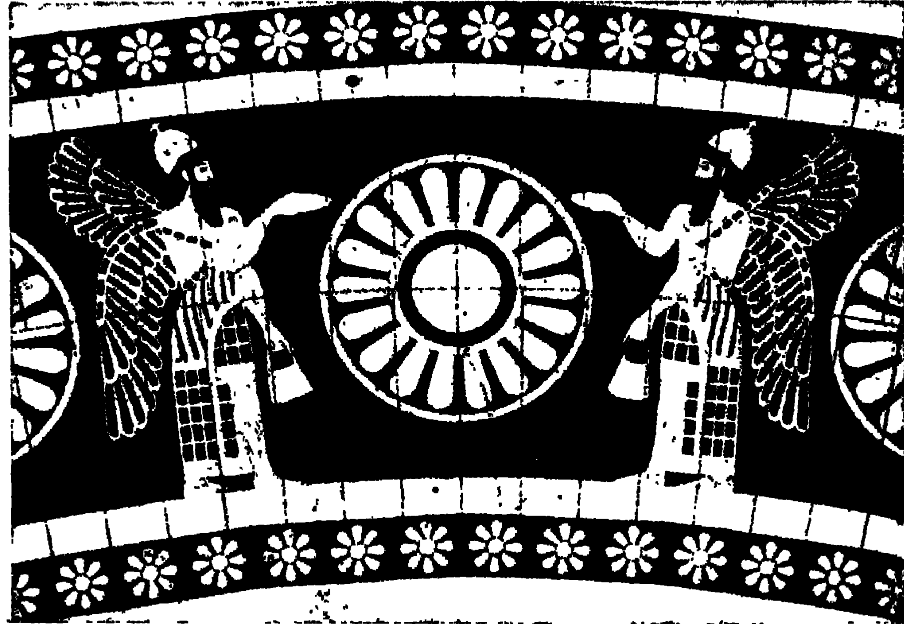
এলাম রাজ্যের ধ্বংস

দিনের মত এলামের শক্তি লোপ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কাজেই সুসা লুণ্ঠন করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এলাম বিজয়ের পর ব্যাবিলনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হন না। আরবদেশীয় কোন কোন রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে শ্যামাস-সুমুকিনের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহাদের একজনকে বন্দী করিয়া নিনেভেতে লইয়া আসেন। ইহাই হইল মোটামুটি তাঁহার বিজয়-কাহিনী।

ব্যাবিলন বিজয়ের কয়েক বৎসর পরে অসুরবানিপাল নিনেভেতে বিশেষ সমারোহসহকারে একটি বিজয় উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতে বিজয়ী অসুররাজের শকট টানিয়াছিল এলামের তিন জন ভূতপূর্ব রাজা ও বন্দী আরবরাজ। এক হিসাবে

বিজয় উৎসব

ইহাই হইল অ্যাসিরীয় রাজশক্তির বিকাশ। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। সুতরাং যদিও ইহার পর অনেক বৎসর



অসুর রাজাদের রাজপ্রাসাদের গায়ে খোদিত কারুকার্য

অসুরবানিপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তথাপি এইখানেই তাঁহার নিকট হইতে আমরা বিদায় লইব। তবে এই কথা জানা বিশেষ দরকার যে, অসুরবানিপালের নাম অমর হইয়া আছে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকাগারের জন্য। অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার যেখানে যে কোন পুরাতন গ্রন্থ তাঁহার লোকেরা পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহার নকল করিয়া নিনেভে লাইব্রেরীতে রাখা হইয়াছে। অসুরবানিপালের নিকট এইজন্য ঐতিহাসিকেরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার সময়েই অ্যাসিরীয় আর্টের চরম পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অ্যাসিরিয়ার পতন

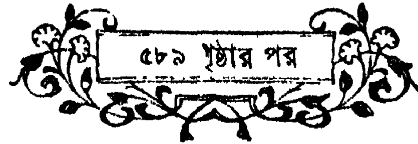
অসুরবানিপালের মৃত্যু হইতে না হইতেই অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই মিশর স্বাধীন হইয়াছিল। এইবার অন্যান্য অংশেও বিদ্রোহ

উপস্থিত হয়। অসুরবানিপালের উত্তরাধিকারিরা নিতান্ত অপদার্থ ছিল। তাহাদের না ছিল যোগ্যতা না ছিল সামর্থ্য। কাজেই, একে একে নানা প্রদেশ স্বাধীন হইতে থাকে। এদিকে উত্তর দিক হইতে দলে দলে শকজাতীয় লোকেরা অ্যাসিরিয়ায় প্রবেশ করিতে থাকে। তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে কাহারও সাধ্যে কুলাইল না। এমন কি, তাহারা কালা সহর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লুঠপাট করিয়াছিল। এদিকে মীডদের দেশে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মীডদের রাজা উভক্ষত্র (Kyaxares) ব্যাবিলনের ক্যাল্‌ডীয় শাসন কর্ত্তা নবু-পাম-উস্‌সর (Nabopolassar) অথবা নবপোলাসারের সঙ্গে যোগ দিয়া নিনেভে আক্রমণ করেন (৬০৬)। দুই বৎসর অবরোধের পর নিনেভে আত্মসমর্পণ করে। অ্যাসিরিয়ার শেষ রাজা সিন-সারিস্কুন রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (৬০৬)। বিজেতারা নিনেভে লুঠপাট করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া সহরটিকে ধ্বংস করে। চিরদিনের মত বীর অ্যাসিরীয়জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইল।

এখন মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে, এত সত্বর এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হইল কেন? কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও যে সাম্রাজ্য লোকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে, তাহার অবসান হঠাৎ এই ভাবে হইল কেন? আসল কথা এই যে, অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে অসুরবানিপালের সময়, কিম্বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই। অসুরবানিপালকে যে সব যুদ্ধ করিতে হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই। ক্রমাগত ২০০।৩০০ বৎসরের অবিশ্রাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ক্ষুদ্র অ্যাসিরিয়া দেশের রাজা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য রক্ষা করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার ছিল। শক্তিশালী রণকুশল বুদ্ধিমান নৃপতির পক্ষে সম্ভব হইলেও বিলাসী অপদার্থ রাজাদের তাহা ক্ষমতার বাহিরে। অ্যাসিরিয়াতেও হইয়াছিল তাহাই। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অ্যাসিরিয়ার যে লোকক্ষয় হইয়াছিল তাহা পুরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, দেখা যায়, বীর অ্যাসিরীয় যোদ্ধার পরিবর্ত্তে সেনাকেরিব এছারহ্যাড্ডন প্রভৃতির সৈন্যবাহিনীতে বিদেশী সেনাই ছিল বেশী। এই সব সৈন্যদের কাছে অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের কোন মূল্যই ছিল না, ইহাতে তাঁহাদের গৌরবও কিছুমাত্র ছিল না। তারপর চতুর্থ টিগেলাথ্ পিলেসারের সময় হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার যে বন্দোবস্তের প্রচলন হইয়াছিল, তাহার পরিণামে তাহা হইতে বিষময় ফল ফলিয়াছিল। ক্রমাগত বিজিত অধিবাসীদের অ্যাসিরীয়া অথবা সামরাজ্যের অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত করিবার ফলে তাহাদের শূন্য স্থান অনেক সময় অ্যাসিরীয়দের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইয়াছে। ২৫০ বৎসরের উপর এই নীতি অনুসরণের ফলে ক্রমে ক্রমে খাঁটি বীর অ্যাসিরীয়দের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অবশেষে তাহারা একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয়। আর এই মিশ্রণের ফলে যে মিশ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছিল, শক্তি, সামর্থ্য ও সাহসে তাহারা মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিল না। তা ছাড়া অ্যাসিরীয় সম্রাটের প্রতি তাহাদের কোন বন্ধনই ছিল না। আর যে সিংহাসন প্রজাদের ভক্তি ও ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার স্থায়িত্ব কতদিন? যে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের বক্ষোশোণিতে, যাহার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত নরনারীর ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে নিয়ত ধ্বনিত হইয়াছে, যার গৃহে গৃহে ভগবানের কাছে সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে—সে সাম্রাজ্য যে একদিন আর্ত্তের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসে তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?



উদ্ভিদের দেহ গঠন



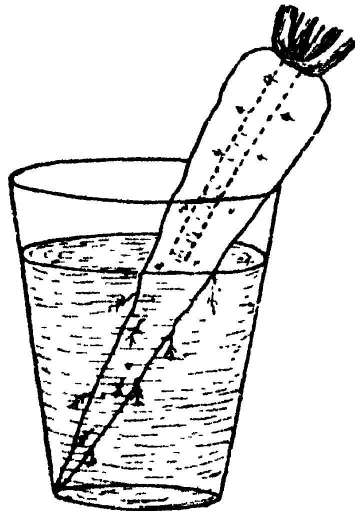
উদ্ভিদের দেহ কি কি উপাদানে গঠিত ও উহার দেহের ভিতরে ঐ উপাদানগুলি সরবরাহ করিয়া কি কি খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, দেহ গঠন করিবার জন্য উদ্ভিদ তাহার শরীরের কোন অংশ দ্বারা কাচা উপাদানগুলি শরীরের মধ্যে সরবরাহ করে ও উহা কোথায় কিরূপে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। উদ্ভিদের মুখই বা কোথায়, তাহার শরীরের ভিতর খাদ্য প্রস্তুত করিবার রান্না ঘরই বা কোথায়; আগুনই বা কোথা হইতে আসে, রান্নাই বা কে করে? আগে উদ্ভিদের মুখের কথা বলিতেছি।

তোমরা অতি সাবধানে শিকড় শুদ্ধ যদি একটি চারা গাছ তুলিয়া আনিয়া উহার শিকড়টি জলে ধুইয়া দেখ দেখিতে পাইবে যে, শিকড়ের অগ্রভাগের একটু, উপরেই শিকড়ের গায়ে চুলের মত সরু সরু অনেকগুলি শিকড় আছে, উহাদিগকে কৈশিক মূল বলে। তোমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, জলে ধোওয়া সত্বেও কৈশিক মূলগুলির অগ্রভাগে মাটির খুব ছোট ছোট কণা লাগিয়া আছে, মাটির কণার সহিত ইহাদের এত অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব! এই কৈশিক মূলগুলি এক একটি ছোট ছোট থলিবিশেষ। ইহা এক প্রকার ঘন অম্লরসে (Carbonic Acid) সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। তোমরা জান যে, মাটিতে সকল সময়েই জল আছে, এমন কি, মাটির এক ক্ষুদ্র কণার চারিধারে সকল সময়েই জলের একটি আবরণ থাকে

এখানে প্রথমেই তোমাদিগকে তরল পদার্থের একটি স্বাভাবিক গুণের কথা বলা প্রয়োজন; যদি দুইটি তরল পদার্থ পাশাপাশি থাকে, এবং তাহাদের গাত্রের দেওয়াল যদি পাতলা ঝিল্লিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে টানিয়া লইতে পারে। তবে অপেক্ষাকৃত তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থের মধ্যে দ্রুতগতিতে যাইয়া মিশ্রিত হয়। আবার ঘন পদার্থ খুব মন্দ গতিতে তরল পদার্থের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ইহাকে চন্মান্তর্ব্বাহ বলে। এই কারণে কৈশিক মূলের ভিতরে যে ঘন রস আছে, ঐ ঘন রস মাটির কণাগুলির সহিত যে জল লাগিয়া আছে, ঐ জলকে ভিতরে টানিয়া লইতে পারে। যেমন খানিকটা শক্ত গুড় একটা বাটিতে রাখিয়া বাটিটিতে জল রাখিলে ঐ জলের সহিত গুড়ের উপাদানগুলি মিশ্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ মাটির কণাগুলির সহিত যে জল লাগিয়া থাকে ঐ জলের সহিত মাটির উপাদানে যে সকল ধাতব পদার্থ থাকে, ঐ সকল ধাতব পদার্থের কতক পরিমাণে মাটির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৈশিক মূলের ভিতরে ঘন অম্লরস আছে। কিন্তু মাটির জল অত ঘন নহে। তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, মাটির কণার সহিত যে জল আছে উহা দ্রুত গতিতে কৈশিক মূলের ঘন রসের সহিত মিলিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৈশিক মূলের ঘন রসও মাটির রসের সহিত মন্দগতিতে মিলিত হইতেছে। কৈশিক মূলের ঘন অম্লরস

মাটির রসের সহিত মিলিত হইয়া মাটির যে সকল উপাদান, তাহাদিগকে আরও তরল করিয়া দিতেছে। এইরূপে মাটি হইতে উদ্ভিদের দেহ গঠনের উপযোগী মৌলিক ধাতব পদার্থের উপাদানগুলি তরল অবস্থায় উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তাহা হইলে এখন আমরা কৈশিক মূলগুলিকে অনায়াসেই উদ্ভিদের মুখ বলিতে পারি।

উদ্ভিদের দেহ বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত। এক স্তর কোষের উপর অপর একটি স্তর সাজানো। কোষগুলি মিলিত হইয়া লম্বা লম্বা নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এক কোষ হইতে অপর কোষে যখন মাটির রস চম্যান্তর্বাহ প্রক্রিয়া গুণে উঠিতে থাকে, তখন শিকড়ের মধ্যে একটি চাপের সৃষ্টি হয় এবং ঐ চাপের প্রভাবে শিকড়ের মধ্যস্থ নালী দিয়া উপরে উঠিয়া কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে পাতার বোঁটায় ও বোটা হইতে পাতায় চলিয়া যায়। এইরূপে মৌলিক উপাদানগুলি পাতায় আসিয়া জমা হয়। এই পাতাই উদ্ভিদের রান্নাঘর এবং পাতাতেই মৌলিক উপাদানগুলি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। কৈশিক মূল যে মাটির রস টানিয়া লইতে পারে ও ঐ রস কাণ্ডের ভিতর দিয়া পাতায় যাইতে পারে তাহা তোমরা নিম্নলিখিত দুইটি পরীক্ষার দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। একটি মূলা সংগ্রহ কর। ছুরি দিয়া মূলাটির ভিতরে শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া ফেল। পরে মধ্যভাগের

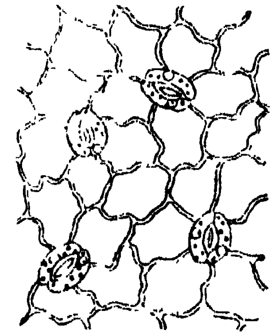


কৈশিক মূল মাটির রস টানে—ইহার পরীক্ষা

ঐ ফাঁপা অংশের অর্দ্ধেকটা ঘন লবণ জল দ্বারা পূর্ণ কর। এখন লবণ জলপূর্ণ মূলার খোলাটিকে একটি জলপূর্ণ গ্লাসের ভিতরে রাখিয়া দাও। গ্লাসের জলের উচ্চতা যেন মূলার খোলের জলের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী না হয়। দুই এক দিন পরে দেখিবে যে, মূলার খোলের উচ্চতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গ্লাসের জলের স্বাদ লইলে দেখিবে যে, উহা লোনা হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিলে যে, কৈশিক মূলের রস মাটির রস গ্রহণ করে এবং ইহাও বুঝিলে যে, কৈশিক মূলের অম্লরস অধিক শক্তিশালী হইলে উহা মাটির জলকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে।

যে কোন গাছের একটি ছোট ডাল কাটিয়া আন। উহার দুই ধার কাটিয়া এক ফুট লম্বা একটি টুকরা লও। ঐ টুকরাটির মাঝামাঝি স্থানের কতকটা অংশের ছাল ছুরি দিয়া তুলিয়া ফেল, যেন শাদা কাঠ বাহির হইয়া পড়ে। এখন ঐ টুকরাটা একটা জলপূর্ণ গ্লাসে বসাইয়া দাও। গ্লাসের জলে লাল কালি মিশাইয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে, গ্লাসের লাল জল ছাল-তোলা অংশের শাদা কাঠের উপর দিয়া উপরে উঠিতেছে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা গেল যে, কাণ্ডের ভিতর দিয়া শিকড় হইতে রস উপরে উঠে এবং তাহাতে কাণ্ডের উপরের ছালের কোন সাহায্যের দরকার হয় না।

পাতাতেই উদ্ভিদের সকল জাতীয় খাদ্য, যথাঃ—শ্বেতসার, তৈল ও অম্লসারজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। পাতার নীচের পিঠে অসংখ্য ছিদ্র আছে; ঐ ছিদ্রগুলির নাম পত্রমুখ। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাতাস হইতে কার্বনিক এসিড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। পাতাকেও তাহা হইলে আমরা উদ্ভিদের মুখ বলিতে পারি। তবে প্রভেদ এই যে, এই মুখ দিয়া খাদ্যের মৌলিক উপাদান বাষ্পীয় আকারে উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। আর অপর মুখটা দিয়া তরল অবস্থায় প্রবেশ করে। পাতাগুলিও কোষের দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ কোষগুলির মধ্যে শিকড় হইতে জল



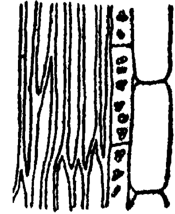
পত্রমুখ

ও ধাতব পদার্থ আসিয়া জমা হইতে থাকে। পাতার কোষগুলির মধ্যে আরও দুইটী পদার্থ থাকে, উহাদের নাম প্রাণপদার্থ ও পত্রহরিৎ। পত্রহরিৎকে আমরা উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতের পাচক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, পত্রহরিৎ প্রাণপদার্থের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ হইতে শক্তি অর্থাৎ আগুন সংগ্রহ করিয়া সেই শক্তির দ্বারা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস এবং জলকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহা হইতে শ্বেতসার প্রস্তুত করে। শ্বেতসার প্রস্তুত হইবার সময় পাতা হইতে কতক অম্লজান বাষ্প বাহির হইয়া যায়। তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিলে যে শ্বেতসার প্রস্তুতের জন্য পত্রহরিৎ, প্রাণপদার্থ এবং সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন হয়। অতএব পাতার যে সকল কোষে প্রাণপদার্থ ও পত্রহরিৎ এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে, কেবল সেই সকল কোষেই শ্বেতসার প্রস্তুত হইতে পারে। পত্রহরিৎ কেবল উদ্ভিদের পাতায় ও অন্য সবুজ অংশে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং পাতাই শ্বেতসার প্রস্তুতের কারখানা।

শ্বেতসার ক্রমশঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শর্করাতে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায়। অন্নসার উদ্ভিদের যে স্থানে প্রাণপদার্থ আছে সেই স্থানেই প্রস্তুত হইতে পারে। তবে পাতাতেই অধিক পরিমাণে অন্নসার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অন্নসার খাদ্য উদ্ভিদ রাত্রিতেও প্রস্তুত করিতে পারে। অন্নসার এবং প্রাণপদার্থ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তৈলজাতীয় খাদ্যে পরিণত হয়। তাহা হইলে উদ্ভিদের পাতাতেই সকল প্রকারের খাদ্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং এই পাতাতেই আমাদের সকল পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "The leaf is the factory of the food of the world."

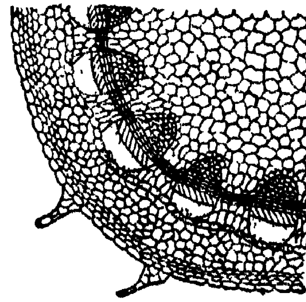
পাতায় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া কাণ্ডের কোষ নালিকার ভিতর দিয়া উহা উদ্ভিদের সকল অংশে পরিচালিত হয়। এখন তোমরা প্রথম দুইটী পরীক্ষার পর যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহার উত্তর দিতেছি। তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোকেই পাতাতে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্য প্রস্তুত হইবার সময় পাতা হইতে অম্লজান বাষ্প বাহির হইয়া যায়। এই সময় পাতা ঐ কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকে বলিয়া উহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য খুব মন্দ গতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রশ্বাসের সহিত carbon dioxide খুব অল্প পরিমাণে বাহির হয়। পাতাকে রাত্রে খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয় না বলিয়া উহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য রাত্রে খুব দ্রুত গতিতে হয়। এই নিমিত্ত রাত্রেই carbon dioxide অধিক পরিমাণে বাহির হয়। সেইজন্য প্রশ্বাসের সহিত যে





কোষের ভিতরকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকা

carbon dioxide বাহির হয়, তাহার পরীক্ষার সময় বোতল দুটীকে অন্ধকারময় স্থানে রাখিতে বলিয়াছিলাম। আমাদের ঠাকুরমাদের গল্পে আছে যে, দিনের বেলায় গাছতলায় থাকা খুব স্বাস্থ্যকর কিন্তু রাত্রে উহা বিষের মত ত্যাগ করা দরকার। কেন, বলত? কারণ দিনের বেলায় খাদ্য প্রস্তুতের সময় পাতা হইতে অম্লজান বাহির হইতেছে। উহা আমাদের নিঃশ্বাসের জন্য খুব উপকারী, আর carbon dioxide বিষাক্ত।



গাছের কোষ

এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাহাদের পাতা সবুজ নয়, অন্য রঙ-বিশিষ্ট। তোমরা বলিতে পার, ঐ সকল পাতায় ত পত্রহরিৎ থাকে না, তাহা হইলে ঐ সকল পাতায় উদ্ভিদের খাদ্য কিরূপে প্রস্তুত হয়? এই সকল পাতায় অন্য রঙের রস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে বলিয়াই পাতার সবুজ রঙকে ঢাকিয়া রাখে। এই সকল পাতাতেও পত্রহরিৎ আছে এবং উহাদের মধ্যেও উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য, এমন অনেক রঙিন পাতার উদ্ভিদ আছে, যাহাদের পাতায় পত্রহরিৎ আদৌ থাকে না। ইহারা ইহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না, ইহারা অন্য গাছ হইতে খাদ্য চুরি করিয়া থাকে।

উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তাও কত বেশী, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। ইহা না থাকিলে কৈশিক মূলগুলি তরল অবস্থায় খাদ্যের উপাদানগুলি গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদের শরীরে পাঠাইতে পারিত না। ইহা ছাড়া পাতার ও কাণ্ডের কোষের ভিতর যে প্রাণপদার্থ আছে উহা প্রচুর জল ব্যতিরেকে সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। ইহা ছাড়া কোষগুলিও শক্ত ও টান থাকিতে পারে না। কোষগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল না থাকিলে গাছ নির্জীব হইয়া পড়ে—ডালপালা মুসড়াইয়া যায়। এই জন্য আমাদের মতই পানীয় হিসাবেও উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন আছে। কৈশিক মূল হইতে নানা প্রকারের উপাদানের সহিত জল পাতার কোষগুলির মধ্যে আসিয়া জমা হয়। কিন্তু কোষগুলির মধ্যে উহা বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। উপাদনগুলিকে কোষগুলির মধ্যে রাখিয়াই উহাকে সরিয়া পড়িতে হয়। কারণ, এক এক ফোঁটা জলের সহিত খুব অল্প পরিমাণ খাদ্যের উপাদান আসে। এইরূপে অনবরত জল পাতার কোষের মধ্যে না আসিলে খাদ্যের উপাদানও কম আসিবে। সেই কারণে জলের গতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জলকে অনবরত বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। কোষগুলির জলধারণ শক্তির একটি সীমা আছে। পাতার মধ্যে অনেক ছিদ্র আছে; ঐ সকল ছিদ্র বাতাসে পূর্ণ থাকে এবং বাতাসের সাহায্যেই কোষের ভিতরে জল শুকাইয়া যায় ও বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে মাটি হইতে যে জল শিকড় দিয়া স্কন্ধে ও কাণ্ড দিয়া পাতায় আসিতেছে, উহা অনবরত পাতা হইতে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইতেছে। যখন মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, তখন পাতা হইতে যে পরিমাণ গতিতে জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়, ঐ পরিমাণ গতিতে জল মাটি হইতে কৈশিক মূলের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ পাতার কোষের মধ্যে আসিয়া পড়ে। উদ্ভিদেব খাদ্য প্রস্তুত ও জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে জল উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে ও বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যখন গ্রীষ্মের মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, কিম্বা কোনও কারণে শিকড়ের সহিত মাটির সম্বন্ধ কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন পাতা হইতে যে পরিমাণ জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়, সেই পরিমাণ জল মাটী হইতে পাতায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। ফলে গাছ শুকাইয়া যায় এবং জলাভাবে মরিয়া যায়। জল যে কেবল বাষ্পাকারেই বৃক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা নহে, ঘর্মরূপেও বাহির হইয়া যায়।

অনেক সময় রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, যে যে উপাদানে উদ্ভিদের দেহ গঠিত অর্থাৎ যে যে উপাদান উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন, তাহা পরীক্ষিত মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে কিন্তু তথাপি উদ্ভিদ উহা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি জলের সহিত উহাদের গ্রহণের উপযোগী গলিত অবস্থায় নাই। বিশেষজ্ঞগণের বহু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মাটি হইতে যে সকল উপাদানের দরকার তাহা মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু উহাদের কয়েকটি কোন কারণ বশতঃ উদ্ভিদ্ সহজে ও শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্য কোন কোন উপাদান উদ্ভিদ্ স্বভাবতঃ মাটী হইতে কম লইতে পারে, তাহার বহু পরীক্ষা হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ্ ও বিভিন্ন প্রকার মাটির প্রকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে দেখা গিয়াছে, মাটি সাধারণতঃ যবক্ষারজান, ফস্ফরাস ও পটাশ (ক্ষার) উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে পরিমিত মাত্রায় সরবরাহ করিতে পারে না। এইজন্যই আমাদের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য যে সকল গাছ-পালা আমরা রোপণ করি উহাদের খাদ্যের জন্য মাটিতে সার প্রয়োগের দ্বারা ঐ তিনটি উপাদান বাড়াইয়া দিয়া উহাদের প্রয়োজন মিটাইতে হয়। প্রধানতঃ উপরি উক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে যাবতীয় রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই অত্যাবশ্যক তিনটি উপাদান মোটামুটি কি কি কাজে লাগে, তাহা তোমরা মনে করিয়া রাখ। কারণ, তাহা হইলে তোমাদের বাগানের গাছপালার কখন কি উপাদানের দরকার, তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে এবং তোমাদিগকে জমিতে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা যখন বলিব, তখন তোমাদের তাহা বুঝিবার কষ্ট হইবে না।

যবক্ষারজান (Nitrogen)—উদ্ভিদের শরীর গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধিলাভ করে এবং কাণ্ড ও পাতাগুলি সতেজ হয়। এই উপাদানের অভাব হইলে উদ্ভিদ্ ক্ষুদ্রকায়, বিবর্ণ (হলদে) ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

প্রস্ফুরক (Phosphorous acid)—উদ্ভিদ্‌কে দৃঢ় ও বলশালী হইতে হইলে এই উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন।

পত্রক (Potassium)—উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। ফল ও মূলের জন্য ইহা খুবই সারবান।

উপরি উক্ত তিনটি উপাদান ছাড়া গাছের খাদ্যের জন্য কখনও কখনও জমিতে চূণ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাও উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। ইহার প্রভাবে মাটিতে বর্ত্তমান জৈবিক পদার্থগুলি সহজে পচিয়া যায়। অম্লযুক্ত মাটিতে ইহার প্রয়োগ একান্ত দরকার। মাটিতে যে সকল কীটাণু বর্ত্তমান থাকিয়া উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, সেই সকল কীটাণু অম্লযুক্ত জমিতে উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারে না।

বাসস্থান, অভ্যাস, রুচি খাদ্য,প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ভিদেরা অনেকটা আমাদের মত। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের বিভিন্ন রকমের বাসস্থান, আবহাওয়া, খাদ্য প্রভৃতির দরকার হয় অর্থাৎ একই স্থানে একই জমিতে সকল প্রকার উদ্ভিদ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে শীতপ্রধান দেশের লোকদিগকে যদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা সাধারণতঃ কৃষ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আবার ঠিক আমাদের মত উদ্ভিদের মধ্যে বড় লোক ও গরীব লোক আছে। আমাদের কোন বড়লোকের ছেলেকে যদি বাধ্য হইয়া তাহার প্রাসাদের ও প্রচুর আহার্য্যের পরিবর্ত্তে দরিদ্রের ঘরে বাস করিয়া দরিদ্রের মত ডাল ভাত খাইতে হয়, স্বভাবতঃই তাহার নিস্তেজ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেইরূপ কোনও কোনও উদ্ভিদের জন্য তাহার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ও মাটিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের উপাদান থাকা প্রয়োজন। উহার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে যদি জঙ্গল স্থানে ও "দরিদ্র" মাটিতে বাস করিতে হয়, উহারা সবল ও সুস্থ থাকে না। ইহা তোমরা জান যে, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের জন্ম হয় ও উহারা সেই ঋতুতেই কেবল পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে বৎসরের সকল সময়েই ধান বা পাট উৎপন্ন করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাণীদিগের উপকারের জন্য সকল প্রকার জমি, আবহাওয়া ইত্যাদির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন তোমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে বলি—

১। উদ্ভিদের প্রাণ আছে; আমাদের ন্যায়ই উহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

২ উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য বাতাস, জল ও আলো (তাপের) প্রয়োজন।

৩। উদ্ভিদ মাটি হইতে যে সকল খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে, তাহার জন্য মাটি খুব নরম ও আলগা থাকা ও মাটিতে রসের (জলের) প্রাচুর্য্য থাকা দরকার

৪। পাতাতেই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সেইজন্য আওতায় বা ছায়া যুক্ত জায়গায় উহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যাঘাত হয়।

৫। শিকড় দিয়াই উদ্ভিদ মাটী হইতে তরল অবস্থায় খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। সেইজন্য শিকড়গুলি যাহাতে অক্ষত অবস্থায় থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬। গ্রীষ্মের দিনে বা মাটী উত্তপ্ত হইলে মাটীতে জল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

৭। উদ্ভিদের আকৃতি ও অবস্থা দেখিয়া মাটীতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয়।

৮। মাটীতে লবণের অংশ বেশী থাকিলে উদ্ভিদ ও মাটীর রস অধিক লবণাক্ত হইয়া যায়; উদ্ভিদ প্রয়োজন অনুসারে তাহার অপেক্ষাকৃত তরল রসের দ্বারা মাটীর রস দ্রুত গতিতে টানিয়া লইতে পারে না

৯। রাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অধিক হয়।



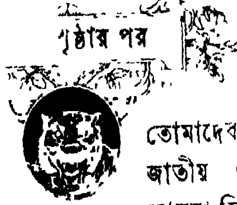
সেকালের মাছ

পৃষ্ঠার পর

সেকালের কতকগুলি জীবজন্তুর কথা পূর্ব্বে তোমাদের কাছে বলা হইয়াছে। তাহারা এখন আর বেশীর ভাগই পৃথিবীতে বাঁচিয়া নাই। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও পূর্ব্বের আকার-প্রকার সম্পূর্ণরূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের সহিত তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কোনও মিল নাই।

পৃথিবী নানাযুগে নানারূপ স্তরে বিভক্ত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সেকথা তোমরা জান। এক এক যুগে এক এক রকমের স্তরবিন্যাসে এক এক জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা পৃথিবীর এই সব যুগবিভাগের নানারূপ নাম দিয়াছেন। একটি যুগের নাম সিলুরিয়াস বা সিলুরিয়। প্রাচীন ব্রিটেনে সিলুরাস (Siluras) নামে এক জাতি ছিল। তাহারা যে অঞ্চলে বাস করিত তাহার নাম ছিল সিলুরিয়। ঐ অঞ্চলের মাটির নীচে যে মৃত্তিকা স্তর পাওয়া গিয়াছে তাহার ঘনত্ব প্রায় ২০,০০০ ফিট। এই স্তরের মাটির মত মাটি যে যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরই নাম দেওয়া হইয়াছে সিলুরিয় যুগ (The Silurian age)। ভূতত্ত্ববিদেরা এযুগের মাটির উপর ও নীচের দুইটি নাম দিয়াছেন। একটির নাম দিয়াছেন উর্দ্ধ বা উপরের স্তর (Upper Silurian) আর একটি নাম দিয়াছেন নিম্ন স্তর (Lower Silurian) বা ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)। এই সিলুরিয়ান স্তর গড়িতে লাগিয়াছিল প্রায় ৩৭০,০০০০০০ বৎসর আর এই সিলুরিয়ান যুগের অস্তিত্ব ছিল ৪০,০০০,০০০ বৎসর!


ইউরিপটেরিড

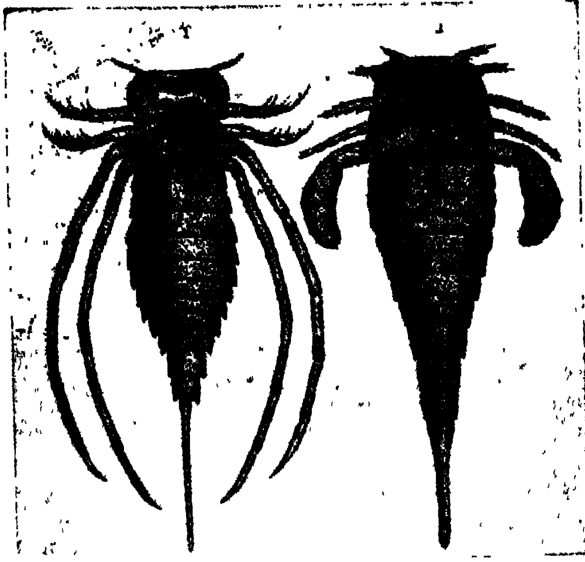
তোমাদের কাছে ট্রিলোবিট (Trilobites)-জাতীয় প্রাণীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমরা সিলুরিয়ান যুগের স্তরে অনেক প্রকার জলজ প্রাণীর অস্থি ও কঙ্কালের চিহ্ন পাই। এযুগের স্তরটা চূণা পাথরে (Lime stone) গঠিত। এসময়কার প্রাণীদের আকার ছিল নানা অদ্ভুত রকমের। এক এক রকম প্রাণী ছিল তাহাদিগকে বলিত ইউরিপ্টেরিড (Eurypterid) বা টেরিগোটাস (Pterygotus), ষ্টাইলোনারাস্ (Stylonurous) এইরূপ। এক একটির আকার ছিল চার পাঁচ ফিট। আর আটটি করিয়া থাকিত পা। টেরিগোটাসের কঙ্কাল-চিহ্ন হইতে দেখা যায় যে, উহারা সাত ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইত।

এসময়েই আমরা মাছের দেখা পাই। প্রাণিজগতে একটা নূতন যুগের ও নূতন জীবনের আবির্ভাব হইল। প্রাণিদেহে 'মেরুদণ্ডের' সৃষ্টি এসময় হইতেই হয়।

তোমরা সিলুরিয় যুগের কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে এইজন্য যে, এই সময় হইতেই 'মেরুদণ্ডী' প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। এজন্য সৃষ্টির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ক্রমে ক্রমে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, আর যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড নাই তাহারা আস্তে আস্তে লোপ পাইতে লাগিল।

মাছের জন্ম

নানারকমের অদ্ভুত আকারের মাছ আমরা এ-যুগের ঊর্দ্ধ স্তরে দেখিতে পাই। একটির নাম সিপা-



(১) ষ্টিলোনারাস (২) ইউরিপটেরাস

লাস্পিস্ (Cipalaspis)। ইহাদের মুখটা ছুরি মত, চোখ দুইটি ছিল মাথার মাঝখানে।



সিপালাসপিস

আর এক রকমের মাছ ছিল তার মাথটা বাকানো এবং শরীরটা গোলগাল; ইহাকে বলিত টেরাস্পিস্ (Pteraspis)। এই

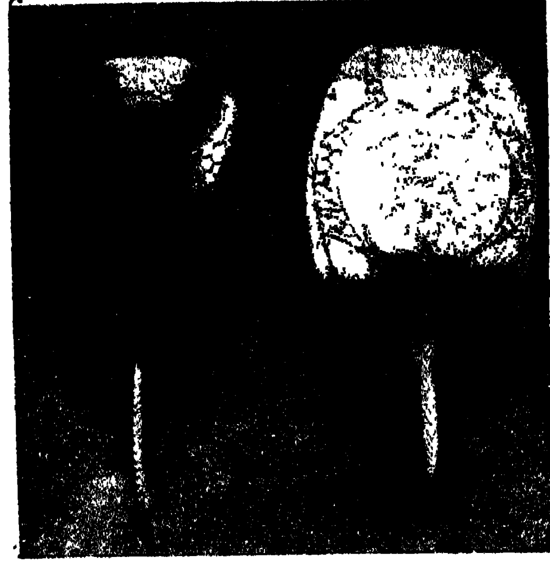
টেরাস্পিস

টেরাস্পিসের অনুরূপ ড্রিপানাস্পিস্

ড্রিপানাস্পিস্

(Drepanaspis)। উত্তর জার্মেনির একটি পাহাড়ের কোলে ড্রিপানাস্পিসের কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

সিলুরিয়ান যুগের পরের যুগের নাম ডিভোনিয়ান (Devonian)। এ যুগের মাছেরাই ছিল প্রধান প্রাণী। ভূতত্ত্ববিদেরা ইংল্যাণ্ডের বর্ত্তমান ডিভনসায়ারে মাটির নীচে যে অতি পুরাণ লাল পাথরে গঠিত স্তর-বিন্যাসের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহারই নাম দিয়াছেন



ড্রিপানাস্পিস্

ডিভোনিয়ান যুগ। এ যুগের পরিমাণ হইবে ৪৫,০০০,০০০ বৎসর। আর ইহা গড়িয়া উঠিতে লাগিয়াছিল ৩৩০,০০০,০০০ বৎসর।

ডিভোনিয়ান যুগে মাছের বাশ অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যেও অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

টেরিকথীস্

কানকো (Fin), দাত এ সকলের সৃষ্টি হওয়া আকারের অনেকটা বদল হইল। হাঙ্গরের ন্যায় ভীষণ প্রাণীর আবির্ভাব হইল, তাহাদের তীক্ষ্ণ বড় বড় দাত, প্রকাণ্ড আকার, দুই দিকে বড় বড় কানকো, শ্বাসযন্ত্র এ সবের উদ্ভব হইল। ঐ স্তরে টেরিকথীস্ (Pterichthys) নামে এক অদ্ভুত রকমের মাছের কঙ্কাল চিহ্ন দেখা যায়। ইহাদের শরীরটা কচ্ছপের আবরণের মত একটা কঠিন আবরণী দিয়া ঢাকা ছিল।

সেকালের একটি রাক্ষসে মাছের নাম ককষ্টিয়াস (Coccosteus)। এই মাছের আকার ছিল ২০।২৫ ফিট লম্বা। এ মাছ আর নাই,

ককষ্টিয়াস্

তবে ইহার বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন আকারের আছে। উহাদিগকে উভচর জীব (Amphibians) বলা যাইতে পারে। ইহাদের আকার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর অনুরূপ—যেমন



ষ্টিগোকেফেলস্



লেবিন্‌ড্রোডোণ্টস্

কার্বোনিফারাস্ (Carboniferous) যুগের স্তর পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও অল্প পরিমাণে, কোথাও

কার্বোনিফারাস

অনেকটা স্থান জুড়িয়া। এই ভাবে সর্ব্বত্রই কার্বোনিফারাস্ যুগের স্তর-বিন্যাসের চিহ্ন দেখিতে পাই। এ যুগের স্তর-বিন্যাসের মধ্যে আমরা দুইটি প্রধান বিশেষত্ব দেখিয়া থাকি। (১) প্রবালের মত প্রাণীর দ্বারা গঠিত সামুদ্রিক স্তর, (২) বেলে পাথর এবং শ্লেট পাথরে গঠিত স্তর-বিন্যাস। এই শ্রেণীর স্তর বেশীর ভাগ হ্রদের জলের মধ্যে কিংবা পুকুর বা দীঘির অগভীর জলের নীচে পাওয়া যায়। এ যুগের স্তরের মধ্যেই পাথুরে কয়লা ও লোহার স্তর পাওয়া গিয়াছে। মানুষের সভ্যতার ও উন্নতির ইতিহাসে কার্বোনিফারাস যুগ নানাদিক দিয়াই কল্যাণকর বলিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা এযুগকে অঙ্গারজনক স্তর বলি।

এ সময়ে প্রাণিজগতে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এ যুগের স্তর-বিন্যাসের মধ্যে যে সকল প্রাণীর কঙ্কাল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে

লেব্রিনদ্রোডোণ্টস্

সে সকলের মধ্যে লেব্রিনদ্রো-ডোণ্টস-এর (Labryinthrodonts) নাম উল্লেখ-যোগ্য। এ সময়ে উভয়চর জীবের প্রাধান্য হইয়াছিল। ডিভোনিয়ান যুগে যেমন মাছ, জুরাসিক্ (Jurassic) যুগে যেমন সরীসৃপের, তেমনি এই সময়ে উভচর জীবেরাই পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করে।

লেব্রিনদ্রোডোণ্টসদের দাঁতের গঠন ছিল বিচিত্র রকমের। ইহারাই সৃষ্টির প্রথম উভচর জীব। জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই ইহারা বাস করিত। ইহাদের শরীর ছিল লম্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল দুর্ব্বল। ইহাদের আকার সচরাচর আট ফিট হইত। দেখিতে অনেকটা কুমীরের মত ছিল। লেব্রিনদ্রোডোণ্টসরা নদীতে বাস করিত এবং বোধ হয় মাছ খাইয়া বাঁচিত।

এই অঙ্গারজনক স্তরে, উদ্ভিদজগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন পৃথিবীর অনেকটা স্থান জুড়িয়া নিবিড় বন ছিল। সেই বনে আকাশ ছোঁয়া তরুশ্রেণী শাখা-প্রশাখায় বেড়িয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া থাকিত। এই সব বিস্তৃত বনভূমিই লক্ষ কোটি বৎসর পরে ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া পাথুরে কয়লার সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে পাথুরে কয়লার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তাহা ত



ককষ্টিয়াস

তোমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছ। কার্বোনি-ফারাস বা অঙ্গারজনক যুগের অস্তিত্ব ছিল ৮০,০০০,০০০ বৎসর, আর ইহার আরম্ভ হয় ২৮৫,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে।

এই অঙ্গারজনক স্তরের পরবর্ত্তী কালের নাম পারমিয়ান (Permian) যুগ। এ সময়ের স্তরবিন্যাস মধ্যে লাল বেলে পাথর এবং চূণা পাথরই বেশীর ভাগ দেখা যায়। অঙ্গারজনক স্তরে যে সকল প্রাণী জীবিত ছিল এ সময়েও তাহারা বিদ্যমান ছিল। উভয়চর জীবের সংখ্যা এ সময়ে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এ সময়ের শেষের দিকে ট্রিলোবিটদের বংশ লোপ পায়। আর তাহাদের সামান্য কঙ্কাল-চিহ্নও দেখা যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ সময়ে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তন শুধু প্রাকৃতিক জগতে নয়, জীব-জগতেও বটে। বন্যা, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুনিঃস্রাবে অনেক বড় বড় দেশ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক ভূখণ্ডের আকারের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রাবে অনেক স্থান একেবারে ধ্বংস হইয়াছিল। এই ভাবে বহু প্রাণী চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক যায় আর আসে। এই ধ্বংসের পর আবার নূতন জগতের সৃষ্টি হইল, তাহাতে আবার নূতন নূতন জীবের আবির্ভাব দেখা গেল।



আরব

৫২৮ পৃষ্ঠার পর

সীমা ও সাধারণ বিবরণ

এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আরব উপদ্বীপ। আরব দেশের পরিমাণ ফল ১,০০০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায়
১৪ লক্ষ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৫০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ৭০০ মাইল। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির সঙ্গে আরব দেশের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সমুদ্রতট রেখা হইতে ইহার উচ্চতা



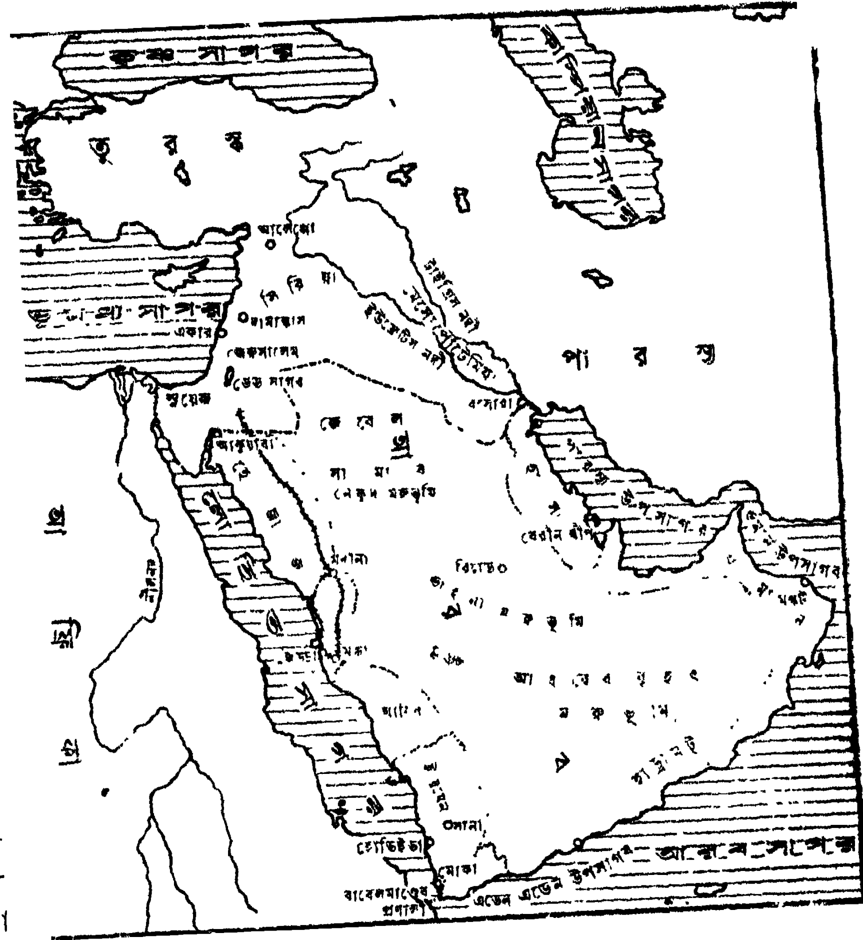
আরবের মরুভূমি

প্রায় ৩,০০০ হাজার ফিট্। এদেশের মধ্যস্থিত ভূ-ভাগের চারিদিক বেড়িয়া অনেক মরু-ভূমি। ঐ সকল মরুভূমির বুকে অনেক মরূদ্যানও আছে।

ভাবে অনেক পাহাড়ও আরবের সমুদ্রতট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এক দিকে সাগর, অপর দিকে পাহাড়, এই দুইটি প্রাকৃতিক সীমার ভিতর অনেকটা স্থান জুড়িয়া বালুকা-পূর্ণ মালভূমি অবস্থিত। আরবকে মরুভূমির দেশ বলিলেই ইহার প্রকৃত বর্ণনা হইল, এইরূপ বলা যাইতে পারে।

একদিন আরবের মরুভূমির বুকে অমৃতের নির্ঝর বহাইয়া দিয়া এক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার নাম হজরত মুহম্মদ। এই মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত ইস্‌লাম





আরবের মানচিত্র

ধর্ম্ম পৃথিবীর নানাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। অতীত কালে আরব দেশে অনেক বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের রচিত রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ আজ পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা আদর করিতেছেন। মুসলমান ধর্ম্ম এদেশের লোকদিগকে এক ধর্ম্ম ও এক-জাতি করিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রের দিক দিয়া এ-দেশের শাসননীতি এক নহে। পৃথিবী জুড়িয়া যখন মহাসমর বাধিয়াছিল, তখন তুর্কীরা আরবের পশ্চিম দিক এবং পূর্ব্ব দিক আপনাদের অধীনে আনিয়াছিল। আবার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের প্রদেশটা ইংরাজ-রাজের কর্তৃত্বাধীন থাকিয়াও স্বাধীন ছিল। এডেনের নাম তোমরা জান। এডেন বন্দর হইয়া জাহাজ বিলাত যায়। এই এডেন বন্দরটি আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এডেন বন্দর ইংরাজের অধীন। আরবের মধ্যস্থিত দেশগুলি সেক্ উপাধিধারী আরবদের হাতে। ইঁহারা সেক্, আমীর ও ইমাম এইসব উপাধিতে পরিচিত।

হেজাজ রাজ্য

লোহিত সাগরের পূর্ব্বপারে ছোট হেজাজ (Hedjaz) রাজ্য। হেজাজ প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় দশলক্ষ হইবে। হেজাজ ষোড়শ শতাব্দীতে তুরস্কের হাতে আসে, এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাসমরের প্রথম দুই বৎসর তুর্কীরা আরবদের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে থাকে এমন কি, মুসলমানদের পুণ্য-তীর্থ মক্কানগরীর উপরও যখন গোলাবর্ষণ করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করে নাই, তখন হেজাজের লোকেরা তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এক নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। হজরত মুহম্মদের বংশধর মক্কার প্রধানতম ব্যক্তি এল্ হোসেন ইবন্ আলি (El Hussein Ibn Ali) এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। এই নবগঠিত রাজ্যের স্বাধীনতা মিত্রশক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন। তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইংরাজ-রাজ হেজাজের অধিবাসিগণকে অর্থ দিয়া, অস্ত্র দিয়া এবং নানারূপে সাহায্য করিয়া এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে সহায় হইয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন (League of Nations) এই নূতন রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মুসলমানদের দুইটি প্রধান তীর্থ মক্কা ও মদিনা, হেজাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

আরব গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। চারিদিকে বন্ধুর পর্ব্বত। কি উচ্চভূমি, কি মালভূমি, কি নিম্নভূমি সমুদয়ই অনুর্ব্বর। মাঝে মাঝে খেজুর গাছের সারি দেখিতে

পাওয়া যায়। এই খেজুর গাছ এবং স্থানে স্থানে নারিকেল গাছই এদেশের উদ্ভিদের সবুজশ্রীর পরিচায়ক। এদেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বৎসরে একবারের বেশী বৃষ্টি হয় না। বনভূমি অতি বিরল। ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়া গেলেও কোথাও তেমন বৃক্ষাদির দর্শন মিলিবে না। মাঝে মাঝে দুই একটা খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে ধূ-ধূ

আরবের জলবায়ু ও শস্যসম্পদ

মাঝে নীচু জমিতে একপ্রকার সাময়িক ঘাসের মত উদ্ভিদের জন্ম হয়। গরু, বাছুর, উট প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুরা তাহা খাইয়া বাঁচে।



আরবের সেক্



খেজুর গাছে খেজুর ফলিয়াছে



বন্য

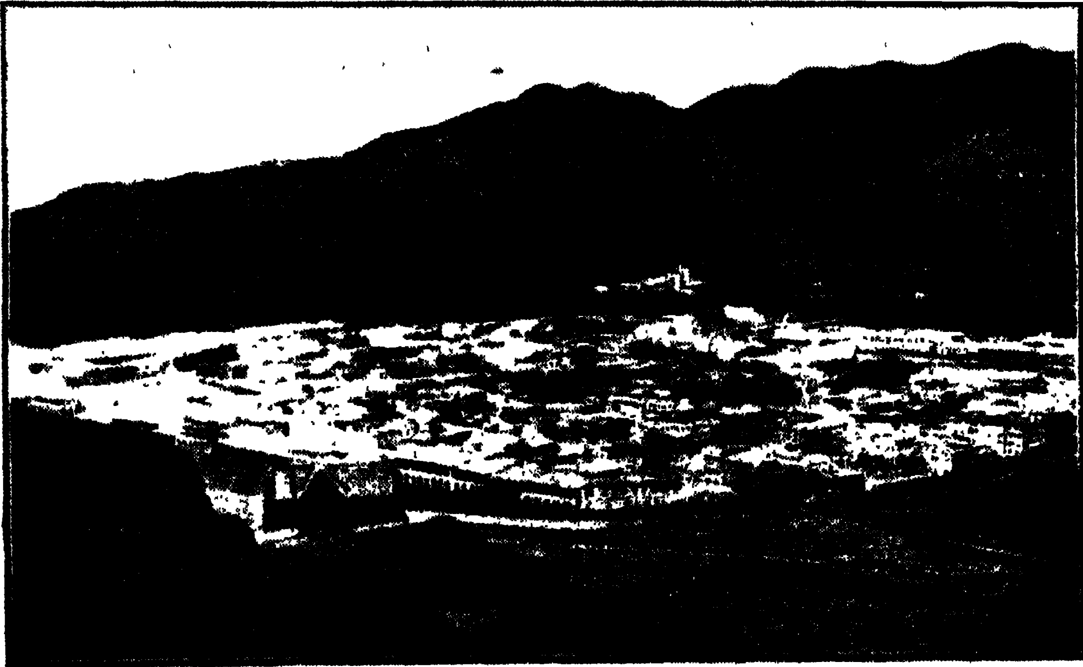
বালুকারাশি। স্থানে স্থানে দুই একটা মরুদ্যানও দেখা যায় গোচারণ ভূমি বলিয়া এখানে কিছু নাই, মাঝে খেজুর এখানকার প্রধান খাদ্য। তা ছাড়া যব, গম, ভুট্টা, তরমুজ এসকলও জন্মে।

ফল অনেক রকমের হয়। কোথাও কোথাও আবার ধান, তামাক, কফি প্রভৃতিরও চাষবাস হইয়া থাকে।

গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, উট, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি প্রধান। আরবদেশীয়



আরবের নারিকেল কুঞ্জ



এডেন বন্দর

আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশই কৃষিকার্য্যের উপযোগী —তা ছাড়া, কেবলই বিশাল মরুভূমির দেশ।

অশ্বের খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। এইরূপ দ্রুত-গামী অশ্ব পৃথিবীতে নাই। বন্য পশুদের মধ্যে

সিংহ, ব্যাঘ্র, হায়েনা বা তরক্ষু, শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু প্রধান। মরূদ্যানের কাছে অনেক অষ্ট্রীচ পাখী দেখা যায়। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে গন্ধক, লবণ, পেট্রোলিয়ম এ সকল প্রচুর পরিমাণে মিলে।



আরবের মাওরা পুরুষ

আরবদেশের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। হজরত মুহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবের



আরবের হামুমী ও কাথিরী পুরুষ

লোকেরা পৌত্তলিক ছিল, তাহারা নানা দেব দেবীর পূজা করিত। ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম Jerusalem ধ্বংস হইবার পর একদল ইহুদি আরবদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। তাহারা আরবদেশের লোকের কাছে সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করিয়া



আরবের ইয়াফি পুরুষ

ছিল। এইভাবে খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব আরবে প্রচারিত হইয়াছিল। হজরত মুহম্মদের অসাধারণ প্রতিভাবলে একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্র আরবের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে এক ধর্ম্ম, এক নীতি, এক শিক্ষা ও আদর্শে উন্নত করিয়া এক অসাধারণ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিল। তাহার পর হজরত

ইতিহাস

মুহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফারা একে একে সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা জয় করেন এবং স্পেনদেশ অধিকার করিয়া এক মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে খলিফাদের পতন ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন সাম্রাজ্য আরবদের হস্তচ্যুত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে হেজাজ এবং জেমেন প্রদেশ (আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত হেজাজ ও এডেনের মধ্যবর্ত্তী দেশ) তুর্কীদের হাতে আসে। আরবের অন্যান্য প্রদেশের উপরও সুলতানের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তবে সেটা নামমাত্র বলা যাইতে পারে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হেজাজের সুলতান এল্‌হোনে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে নেজি-দের সুলতান আজিজ ইবন্ সাউদ্ হেজিজের সুলতান হইলেন। তাঁহার রাজধানী হইল রিয়াধ (Riyodh)। ইবন্ সাউদের অধিকারভুক্ত সব দেশ কয়টিকেই ইউরোপীয় শক্তিসমূহ স্বাধীন দেশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

তোমরা আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়িয়া থাক। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা, আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যুর গল্প প্রায় সকলেই জান। আরব্য



ওমানী পুরুষ

উপন্যাসের গল্প আবার এক হাজার এক রাত্রির গল্প (The thousand and one nights) এ নামেও পরিচিত। আরব্য উপন্যাস আরব সাহিত্যের গৌরব। আজকাল পণ্ডিতেরা আরব্য উপন্যাসের এই গল্পগুলির উৎপত্তির মূল ইতিহাস কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া

আরব্য উপন্যাস

জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহার অনেক গল্প সংস্কৃত হইতে পারসিক সাহিত্যে অনূদিত হইয়াছিল, আরবদেশের লোকেরা আবার উহার উপর রং ফলাইয়া আপনাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইউরোপে আরব্য উপন্যাসের প্রথম প্রচার হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। আরব্য উপন্যাসের ফরাসী অনুবাদ করেন আন্টোইন্ গেলাণ্ড (Antoin Galland)। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লেন সাহেব (Dr. E. W. Lane) ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য ডাক্তার লেন্ কাইরো সহরের আরব অধিবাসীদের সঙ্গে অনেকদিন কাটাইয়া-ছিলেন।

আরব্য উপন্যাসের সৃষ্টি-ইতিহাস এইরূপঃ—



কোয়ারা ও এলবিনো পুরুষ

সেকালে শাহরিয়ার নামে এক সুলতান ছিলেন, তিনি প্রতিদিন রাত্রিতে এক একটি বিবাহ করিতেন এবং পরের দিন প্রাতঃকালে তাহার প্রাণ-দণ্ড করিতেন। এই ভাবে অনেক মহিলার প্রাণ দিতে হইল। অবশেষে সুলতানের প্রধান উজীরের কন্যা শাহারজাদীর সহিত সুলতানের বিবাহ হইল। শাহারজাদী বিবাহের রাত্রিতে সুলতানকে একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সে রাত্রিতে আর তাহা শেষ হইল না। শাহারজাদী গল্পটি এমন স্থানে আসিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সুলতান উহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য তাঁহাকে

অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গল্প আর শেষ হইল না। এই ভাবে গল্প শেষ না হওয়ায় শাহারজাদীর প্রাণদণ্ড দিনের পর দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল। গল্প



মরুভূমির বেদুইন

শুনিতে শুনিতে ক্রমে সুলতান শাহারজাদীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার আর প্রাণদণ্ড হইল না।



চুলকাটা মাথা] চুল কাটাইবার প্রথা [চুলশুদ্ধ মাথা

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই আরব্য উপন্যাসের অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার অনেক সংস্করণ আছে।

ভারত মহাসাগরের সে অংশটুকু, আরবদেশ ভারতবর্ষ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহারই নাম আরব সাগর।

আরব সাগর

লোহিত সাগর (Red sea) এবং পারস্য উপসাগর (Persian gulf) আরব সাগরেরই দুইটি শাখা। সুয়েজ খাল খননের পর হইতে আরবদেশের বাণিজ্য আবার অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

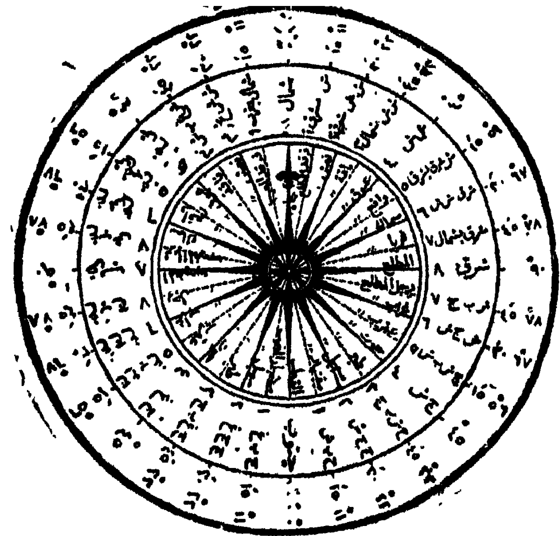
আরবদেশের লোকেরা সাধারণ ভাবে আরব বলিয়া পরিচিত, দেশের নাম ও জাতির নাম এক। কিন্তু ইহারা অনেক জাতি ও শ্রেণীতে বিভক্ত।

আরব জাতি

আরবেরা দেখিতে একহারা, মজবুত গড়ন, গায়ের রং বাদামি, এবং মুখ, চোখ, নাক সবই বেশ মানানসই। ইহারা কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, শিষ্টাচারী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। অতিথি-অভ্যাগতদিগকে সেবা ও যত্ন করা আরব-জাতির স্বাভাবিক রীতি। তোমরা অনেকেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি পড়িয়াছ—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

এই বেদুইনরা আরবের লোক। দুর্দ্দান্ত, সাহসী, দস্যু এবং যাযাবর জাতি বলিয়া ইহারা পরিচিত। ইহারা সারা বৎসর গৃহপালিত পশু-পক্ষী ও স্ত্রী-পুত্র লইয়া আজ এখানে, কাল সেখানে, এই ভাবে তাঁবুতে তাঁবুতেই বাস



আরবদেশীয় কম্পাস

করে। আরবেরা পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত এখন আর তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বলিয়া

কিছু নাই। তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

আরবেরা অতি প্রাচীনকালে গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা এবং বিবিধ দেবদেবীর আরাধনা করিত। মুসলমান ধর্ম্ম আরবদিগকে নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে।

উষ্ট্রচালিত জলোত্তোলন যন্ত্র

আরব দেশে সুন্নি ও শিয়াএই দুইটি প্রধান মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীত ওহাবি নামেও একটি সম্প্রদায় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং কিছু-দিনের জন্য দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তির উপরও ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

আরবী ভাষা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষা শব্দ-সম্পদে উচ্চারণ সৌষ্ঠবে, কোমলতায় এবং কবিত্বপূর্ণ ভাবে ঐশ্বর্য্যশালী। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এক-মাত্র লিখিত ভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক সময়ে ইহা দক্ষিণ স্পেন, সিসিলি দ্বীপ, পূর্ব্ব এবং উত্তর আফ্রিকায় লিখিত ও কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত; এখনও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। যেখানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেখানে ইহা শিক্ষিত সমাজের ভাষারূপে আদর পাইয়াছে।

আরব সাহিত্য

হজরত মুহম্মদের শুভ আবির্ভাবে আরব সাহিত্য অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। মুহম্মদ যেভাবে জীবন যাপন করিতেন, যে সমুদয় উপদেশ দিতেন, সে সমুদয় পুণ্যবাণী তাঁহার শিষ্য মহাত্মা আবুবেকর সযত্নে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। হজরত মুহম্মদ পরলোক গমন করিলে পর আবুবেকর প্রথম খালিফ বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তৃতীয় খালিফ ওথ্‌মান বা ওস্‌মান ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্রতম গ্রন্থ কোরাণ সরিফ প্রকাশ করেন। মধ্য-যুগের বেশীর ভাগ ভূগোলই আরব-দের লিখিত। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবদেশে অনেক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের জন্ম হইয়াছে। চিকিৎসা বিষয়ে এবং রসায়ন বিজ্ঞানে আরবেরা এক সময়ে অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারাই ইউরোপে বীজগণিতের প্রচলন করেন। বোগদাদ এবং করদোবায় (Cordora) মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আরবেরা গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিতেন,এখনও তাঁহাদের রচিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজের কাছে আদর পাইয়া আসিতেছে। গল্প, উপন্যাস, দৈত্যদানা, ভূতপ্রেতের ও যাদুবিদ্যার কৌতুকজনক কাহিনী আরবদের দ্বারা ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর নানা স্থান হইতে হাজারে হাজারে মুসলমান 'হজ'

মস্কট

করিবার জন্য হজরত মুহম্মদের জন্মভূমি মক্কানগরীতে গমন করেন। মক্কা ও মদিনা এই সহর দুইটি আরব দেশের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। মদিনা সহরে হজরত মুহম্মদের সমাধি-মন্দির অবস্থিত। মক্কা ও মদিনা এ দুইটি সহরই হেজাজরাজ্য মধ্যে অবস্থিত। মক্কাযাত্রীরা সমুদ্রপথে জিদ্দা (Jiddah) বন্দর হইয়া মক্কা যাইয়া পৌছেন।

আরব দেশে হেজাজ, তেহামা, ইমেন্, নেজ্‌দ এই কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। নেজ্‌দ আরবের বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। এখানকার মরূদ্যান জগদ্বিখ্যাত ও বহু কূপদ্বারা শোভিত এবং সুমিষ্ট জলদ্বারা পরিপূর্ণ। আরবের লোকদের সমাধিভূমি মদিনাতে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে। এখন অধিকাংশ তীর্থ-যাত্রী রেলপথে মদিনায় গমন করিয়া থাকেন।

মক্কা একটি বালুকাময় উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত ইহার চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখানকার অধিকাংশ বাড়ী প্রস্তরনির্মিত এবং রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত। যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক বাড়ী পাওয়া যায়। স্নান করিবার জন্য এখানে অনেকগুলি হাম্‌মাম বা স্নানাগার আছে। এখানে ধার্ম্মিক যাত্রীগণের দেখিবার উপযুক্ত অনেকগুলি স্থান আছে। তাহার মধ্যে কাবানামক পরম পবিত্র স্থানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাবায়



আরবেরা উষ্ট্রের পিঠে চড়িয়া মরুভূমি পার হইতেছে

কাছে উষ্ট্র অত্যন্ত জীব। ইহারা ইহার পিঠে চড়িয়া মরুভূমি উত্তীর্ণ হয়। এজন্য উষ্ট্রকে মরুভূমির জাহাজ বলে। উষ্ট্রের দুধ, উষ্ট্রের মাংস ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। এদেশের সকলের চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা হইতেছে, ৯,০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট।

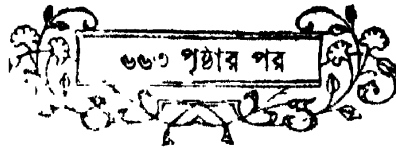
জিদ্দা, মক্কা, মদিনা, মোচ্চা, মস্কট, রিয়াদ (নেজদের রাজধানী) এই কয়টি হইতেছে আরব দেশের প্রধান সহর ও বন্দর। জিদ্দা মক্কার বন্দর কেননা, এই পথেই মক্কা-যাত্রী মুসলমানেরা যাতায়াত করেন। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক হজরত মুহম্মদের জন্মভূমি মক্কানগরীতে এবং তাঁহার সংগ-আসওয়াদ নামক একটি কৃষ্ণ শিলা আছে—যাত্রিগণ উহাকে চুম্বন বা স্পর্শ করিয়া কাবার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন। এই কৃষ্ণ শিলার উপরে কত ভক্তের অশ্রুধারা পতিত হইতেছে—কত পবিত্র স্মৃতি, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তীর্থ-যাত্রীর প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করে। ইহা ভিন্ন এখানে জম্‌জম্ নামক একটি কূপ আছে। ইহার জল অতি পবিত্র।

আরবদেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না। লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। আবার মরুভূমি অঞ্চলে দিনের বেলা যেমন গরম বোধ হয়, রাত্রিতে তেমনি অত্যধিক শীত পড়িয়া থাকে।



মালী বানর

(জাতকের গল্প)


৩৬৩ পৃষ্ঠার পর

সে অনেক দিনের কথা। ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। একদিন কি জানি কি উপলক্ষে রাজ্য জোড়া এক উৎসবের ঘোষণা করলো। ঢাক ঢোল আর বাঁশী ভেঁপু বাজিয়ে



লোকজনেরা উৎসবের কথা সকলকে জানিয়ে দিলো

হৈ চৈ চীৎকার করে রাজার লোকজনেরা উৎসবের কথা সকলকে জানিয়ে দিলো। উৎসবের আনন্দে সকলের মন মেতে উঠলো। রাজধানীর যত সব লোক দলে দলে চল্লো নগর ছাড়িয়ে—মাঠের শেষে যেখানে মেলা বসেছে সে মেলায় যোগ দিতে। সকলে এক সাথে মিলে আনন্দ করবার এই একটি দিন এসেছে, সেটা প্রাণ ভরে ভোগ করে নিতে হবে—সবার মনে এমনি একটা ভাব জেগে উঠেছে। রঙ বেরঙের পোষাক পরে ছেলে বুড়ো, পুরুষ নারী সকলে হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে নদীর স্রোতের মত ছুটে চলেছে বিশাল বিস্তৃত সেই প্রান্তরের মধ্যে সেই মেলার জায়গায়।

এত আনন্দ, এত হাসি, এত গান-বাজনার মধ্যে কিন্তু একটি লোকের মুখে শুধু হাসি নেই, সে বেচারা বিষণ্ণ মনে চুপ করে বসে আছে। সে হচ্ছে রাজার বাগানের মালী। সব কাজেরই অবসর আছে, কিন্তু তার কাজের অবসর কোথায়—ছুটি কোথায়? একদিন বাগানের গাছগুলিতে জল না দিলে যে, সব শুকিয়ে যাবে—মরে যাবে! মালী বেচারীর মনটা উৎসবে যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারই সামনে রাজ্যের সব লোক ছুটে চলেছে, কিন্তু তার যে কোনো উপায়ই নেই, তাই মুখখানা মলিন করে কি করা যায় বসে বসে সেই কথাই

ভাব্‌ছিল। অনেকক্ষণ ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ একটা কথা তার মনে এল। তাই তো রাজার বাগানে যে একদল বানর রয়েছে। তারা ফলের দিনে পাকা মিষ্টি



সে বেচারা বিষণ্ণ মনে চুপ করে ভাবছে

ফল, নয়তো অন্য সময়ে গাছের কচি কচি নরম পাতা আর ফুল এই সব খেয়ে মহা আনন্দে দিন কাটায়।



তারা সহজেই রাজী হ'য়ে গেল

মালী তাদের কখনো কিছু বলে না। রাজাও কোন আপত্তি করেন না। এই উপকারের বদলে নিশ্চয়ই তার একটুকু কাজ এরা করে দেবে। এদের একদিনের কাজের ভার দিয়ে গেলে কেমন হয়!

মালীর মুখে এইবার অল্পে অল্পে হাসি ফুটে উঠলো। বানরদের কাছে গিয়ে তাদের রাজাকে ডেকে বল্লে—ভাই, আজ রাজ্যের সবাই মিলে আনন্দ করতে বেরিয়েছে; তোমরা যদি এই একটি দিন আমার হয়ে গাছগুলিতে জল দিয়ে দাও তো আমিও গিয়ে এদের সঙ্গে জুট্‌তে পারি।" বানরেরা এত দিন মালীর দয়ায় সুখে রয়েছে, তারা সহজেই রাজী হয়ে গেল। খুসী হয়ে মালী সেজে গুজে চল্‌লো উৎসবে যোগ দিবার জন্য সেই মেলার দিকে। যাবার সময় সে আবার বানরদের ডেকে বলে গেল,—"দেখ ভাই, কাজ যেন ঠিক মত হয়। ভুল কোরো না যেন!" বানরেরা বল্লে—সে কি বন্ধু! তা কি হয়, আমরা ঠিক তোমার কাজ করে রাখব। মালী খুব খুসী হয়ে চলে গেল।

বিকেল বেলা জল দেবার সময় হলো। বানরেরা জল দেবার জন্য দলে দলে চামড়ার তৈয়ারী থলে ভরে কাঁধে করে বাগানে এসে হাজির হলো। ভাল করে



দেখ ভাই, কাজ যেন ঠিক মত হয়

কাজ ক'রতে হবে তো? বানরদের রাজা সকলকে ডেকে বল্লে—দেখ, জল নষ্ট করা তো হবে না!

কাজেই, আমাদের এক কাজ করতে হবে। প্রত্যেকটি গাছের গোড়া খুঁড়ে শিকড় তুলে নিয়ে দেখতে হবে কোন্‌টাতে কতটা জলের দরকার। তবেই তো ঠিকমত জল দেওয়া হবে! অন্য বানরেরাও ভেবে বল্‌লে—হাঁ, এ ঠিক কথা! তখন সবাই মিলে মহা উৎসাহে কাজ সুরু করে দিল! এক একটা করে গাছ তোলে, আর শিকড় দেখে তাতে জল ঢালে। এমনি করে তাদের বাগানের সব গাছে জল দেওয়া শেষ হলো! এভাবে জল দেওয়ার ফলে গাছগুলির যা দশা হলো তা ত বোঝাই যায়। মালী বেচারা ফিরে এসে বাগানের অবস্থা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল! কিন্তু আর ত এর প্রতিকার নাই!

সংসারে এম্‌নিই হয়ে থাকে। জ্ঞানের পরিধি যদি আমাদের বিস্তৃত না হয়, তাহ'লে যে কাজই আমরা করতে চাই না কেন, তাতে সাফল্য লাভ করা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। মূর্খ যারা, কোনো জ্ঞান যাদের হয়নি, যত বড় মহৎ অভিপ্রায় নিয়েই তারা কাজ আরম্ভ করুক্‌ না কেন, উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তারা যে কাজ করে বসে, তার ফলে সংসারে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়ে থাকে বেশী। সুতরাং যাদের জ্ঞানবুদ্ধি অল্প, তাদের উপরে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিও না।



তখন সবাই মিলে মহা উৎসাহে কাজ সুরু করে দিলে

নেকড়ে বাঘ ও গাধা

তিব্বতের গল্প

[তিব্বত দেশের গল্প ও কাহিনী বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ। যে সকল রূপকথা প্রচলিত আছে, তাহার সহিতও ভারতবর্ষের প্রচলিত রূপকথার আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য রহিয়াছে।]

সে সত্যিকালের কথা—তখন পশু-পক্ষীরাও মানুষের মত কথা বলিতে পারিত। একদিন এক পাহাড়ের গায়ে, এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে মস্ত বড় একটা গাধার দেখা হইল। গাধাটিকে দেখিয়া, তাহাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিবার লোভটা যদিও নেকড়ে বাঘের মনে বেশ ভাল করিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছিল, তবু কি জানি কেন, গাধার সেই বিকট



নেকড়ে বাঘের সঙ্গে গাধার দেখা হইল

চীৎকার শুনিয়া ও বেশ সাহস দেখিয়া নেকড়ে বাঘ গাধার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিল। কথা রইল যে, নেকড়ে যখন শিকারের খোঁজে বাহির হইবে, গাধা তখন দিবে, তাহার গুহা-ঘরে পাহারা। আপদে-বিপদে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে।

একদিন নেকড়ে শিকারের খোঁজে বাহির হইয়াছে, তাহার বিকট চীৎকারে, বনের জন্তুরা সব ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, হঠাৎ একটা বড় রকমের চমরী ষাঁড় একটা পাহাড়ের কোল হইতে নীচে খড়ের মধ্যে পড়িয়া গেল। বেচারা নেকড়ে বাঘের ভয়ে পলাইতে যাইয়া এই ভাবে প্রাণ হারাইল। গাধা দেখিল, এই একটা মস্ত সুযোগ; সে তাড়াতাড়ি চমরী গরুটার কাছে যাইয়া দিয়া সারা গায়ে রক্ত মাখাইল এবং নিজের জিহ্বাটাও করিয়া ফেলিল একেবারে রক্তে রাঙা। নেকড়ে ফিরিয়া আসিলে খুব চীৎকার করিয়া বলিল, বন্ধু, এ পথ দিয়ে চমরী



চমরী ষাঁড় খড়ের মধ্যে পড়িয়া গেল

ষাঁড়টা যাচ্ছিল, আমি মেরে ফেলেছি। ইহাতে নেকড়ে খুব খুসি হইয়া বলিল—ঠিক কথা—তুমি সাবাস জোয়ান বটে। আমরা দুইজনেই দুই-জনকে আপদে-বিপদে ও শিকারের ব্যাপারে সাহায্য করিব।

একদিন গাধা অনেক দূরে একটা দূর পাহাড়ের কোলে মস্ত বড় মাঠ,—সেখানে চরিতে গেল। সে ত মাঠ নয়—যেন সব্‌জী বাগান, এমনি সবুজ সুন্দর ঘাসে সে মাঠটি ভরা। সেখানে আর অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার ছিল না। কাজেই, গাধা বেশ পেট ভরিয়া ঘাস খাইয়া চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল, তার ভয় হইয়াছিল, কি জানি বাপু, এখানে একা পড়িয়া আছি—যদি বাঘ-ভালুক আসিয়া হানা দেয় তাহা হইলে যে প্রাণ হারাইতে হইবে। নেকড়ে বাঘ দূর হইতে গাধার ডাক শুনিয়া ভাবিল—নিশ্চয়ই

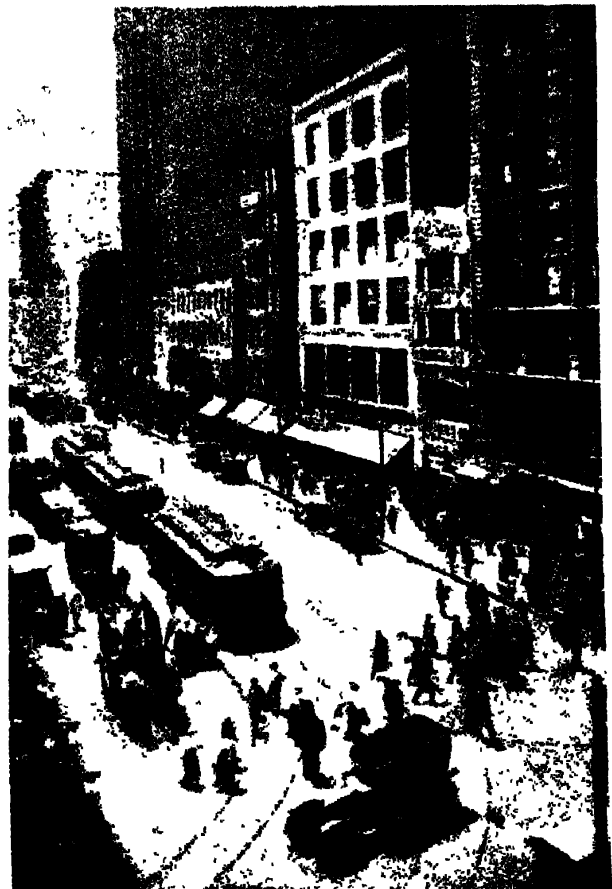
পৃথিবীর ছয়টি বড় নগর



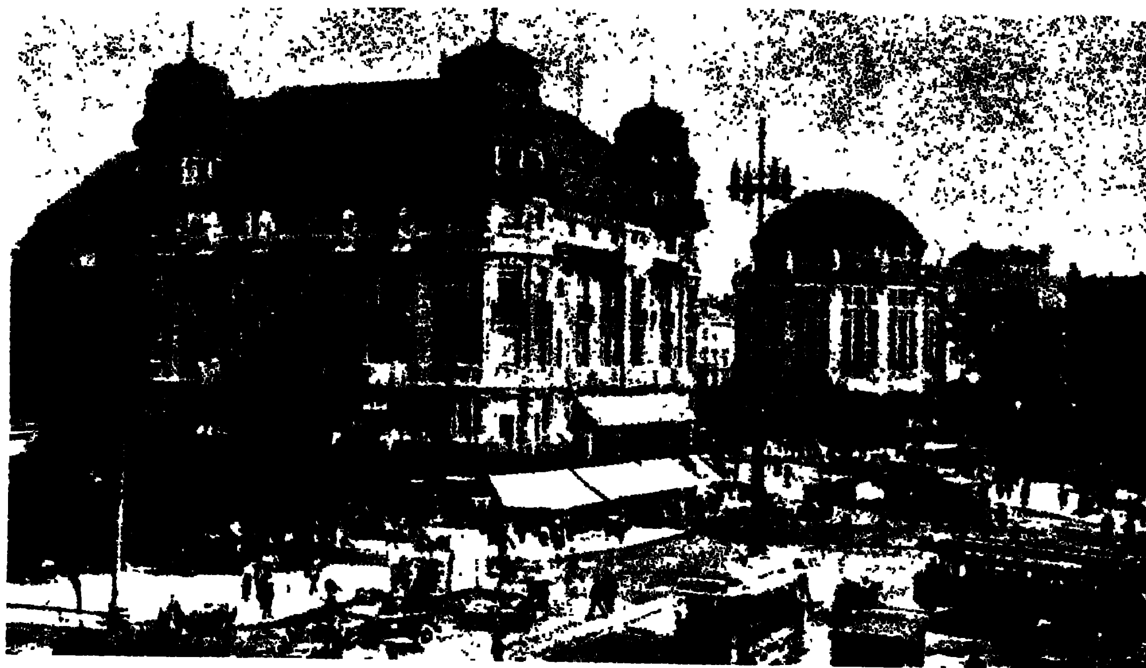
লণ্ডন



নিউইয়র্ক



শিকাগো



বার্লিন

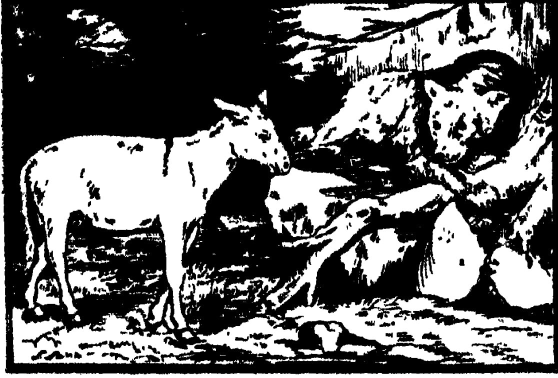


প্যারিস



টোকিয়ো

তাহার বন্ধু কোন বিপদে পড়িয়াছে; তাই সে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া আসিল। নেকড়ে আসিয়া বলিল—বন্ধু! তোমার কি কোন বিপদ ঘটিয়াছিল? গাধা ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল—বিপদ



যদি বাঘ ভালুক আসিয়া হানা দেয়

আমার কিরূপে বিপদ হইবে? আমি পেট ভরিয়া ঘাস খাইয়া আনন্দে চীৎকার করিতেছিলাম। নেকড়ে বাঘ বলিল—তাই নাকি? আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম অন্যরূপ!

আর একদিন গাধা অমনি ভাবে একাকী মাঠে চরিতেছে, এমন সময়ে একদল নেকড়ে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। গাধা বিপদে পড়িয়া খুব জোড়ে ডাকিতে লাগিল- কিন্তু আজ আর তাহার বন্ধু নেকড়ে বাঘ তাহাকে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল না। সে ডাক শুনিয়া মনে ভাবিয়াছিল, বুঝি তাহার বন্ধু পেট ভরিয়া খাইয়া মনের আনন্দে



নেকড়ে বাঘের দল গাধাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল

চীৎকার করিতেছে। নেকড়ে বাঘের দল অসহায় গাধাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ঘরে ফিরিয়া নেকড়ে দেখিল—বন্ধু তাহার তখনও ঘরে ফিরে নাই। খুঁজিতে যাইয়া দেখিল—তাহাকে নেকড়ের দল মারিয়া ফেলিয়াছে! নির্ব্বোধ ও মিথ্যা অহঙ্কারী ব্যক্তির এইরূপ সাজাই ভুগিতে হয়।

শি-রিঙ্গ ও চাম্‌বা

অনেক দিন আগে এক গ্রামে পাশাপাশি বাড়ীতে দু'জন লোক বাস করতো। একজনের নাম ছিল শি-রিঙ্গ—সে ছিল খুব ধনী, একগুঁয়ে আর অত্যাচারী—আর একজনের নাম ছিল চাম্‌বা। চাম্‌বা ছিল অতি গরীব। কিন্তু মানুষটি ছিল বড় ভাল—সে সাধ্যমত লোকের উপকার করিতে এতটুকু কসুর করত না।

একবার দুটো চড়াই পাখী এসে চামবার ঘরের দরজার উপরটায় বাসা বাঁধলো ক্রমে তাদের বাচ্চা হ'ল। একদিন বড় চড়াই দুটি খাবার জোগাড়ে বাইরে চলে গেছে, দৈবাৎ একটি ছোট্ট বাচ্চা বাসা থেকে পড়ে গেল ঠিক চাম্‌বার দরজার চৌকাঠের উপরে। সেই আঘাতে বাচ্চা পাখীটির একটি পা ভেঙে গেল। বাড়ী ফিরে এসে চাম্‌বা বাচ্চাটিকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার ভাঙা পা'টি বেশ যত্ন করে সুতো দিয়ে বেঁধে, বাসার মাঝখানে রেখে এল।

এই যে চড়াই পাখীটি, এ কিন্তু সত্যি সত্যি তাই পাখী নয়, ছদ্মবেশে একজন দেবতা। চাম্‌বা বেচারা কি করে জানবে? চড়াই পাখী তার ঠোঁটে করে কতক গুলি বীজ নিয়ে এসে চাম্‌বার কাছে দিয়ে বললে—তোমাকে যে দানাগুলি দিলাম, এগুলো তোমার বাগানে পুঁতে দিও। তুমি আমার যে উপকার করেছ, এ তারই পুরস্কার। এই বলেই পাখীটি ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো।

চাম্‌বা ভাব্‌লো, এ কি রকম! চড়াই পাখীও কথা বলে! মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়, উপকারীর অপমান করে, কিন্তু ছোট পাখীটির বুকের মধ্যে বাসা করে আছে, অসীম কৃতজ্ঞতা। সে দিল তার সাধ্যমত উপকারের উপহার! এই বলে চড়াইয়ের দেওয়া সেই দানা কয়টি সে মাটিতে পুঁতে দিল।

কয়েক মাস পরে একদিন চাম্‌বা ঘরের এদিক ওদিক বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল, সেই বীজ হ'তে কতকগুলি অতি সুন্দর বড় বড় গাছ জন্মেছে।

উজ্জল শ্যামল তাদের পাতা—আর পাতার শাখে শাখে ডালে ডালে ফলেছে—মণি-মুক্তা, হীরা জহরৎ আর মোহর। চাম্‌বা গাছের ডাল হ'তে সব



পাখীটি ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো

মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ তুলে নিয়ে গেল রাজধানী লাসা সহরে। সেখানে অনেক টাকায় সব বিক্রী করে বাড়ী ফিরে এল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেখানে ছিল ভাঙা কুঁড়ে, সেখানে হলো মস্ত বড় পাথরের বাড়ী!

চাম্‌বার প্রতিবেশী শি-রিঙ্গ, চাম্‌বার এতটা ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল। সে ভাব্‌লো এ কি কোন যাদু মন্ত্র পেল? নইলে এত বড়লোক হ'য়ে গেল কি করে—ব্যাপারটা জানতে হয় ত।

একদিন সে চাম্‌বার বাড়ী বেড়াতে এসে জিজ্ঞেস করলো, ভাই বল দেখি কি ভাবে তুমি হঠাৎ এত বড় ধনী হ'লে? সরল-মন চাম্‌বার—সে শি-রিঙ্গকে সব কথা খুলে বল্‌লো! শি-রিঙ্গি সব শুনে মনে মনে ভাব্‌লো, হায়রে, আমার বাড়ীতে যদি একটা অমন ধরণের চড়াই এসে বাসা বাঁধ্‌তো!

২

সত্যিসত্যিই তাই হলো। শি-রিঙ্গের বাড়ীতেও একদিন এক জোড়া চড়াই এসে বাসা বাঁধ্‌লে। তাদের বাচ্চা হলো। যেমনটি হয়েছিল—চাম্‌বার বাড়ীতে, এখানেও তেমনি হলো। একদিন একটি বাচ্চা মাটিতে পড়ে পা ভাঙ্গলো। শি-রিঙ্গ যত্ন করে সুতো দিয়ে পা বেঁধে বাচ্চা পাখীটিকে বাসায় তুলে রাখ্‌লো।

একদিন বড় চড়াই পাখীটি ঠোঁটে করে কতক-গুলি দানা নিয়ে এসে শি-রিঙ্গকে বল্‌লে—তুমি আমার যে উপকার করেছ, এই নেও তার প্রতিদান। এই দানা কয়টি তোমার বাগানে পুঁতে দিও।

শি রিঙ্গের মনে আর আনন্দ ধরে না! সে খুব যত্ন করে মাটি তৈরী করে ঐ বীজ কয়টি পুঁতে দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকগুলি গাছ হলো! একদিন ভোরের বেলা শি-রিঙ্গ বাগানে গেল দেখ্‌তে কত-গুলো মণি-মাণিক, মুক্তা-মোহর ফলেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। কোথায় মণি-মাণিক্য? তার বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! রাক্ষসের মত তার মুখ মূলোর মত তার দাঁত, সিংহের কেশরের মত তার মাথার চুল, পরণে তার চমরী গরুর ছাল, চন্দ্র-সূর্য্যের মত তার বড় বড় গোলগোল চক্ষু দুটো। হাতের মধ্যে এক তাড়া কাগজ! এই লোকটা ভাঙা গলায় বললে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ছিলাম তোমার মহাজন। তুমি সেকালে তোমার ঋণের কড়ি শোধ করনি, তাই এবার সেই ঋণ শোধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। একথা বলে সে তার সব কাগজ-পত্তর শি-রিঙ্গের সাম্‌নে ধরলো! শি-রিঙ্গ দেখ্‌লো, লোকটার কথা সত্য—এতটুকু মিছে নয়—কাজেই, তার বাড়ীঘর, গরু-বাছুর, লোকজন, টাকাকড়ি সব হারাতে হলো। শি-রিঙ্গ কোথায় হবে মস্ত বড় ধনী, তার বদলে হলো কি না একেবারে দীন ভিখারী।

৩

চাম্‌বার এখন সোণার সংসার। ধন-রত্নে মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ তার ভাণ্ডার। সে একবার দেশ বেড়াতে যাবে ঠিক করে একটা মস্ত বড় থলিতে সোণার গুঁড়ো ভরে এনে শি রিঙ্গকে বল্‌লো—ভাই, আমি দেশ ভ্রমণে বেরুচ্ছি, কবে ফিরবো, তা ত এখন আর ঠিক করে বলতে পারি না, তাই তোমার কাছে এই থলি-ভরা সোণার গুঁড়োগুলি রেখে গেলাম। শি-রিঙ্গ বললো—এ আর তেমন কি কঠিন কাজ—এই না বলে সে থলিটি তুলে ঘরের মধ্যে রেখে দিলো।

শি রিঙ্গের এ সময় অতি-বড় দারিদ্র্য অবস্থা। তার খাওয়া-পরাই চলে না। তারপর, হাতের কাছে এত গুলো সোণা পেয়ে আর লোভ সংবরণ করতে পারলো না—ধীরে ধীরে সবটাই খরচ করে ফেল্‌লো। সোণার গুঁড়োর এক রত্তিও আর থলিতে রইল না। কি আর করে—বালি দিয়ে চাম্‌ড়ার থলি পূরে রাখ্‌লো।

কয়েক বছর নানা দেশ বিদেশ ঘুরে, চাম্‌বা দেশে ফিরে এসে শি-রিঙ্গের কাছে তার সোণার থলি ফিরে চাইলো। শি-রিঙ্গ একটি কথাও না বলে চাম্‌বাকে

তার থলি ফিরিয়ে দিল। চাম্বা তার সোনা ঠিক মত আছে কিনা, তা দেখবার জন্ত যেমন থলি খুললো, অমনি সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কেথায় সোনা! সোনার বদলে রয়েছে থলি-ভরতি বালি! চাম্বা বললো—একি! আমার সোনা কোথায়?

শি-রিঙের মুখে আর কথাটি নাই। সে শুধু বলতে লাগলো—তা ত জানিনে ভাই, এই রকমই ত ছিল,



সোনা বদলে বালি হয়ে গেছে

এমনটাই ত হয়েছে! সোনার বদলে বালি হয়ে গেছে, কি করব বল, আমি তা কিছু জানি না।

চাম্বা আর কি করে? সে সেই বালি-ভরা থলেটি বাড়ী নিয়ে এল।

৪

চাম্বা গ্রামে একটি পাঠশালা করলো। দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যাতে বিনা পয়সায় ভাল ভাবে লেখা-পড়া শিখতে পারে, এই হলো তার উদ্দেশ্য।

শি-রিঙ মনে করলো, তার ত আর টাকা কড়ি নেই, এ হলো মস্ত বড় সুবিধা, সে তার ছেলেটিকে চাম্বার পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখবার জন্ত পাঠিয়ে দিলো।

দেশে বসে থাকলে ত আর টাকা-কড়ি হয় না; কাজেই, শি-রিঙও অর্থোপার্জ্জনের জন্য দূরদেশে যাওয়া স্থির করলো। যাবার সময় তার ছেলেটিকে রেখে গেল চাম্বার হেপাজতে।

শি-রিঙ চলে যাবার পর, চাম্বা একটি বানরকে পোষ মানিয়ে তাকে বলতে শিখালো—শুধু এ কয়টি কথা—বাবা, আমি বানর হয়ে গেছি! বাবা, আমি বানর হয়ে গেছি!

শি-রিঙ কিছু দিন পরে বাড়ী ফিরে এল, এবং চাম্বার পাঠশালায় দেখতে গেল—তার ছেলের এখন কিরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সে কি রকম লেখা-পড়া শিখেছে, এই-সব। কিন্তু পাঠশালার কোন শ্রেণীতেই সে তার ছেলেকে দেখতে পেল না! দেখতে পেল বসবার আসনে একটা বানর বসে রয়েছে।

চাম্বার সঙ্গে দেখা হ'তেই সে জিজ্ঞাসা করলো—ভাই, আমার ছেলের পড়াশুনা কি রকম হচ্ছে?

চাম্বা তাড়াতাড়ি বানরটিকে নিয়ে এসে শি-রিঙের কাছে হাজির করলো।



বাবা, আমি বানর হয়ে গেছি

শি-রিঙ রেগে বললো—এ কি? আমার ছেলে কোথায় বল? আমার ছেলেকে এনে দাও।

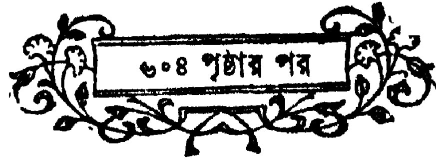
তখন বানরটা কিচি মিচি করে বলে উঠলো "বাবা আমি বানর হয়ে গেছি! বাবা, আমি বানর হয়ে গেছি!

শি-রিঙ রেগে হৈ রৈ করতে লাগলো! চাম্বাকে মেরে ফেলে আর কি! কিন্তু চাম্বার কোন ভাবান্তর হলো না—সে শুধু হাসতে লাগলো। শি-রিঙ খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলো—বন্ধু চাম্বা সেই সোনার থলের বালি হওয়ার দিব্য এ প্রতিশোধ নিয়েছে! তখন সে নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে চাম্বাকে বিনয় করে বললো—ভাই, আমি তোমার সোনা শুধলে তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিও।

চাম্বা হেসে বললে—এ বেশ কথা!



বায়ু

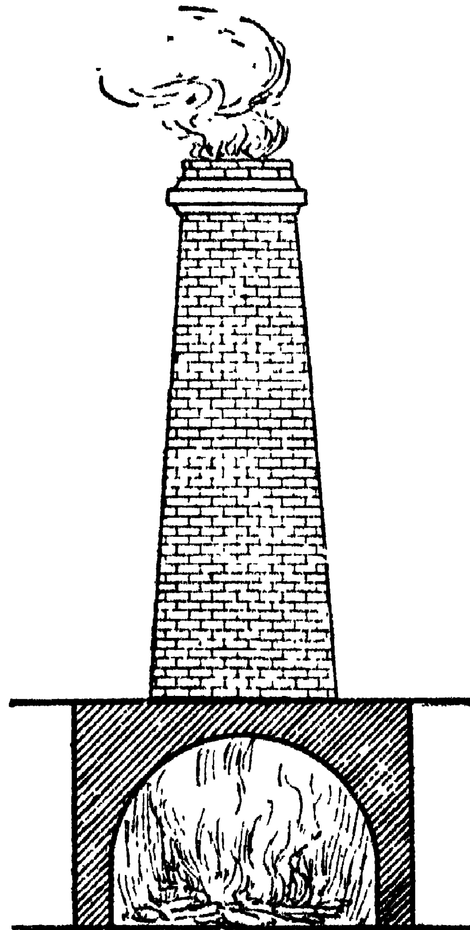

৬০৪ পৃষ্ঠার পর

চিম্‌নি

চিম্‌নির কি কাজ, জান? তোমাদের বলা হইয়াছে, আগুনের আঁচে বাতাস গরম হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। কাজেই, একটি বায়ু-প্রবাহ সৃষ্ট হয় ও নূতন বাতাস পাইয়া আগুন আরও জ্বলিতে থাকে। উর্দ্ধে প্রবাহমান বায়ু, কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড ও ধূমের গতি চিমনির দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আগুনের দাহ আরও সুন্দররূপে সংসাধিত হয়। ল্যাম্পে চিমনিও ঠিক তাহাই করে। ঠিকমত চিমনি লাগাইলে ও দীপ শিখার তলায় বায়ু-প্রবেশের পথ পরিষ্কার রাখিলে, শিখা পরিষ্কার ও ধূমবিহীন হয়।

প্রবল বাতাসে ক্ষীণ শিখার নির্ব্বাপন

এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, কেন বাতাস পাইলে আগুন আরও ভালরূপে জ্বলিয়া উঠে। হাপার দিয়া আগুন আরও ভালরূপে জ্বালান হয়। তবে প্রবল বাতাসে অবশ্যই ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। তাহা অন্য কারণে হয়। দাহক্রিয়ার অগ্নিরূপে আবির্ভাব হইবার জন্য পদার্থদিগকে তাহাদের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে উত্তপ্ত হইতে হয়। যদি প্রবল বাতাসে সে উত্তাপ ক্ষয় হইয়া যায় তাহা হইলে দাহে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া পড়ে।



কল-কারখানার চিম্‌নি

অক্সিজেনের পুনর্জ্জন্ম

বায়ু হইতে এই রকমে নানা ক্রিয়ায় যদি অক্সিজেন ধ্বংস হইয়া যাইত ও তাহা আর কোনপ্রকারে সৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে এত দিনে কোনকালে জীববংশ লুপ্ত হইয়া যাইত, সৃষ্টির গতি অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে, ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামক গাছপালার সবুজ পাতার ভিতর যে পদার্থটি আছে তাহা সূর্য্যালোক-সাহায্যে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভাঙ্গিয়া অক্সিজেনের মুক্তিসাধন করে ও কার্ব্বননামক অঙ্গার জাতীয় পদার্থটিকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিজের পুষ্টিসাধনার্থে গ্রহণ করে। কার্ব্বন নানাবিধ যৌগিক পদার্থরূপে বৃক্ষজগতে ও তথা হইতে অন্য নানাবিধ যৌগিক পদার্থরূপে

প্রাণিজগতে যায়, তথা হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে আবার চক্রবৎ বৃক্ষজগতে ফিরিয়া যায়। ফলে কোন পদার্থই



বাতাস পাইলে আগুন জ্বলিয়া ওঠে

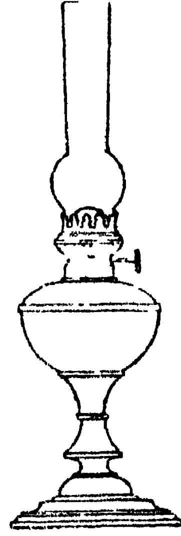
নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায় না। নাইট্রোজেন অক্সিজেনকে ফিকা করিয়া আমাদের নিঃশ্বাসের উপযোগী করিয়া দেয়।

আকাশের বিদ্যুৎ প্রভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাতাসের স্বল্প পরিমাণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কখন কখন কিছু সংযোগ হয়।

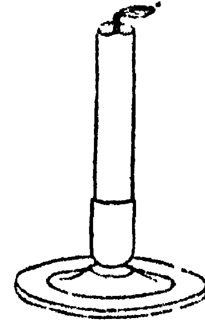
নাইট্রোজেন ও তাহার কর্ম

বৃষ্টিজলে তাহা ধরণীতলে পতিত হইয়া মৃত্তিকার ক্ষারাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃক্ষাদির খাদ্যরূপে পরিণত হয়।

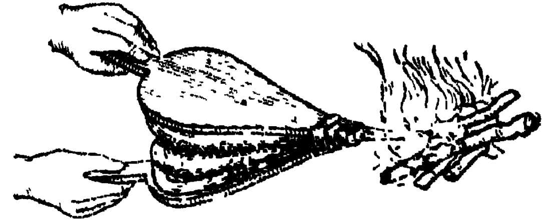
কথঞ্চিৎ নাইট্রোজেন এক প্রকার কীটাণু দ্বারা শীম ও ছোলা জাতীয় গুল্মাদির দেহে সরাসরি সংযুক্ত হইয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। বৃক্ষদেহে ও বৃক্ষদেহ হইতে প্রাণিদেহে নানাবিধ যৌগিক পদার্থরূপে নাইট্রোজেন বিরাজ করে। আবার বৃক্ষ ও প্রাণিদেহের ধ্বংসে পুনরায় বাতাসে ফিরিয়া আসে। এইরূপে নাইট্রোজেনও চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে। আমাদের শরীরের মাংসাদি এই নাইট্রোজেনের নানাবিধ যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ। মাছ মাংস, ছানা, দাইল প্রভৃতি ও ক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহৃত অনেক বস্তু ইহাদিগকে প্রোটিন বা নাইট্রোজেনীয় পদার্থ বলা হয়।



ল্যাম্প ও চিমনি



প্রবল বাতাসে ক্ষীণ দীপশিখা নিবিয়া যায়



হাপর

অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ

অক্সিজেনের সহস্র সহস্র যৌগিক পদার্থ আমাদের নিত্যসঙ্গী। পাথর বালি, চূণ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দ্বিতীয় জীবন জল পর্য্যন্ত, বহুবিধ পদার্থে এই অক্সিজেন যৌগিক ভাবে বর্ত্তমান।

বাতাসে জলীয় বাষ্প

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে। এই বাষ্প আসে নানাবিধ স্থান হইতে। নদ, নদী, সমুদ্রের জল উবিয়া কাষ্ঠ ইত্যাদি বিবিধ দাহ্য পদার্থ পুড়িয়া, এমন কি, আমাদের প্রশ্বাস হইতে এই জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয় ও তাহা বাতাসে প্রবেশ করে। একটি পরিষ্কার আয়নার উপর নিঃশ্বাস ফেলিলে, সেই নিঃশ্বাসে জলীয় বাষ্পের বিদ্যমানতা দেখা যাইবে। কতখানি জল বাতাসে থাকিতে পারে, তাহা বাতাসের উত্তাপের উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে অনেকখানি জল তাহার ভিতর থাকিতে পারে। বাতাসে যতখানি জল থাকিতে পারে,

বাতাসে অবস্থিত জলের পরিমাণ তাহার যত কাছাকাছি হইতে থাকে, তত মন্দীভূত বেগে বাতাসে জল শোষিত হইতে বা বাষ্পীভূত হইতে সমর্থ হয়। ইহা ঠিক যেমন তোমাদের পেট ভরিবার কাছাকাছি হইলে হয়। এই জন্যই গ্রীষ্মে দ্রুতগতিতে বস্ত্রাদি শুষ্ক হয়; বর্ষায় হয় না। বাতাসে জলের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে ততই একটা কি রকম গুমোটের সৃষ্টি হয়, কারণ নিঃশ্বাসে আমরা ততটা অক্সিজেন পাই না। বাতাসে যতখানি জল থাকিতে পারে তাহার মাত্র শতকরা ৭০ ভাগ থাকিলেই শরীরের জন্য সুবিধাকর।

বাতাসে হয় তো এখন তত জল নাই; কিন্তু যদি ইহা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা করিতে করিতে এমন অবস্থায় আনা যায়, যে অবস্থায় তাহাতে এখন যাহা জল আছে, তাহাও তাহার পক্ষে বেশী, তাহা হইলে সেই বেশী জলটা বাতাস নানা ভাবে ফেলিয়া দেয়।



··জলের ফোঁটা...হইয়া ধরণীতলে পতিত হয়

সেই জল মেঘরূপে ও সেই মেঘ আরও শীতল বায়ুস্তরে প্রবেশ করিলে জলের ফোঁটায় পরিণত হইয়া ধরণীতলে পতিত হয়। নীচের স্তরের বায়ু, শীতল পদার্থের স্পর্শে শীতল হইলে, সেই বেশীর ভাগ জল শিশিররূপে ফেলিয়া দেয়। শীতকালের রাত্রে অতি শীতল পদার্থের উপর শিশির পড়ে।

বায়ুতে ভাসমান ধূম ও ধূলিকণার উপর যে শিশির পতিত হয়, তাহা ধূম ও ধূলিকণার সহিত একটা অস্বচ্ছ স্তরের মত হয়। ইহাকে আমরা কুয়াশা বলি।

তোমরা দেখিয়া থাকিবে, কোনও পাত্রে বরফ রাখিলে পাত্রের বাহিরের গাত্র বহিয়া জলধারা গড়াইতে থাকে। ইহাও উপরি উক্ত কারণে হয়।

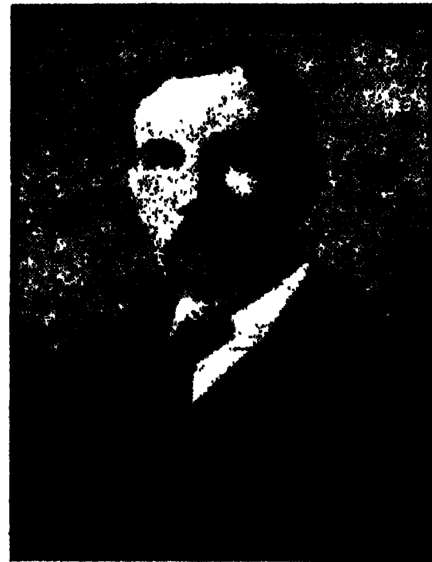
জলীয় বাষ্প থাকায় আরও একটি লাভ হয়। আমাদের ধরণী শীঘ্র শীতল হইয়া যাইতে পায় না। ইহা তাপরশ্মির প্রতিরোধক। বাতাসে ইহা যদি হঠাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে দিবাবসানে ধরণীতল বরফবৎ ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। তোমরা দেখিয়া থাকিবে, আকাশে মেঘ থাকিলে রাত্রে তত শীত বোধ হয় না।

গত দিনের স্থানীয় বাতাসের উত্তাপ, বাতাসের চাপ, বৃষ্টির পরিমাণ ও বাতাসে বাষ্পের পরিমাণ, প্রতিদিন খবরের কাগজে লেখা থাকে। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য মেটেরোলজিকেল রিপোর্ট ১৯৩২ খৃঃ, ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় এলাহাবাদ সহরের আবহাওয়ার বিবরণ নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

ব্যারোমিটার (সংশোধিত)......	২৯.৭১৪
বায়ুর উত্তাপ···	···৫১.৯ ফাঃ
„ আর্দ্রতা ···	...৬৩%
„ গতি	পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম
সর্ব্বোচ্চ তাপক্রম (গৃহের মধ্যে)··	৭৪.৫° ফাঃ
সর্ব্বনিম্ন তাপক্রম (গৃহের মধ্যে)...	৪৫° ফাঃ
মধ্য তাপক্রম	৪৯.৭° ফাঃ
বৃষ্টি	•

বাতাসে আরও যে কয়েক প্রকার গ্যাস আছে তাহার ভিতর আর্গন, ওজোন ও অ্যামোনিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে উল্লেখযোগ্য।

মনীষী র‍্যামসে (Ramsay) তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পরিশ্রমের ফলে বাতাসে আর্গন, হিলিয়ম প্রভৃতি গ্যাসের সন্ধান পান। এই গ্যাসগুলিকে কোনও রাসায়নিক ক্রিয়ায় কাজ করাইতে পারা যায় নাই। ইহাদের



মনীষী র‍্যামসে

সমষ্টি পরিমাণ বাতাসে, শতকরা একভাগেরও কম। ওজোন বোধ হয় অক্সিজেন হইতে অশনি প্রপাতে উৎপন্ন হয়। অন্যবিধ কারণেও ইহা সৃষ্ট হয়। পার্ব্বত্য



মনীষী ল্যাভয়সিয়ে (Lavoisier)

পদার্থ পচাইয়া অ্যামোনিয়া ও কোন জাতীয় জীবাণু তাহা হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি প্রস্তুত করে। আবার রোগ-বীজাণু সমূহ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। বহুজাতীয় বীজাণু মৃদু তাপে ও জলীয় বাষ্পে বৃদ্ধি পায়। বর্ষায় সেই কারণে এত ছাতা পড়ে। প্রচণ্ড শীতে বহু জাতীয় জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

জনবহুল স্থানে বায়ুতে যে অস্বাস্থ্যকর ভাব থাকে, তাহা বহুপরিমাণে দেহজাত বীজাণু সমাকীর্ণতার জন্য হয়।

ধূলি ও নানাবিধ জৈব ও অজৈব পদার্থ বায়ুতে



মনীষী শীল (Scheele)

ইহারা উভয়েই বায়ুকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিলনে উৎপন্ন মিশ্র পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করেন।

প্রদেশে, দেবদারু-ঘনবনে ও সামুদ্রিক বাতাসে ইহা নাকি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। বীজাণু-ধ্বংসের কাজে বৈজ্ঞানিকেরা ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন।

অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনীয় পদার্থের পচনে ও অন্য নানাবিধ কারণে জন্মে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া বহুপ্রকারের কার্য্যে ব্যবহার করেন। মাথা ধরিলে যে স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ দেওয়া হয়, তাহার গন্ধে এই অ্যামোনিয়া বর্ত্তমান।

বাতাসে সহস্র সহস্র জীবাণু ও বীজাণু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা নানারূপ কার্য্য করে। কোন

বাতাসে জীবাণু

জাতীয় জীবাণু দুগ্ধ বিকৃত করিয়া দধিতে পরিণত করে, কোন জাতীয় জীবাণু ইক্ষু, তাল বা খর্জ্জুর রস মদ্যে পরিণত করে, কোন জাতীয় জীবাণু মৃতদেহ বা জীবদেহ-নির্গত

প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। জানালার ফাঁকে ঘরে যে রৌদ্ররেখা প্রবেশ করে, তাহাতে দেখিতে পাইবে এই জাতীয় কণিকাগুলি অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই কণিকাগুলি হইতে রৌদ্রে বিচ্ছুরিত হওয়ায় আমরা রৌদ্ররেখাটিকে দেখিতে পাই; বা পরিষ্কৃত বায়ুতে রৌদ্রের রেখা দৃষ্টিগোচর হয় না।

বাতাসের ও বাতাসে বর্ত্তমান বহুবিধ গ্যাসের গুণাবলীর কথা তোমাদের কিঞ্চিৎ বলা হইল। বাতাস আমাদের জীবন। তাই বুঝি, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, এ রত্নে আমরা অধিকারী। বুঝিয়া দেখ, বৈজ্ঞানিকেরা কত না পরিশ্রমে, কত না গবেষণায় এই সব ও আরও বহু তথ্য বাহির করিয়াছেন। তোমরা যদি তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমরাও ধন্য হইবে ও তোমাদের মাতৃভূমি কৃতার্থ হইবে।



ভারতবর্ষ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য

পৃষ্ঠার পর

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, আলেক্সান্দের যখন পাঞ্জাব-জয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক যুবক তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে মগধের দিকে অগ্রসর হইতে প্ররোচিত করেন। পরে কোনো কারণে আলেকসান্দের তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় তিনি গ্রীক-শিবির হইতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি চাণক্য-নামে তক্ষশীলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধের নন্দরাজকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করেন এবং প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চাণক্য সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, তোমরাও বোধ হয় কিছু কিছু শুনিয়াছ। তিনি নাকি অত্যন্ত রাগী লোক ছিলেন এবং একবার নন্দরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, যেরূপে হউক, নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিবেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে তাঁহার চন্দ্রগুপ্তের সহিত দেখা হয়, এবং দু'জনে মিলিয়া নন্দবংশ ধ্বংস করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের উপদেশের জন্য একখানি অর্থশাস্ত্র বা রাজনীতি-সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থখানি 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' বা কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র নামে খ্যাত। সংস্কৃত ভাষায় 'অর্থশাস্ত্র' মানে রাজনীতি বা Politics আজকাল অনেকে Economics অর্থে 'অর্থশাস্ত্র' শব্দের ব্যবহার করেন। কিন্তু Economics-এর সংস্কৃত নাম 'বার্ত্তা'। ইহাতে কিরূপে রাজ্যশাসন করা উচিত, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এ ধরণের বই ভারতবর্ষে খুবই কম, সেইজন্য ঐতিহাসিকদের নিকট বইখানির খুবই আদর। অনেক পণ্ডিত কিন্তু মনে করেন যে, বইখানি চাণক্যের লেখা নয়, অন্য কেহ কৌটিল্যের নাম দিয়া আরও চার পাঁচ শত বৎসর পরে বইখানি লিখিয়াছিল। এ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

'মুদ্রারাক্ষস' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক আছে। ইহার লেখক বিশাখদত্ত



বোধ হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকের লোক। নন্দরাজের রাক্ষস নামে এক প্রভুভক্ত মন্ত্রী ছিল। নন্দের সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর রাক্ষস নানা প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপর পক্ষে চাণক্য কিরূপে ধূর্ততার সহিত তাহার সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দেন, নাটকটিতে অতি সুন্দরভাবে ইহা বিবৃত হইয়াছে। পড়িয়া মনে হয় যে, চাণক্য নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিতেন না।

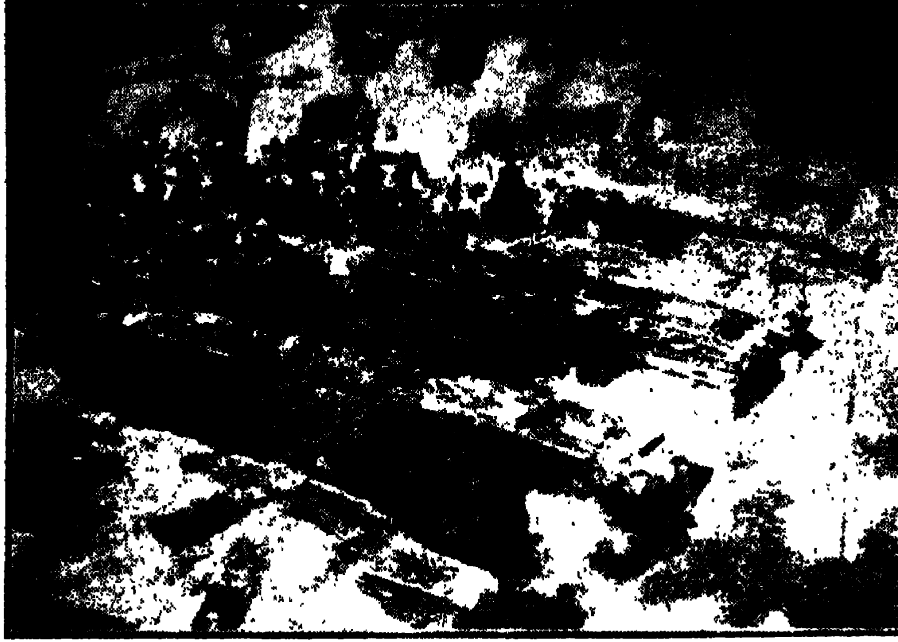
তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ যে, চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজের পুত্র ছিলেন, তাঁহার মাতা ছিলেন, নন্দের দাসী মুরা; মুরার পুত্র বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের নাম মৌর্য্য। কিন্তু কোনো পুরাতন গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ নাই। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশে মৌর্য্য নামে একটি গণরাজ্য ছিল, চন্দ্রগুপ্ত সেই রাজ্যের লোক ছিলেন এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। এইজন্য মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র ছিলেন না, বরং উচ্চ জাতির ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। আজকাল বড় বড় ঐতিহাসিকগণ আর মুরার গল্প বিশ্বাস করেন না এবং চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন।

চন্দ্রগুপ্তের মত শক্তিশালী সম্রাট ভারতে বিরল। তিনি পাঞ্জাব হইতে গ্রীক্‌দিগকে বিতাড়িত করিয়া সমস্ত উত্তর-ভারত জয় করিয়া লন। এমন কি, মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্যেরও অনেকখানি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ছিল গ্রীক্‌দিগকে পরাস্ত করা। আলেক্‌সান্দেরের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে সাম্রাজ্য লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে সেলিউকস্ নামক সেনাপতি পশ্চিম এশিয়া জয় করিয়া লন। আলেক্‌সান্দেরের মত তাঁহারও ভারত-জয়ের ইচ্ছা হইল। তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বলা যায় না, তবে মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে বিশেষ সুবিধা করিতে দেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজয়ের কথাও শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা সেলিউকস্-চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। বোধ হয়, চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকস্‌কে বিশেষরূপে পরাজিত করেন, এই জন্যই গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ লজ্জায় এই সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। যুদ্ধের পর সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তকে আফগানিস্থান প্রদেশ দান করেন এবং ইহার বদলে মাত্র ৫০০ রণগজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন। দুই সম্রাটের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হইল এবং চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় সেলিউকসের কন্যাকে বিবাহ করেন। পাঞ্জাবে এখনো চন্দ্রগুপ্তের এই বীরত্বকাহিনী গীত হইয়া থাকে।

জৈনগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম্মের অনুগত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে নাকি উত্তর-ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেইজন্য তিনি জৈন নেতা ভদ্রবাহুর সহিত রাজ্য ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ-বেলগোলা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। জৈনদের মতে না খাইয়া মরা খুব পুণ্যের কাজ।

সেলিউকস্ পরাজিত হইবার পর চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থেনীস্ নামে এক গ্রীক্ দূত পাঠান। তিনি সম্ভবতঃ দুই তিন বার ভারতবর্ষে আসেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সভায় অনেকদিন বাস করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে পুস্তকখানি এখন আর পাওয়া যায় না। আরিআন্, সট্রাবো প্রভৃতি পরবর্ত্তী

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ নিজেদের গ্রন্থে মেগাস্থেনীসের 'ইণ্ডিকা' হইতে অনেক কথা



পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ। মৌর্য্য রাজপ্রাসাদের কাষ্ঠমঞ্চের সম্মুখ-দৃশ্য

নিজেদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে মেগাস্থেনীস-বর্ণিত ভারতবর্ষের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

মেগাস্থেনীস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িয়া বোঝা যায় যে, নগরটি কত বৃহৎ ছিল। নগরটি প্রায় ৯ মাইল লম্বা ও দেড় মাইল চওড়া ছিল। নগরটি ঘিরিয়া একটি কাঠের প্রাচীর ছিল, তাহাতে ৫৭০টি চূড়া ও ৬৪টি ফটক ছিল। প্রাচীরের পাশে বাহিরের দিকে ৪০ হাত লম্বা ও ৩০ হাত গভীর একটি পরিখা ছিল। সেখানে নগরের সকল জঞ্জাল গিয়া পড়ত; এবং শত্রুগণও শীঘ্র নগর আক্রমণ করিতে পারিত না।

নগরের শাসন-প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল। নানাদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ছয়টি প্রবন্ধকারিণী সভা (বোর্ড) ছিল, এক একটি বোর্ডে পাঁচ জন করিয়া সভ্য ছিল। প্রথম বোর্ডটি শিল্প-সংক্রান্ত সকল কাজ দেখিত ও শিল্পীদের



মৌর্য্য রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব-দৃশ্য

বেতন ধার্য্য করিয়া দিত। দ্বিতীয় বোর্ডের

কাজ ছিল বিদেশী লোকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা। বিদেশী-দের অসুখ করিলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইত, আর মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্পত্তি আত্মীয়দের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় বোর্ড জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিত। এবং যাহাতে কোনও জন্ম বা মৃত্যু লুকানো না থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিত আজ-কাল দশবৎসর অন্তর লোকসংখ্যা গণনা (census) করা হয়।

বেলে পাথরের পালিশ-করা স্তম্ভশ্রেণী দেখা যাইতেছে

সেকালে কিন্তু ইহার জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। চতুর্থ বোর্ড ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে নিযুক্ত থাকিত, বণিকদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিত এবং দোকান-দারেরা যাহাতে কম ওজন দিয়া না ঠকায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিত। পঞ্চম বোর্ড শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিত, পুরানো জিনিস নূতন বলিয়া বিক্রয় করিলে শাস্তি দিত। ষষ্ঠ বোর্ড বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য হইতে শুল্ক আদায় করিত। কেহ যদি শুল্ক এড়াইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।



পালিশ-করা বেলে পাথর

তোমরা দেখিতেছ যে, চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্রের শাসন-প্রণালীর সহিত বর্ত্তমান কর্পোরেশান বা মিউনিসিপ্যালিটীর শাসনপ্রণালীর কিছু

কিছু মিল দেখা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্যগণকে নগরবাসীরা নির্ব্বাচন করেন। পুরাকালে সভ্যগণ কিরূপে নিযুক্ত হইত জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব রাজাই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন।

রাজা নিজে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সমস্ত দিনই তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, কখনো মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিতেন, কখনো বা চরদের নিকট হইতে রাজ্যের খবর শুনিতেন। তিনি নিতান্ত দরকার না পড়িলে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন না। প্রাসাদে জাঁকজমকের সীমা ছিল না। রাজা সোনার পাল্কীতে চড়িয়া বেড়াইতেন, সোনা-রূপার থালায় খাইতেন। রমণীর দল রক্ষী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। এ সব সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহার জীবন সুখের ছিল না। সর্ব্বদা তিনি প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভীত থাকিতেন, এমন কি, রাত্রিবেলায় এক ঘর হইতে অন্য ঘরে শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। বর্ত্তমান পাটনা সহরের দক্ষিণ দিকে কুমরাহার নামে একটি স্থান আছে। এখানে মৌর্য্য-সম্রাটদের স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদের কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে তাহার কয়েকটি ছবি দেখ।

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদল অতি বিরাট ছিল। তাহাতে ছিল ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৯,০০০ রণগজ। সেনার এক একটি বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য এক একটি বোর্ড ছিল। সৈন্যদল যাহাতে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইত।

মেগাস্থেনীস্ কথানুযায়ী ভারতের লোকদের ৭টি বিভাগ করিয়াছেনঃ—(১) পণ্ডিতগণ—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষুগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা লেখা-পড়া, ধর্ম্ম ও দর্শন চর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, অন্য কোনো কাজ করিতে হইত না। (২) কৃষিজীবিগণ—ইহারা গ্রামেই থাকিত, দরকার না হইলে সহরে আসিত না। রাজা কর স্বরূপ ইহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ লইতেন। (৩) মেষ-পালকগণ—ইহারা তাঁবু ফেলিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং বন্য-জন্তু শীকার করিত। (৪) শিল্পজীবিগণ—যেমন ছুতোর, কামার তাঁতী প্রভৃতি। (৫) সৈনিকগণ। (৬) রাজকীয় চরগণ—কোনো দেশে কি হইতেছে খোঁজ লইয়া ইহারা রাজার নিকট নিবেদন করিত। (৭) রাজন্যবর্গ—এই দল হইতে রাজকর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইতেন। মেগাস্থেনীস আরো বলিয়াছেন যে, এই ভাগগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাহ হইত না এবং কোনো লোক নিজের কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজও করিতে পারিত না।

দেশের আইন বড় কঠোর ছিল। সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য হাত-পা কাটিয়া ফেলা হইত। অল্প কারণে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হইত। একটি উদাহরণ দিই, কেহ যদি রাজার কোনো মন্ত্রীকে আহত করিত, তাহা হইলে তাহার বধের হুকুম হইত। বোধ হয় এই কারণে দেশে চুরি-ডাকাতি ও জাল-জুয়াচুরী খুব কম হইত। অরক্ষিত অবস্থায় জিনিসপত্র ফেলিয়া রাখিয়া লোকে বাড়ীর বাহিরে যাইত। সম্পত্তি বন্ধক প্রভৃতি লইয়া মামলা মোকদ্দমা প্রায় হইতই না। মেগাস্থেনীস্ উচ্চকণ্ঠে ভারতীয়দের সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন।

লোকে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের সময় যাহাতে কৃষির কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইত সৈন্যগণ শস্য-

ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে বাধ্য হইলে কৃষককে নষ্ট শস্যের মূল্য দেওয়া হইত। দেশে দাসত্ব প্রথা ছিল না। গ্রীসদেশে দাসদের জন্য অত্যন্ত কঠিন নিয়ম ছিল বলিয়া ভারতে এই প্রথা নাই, এই কথা গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। বেশ-ভূষার দিকে লোকের খুব দৃষ্টি ছিল। ভাল দেখাইবে বলিয়া তাহারা সোনার গয়না ও মসলিনের ফুলতোলা কাপড় পরিত। নগরে মাঝে মাঝে খুব উৎসব হইত, তাহার একটি অঙ্গ ছিল ষাঁড়ের লড়াই। মেগাস্থেনীসের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে, নাগরিকদের জীবন বেশ সহজ ছিল। ভারতীয়দের খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম কিন্তু মেগাস্থেনীসের ভাল লাগে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, লোকদের খাওয়ার কোনো বাঁধা সময় ছিল না এবং খাওয়ার সময় তাহারা একলা খাইত। এই দুইটী গুণ আমাদের এখনো অনেক পরিমাণে আছে, না?

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি অবিশ্বাস্য কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে নাকি এক প্রকার লোক থাকিত তাহাদের কান এত বড় ছিল যে, তাহারা কানের উপরেই শুইয়া থাকিত। আর এক রকম লোকের নাকি তিনটি করিয়া চোখ থাকিত, এক রকম পিঁপড়া ছিল তাহারা নাকি মাটী হইতে সোনা খুঁড়িয়া বাহির করিত, ইত্যাদি অনেক হাস্যকর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব কথা তোমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। ভারতের লোকেরা নাকি লিখিতে পড়িতে পারিত না, লোকে টাকা লইয়া শোধ না করিলে নাকি হাকিমের কাছে কোনও বিচার হইত না। মেগাস্থেনীস এই সব কথা কতদূর লিখিয়া গিয়াছিলেন, বলা শক্ত। কারণ, তাঁহার বই আর পাওয়া যায় না। যে সব পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক তাঁহার গ্রন্থের সাহায্য লইয়া নিজেরা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা অনেক কথা কল্পনায় রঙীন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

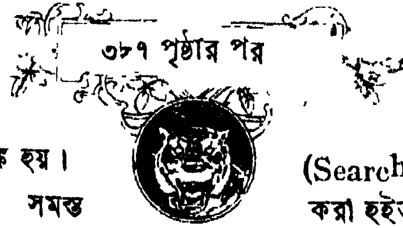
মেগাস্থেনীস যে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তের কঠোর ও সুব্যবস্থিত শাসন তাহার একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল দেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দেশের শাসনের দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তখনকার দিনে দূর দেশে শীঘ্র যাতায়াতের কোনও উপায় ছিল না, তৎসত্ত্বেও তিনি যেরূপ পারিদর্শিতার সহিত তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নাম দিয়াছেন Amitrochades বা অমিত্রখাদ (শত্রুজয়ী)। একবার তিনি সীরিয়ায় গ্রীক্ রাজা আন্তিওকস্ সোতেরের নিকট কিছু ফল, আঙুরের মদ একজন গ্রীক্পণ্ডিত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অন্তিওকস্ ফল ও মদ সানন্দে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া পাঠাইলেন যে, গ্রীকগণ কোনও পণ্ডিত বিক্রয় করা পাপ বলিয়া মনে করে।

বিন্দুসারের রাজত্বে রাজ্যের সর্ব্বত্র অশান্তি উপস্থিত হয়। একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ হওয়ায় বিন্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে ঐ প্রদেশের শাসক করিয়া পাঠান। অশোক অতি সহজেই প্রজাদিগকে শান্ত করেন। পরে তিনি আবার উজ্জয়িনীর শাসকরূপে প্রেরিত হন। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৪ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়।

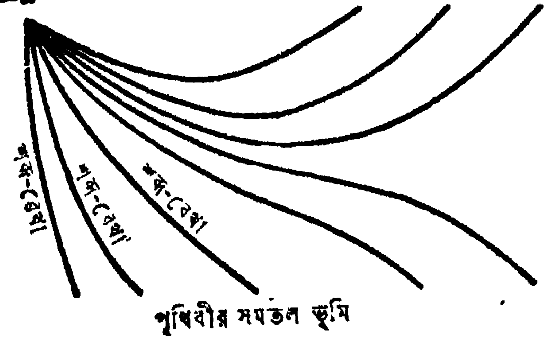


যুদ্ধে শব্দ-বিজ্ঞানের ব্যবহার



বিগত মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে রাত্রে উড়োজাহাজের খুব উপদ্রব হইত। সে সময়কার কথা মনে পড়িলে এখনও মনে আতঙ্ক হয়। রাত্রে লোকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সমস্ত সহরে টুঁ শব্দটি নাই। হঠাৎ উড়োজাহাজের গোঁ গোঁ শব্দ শুনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আস্ফোটকের শব্দ এবং বাড়ীঘর ভাঙ্গার কড়্ কড়্ শব্দ। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! সাধারণ লোকেরা কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বালকের ক্রন্দনে, মাতার করুণ চীৎকার এবং মুমূর্ষুর আর্ত্তস্বরে সহর ভরিয়া গেল। অন্যদিকে সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা শত্রুর উড়োজাহাজ ধ্বংস করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে টেলিফোনে (Telephone) উড়োজাহাজের গতিবিধির উপর খবর পাঠান হইল। তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। আমাদের পরম সৌভাগ্য, ভারতবর্ষে এইরূপ শত্রুর উপদ্রব হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, একদিকে হিমালয়ের উচ্চ চূড়া এবং অন্যদিকে বিশাল সমুদ্র ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে।

যুদ্ধের সময় যাহাতে উড়োজাহাজের চালকেরা লোকালয় চিনিতে না পারে, সেইজন্য সে সময় রাত্রে রাস্তায় বা বড় বড় কারখানায় আলো জ্বালাইবার হুকুম ছিল না। সমস্ত সহর অন্ধকারে শঙ্কিত অবস্থায় চুপটি করিয়া বসিয়া অনেক সময় রাত্রি কাটাইত। রাত্রে ভাল দেখিতে না পাওয়ায় গোলাবর্ষণকারীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইত এবং শত্রুর উড়োজাহাজকে ধ্বংস করাও কঠিন হইয়া উঠিত, কারণ, কিছুই দেখা যাইত না। সময় সময় খুব শক্তিশালী সন্ধানী বাতির (Search light) দ্বারা আকাশ-পথে অন্বেষণ করা হইত। কিন্তু তাহাতেও এক ভয়ের কারণ ছিল, সেহেতু সন্ধানী-বাতির দ্বারা শত্রুদেরও স্থান নির্দ্দেশ করিবার সুবিধা হইয়া যাইত। কাজে কাজেই, সন্ধানী বাতি ব্যবহার করা বন্ধ করিতে হইল এবং কেবল উপরকার গোঁ গোঁ শব্দ অনুসরণ করিয়া তাহাদের সাময়িক স্থিতি বুঝিয়া নিম্ন হইতে ধ্বংসকারী গোলা ছোড়া হইত। কিন্তু শব্দ ভেদ করিয়া উড়োজাহাজের খবর লওয়া বা উর্দ্ধে তাহার স্থান

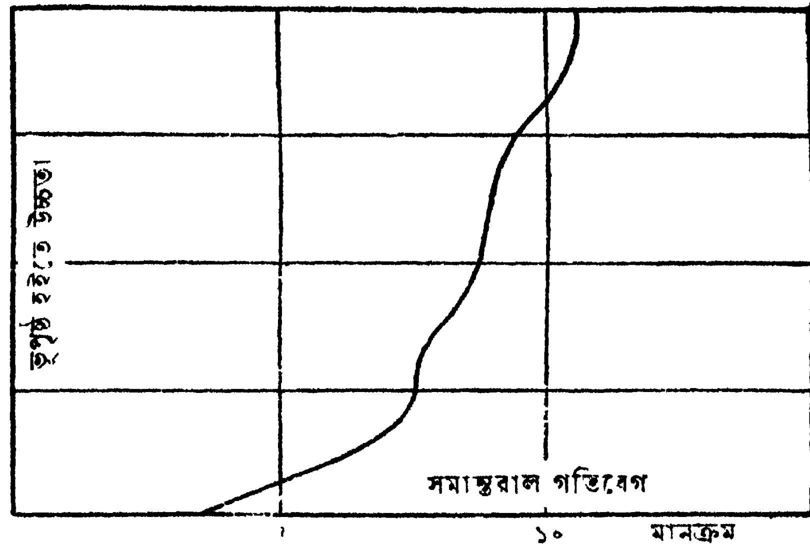


১নং চিত্র—উড়োজাহাজ উর্দ্ধে শব্দ করিতেছে

নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। ১নং চিত্রে উর্দ্ধে উড়োজাহাজ শব্দ করিতেছে এবং সেই শব্দ কি প্রকারে আঁকাবাঁকা পথে নীচে নামিয়া আসে, তাহাই শব্দের পথ-নির্দ্দেশক রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। এই রেখাগুলি টানিবার সময় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি স্মরণ

রাখা হইয়াছে যথা, উপর হইতে নীচে নামিলে তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় শব্দের গতিবেগও বাড়ে এবং সেই কারণ শব্দের পথ নির্দ্দেশক রেখার গতি আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। একথা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে।

আরও একটি কথা বুঝিতে হইবে। শব্দ যদি বায়ু-প্রবাহের দিকে হয়, তাহা হইলে শব্দের গতিবেগ বাড়িবে এবং বায়ু বিপরীত হইলে শব্দের গতিবেগ কমিয়া যাইবে। মনে কর, শব্দের গতিবেগ ১২০০ ফিট এবং যেদিকে শব্দ বিস্তার করিতেছে সেই দিকেই বায়ু সেকেণ্ডে ২০ ফিট অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইলে শব্দের গতিবেগ সেই দিকে ১২০০ ফিট হইল। কিন্তু বিপরীত দিকে ১১৮০ ফিট মাত্র হইবে। দ্বিতীয় কথা, তাপের ন্যায় উপরে উঠিলে বায়ুর বেগ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। ২নং চিত্রে বায়ুর বেগ কেমন উচ্চতা হিসাবে বাড়িতেছে, তাহাই দেখান হইয়াছে।



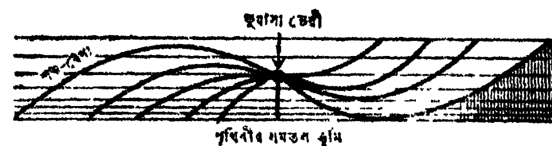
২নং চিত্র—বায়ুর বেগ উচ্চতা হিসাবে বাড়িতেছে

এখন ভাবিয়া দেখ, বায়ু এবং তাপের ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ায় শব্দের পথ কতই জটিল হইয়া উঠিবে। বায়ুর বেগ কখন কি থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। কাজে কাজেই, শব্দভেদ করিয়া উড়োজাহাজ ধ্বংস করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

১নং চিত্রে আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীর উপর যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছে উড়োজাহাজ মোটেই সেই দিকে অবস্থান করে না। শব্দের আঁকা-বাঁকা জটিল পথ দেখিলেই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীর উপর শব্দের পথ অনুসরণ করিলে শব্দ-কারীর উচ্চতা অতি অল্প মনে হইবে। কিন্তু শব্দের পথপ্রদর্শক রেখার পিছু পিছু গেলে আমরা শব্দকারী উড়োজাহাজকে ধরিতে পারিব। অতএব গোলাবর্ষণ-কারীদের নিকট শব্দের পথপ্রদর্শক ম্যাপ থাকিলে তাহারা অনায়াসে শত্রুর উড়োজাহাজকে লক্ষ্য করিয়া ধ্বংস করিয়া নিজেরা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিবে।

তোমরা হয়ত মনে করিতেছ যে, এই প্রকার উড়োজাহাজের সংস্থিতি বাহির করিতে যত সময় লাগিবে সেই সময়ের মধ্যে সেই উড়োজাহাজ অন্যত্র পলাইয়া যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে মোটেই সময় লাগে না সকল প্রকার উপদেশের নক্সা (Chart) তৈয়ার থাকে। পৃথিবীর উপর শব্দের পথের দিক্-নির্ণয় করিয়া এবং চার্ট দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গোলা-বর্ষণকারী (artilley man) কে টেলিফোনের দ্বারা জানাইয়া থাকেন এবং সকল কাজ খুবই তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

তোমরা জান, সমুদ্রগর্ভে পাহাড় থাকিলে জাহাজের পক্ষে কত বিপজ্জনক বিশেষতঃ রাত্রে এবং কুয়াসার সময়। সেইজন্য সেই সমুদ্রে নিমগ্ন ছোট ছোট পাহাড়ের উপর আলোক-স্তম্ভ (Light House) তৈয়ার করা হইয়াছে। সেখানে রাত্রে রেল-এঞ্জিনের সার্চ্চ লাইটের মতন আলো ছড়াইয়া নিকটবর্ত্তী জাহাজকে সতর্ক করা হয়। এইরূপ

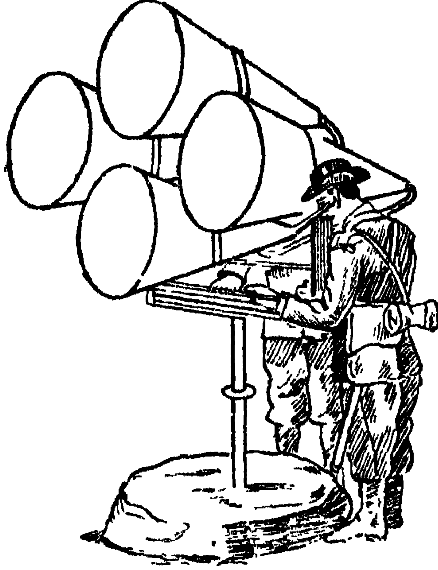


৩নং চিত্র—ফগ হর্ণের শব্দ-রেখা

আলো প্রায় ১০ মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘন কুয়াসার সময় আলোক সেই কুয়াসা ভেদ করিতে পারে না। তখন কুয়াসা-ভেরী (Fog Horn) দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া



হয়। এঞ্জিন দ্বারা কারখানার 'ভোঁ'র মতন খুব জোরে ভেরী বাজান হয় এবং সেই গভীর শব্দ দশ বারো মাইল পর্য্যন্ত সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুর বেগ থাকিলে শব্দের পথ কি ভাবে বায়ুর গতির দিকে এবং তাঁহার বিপরীতে থাকিয়া বাঁকিয়া যায়, তাহা ৩নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। এই



৪নং চিত্র—শব্দগ্রাহক হর্ণ

রেখা টানিবার নিয়ম পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলিয়াছি। দেখ, শব্দের পথপ্রদর্শক রেখা বায়ুর অনুকূল দিকে কেমন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সকল রেখাগুলি উপরে ভেরী হইতে যাত্রা করিয়া নিম্নে পৃথিবীর উপর পৌঁছিতেই পারে না বরং কোনও এক উচ্চ স্থান হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া উপরে উঠিয়া যায়। যে সকল স্থানে শব্দের রেখা মোটেই পৌঁছিতে পারে না, সে সকল স্থানে জাহাজ থাকিলে মোটেই শব্দ শুনিতে পাইবে না। জাহাজ শব্দের ছায়ার (sound shadow) মধ্যে অবস্থান করিলে তাহার পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। এই সকল কারণে আজ-কাল (Signalling by Fog Horn) অথবা কুয়াসা ভেরীর কথা বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন।

আমরা এখানে যুদ্ধ এবং শান্তির সময় শব্দ-বিজ্ঞানের ব্যবহার বুঝাইলাম। এইরূপে আমরা প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আমাদের ধ্বংস বা রক্ষা করিবার কাজে লাগাইতে পারি।

৪নং চিত্রে দেখ, দুইজন সৈনিক উড়োজাহাজের সংস্থিতি নির্ণয়কারী যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। এই যন্ত্র ঊর্দ্ধে স্থান নির্ণয় করিবার দুইটি হর্ণ (Horn) ব্যবহার করা হয় এবং সৈনিকের দক্ষিণে কিংবা বামে শব্দ হইতেছে কিনা জানিবার জন্য পাশাপাশি দুইটি চোং লাগান থাকে। প্রত্যেক চোং হইতে একটি নল ডাক্তারদের ষ্টেথিস্‌কোপের ন্যায় প্রত্যেক কানে প্রবেশ করান হয়। হর্ণগুলি উপরে নীচে এবং এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া উড়োজাহাজের সংস্থিতি নির্ণয় করা হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হইত। এখন এই যন্ত্রের আরও উন্নতি হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল কাজ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ডুবোজাহাজের গতিবিধি দূর হইতে জানিবার জন্যও এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাহাকে (Hydrophone) কহে। তাহার বিবরণ আমরা অন্য সময়ে বলিব।



দর্শনের কথা

তোমরা অনেকেই হয়তো আবু হোসেনের গল্প শুনেছ। বোগদাদের খলিফা ছিলেন হারুন আর রশীদ—তাঁর মতন নাম করা রাজা দুনিয়ায় খুব কমই হয়েছেন। প্রজাদের সত্যিকার অবস্থা কি রকম, তা নিজের চোখে দেখবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে কখনো ভিখারী, কখনো সওদাগর এইরূপ নানা বিভিন্ন সাজে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে লোক-লস্কর আমীর-ওমরাহ কেউ থাকত না, কেবল উজীর জাফর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। এমনি করে ঘুরে ঘুরে অনেক সময় তিনি কত বিপদে পড়েছেন, অনেক সময় খুব মজার ব্যাপারও হয়েছে। তারই একটি গল্প শোন।

আবু হোসেন ছিলেন বোগদাদের এক ধনী সওদাগরের ছেলে। বাপ অনেক টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন। কাজেই, তাঁর আর ভাবনা কি? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটান। অবশেষে হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'ল টাকা-পয়সা ফুরিয়ে এসেছে, এমন ক'রে আর বেশী দিন চলবে না। বন্ধুর দলও তখন কোথায় খসে পড়ল—হোসেনও ভাব্‌লেন, যাক্ বাঁচা গেল। হোসেনের কিন্তু লোকজনকে খাইয়ে খুব আনন্দ বোধ হ'ত। তিনি তাই ঠিক করলেন যে, এখন অবস্থা খারাপ বলে তো আর আগের মত দেদার দু-হাতে টাকা খরচ ক'রে ভোজ দেওয়া চলবে না—রোজ সন্ধ্যায় যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তাকেই খেতে নেমন্তন্ন করবেন। বোগদাদের বড় বাজারের কাছে একটি পুল ছিল—রোজ সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে হোসেন দাঁড়াতেন, যার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ত, তাকেই বাড়ীতে ডেকে আনতেন।

এদিকে বিদেশী পথিক সেজে হারুন, জাফরের সঙ্গে ঘুরছেন, এমন সময় পুলের উপর হোসেনের সঙ্গে তাঁর দেখা। হোসেন তো অমনি তাঁদের রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন, খলিফাও রাজী হয়ে তাঁর সঙ্গে চল্লেন। খাওয়া-দাওয়ার সময় গল্পে গল্পে হোসেন তাঁর জীবনের সব কথা খলিফাকে বলে অবশেষে কথায় কথায় বল্লেন যে, খলিফার জীবন যে কি রকম, তা দেখতে তাঁর বড় ইচ্ছা করে। একদিনের জন্য খলিফা হ'তে পারলেও তাঁর জীবনে আর কোনো খেদ থাকত না। হোসেনের খোলাখুলি হাসিখুসী ব্যবহার খলিফার খুব ভালো লেগেছিল, তিনি ঠিক করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কৌশল ক'রে হোসেনের সরবতের মধ্যে তিনি একটা ওষুধ মিশিয়ে দিলেন, খেয়েই ঘুমে হোসেন ঢলে পড়লেন।

হোসেনের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেলা অনেক হয়েছে, কিন্তু চোখ মেলে তিনি একেবারে অবাক্। রোজ ঘুম ভেঙে ঘরের পরিচিত পুরানো আসবাব-পত্তর চোখে পড়ে, কিন্তু আজ যে সব সোনায় রূপোয় বাঁধানো ঝকঝকে আসবাব, এ সব এল কোথা থেকে? ভালো ক'রে চোখ রগড়ে আবার তাকিয়ে দেখেন যে, ভুলতো হয়নি, সত্যিই সমস্ত আস-বাবপত্র এমন দামী আর ঝকঝকে যে, জীবনে কোনোদিন তিনি তেমন জিনিস দেখেন নি। আর শোবার ঘরেরই বা হ'ল কি? মার্বেল পাথরে বাঁধানো, চারিদিকে কিংখাপের পর্দা, ঘরের কোণায় কোণায় জলের ফোয়ারা। পালঙ্ক হাতীর দাঁতের, তাতে মখমলের গদি—বিলাসের

যে এত উপকরণ আছে, সে-কথা হোসেন কোনো-দিন ভাবতেও পারেন নি।

খানিকক্ষণ পরে একটু একটু বিশ্বাস হ'ল যে, এ সব সত্যি, কেবলমাত্র স্বপ্ন নয়। তখনও কিন্তু কোথায়? একজন বাঁদী উত্তর দিলে, কেন, জাঁহাপনা তো প্রাসাদেই রয়েছেন! বোগ্দাদের খলিফা শাহানশাহ বাদশাহ বলে সকলে তখন তাঁকে অভিবাদন করল। হোসেন আরো আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—খলিফা বলছ কাকে? কাল রাত্তিরে আমি নিজের বাড়ীতে ঘুমোলাম—তখন ছিলাম বোগ্দাদের সওদাগর আবু হোসেন, আর আজ ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি যে, বোগ্দাদের খলিফা হয়ে গেছি! আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি?

বাঁদীরা উত্তর দিল—জাঁহাপনা বলছেন কি? আবু হোসেন কে? আর আপনিই বা সওদাগর হ'তে থাবেন কেন? বোগ্দাদের খলিফা আপনি—আপনি তো চিরদিন এই প্রাসাদেই থাকেন। আবু হোসেনকেই আপনি বোধ হয় স্বপ্নে দেখেছেন।

হোসেনের তখন মনে হ'ল যে, হবেই বা—সত্যই বোধ হয়, তিনি বোগ্দাদের খলিফা—আবু হোসেনের কথাই তিনি স্বপ্নে দেখেছেন।

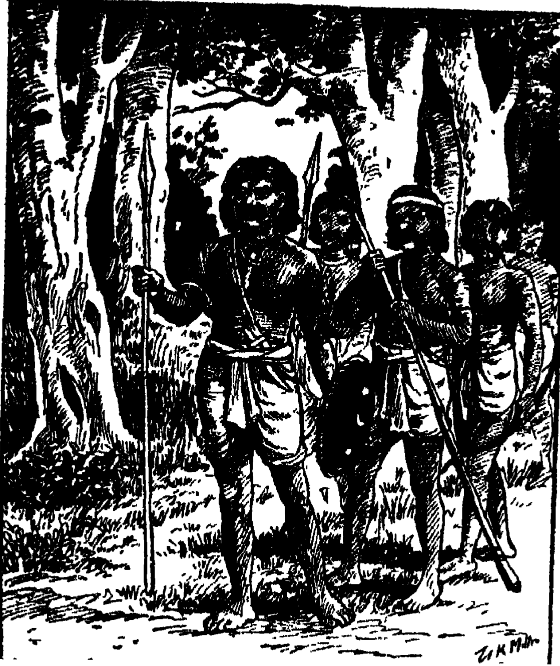
আবু হোসেন ভাবছেন, কোন্‌টি স্বপ্ন আর কোন্‌টি সত্য

হোসেন কিছুই বুঝতে পারছেন না; ভাবছেন যে, এক রাত্তিরে হ'ল কি? উঠতে যেতেই বাঁদীরা সোনার বাটিতে ক'রে জল নিয়ে এল, কেউ চামর দিয়ে বাতাস করতে লাগল; জিজ্ঞেস করল, জাঁহাপনার রাত্তিরে ঘুম ভালো হয়েছে তো? হোসেনের আরো আশ্চর্য্য লাগল—ভাবলেন যে, জাঁহাপনা বলে কারে! জিজ্ঞেস করলেন—আমি

গল্পের শেষ বোধ হয় তোমরা জানো। দুই এক দিন পরে হারুন আর রশীদের হুকুমে আবার হোসেনকে তাঁর নিজের বাড়ীতে রেখে আসা হ'ল—সেখানে জেগে তখন তাঁর ধাঁধা লাগল, যে, কোন্‌টি স্বপ্ন আর কোন্‌টি সত্য। এ রকম দুই-তিন বার প্রাসাদ থেকে বাড়ী, বাড়ী থেকে প্রাসাদে নেওয়ার ফলে হোসেনের মনে

তখন সত্য সত্যই সন্দেহ হ'ল যে, তিনি কি? সত্যিই তিনি সওদাগর আবু হোসেন, না, বোগদাদের খলিফা হারুন আর রশীদ? শেষে খলিফা যখন তাঁর সমস্ত ব্যাপারটি বল্লেন, তখন তাঁর সন্দেহ ঘুচ্‌ল—নিজের সম্বন্ধে নিজেরই অনিশ্চয়তা দূর হ'ল।

আবু হোসেনের দুর্গতির কথা ভেবে তোমরা হয় তো হাস্‌ছ। কিন্তু বেচারী করবেই বা কি? তোমরা যদি তাঁর অবস্থায় পড়তে, তবে তোমরাই বা কি করতে? ধর, রোজ সকালে উঠে তোমরা দেখ সূর্য্য উঠেছে—বাড়ীতে তোমাদের জন্য খাবার তৈরী,



জঙ্গলের মধ্যে বাবরী-চুল লাঠিওয়ালেরা ঘুরে বেড়াচ্চে

পড়া করে স্কুলে যেতে হবে। কোনোদিন উঠে যদি দেখ যে, সূর্য্য ডুবু-ডুবু বা ওঠেই নি, তবে কি ভাব্‌বে? তার পরে যদি ঘুম ভেঙে দেখ যে, জন-মনুষ্যহীন প্রকাণ্ড জঙ্গলের মধ্যে রয়েছো, সেখানে বাবরী-চুল লাঠিয়ালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে কি ভাব, বলতো? তখনো কি তোমাদের নিজেদেরকে স্কুলের ছেলে বলেই মনে হবে, না, ভাব্‌বে যে, তোমরা ডাকাতের দলের সর্দ্দার?

রোজ রাত্তিরে আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখি—স্বপ্নে কেউ হয় রাজা, কেউ হয় গুণী, কেউ হয় সওদাগর। কত অসম্ভব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে, কতদিন কেটে যায়!—হয় তো স্বপ্ন দেখ্‌লে যে, সাত বছরই কেটে গেল। কিন্তু ভোরে জেগে তখুনি মনে পড়ে যে, সাত বছর কেমন ক'রে কাটবে, সত্যিই তো মোটে কাল রাত্তিরে ঘুমোতে গেছি। তখন থেকে ১২ ঘণ্টা মোটে হয়েছে। কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা তা ঠিক কর কি ক'রে? যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ তো মনে হয় যে, তাই সত্যি—সেটা যে স্বপ্ন, সে-কথা কখনো ভাব্‌তেই পারি না। তেমনি, যখন জেগে থাকি, তখন জেগে থাকাটাই মনে হয় সত্যি, কিন্তু সেটাও ঘুমের স্বপ্নের মতন, আর একটি স্বপ্ন নয় তা জানবে কি ক'রে? স্বপ্নের সঙ্গে জেগে থাকার মিল নেই, কিন্তু কেবল তাথেকে কোন্‌টি সত্যি, কোন্‌টি মিথ্যা তা ঠিক করা চলে না।

সত্যি মিথ্যা ঠিক কিন্তু আমরা করি। আর ঘটনার সঙ্গে ঘটনার মিল থেকেই আমরা তা ঠিক করি। স্বপ্নের সঙ্গে যে কেবল জেগে থাকার মিল নেই, তা নয়। তা যদি হ'ত, তবে স্বপ্ন আর জেগে থাকার মধ্যে সত্যি মিথ্যা ঠিক করা যেতই না। স্বপ্নের সঙ্গেও স্বপ্নের মিল নেই ব'লে আমরা বলি তাকে মিথ্যা—আর জেগে থাকার সমস্ত ঘটনার মধ্যেই মিল আছে ব'লে তাকে বলি সত্যি। স্বপ্নে আমরা দেখি যে, আজ হয়েছি রাজা, কাল হয় তো ডাকাতের সর্দ্দার। আজ গেছি চীনে, কাল গেলাম আরবে—এমনি সমস্ত ঘটনার ছড়াছড়ি, আর তাদের একটির সঙ্গে আর একটিকে খাপ খাওয়ানো যায় না কিন্তু জেগে থেকে আজ যদি ঘরে টেবিল চেয়ার দেখে থাক। তবে কালও ঠিক তাই দেখবে, আর যদি দেখতে না পাও, তখুনি তার কারণ খুঁজে পাবে। মা এসে হয় তো বলবেন যে, ঘর ধুতে হবে ব'লে টেবিলটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এমন যদি হ'ত যে, রাত্তিরের পর রাত্তিরে রোজ একই স্বপ্ন দেখ্‌ছ—আজ দেখ্‌লে যে, তুমি বিলেত বেড়াতে যাবে ব'লে জাহাজে চড়েছ, কাল দেখ্‌লে যে, জাহাজ সমুদ্রের বুকে চলেছে, পর পর এমনি করে রোজ দেখ্‌ছ যে, ঘটনা ঠিক সাজানো মতন ঘটছে,—তাহ'লে তখন সত্যি সন্দেহ হবে যে, কোন্‌টা সত্যিকার,—দিনের বেলা জেগে থাকা, না, রাত্তিরে স্বপ্ন দেখা। আবু হোসেনের কপালে দিনের বেলায়ই এ রকম গোল ঘটেছিল।

তোমরা এসব বিষয়ে কোনোদিন ভেবেছ কি না, জানিনে—কিন্তু যদি ভাব্‌তে সুরু কর, তবে দেখবে যে, ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। এমান ভাবে দেখতে গেলে এর মধ্যে যে কোনো গোল আছে, বা কোন গোল

থাক্‌তে পারে, তা কখনো মনেই হয় না, কিন্তু সত্যি সত্যি যে ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে একটু ভাবলেই দেখা যায়। সত্যিই যদি ব্যাপারটা নেহাৎই সহজ হবে, তবে আমরা ভুল করি কেমন ক'রে? যতক্ষণ আমাদের কোনো বিষয়ে ভুল থাকে ততক্ষণ যে ভুল করেছি, সেকথা মনেই হয় না—যখন ভুল ভেঙে যায়, তখনি প্রথম জানতে পারি যে, ভুল হয়েছিল। তোমাদের মাষ্টার মশাইরা আঁক কষতে দেন, নানা রকম পড়া তৈরী করতে দেন। সে-সব করতে তোমাদের অনেক সময় অনেক ভুলও হয়ে থাকে, কিন্তু তাকে ভুল বলে জেনে কি কেউ কখনো মাষ্টারের কাছে নিয়ে আসে? তোমরা ভাবো যে, অঙ্ক ঠিক হয়ে গেছে, শেষে মাষ্টার মশায়ের বকুনি শুনেই হয় তো প্রথম ভুল ধরতে পার।



...বকুনি শুনে হয় তো ভুল ধরতে পার

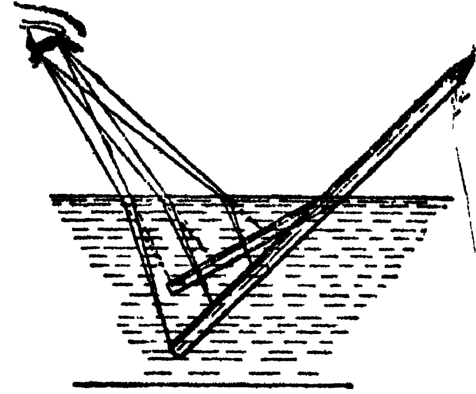
স্বপ্নে আমরা যা দেখি, স্বপ্নের মধ্যে তার বাস্তবতা নিয়ে কোনো সন্দেহই মনে আসে না—স্বপ্নের চেয়ারে বসে স্বপ্নের টেবিলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে পড়ালেখা করি, স্বপ্নের রেলগাড়ীতে ক'রে স্বপ্নের নদ-নদী-পাহাড় পার হয়ে যাই। জেগে থাকার বেলাও তেমনি



বুনো মোষ শিং বাগিয়ে বসে আছে

জেগে থাকা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ সাধারণতঃ মনে থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ভুল ক'রে বসি যে, তখন আর আগেকার মত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চল্‌তে চল্‌তে গাছের গুঁড়ি দেখে মনে হয় যে, বুনো মোষ শিং বাগিয়ে বসে আছে, গাছের আনাচে-কানাচে অন্ধকারে একশোটা ভূত নানাভাবে এসে ভয় দেখায়। কেবল এতেই কিন্তু শেষ নয়—সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ও দিনে-দুপুরে আমরা নানা রকম চোখের ধাঁধা দেখি। মরুভূমিতে মরীচিকার কথা তোমরা শুনেছ—ধূ-ধূ-করা বালির মধ্যে সেখানে মনে হয় যে, দীঘিতে জল টলমল করছে।

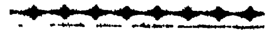
ঘরোয়া ব্যাপারই না হয় দেখা যাক্। একটা পেন্সিল যদি জলে ডুবিয়ে রাখ, তবে দেখ্‌বে যে, পেন্সিলটা



জলের মধ্যে পেন্সিলটা যেন ভেঙে গেছে

যেন বেঁকে গেছে—যদি হাত দিয়ে জল নাড়াও, তবে সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে, জলের মধ্যে পেন্সিলটা একবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, একবার জোড় লাগছে। তাই বলে সত্যি সত্যিই কি পেন্সিলটা বাঁকা? সত্যি সত্যি কি পেন্সিলটা একবার ভাঙে, একবার জোড় লাগে? হাত দিয়ে ছুলেই মনে হয় যে, পেন্সিল ঠিক সোজাই আছে. মোটেই ভাঙেনি, কিন্তু চোখে ত স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, পেন্সিলটা ভাঙা, জলের মধ্যে বেঁকে গেছে।

এই সব নানা কারণে আমরা যা দেখি, যা ভাবি, সে-সব সম্বন্ধে সত্যি-মিথ্যা বিচারের কথা ওঠে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার মিল দিয়ে অনেকে সে বিচার করতে চায়, তা আমরা দেখেছি। জলের মধ্যে বাঁকা পেন্সিল দেখতে পাই, কিন্তু পেন্সিল ছুলে পরে তা মনে হয় না, ছোঁওয়ার সঙ্গে দেখার মিল থাকে না। তার পরে যখন পেন্সিলটা বের ক'রে নি, তখন তাকে বাঁকা মনে হয় না—জলের মধ্যে ছুঁয়ে যা মনে হয়েছিল বাইরে এনে ছুঁয়ে এবং দেখেও তাই মনে হয়। তাই এ সমস্ত মিল দেখে বলি যে, বাঁকা পেন্সিলটা দেখাই হ'ল ভুল—আসলে পেন্সিলটা বাঁকা নয়। তারপরে পেন্সিলটা বাঁকা দেখারও কোনো ঠিক নেই—যদি জলের এ-ধার থেকে





পেন্সিলটার দিকে তাকাই, তবে মনে হয় যে, তা ডাইনে বাঁকা, কিন্তু ঘুরে গিয়ে অন্য দিক থেকে তাকালে মনে হয় যে, তা নয়—পেন্সিলটা বাঁদিকে বাঁকা। এমনি, আমাদের জায়গা বাদলের সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিলটাও নানাদিকে বেঁকুতে থাকে—একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল থাকে না।

মিল দেখেই কি তাহলে আমরা সত্যি-মিথ্যা ঠিক করি? তা বলেও কিন্তু নিস্তার নেই, কারণ, তখন নতুন নতুন নানা প্রশ্ন ওঠে। কোনো জিনিষের সঙ্গে যে অন্য কোনো জিনিষ খাপ খাচ্ছে, তা জানা যায় কি করে? আর কেই বা তা জানে? আমি আজ ভোরে উঠে দেখলাম যে, মেঘ করেছে, পূর্ব্ব আকাশে সূর্য্যের দেখা নেই। কাল যে সূর্য্য উঠেছিল সে-কথা মনে রইল কি ক'রে? আর যে-আমি কাল সূর্য্য ওঠা দেখেছিলাম, সে-আমির সঙ্গে আজ সকালকার আমির কি সম্বন্ধ? স্বপ্নে তো দেখেছি যে, কখনো আমি রাজা, কখনো আমি জাহাজের কাপ্তেন সেই সব "আমির" সঙ্গেই বা আমার আজ সকালকার জেগে থাকা আমির কি সম্বন্ধ?

এ-সব আলোচনা পরে আর একদিন করা যাবে —আজকে কেবল আর একটা মুস্কিলের কথা বলব। সত্যি-মিথ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ না হ'লে মিল দেখার কথাই ওঠে না, অন্য ঘটনার সঙ্গে কোনো ঘটনার মিল আছে কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছু ভাবিই না। ধর, আজ যে টেবিলে কাগজ রেখে লিখছি, এ টেবিল যে সত্যি সত্যি টেবিল, তা জানতে আমাদের কালকের কথা মনে করার কোনো দরকার হয় না—কাল কি দেখেছি না দেখেছি, সে-সব কথা খেয়ালই করি না। তা ছাড়া সন্দেহ যদি ওঠেও, তবু কেবলমাত্র এক জিনিষের সঙ্গে অন্য জিনিষের খাপ খাওয়াকেই কি আমরা সত্যি মিথ্যা বলি? সত্যি মিথ্যা আমরা ঠিক করি তাই দিয়ে, কিন্তু সত্যি-মিথ্যার মানে খাপ খাওয়া বা না খাওয়া নয়। সত্যি বলে জিনিষটা খাপ খায়, খাপ খায় বলে তা সত্যি নয়। টেবিলটা সত্যিই টেবিল বলেই রোজ আমরা তাকে দেখি, রোজ আমরা তাকে দেখি বলেই তা সত্যি সত্যি টেবিল নয়।

অনেকে আবার তাই বলে যে, ও-সব খাপ খাওয়া-না-খাওয়া কাজের কথা নয়। আসলে আমাদের মনটা হচ্ছে আয়নার মত—তাতে বাইরের জিনিষের ছায়া পড়ে বলেই আমরা জানতে পাই। সে ছায়া যখন ঠিক ছায়া, তখন আমাদের জানাকে বলি সত্যি—তা নইলে বলি ভুল। তোমরাও হয় তো প্রথমে এমনি ক'রেই ভাবো। জিনিষগুলি রয়েছে বাইরে, আমরা তাদের বিষয় চিন্তা করি, আমাদের চিন্তা যখন জিনিষের সঙ্গে মেলে, তখনই তা ঠিক হয়।

ব্যাপারটা যদি এত সহজ হ'ত, তবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো অর্থই হ'ত না। কিন্তু আমাদের মন যদি আয়নার মতনই হয়, তবে ভুল সম্ভব হয় কি ক'রে? হয় জিনিষের ছায়া তাতে পড়ে, তা নইলে পড়ে না, কিন্তু সত্যি-মিথ্যার কথা ওঠে কেমন ক'রে? তা ছাড়া সত্যি-মিথ্যা কোনো রকম ক'রে সম্ভব হলেও আমরা তার কথা জানব কেমন ক'রে? আমাদের মনে রয়েছে ছায়া—আমরা সেই ছায়াকেই জানি, কিন্তু তাহ'লে সে ছায়া জিনিষের ঠিক ছায়া কি না, সে-কথা ঠিক হবে কেমন ক'রে? আর যদি বল যে জিনিষগুলি জানি বলেই ছায়া ঠিক না ভুল তা বুঝতে পারি, তবে আর তার ছায়ার দরকার কি? জিনিষগুলিই যদি জানি, তবে মনের মধ্যে তাদের ছায়ার তো কথাই ওঠে না—মনও তা'হলে আয়নার মতন নয়, তাতে ছবি পড়তে পারে না। বরং বলতে পার যে, মনটা কাঁচের মতন—তার মধ্য দিয়ে সব পরিষ্কার দেখা যায়। তা বললে কিন্তু ভুল কেমন ক'রে হয় সে-কথা আর বোঝানো যায় না। কাঁচ যদি পরিষ্কার হয়, তবে তার মধ্য দিয়ে আমরা জিনিষ দেখি, না দেখতে পেলে বলি যে কোনো জিনিষ নেই—কিন্তু ভুলের তো কোনো কথা ওঠে না।

এখন যদি বল যে, কাঁচও তো নানা রকম হয়—কোনোটার মধ্য দিয়ে সব জিনিষকে বড় দেখায়, কোনোটার মধ্য দিয়ে সব ছোট দেখায়; রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে সব জিনিষকে রঙীন দেখায়। তার পরে আবার এক রকম কাঁচ আছে যে, তার ঠিক মধ্য দিয়ে তাকালে জিনিষটাকে ঠিক দেখা যায়—একটু এদিক ওদিক হ'লেই নানাভাবে বেঁকেচুরে যায়। মনটাও হচ্ছে তেমনি কাঁচ—তার ঠিক মধ্য দিয়ে তাকালে জিনিষ ঠিক জানি। তা নইলেই নানা রকম ভুল হয়।

এ কথা বলেও কিন্তু নিস্তার নেই। আমরা ইচ্ছে করলে কাঁচ সরিয়ে ফেলতে পারি, তাই একবার এমনি ক'রে দেখে, আবার কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখে বলি যে, এ কাঁচটার মধ্য দিয়ে দেখলে সব জিনিষ বড় দেখায় বা রঙীন লাগে। কিন্তু কাচ যদি না সরানো যায়? ধর, একেবারে ছেলেবেলায় তোমাদের চোখে

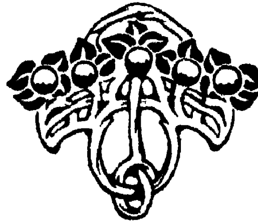
রঙীন এক চশমা এমন ক'রে এঁটে দিলাম যে, সে চশমা কোনো দিন খোলা যাবে না ..এমন কি চশমা রয়েছে সে-কথাও তোমরা জান্‌তে পাবে না। তাহলে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে যে, জিনিসগুলি সত্যি সত্যি



তোমাদের চোখে রঙীন চশ্‌মা এঁটে দিলাম রঙীন নব—রঙীন চশমাব জন্য তাদের রঙীন দেখাচ্ছে? তাহ'লে তোমরা চিরদিনই ভাব্‌বে যে, পৃথিবীতে বুঝি সব জিনিষই একরঙা, কেবল কোনো রঙ একটু বেশী উজ্জল, কোনোটা একটু কম।

মন নিয়ে হয়েছে সেই অবস্থা। মনকে সরিয়ে ত আর আমরা জিনিষ জানতে পারি না। কাজেই, মনকে বাদ দিয়ে জিনিষগুলি আসলে কি রকম সে-কথা ভাবা যায় না। রঙীন কাচই বল, আর ছোট-বড় করা কাঁচই বল, কিছুরই সঙ্গে তাই মনকে তুলনা করা যায় না। কাজেই আগেকার মুস্কিল থেকেই যায়। যদি জিনিষকেই আমরা জানি, তবে মনে তাদের ছায়ার কোনো দরকার নেই, কিন্তু তাতে ভুল কেমন ক'রে হয়, সে-কথা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর যদি মনে ছায়াই পড়ে, তবে জিনিষ যে কিছু আছে, সে-কথা জানতে পাই না। কাজেই ছায়া ঠিক কি বেঠিক, সে কথা জিজ্ঞাসার অর্থ থাকে না।

তোমাদের এ কথাগুলি বুঝতে বেশ কষ্ট হয়েছে, না? কিন্তু প্রথম প্রথম এ রকম একটু কঠিন লাগলেও ক্রমে দেখ্‌বে যে, দর্শন জিনিষটারও রস আছে। আমরা রোজ যা করি, যা ভাবি, সেই প্রতিদিনের জিনিষের মধ্যে এত রহস্য থাক্‌তে পারে তা মনে ক'রে তোমাদের অদ্ভুত লাগছে, না? কিন্তু এ রহস্য যেমন অদ্ভুত, তার উত্তরগুলি আরো বেশী অদ্ভুত লাগবে। নানা মুনির নানা মত। তাদের উত্তরগুলি জান্‌লে দেখ্‌বে যে, মানুষের মনের মত মজার জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু নাই।





ধ্যানে ও ধর্ম্মে

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

৪৭৬ পৃষ্ঠার পর



বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের নাম জগদ্বিখ্যাত। এই বুদ্ধদেবের বিমাতা ও মহারাজ শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নীর নাম ছিল মহাপ্রজাপতি গৌতমী। দেবদহনগরে মহাসুপ্প বুদ্ধবংশে তাঁহার জন্ম। তারপর বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাক্যবংশের রাজান্তঃপুরে রাণী হইয়া প্রবেশ করিলেন।

পুত্র সিদ্ধার্থ যখন তপস্যার বলে বুদ্ধদেব হইয়া দেশে ফিরিলেন, তখন সমস্ত রাজ্যে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম চঞ্চলতা দেখা দিল, শত শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব লইয়া ভিক্ষু হইতে লাগিল। মহারাজ শুদ্ধোধন তত-দিনে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। রাণী গৌতমীর কাছে জগৎ যেন শূন্য মনে হইতেছিল। বুদ্ধদেবের এই নূতন ধর্ম্মে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, এই ধর্ম্মে ভিক্ষুণী ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত শূন্য মন পূর্ণ করিবেন।

বুদ্ধদেব তখন কপিলাবস্তুতে। মহাপ্রজাপতি সসম্ভ্রমে পুত্রের কাছে আসিয়া মনের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু বুদ্ধ বলিলেন, স্ত্রীলোকের ভিক্ষু-ব্রত লইবার অধিকার বা দরকার কিছুই নাই। আপনি যে এই শুভকাজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে।

গৌতমী শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মনের সঙ্কল্প ছাড়িলেন না। তিনি নিজের একরাশ মাথার চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং ভিক্ষুণীদের মত বেশভূষা ধারণ করিলেন।

কিছুদিন পরে বুদ্ধদেব কপিলা-বস্তু ছাড়িয়া বৈশালী নগরে গমন করিলেন। গৌতমী উপায়ন্তর না দেখিয়া বৈশালীতে তাঁহার অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলেন। শাক্য-বংশের আরও অনেক মহিলা তাঁহার সঙ্গ লইলেন। পায়ে হাঁটিয়া অনেক ক্লেশে অনেক দিনের শেষে তাঁহারা আবার আসিয়া বুদ্ধের চরণে শরণ লইবার বাসনা জানাইলেন।

বুদ্ধদেব তখনও অনিচ্ছুক। তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দ এই পুরমহিলাদের ঐকান্তিক ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি আবার এই প্রসঙ্গ উত্থা-পন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন—স্ত্রী লোক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না? তাহারা কি অর্হৎ হইবার অধিকারিণী নহে? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—তাহারা অধিকারিণী এ কথা সত্য। তখন আনন্দ বলিলেন, তবে কেন মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইতেছে না? ভগবন্! তিনি আপনার মাতৃ-বিয়োগের পর স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালন-পালন করিয়া-ছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি উচিত হয়? আর তাঁর সঙ্গে যে-সকল পুরমহিলা আসিয়াছেন, অনভ্যস্ত পদ ব্রজে ইহাদের কোমল চরণগুলি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত।

প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় বহিয়া ইহাদের ক্ষীণতনু মলিন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্ম-পিপাসা ত পুরুষের চেয়ে কম নয়, তবে ইহাদের ভিক্ষুণীর অধিকার দিলে ক্ষতি কি ?

অনেক বাদানুবাদের পর বুদ্ধদেব বলিলেন—যদি ইহারা আটটি অবশ্যপালনীয় নিয়ম গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে উহা সম্ভব হইতে পারে। সেই আটটি অনুশাসন এইরূপঃ—

১। ভিক্ষুদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে।

২। যে স্থানে ভিক্ষু নাই সেখানে ভিক্ষুণীরা বর্ষা-যাপন করিবেন না।

৩। ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুমতি লইয়া প্রত্যেক পক্ষে ভিক্ষুণীরা উপবাস এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।

৪। প্রত্যেক বৎসর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রতপালন করিবেন।

৫। উভয় সঙ্ঘ হইতে "মানত" শাসন গ্রহণ করিবেন।

৬। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উপসম্পদ উভয় সঙ্ঘ হইতে দীক্ষালাভ করিবেন।

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

৮। ভিক্ষুরা তাহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রক্ষা করিবেন, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিতে পারিবেন না।

মহাপ্রজাপতি এই ধর্ম্মশাসন গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যারূপে দীক্ষিতা হইলেন এবং তাঁহার সহ-গামিনী পাঁচ শত শাক্যমহিলাকে লইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া প্রথম ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ভাবে স্ত্রীলোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিলেন। ভিক্ষুণী হইয়া মহাপ্রজাপতি ইহার প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মহাপ্রজাপতির প্রতি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ কঠোরতার ভিতর দিয়া মহাপ্রজাপতির জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ-প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণা, ধর্ম্মসাধন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীল হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সদ্ভাবে সন্তোষের সহিত জীবনধারণ করা, বৌদ্ধ-তপস্বিনীর অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাপ্রজাপতি এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিয়া অর্হত্ত্বের মর্য্যাদা লাভ করেন।

মহাপ্রজাপতির এইরূপ অসামান্য শক্তির বিকাশ হইয়াছিল যে, ভিক্ষুগণ পর্য্যন্ত উহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এমন কি, ভিক্ষুসঙ্ঘও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিশাখা

বিশাখা ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। অঙ্গ-রাজ্যে ভদ্রানগরে ধনঞ্জয় নামক এক শ্রেষ্ঠীর ঘরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার মাতার নাম সুমনা দেবী। বিশাখার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন একবার ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়া ভদ্রানগরে শুভাগমন করিলেন। বিশাখার পিতামহ বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিশাখাকে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া অবধি বিশাখার প্রাণে ধর্ম্মানুরাগের সঞ্চার হইল।

তারপর ধীরে ধীরে বৎসর কাটিয়া গেল। বিশাখা বড় হইলেন। শ্রাবস্তিপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পূর্ণবর্দ্ধনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

শ্বশুরগৃহে আসিয়া বিশাখা দেখিলেন, তাহাদের পরিবার নাগা সন্ন্যাসীদের উপাসক। বুদ্ধের যাহারা উপাসক, তাহারা নাগা সন্ন্যাসীদের আচার-ব্যবহারকে বড়ই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কাজেই বিশাখার মন ক্ষুব্ধ হইয়া গেল। বধূ যাহাতে শ্বশুর-কুলের ধর্ম্মানুষ্ঠান মানিয়া লয়, বিশাখার স্বামী ও শ্বশুরশাশুড়ীর তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু বিশাখা তাহা

কোনোমতেই পারিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার স্বামীর পরিবারকে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মে অনুপ্রাণিত করিবেন।

বাস্তবিক তাহাই হইল। তাঁহার একান্ত চেষ্টায় বলে তিনি ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধভিক্ষুদের দ্বারা মহা-ধর্মের বাণী শুনাইয়া শ্বশুর ও স্বামীর হৃদয়কে বৌদ্ধ-ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করাইলেন। অবশেষে সমস্ত পরিবারটিই বুদ্ধের উপাসক হইয়া পড়িল।

একদিন স্বয়ং বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিশাখা নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাযত্নসহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা শেষ করিয়া বিশাখা বুদ্ধদেবের নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, যতদিন আমি বাঁচিব, আমি যেন ভিক্ষুদিগকে বর্ষার শীতবস্ত্র যোগাইবার অধিকার পাই; যাঁহারা আমার অতিথি হইবেন এবং যাঁহারা পরিব্রজনে বিদেশে যাইবেন, তাঁহাদের সকলেরই খাদ্য আমি যোগাইব; পীড়িত ভিক্ষুদিগের এবং পীড়িতের সেবাকারীদের সকল ঔষধ পত্রের ব্যবস্থাও আমি করিব.; এবং সমস্ত ভিক্ষুর প্রতিদিনের অন্নবস্ত্রের ভার আমি লইতে চাই। আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

এই দিন হইতে ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিপালনের অধিকাংশ দায়িত্ব বিশাখার উপর ন্যস্ত হইল। ইহার পর বিশাখা একদিন ভিক্ষুদিগের বাসস্থান দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, সেখানে মানুষ বাস করিতে পারে না, একেবারে কাঁটাবনে পরিপূর্ণ। তিনি অমনি তাঁহাদের জন্য একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া দিলেন। বুদ্ধদেবের অনুমতি লইয়া ভিক্ষুগণ সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন।

বিশাখা অত্যন্ত ধনবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি তিনি এইভাবে পরের কল্যাণের জন্য বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার একখানি অমূল্য অলঙ্কার ছিল, তাহার নাম মহালতা। সে সময়ে সমস্ত রাজ্যে তিনটি মহিলা ব্যতীত আর কাহারো ঐ অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু বিশাখা মনে করিলেন, এ অলঙ্কার লইয়া তাঁহার কি হইবে? তিনি ঐ মহালতা বিক্রয় করিয়া নয়কোটি এক লক্ষ মুদ্রা পাইলেন ও সেই মুদ্রা বুদ্ধের চরণে অর্পণ করিলেন। বুদ্ধের নির্দ্দেশ অনুসারে তারপর সেই টাকায় একটি সপ্ততল বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইল।

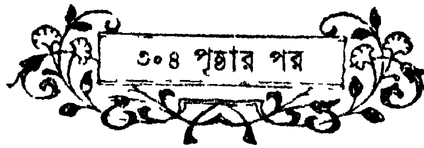
এইরূপ অসাধারণ দান ও বুদ্ধভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার চরিত্রে আর একটি গুণ ছিল—প্রতিভা। এই প্রতিভার কাছে ভিক্ষুগণ পর্য্যন্ত সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন না করিয়া পারেন নাই। ভিক্ষুগণ যখনই কোনও সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তখনই এই নারীর কাছে উপদেশ লইতেন। তাঁহার জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির প্রতি তাঁহাদের এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিয়মাবলী পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন ধর্ম্ম-প্রাণ ও বুদ্ধদেবের একান্ত অনুরক্ত এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের উপদেশদাত্রী হইয়াও বিশাখা নিজে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন নাই এবং স্বয়ং বুদ্ধদেবও কখনও তাঁহাকে ইহা গ্রহণ করিতে বলেন নাই। ইহার কারণও অবশ্য ছিল। ভগবান বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, সকল নারীর স্থান এক ক্ষেত্রে হয় না। যাহার যেদিকে শক্তি ও প্রেরণা, তাহার স্থান সেইদিকেই। বিশাখা যদি পৃথিবীর সকল সম্পদ ছাড়িয়া ভিক্ষুণী হন, তাহা হইলে বিশাখার পক্ষে লাভ-লোকসান বিশেষ কিছুই নাই, কারণ, তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী, অথচ পৃথিবীর পক্ষে তাহাতে ক্ষতি হইবে অনেকখানি, কারণ, পৃথিবীর জনসাধারণ তাঁহার অকাতর মুক্তহস্তের দান হইতে বঞ্চিত হইবে।

তাই বুদ্ধদেব বিশাখার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন সংসারের মাঝখানে, এবং সেইখানে থাকিয়াই তিনি নিজের জীবন সার্থক ও অন্যের জীবন কৃতার্থ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।



ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি


৩০৪ পৃষ্ঠার পর

একথা তোমরা সকলেই জান যে, আমাদের হিন্দু-জাতির মত ইংরাজ জাতিরও উৎপত্তি আর্য্য বংশ হইতে। অনেকের মতে পুরাকালে আর্য্যেরা মধ্য এশিয়ায় বাস করিত। কালক্রমে তাহাদের দল পুষ্ট হওয়ায় তাহারা ঐ সঙ্কীর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশে যাত্রা করে। তাহাদের একদল ভারতবর্ষে আইসে—উহারাই ভারতীয় হিন্দু বা আর্য্যজাতি। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ঐ দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—একটি ভাগ পারস্যাভিমুখে যাত্রা করে এবং তাহারা ইরানীয়ান (পারসিক) নামে অভিহিত হয়। আর্য্যদের মধ্যে যাহারা ইউরোপে যাত্রা করে, তাহারা সাধারণতঃ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একটি দল প্রাচীন গ্রীসদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহারাই বিখ্যাত গ্রীক্‌জাতি। আর একটি দল ইটালীতে উপস্থিত হয়—তাহারা রোমান্ বা রোমক্ নামে বিখ্যাত। কিন্তু তৃতীয় দলটি গ্রীস্ বা ইটালী দেশের দিকে না যাইয়া বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে জার্ম্মাণী বলি, সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে—উহারাই দুর্দ্ধর্ষ টিউটন জাতি। এই টিউটন জাতি আবার কাল-ক্রমে নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে যাহা-দিগকে Angle (এঙ্গল) জাতি ও Saxon (স্যাক্‌সন) জাতি বলা হয় তাহারা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্র-পারস্থিত ব্রিটানিয়া দেশ জয় করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতে থাকে। এই এঙ্গল (Angle) জাতির নাম অনুসারে ব্রিটানিয়ার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ইংল্যাণ্ড অর্থাৎ এঙ্গল্‌দের দেশ (Angles' land —land of the Angles) নামে পরিচিত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত ঐ দেশের নাম ইংল্যাণ্ড রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, হিন্দু জাতি এবং ইংরাজ জাতি এক সময় একই দেশে বাস করিত। যখন তাহারা একদেশে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ায় বাস করিত তখন তাহাদের ভাষাও ছিল এক। উহার নাম প্রাচীন আর্য্যভাষা। অধুনা ঐ ভাষা বিলুপ্ত (অনেকে আমাদের বেদের ভাষাকে প্রাচীন আর্য্যভাষা বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন)। এখন কিন্তু ইংরাজী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বা বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্য



কিছুই বুঝিবার উপায় নাই; যদিও এই দুইটি ভাষা প্রাচীন আর্য্যভাষা হইতেই আসিয়াছে। উভয় ভাষাই কালক্রমে অনেক নূতন কথার আমদানী করিয়াছে। তবে উভয় ভাষাতেই এখন গোটা কয়েক কথা আছে যাহার মূল উৎপত্তি এক। যেমনঃ—

সংস্কৃত	ইংরাজী
গো (গৌ)	Cow
ভ্রাতৃ	Brother (পারসী—বিরদার)
গম ধাতু (যাওয়া)	Come
পিতৃ	father (Latin Pater)
মাতৃ	mother
দন্ত	tooth (Latin-- dent)

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সংস্কৃত ভ, গ, ধ ইংরাজীতে ব, গ, দ অথবা ভ, সংস্কৃত ব, ভ, গ ইংরাজীতে প, ট, ক এবং সংস্কৃত প, ট, ক ইংরাজীতে ফ, ত (th)' হ প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেন এমন হইল? ইহার উত্তর এই যে, সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং স্থানবিশেষে, শব্দেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যেমন 'ভাত' উচ্চারণ করিতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোকেরা কিন্তু তেমন পারে না, তাহারা 'ভাত'কে বলে 'বাত'। দেশকালপাত্রভেদে এইরূপ উচ্চারণের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আমরা বলি 'লক্ষ্মী' হিন্দুস্থানীরা বলে 'লছমী'। যে স্থানকে আমরা বলি 'দেবঘর' হিন্দুস্থানীরা বলে 'দেওঘর'। এখন তোমরা বোধ হয় সহজেই বুঝিবে, আদিকালে ইংরাজী এবং সংস্কৃত একই ভাষা অথবা এক ভাষার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও কালক্রমে উভয় ভাষাতে বহুল পরিবর্ত্তন আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এমন ভাবে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে যে, উহাদিগকে এক মায়ের পেটের বোন বলিয়া মনে হয় না।

এখন আমরা ইংরাজী ভাষাতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহারই কিছু আলোচনা করিব। ভাষার পরিবর্ত্তনের একটি কারণ আমরা আলোচনা করিয়াছি কিন্তু অন্য একটি কারণ আছে যাহা ইংরাজী ভাষার উপর আধিপত্য করিয়াছে। সেটি হইতেছে নানাজাতির সংমিশ্রণ। প্রাচীন এঙ্গলস (Angles) এবং স্যাক্সন (Saxon) জাতি ইংল্যাণ্ড দেশ অধিকার করিয়া ঐ দেশের আদিম অধিবাসী কেল্‌টিক (Celtic) জাতিকে একপ্রকার নির্ম্মূল করিয়া ফেলিলেও তাহাদের ভাষা হইতে কিছু কিছু কথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তার পরে ঐ এঙ্গল ও স্যাক্সন জাতি খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আমাদের দেশে যেমন মন্ত্র-তন্ত্র সবই সংস্কৃত ভাষাতে লেখা, তখনকার দিনে খৃষ্টান ধর্ম্মের মন্ত্র-তন্ত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হইত এবং যাহারা খৃষ্টান হইত তাহাদিগকে ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা করিতে হইত এবং সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ল্যাটিন ভাষায় রচিত মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হইত। সুতরাং খৃষ্টান হইবার পরে ইংরাজ জাতি ল্যাটিন ভাষা আলোচনা করিতে বাধ্য হয় এবং এই জন্য বহু ল্যাটিন শব্দ ইংরাজী ভাষাতে আমদানী হয়। তারপর ডেনমার্কবাসী টিউটনগণ আসিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ গ্রাস করে। তাহাদের সঙ্গে মিশিবার সময় ইংরাজ জাতি ডেনিস্ (Danish) ভাষা হইতে অনেক কথাই নিজেদের ভাষাতে গ্রহণ করে। ইহার পরে ইংরাজী ভাষায় আরও গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই গুরু পরিবর্ত্তনের মূল কারণ নর্মান (Norman) জাতিদের দ্বারা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ও অধিকার। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তর্গত নর্ম্যাণ্ডি (Normandy) হইতে

আসিয়া বিজয়ী উইলিয়াম (William the Conqueror) ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার সঙ্গে যে দল আসিল তাহারা সকলেই ফরাসী—ইংরাজী



বিজয়ী উইলিয়ম

কথা তাহারা বলিতে পারিত না, কাজেই ইংল্যাণ্ডে তাহারা নিজের ভাষা প্রচলন করিল। আমাদের দেশে আমরা যেমন ইংরাজ-অধিকারের পর হইতে ইংরাজী ভাষার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং ঐ ভাষা শিক্ষা না করিলে রাজকার্য্য পাইবার কোন আশাই থাকে না, সেইরূপ ইংল্যাণ্ডেও একদিন ফরাসী ভাষা শিক্ষা না করিলে উচ্চ রাজকার্য্য পাইবার কোন উপায়ই ছিল না। ব্যাপার এমন দাঁড়াইল যে, বিদ্যালয়ে পড়াশুনা, আদালতের রাজকার্য্য প্রভৃতিতে ফরাসী ভাষার ব্যবহারই চল্‌তি হইয়া গেল। অবস্থা এইরূপ থাকিলে ইংরাজী ভাষা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কি না কে জানে? কিন্তু দৈবের ঘটনা অন্যরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ফরাসী রাজগণ নর্ম্যাণ্ডির (Normandy) সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া কার্য্য চালাইতে পারিতেন ততদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষা ইংল্যাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু শীঘ্রই এমন একদিন আসিল যখন নর্ম্যাণ্ডি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। তখন হইতেই তাঁহারা ইংল্যাণ্ডকেই নিজেদের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী ছিল না বলিয়া ইংরাজদের সহিত বিবাহ ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আচার ব্যবহারে আদান-প্রদান চালাইতে হইল। এইরূপে বাধ্য হইয়া ইংরাজী ভাষা তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইল। কালক্রমে নিজেদের মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়া ইংরাজী ভাষাকেই তাঁহারা মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী ভাষার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় দিন। স্কুল-কলেজে, রাজদরবারে এবং বিচারালয়ে আবার ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষায় বহু কথার আমদানী হইয়া গিয়াছে। ফরাসী ভাষা আবার মূলতঃ ল্যাটিন ভাষা হইতেই আগত সুতরাং এই ফরাসী কথাগুলিকে আমরা ল্যাটিন কথা বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। কোনও ভাল ইংরাজী অভিধান আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রায় অর্দ্ধেক কথাগুলি হয় ল্যাটিন, না হয় ফরাসী ভাষা হইতে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু এখন আর এই কথাগুলি ল্যাটিন বা ফরাসী কথা বলিয়া সহজে ধরিবার উপায় নাই। ইংরাজেরা ঐ কথাগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের করিয়া লইয়াছে এবং প্রকৃত ইংরাজী কথার মতই উহাদের উচ্চারণ করা হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ইংল্যাণ্ডে প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষার আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক নূতন ল্যাটিন ও গ্রীক্ কথা ইংরাজী ভাষাতে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই



বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (Scientific terms) যথাঃ—ফোটোগ্রাফি (Photography), রেডিওলজি (Radiology) প্রভৃতি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের খাতিরে ইংরাজ জাতিকে বহু দেশে যাতায়াত করিতে হইয়াছে এবং ঐ সকল দেশের ভাষা হইতে কিছু কিছু কথা ইংরাজী ভাষাতে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। যেমন Rickshaw, tea, rice, Pundit, jungle ইত্যাদি। এখন কথা হইতেছে, যদিও ইংরাজী ভাষার অর্দ্ধেকেরও অধিক শব্দ বিদেশ হইতে আমদানী, তবুও আমরা ঐ ভাষার অন্য নাম দেই না কেন? ইহার কারণ, কথার বহুল আমদানী হইলেও যাহাকে আমরা বলি প্রকাশ-রীতি (Mode of Expression) অর্থাৎ ব্যাকরণ (Grammar), তাহা প্রায় একরূপ খাঁটী ইংরাজীই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিদেশী কথা ব্যবহার করিলেও ভাষা মূলতঃ ইংরাজী ভাষাই রহিয়া গিয়াছে। আমি যদি বলি 'ঐ চেয়ারখানা টেবিলের উপর রাখ' তবে কেহ মনে করিতে পারিবে না আমি বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলিতেছি—যদিও আমার এই বাক্যে 'চেয়ার' ও 'টেবিল' এই ইংরাজী শব্দ স্থান পাইয়াছে। কেননা, আমি বাঙ্গালা ব্যাকরণ অনুসারেই আমার বাক্যটি বলিয়াছি। নানাদেশ হইতে কথার আমদানী না করিলে আজকাল আর চলে না। কোন জাতি বা কোন ভাষা আজকাল আর কূপমণ্ডুকের মত নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। জাতির মত ভাষাও বিস্তার লাভ করিতে চাহে। নানাজাতির সহিত আদান-প্রদানে এই বিস্তার লাভের সুবিধা হয়।



ডেন-শিবিরে বীণাবাদক-বেশে রাজা আলফ্রেড

আমরা ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি এবং ঐ ভাষার উপর অন্যান্য বিদেশী ভাষার প্রভাবের কথা বলিয়াছি। এইবার ইংরাজী

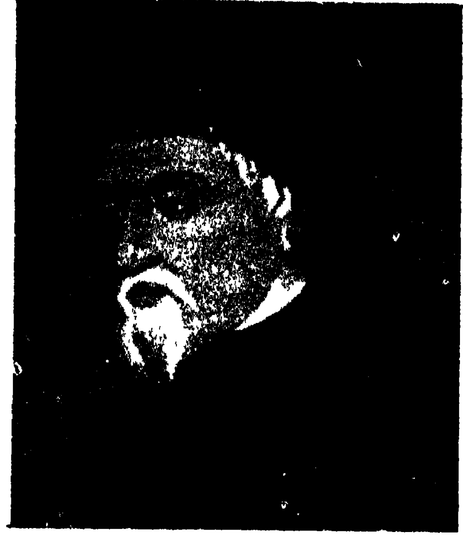
ভাষা কিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং কিরূপে সরল প্রাঞ্জল হইল, তাহারই আলোচনা করিব। সংস্কৃত ভাষাতে যেমন বিভক্তির ছাড়াছড়ি দেখিতে পাও, আদিম ইংরাজী ভাষাও ঐরূপ বিভক্তিবহুল ছিল, এবং সংস্কৃতের মত উহা শিক্ষা করাও এক-রূপ দুরূহ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা আল্‌ফ্রেড (Alfred)-এর সময়ের ইংরাজী তোমরা বুঝিতেই পারিবে না।



আল্‌ফ্রেড

প্রধান কারণ, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা জীবিত থাকিলে তাহাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিত। ফরাসী জাতিরা যখন ইংল্যাণ্ডে বাস করিতে লাগিল এবং ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিল, তখন ইংরাজী শিখিবার পক্ষে এই বিভক্তিগুলি হইল তাহাদের প্রধান অন্তরায়, সুতরাং এই সময়ে কিছু কিছু বিভক্তি উঠিয়া গেল। এইরূপে একটু একটু করিয়া আজ ইংরাজী ভাষাতে বিভক্তি লোপ পাইয়াছে। শুধু 's, এবং বহুবচনে প্রকাশ করিবার s ভিন্ন noun-এ অন্য কোন বিভক্তি নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংরাজী ভাষা আলোচনা করিলে আমরা তিনটি কথিত ভাষা (dialects) দেখিতে পাই।, Southern English dialect, Northern English dialect এবং Midland English dialect এই তিনটির মধ্যে Midland English dialectই কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষা (Literary English) হইয়া দাঁড়ায়। ইহার প্রধান কারণ, ইংল্যাণ্ডের দুইটি



চসার

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড (Oxford) ও কেম্‌ব্রিজ (Cambridge) এবং ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে এই ভাষার চলন ছিল। রাজধানীর ভাষা বলিয়া বড় বড় লেখকেরা এই ভাষাতেই কাব্য লিখিতেন। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি চসার (Chaucer) এই ভাষাতেই তাঁহার কবিতা-গুলি রচনা করেন। চসার-এর পর হইতে সমস্ত ইংরাজ লেখকেরাই এই ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেন। যে কারণে কলিকাতার ভাষা লিখিত বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই কারণে এই Midland dialect ইংল্যাণ্ডের লিখিত ভাষা অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাষা (Literary English) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



হজরত মুহম্মদ

৬ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর নানা দেশে যে-সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমাদের ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ। এই ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতার নাম হজরত মুহম্মদ। মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ আরবদেশের মক্কা নগরীতে কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল—মহাত্মা আবদুল্লাহ। আর পিতামহ ছিলেন—মহানুভব আবদুল মুত্তলিব। মুহম্মদের মাতা আমেনা বিবি রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ও গুণশালিনী মহিলা ছিলেন। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মুহম্মদের জন্ম হইয়াছিল।

মুহম্মদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। হজরতের বয়স যখন চারি মাস, সে সময়ে আমেনা বিবি পরলোক গমন করেন। মাতা-পিতৃহীন মুহম্মদের লালনপালনের ভার পড়িল তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মুত্তলিবের উপর। আবদুল্লাহ পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন বলিয়া তিনি পিতা আবদুল মুত্তলিবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আবদুল মুত্তলিব প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। ঐরূপ নিদারুণ শোকের সময় হজরতকে পাইয়া শোকের ভিতরও মহাপ্রাণ মুত্তলিবের প্রাণে শান্তি আসিয়াছিল। তিনি শিশু মুহম্মদের পবিত্র মুখে পুত্র আবদুল্লার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তিনি পরিজনদিগকে বলিতেন, "তোমরা মুহম্মদকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এই সুন্দর শিশুই আমার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইবে।" কিছুদিন পরে প্রতিপালক পিতামহ আবদুল্লাহ মত্তলিবেরও মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে স্নেহপরায়ণ পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তালেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। স্নেহপরায়ণ আবু-তালেব তাঁহাকে এমনই যত্ন করিতেন যে, মুহম্মদ একদিনের জন্যও পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ বা অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই।

আবু-তালেবের আশ্রয়ে মুহম্মদের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইল। কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া দেশে গমন করেন। এ-সময়ে তাঁহার বয়স চতুর্দশ বৎসরের বেশী ছিল না, কাজেই, দেশী ভাষা ভিন্ন বিদেশী ভাষা কিছুই জানিতেন না, এজন্য সিরিয়া গমন তাঁহার পক্ষে তেমন প্রীতিজনক হয় নাই। সিরিয়াতেই কিশোর মুহম্মদ খৃষ্টানদের সংসর্গে আসিয়াছিলেন।

কোন বিদ্যালয়ে মুহম্মদের শিক্ষা লাভ হয় নাই। তাঁহার জন্ম সময়ে আরবদেশের লোকেরা লিখিতে পড়িতে জানিতেন। মুহম্মদ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রতিভা এবং প্রকৃতির অভিনব বৈচিত্র্য ও সৃষ্টি রহস্যের ভিতর দিয়া তাঁহার মন ও প্রাণ [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। সেই শৈশব-

কালেই তাঁহার চিন্তাশীলতা, সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার জন্য সর্ব্বত্র তাঁহার সুযশ ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও বিশ্বস্ততার জন্য সাধারণের কাছে তিনি আমিন নামক গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যেমন মুহম্মদের বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তেমনি এই নবীন যুবকের সৌন্দর্য্য, জীবিকার্জ্জনের পরিশ্রমে অনুরক্তি এবং জ্যোতির্ম্ময় তেজোদীপ্ত বদনমণ্ডলের প্রভায় মক্কার লোকেরা তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সে-সময়ে মক্কায় খাদিজা নামে এক বিপুল ঐশ্বর্য্য-শালিনী বিধবা বাস করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া নানা দেশ বিদেশের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। খাদিজার একজন বিশ্বস্ত কার্য্যাধ্যক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি লোকের মুখে মুহম্মদের সাধুতা ও সত্যবাদিতার বহু সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া একদল লোকের সহিত সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতিশয় বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। খাদিজা মুহম্মদের নির্ম্মল চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধা হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে হজরতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। এই শ্রদ্ধা ক্রমে অনুরাগে পরিণত হইল। খাদিজা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। তৎকালে মুহম্মদ পঁচিশ বৎসরের যুবক। খাদিজার বয়স চল্লিশ বর্ষেরও অধিক হইয়াছিল। খাদিজা এই দরিদ্র ও সহায়-সম্পদহীন যুবকের পরিণয়প্রার্থিনী হইলেন। হজরতের মত দরিদ্রের পক্ষে সম্পদশালিনী রমণী লাভ একান্ত দুর্লভ ছিল। সুতরাং, আবু-তালেব আনন্দের সহিত খাদিজার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে শুভলগ্নে, শুভক্ষণে সৌভাগ্যবতী খাদিজার সহিত মুহম্মদের শুভবিবাহ সম্পাদিত হইল। এই বিবাহে দুইজনেই অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। যতদিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, ততদিন একদিনের জন্যও তাঁহাদের প্রেম শিথিল হয় নাই। খাদিজার গর্ভে ইমাম হোসাইনের জননী, হজরত ফাতেমা বিবি জন্মগ্রহণ করেন। খাদিজা হজরতের সহিত পরিণীতা হইয়া পঁচিশ বৎসর কাল জীবিতা ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে হজরত আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মুহম্মদ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনার জন্য মনোযোগী হইলেন। এই বিশাল সৃষ্টির অন্তরালে কোন্ অজ্ঞাত শক্তি কাজ করিতেছে, কাহার ইঙ্গিতে মানুষের এই সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ, কে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, এই সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। মক্কার অনতিদূরে হেরা নামক একটি পর্ব্বত আছে, তিনি সেই পর্ব্বতের এক নির্জ্জন গুহায় বসিয়া কেবল পরমার্থ চিন্তা করিতেন। এইরূপ ধ্যাননিরত ভাবে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। একদিন তাঁহার নিকট সত্যের জ্যোতিঃ বিভাসিত হইল। একদিন তিনি একাগ্রমনে ধ্যানমগ্ন থাকিতে থাকিতে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাদেশ (অহী) লাভ করিলেন। এই সময়ে মুহম্মদ একদা খাদিজাকে বলিলেন, "আমি পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৃপা লাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয়-অন্ধকার দূর হইয়াছে। আমার মানস-নয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাবা মন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল নির্জ্জীব পদার্থ মাত্র। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। তিনি মহান, জীবন্ত ও সত্যস্বরূপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা। তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন। (লায় ইলাহা ইল্লাহ) এক ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও আরাধনা করিতে নাই।"

এই মহাসত্য লাভের পর তিনি মনুষ্য মাত্রকেই এই সত্যলাভের অধিকারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মুহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য মনোযোগী হইলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত এই নবধর্ম্মের নাম —ইস্‌লাম ধর্ম্ম। হজরত মুহম্মদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম খাদিজা বিবি, এবং বালকদের মধ্যে আবু-তালেবের দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক পুত্র আলী এবং পুরুষদের মধ্যে আবু-বাকর সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হজরত আবু-বাকর কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বনামখ্যাত ও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিন বৎসর কাল ধর্ম্ম-প্রচারের পরও মক্কা নগরীতে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা চল্লিশ জনের বেশি হয় নাই।

তিন বৎসরের পর শিষ্য-সংখ্যা চল্লিশে পরিণত হইলে মহাত্মা আবু-বাকর সিদ্দিক তাঁহাকে প্রকাশ্য-ভাবে আরববাসীদের সমক্ষে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মুহম্মদ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা করিবার জন্য আরবদেশের শ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবা মন্দিরে গমন করিলেন। আবু-বাকর প্রথমে

একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলেন, তারপর পৌত্তলিক ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সে-সময়ে আরব দেশের লোকেরা নানা কুসংস্কারে অন্ধ ছিল, ঈশ্বর কি, তাহা জানিত না, তাহারা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করিত। কাজেই, উগ্রস্বভাব আরবগণ তাহাদের ধর্ম্মের নিন্দা শুনিয়া বিধর্ম্মীদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে আসিয়া লোক জড় হইতে লাগিল। কাবা মন্দির মুহম্মদের দলস্থ সকলের আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল। দয়ার্দ্রচিত্ত তালিব পরিবারের লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিল। সেদিন ইহাদের সাহায্য না পাইলে মুহম্মদ ও তাঁহার অনুচরগণের জীবন রক্ষাই অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্যমে এইরূপ অনর্থ ঘটিলেও মুহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ একদিনের জন্যও ভগ্নোৎসাহ হন নাই। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁহারা পুনরায় নবোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য-সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

এদিকে কোরাইশগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ইসলামী দলের প্রতি ভীষণ শত্রুতা করিতে লাগিল। তাহাদের কাছে অল্পসংখ্যক ইসলামগণের নির্য্যাতনের পরিসীমা রহিল না। সে সময়ে মক্কার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উমিয়ার বেলাল নামে এক ক্রীতদাস ছিল। বেলাল ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহার নির্য্যাতনের অবধি ছিল না। নানারূপ অমানুষিক যন্ত্রণা সহিয়াও বেলাল ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। অবশেষে মহানুভব আবু-বাকর তাহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দেন। সেই হইতে বেলাল স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া গিয়াছে। হজরত মুহম্মদ ত্রয়োদশ বৎসর কাল মক্কায় বাস করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু তাহাতে আরবদের মনে এই নূতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা জন্মিল না, তবে তাহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে মক্কার অনেকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কার বাহিরেও কোন কোন স্থানে ইসলাম ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল। হজরত মুহম্মদ দেখিলেন যে, ত্রয়োদশ বৎসর কাল মক্কায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও সাফল্যলাভ করিতে পারিলেন না, এবং বিরুদ্ধবাদী



কাবা

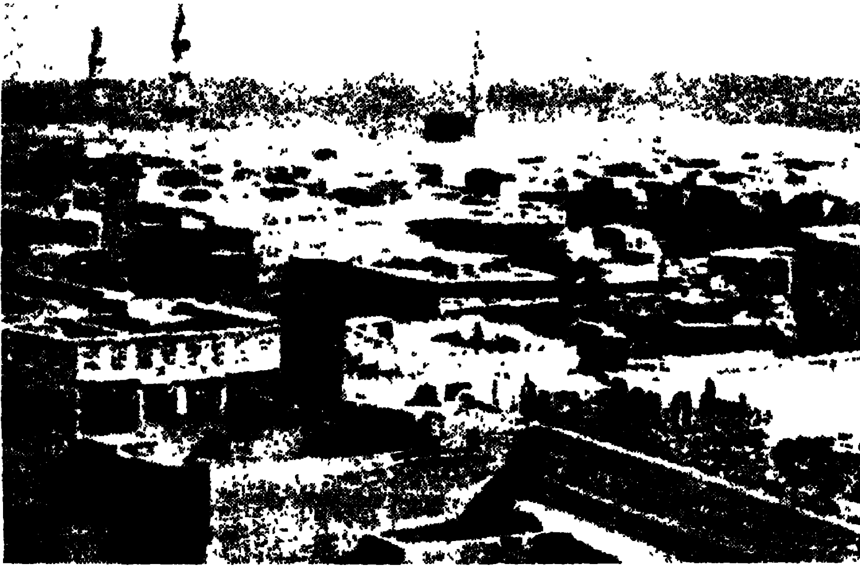
কোরাইশদের উৎপীড়ন সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এজন্য তিনি শিষ্যবৃন্দসহ মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। মদিনাবাসীরাও পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সাহায্য লাভের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। হজরতের আদেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্যগণ ক্রমশঃ মক্কার মায়া ত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রস্থান করিলেন। একে একে সকল মুসলমান চলিয়া গেলে সর্ব্বশেষে হজরত ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুলাই (৮ই রবিউল আওয়াল) মাসের বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে

মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় হইতেই হিজরীসনের গণনা আরম্ভ হয়।

হজরত মদিনার প্রান্তভাগে কোবা নামক স্থানে তিন দিবস বিশ্রাম করিয়া ষোড়শ তারিখে শুক্রবার দিন মদিনায় প্রবেশ করিলেন। মদিনা নগরবাসীরা প্রত্যেকে নিজ বাসগৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হজরত হাসিমুখে সকলকে কহিলেন, "আমার বাহন এই উট যেস্থানে দাঁড়াইবে, আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করিব।" অবশেষে তাঁহার বাহন আবু আইউবের গৃহদ্বারে গিয়া বসিয়া পড়িল। আবু আইউব মহা আনন্দের সহিত উটের পিঠ হইতে সমস্ত জিনিষ-পত্রাদি নামাইয়া স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন।

এই মদিনা হইতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। এখানেই তিনি সম্মিলিতভাবে উপাসনার জন্য মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মস্‌জেদ নির্ম্মাণ-কার্য্যে তিনি স্বয়ং যোগদান করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম জগতের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মমন্দির নয়নরঞ্জন কারুকার্য্যে সৌন্দর্য্যশালী হইল না। মস্‌জেদের প্রাচীর ইষ্টক ও কর্দ্দমে এবং ছাত খর্জ্জুর-পত্রে নির্ম্মিত হইল। এই জাঁকজমকহীন মস্‌জেদের অনুষ্ঠান ক্রিয়াদিও বিনা আড়ম্বরে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এই মস্‌জেদের একাংশ নিরাশ্রয় লোকদের জন্য নিরূপিত হইল। হজরত সর্ব্বদা এই মস্‌জেদে উপাসনা করিতেন এবং সময় সময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

হজরতের অসাধারণ মহত্বপ্রভাবে ধীরে ধীরে ইস্‌লামের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বহু লোক আগ্রহের সহিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিল। হজরত এ সময়ে মদিনার অনুরক্ত শিষ্য গণের সাহায্যে একটি ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়া উক্ত ধর্ম্মমণ্ডলীকে রাজ-শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ, সাম্যবাদ এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মিতা, অলৌকিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কথা ক্রমশঃ আরব দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এজন্য আরব দেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে দ্রুতগতিতে আরব দেশের নানা স্থানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।



মদিনা

হজরত মুহম্মদ মক্কা হইতে আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান বলিয়া এই স্থান প্রসিদ্ধ

এদিকে দেশে দেশে মুহম্মদের নাম ও যশঃ এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম যতই প্রসার লাভ করিতে লাগিল, ততই তাঁহার জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরাইশ সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

হজরত মুহম্মদ পাঁচ বৎসর কাল মদিনায় থাকিবার পর শিষ্যদের সহিত মক্কাদর্শনে গমন করেন। এই সময়ে কোরাইশদের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি ইতিহাসে 'হোদয়বিয়া'র সন্ধি নামে খ্যাত হইয়াছে। মুহম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ও প্রচারক আবু-বাকর বলিয়াছেন, "হোদয়বিয়া'র সন্ধি স্থাপন জন্য ইসলাম ধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় নাই।" এ সময়ে মক্কাবাসী অসংখ্য

নরনারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সন্ধির পর বৎসর তিনি পুনরায় মক্কা দর্শনের জন্য গমন করেন। এইবার মক্কার সমস্ত নরনারীকে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মক্কায় ইস্লাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শীঘ্রই আরবদেশের সর্ব্বত্র ইস্লাম ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

ইস্লাম ধর্মের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে। এজন্য হজরত মুহম্মদের আদেশে মুসলমানগণকে তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে তের বার কোরাইশ্‌দের বিরুদ্ধে, ছয় বার ইহুদীদের বিরুদ্ধে, দুইবার খৃষ্টানের বিরুদ্ধে এবং বারো বার বারোটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। ইস্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশ ও ইহুদীদের শত্রুতাই ছিল সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের নাম যাহাতে পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, সেজন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। হজরত মুহম্মদ ও মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ যে তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মুহম্মদ পনেরবার তাঁহাদের সঙ্গী ছিলেন।

মুহম্মদ শেষ বার বার হাজার সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর নিকট কোরাইশরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয় শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণার দ্বারা তাহাদিগকে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হজরত মক্কায় প্রবেশ করিলে পর মক্কার নেতারা দণ্ডের ভয়ে ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি ভাবিতেছ? তাহারা উত্তর করিল—হে ক্ষমতাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। মুহম্মদ বলিলেন—"প্রাচীনকালে মহাত্মা ইউসফ, উৎপীড়নকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সেই কথাই বলিতেছি। তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" মুহম্মদের এইরূপ সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কাবাসী ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।



মক্কা

কিছুকাল মক্কানগরীতে অবস্থানের পর হজরত পুনরায় মদিনায় গমন করিলেন। দূর হইতে মদিনা দেখিয়া তিনি মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"জগদীশ্বরই মহৎ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, এক ঈশ্বর

ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি তাঁহার সামান্য দাসের সহায় হইয়া পাপ ছিন্নভিন্ন করিয়া ধর্মস্থাপন করিয়াছেন। চল, এখন আমরা ঘরে ঘরে বসিয়া তাঁহার উপাসনা করি।"

এইবার মদিনায় পৌঁছিবার পর হইতেই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। যৌবনে ভীষণ উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া এবং প্রৌঢ় বয়সে অনবরত অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহে নিরত থাকার দরুণ তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সহসা এক দিন রাত্রিতে তাঁহার ভীষণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল কিছুতেই সে বেদনার উপশম হইল না। দ্বিতীয় দিবস তিনি জ্বর রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে পীড়িত অবস্থায়ও হজরত মসজেদে যাইয়া মুসলমানদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ উপদেশ যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলিয়াছিলেন—"হে মুসলমানগণ! তোমরা চিরকাল একতাবদ্ধ হইয়া থাকিও। তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মান ও প্রেম করিও এবং বিপদে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিও। ঈশ্বরের উপাসনা প্রার্থনা ও সৎকার্য্যেই মানব চিরসৌভাগ্যবান হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মানুষ নরকগামী হয়।"

ক্রমে শেষের সে দিন আসিল। ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন সোমবার ১২ই রবিউল আওউয়াল মাসে হজরত এই অনিত্যধাম ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিন দিন, তিন রাত্রি সেই পবিত্র শবদেহ কবরস্থ করা হইল না। দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে মুসলমানেরা আসিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করিল। তিন দিবস পরে হজরতের পবিত্র শব মসজেদের সংলগ্ন পত্নী আয়েসা বিবির গৃহে সমাহিত হইল।

হজরত মুহম্মদের পুণ্যজীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। মুহম্মদ আত্মীয় স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান্ ছিলেন, তিনি দাস-দাসীর সঙ্গে অতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর আনস নামে একজন ভৃত্য বলিয়াছিলেন,—আমি দশ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি, তিনি একদিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালকবালিকারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালকবালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য এক দিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

হজরত মুহম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন। শবাধার দেখিলেই বহন করিয়া সমাধিস্থানে লইয়া যাইতেন, ক্রীতদাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণবস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন. অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎকালে হস্তমর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখনও প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার ন্যায় মুক্ত হস্ত বীর-হৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয়দান করিতে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীনহীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে পথিমধ্যে ধরিয়া তাহাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিত। গরীব দুঃখীর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপন করিত। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে একদিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিতেন।

হজরত মুহম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময় কেবল খর্জ্জুর ও জল তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিত না। পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসুখ মুহম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধাবিভক্ত আরব জাতির ঐক্যবন্ধন মুহম্মদের প্রতি কার্য্যের মূল-মন্ত্র ছিল। তাঁহার সকল জীবন; তিনি স্বীয় মূলমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হজরত মুহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সমুদয় প্রত্যাদেশ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই কোরাণ শরীফ নামে বিখ্যাত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিত।

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা এসিয়া, ইউরোপের স্পেন এবং আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের এক জাতির পর আর এক জাতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করেন।

হজরত মুহম্মদের বাণী

আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মুহম্মদ আল্লার প্রেরিত। (লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্ মুহম্মদ-র্ রসুল-ল্লাহ্)

* * *

জগদীশ্বরই মহৎ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর উপাস্য নাই। তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা এবং তিনিই মহৎ ও মহীয়ান্।

তোমরা একে অপরের ভ্রাতা ইসলামধর্ম্মাবলম্বী-মাত্রেই এক ভ্রাতৃমণ্ডলীর লোক

জ্ঞানিগণকে সম্মান করিলে, আমার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

* * *

মুসলমানের অকপটতার প্রমাণ এই যে, সে (তাহার) কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনোযোগ প্রদান করে না।

* *

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এবং সমস্ত দিন তোমাদের কর্ম্ম ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে।

* * *

যে নিজের জন্যও পরিশ্রম করে না বা অপরেরও কোন কার্য্য সম্পাদন করে না, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না।

যাহারা সাধুভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়।

* * *

রমণীগণকে সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে।

ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন—যাহারা বিপৎপাতে অধীর হয় না এবং অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তাহারা সদ্গুণের অনুষ্ঠানকারী।

* * *

যে ব্যক্তি কথা বলিবার সময় মিথ্যা কথা বলে, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তাহার নিকট কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখিলে তাহা আত্মসাৎ করে, সে আমার কেহই নহে—বরং প্রকৃত পক্ষে সে [আমার] বিরুদ্ধাচারী।

* * *

দক্ষিণ হস্ত যাহা প্রদান করে, বাম হস্ত জানিতে পারে না, এরূপ দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যে ভিক্ষা না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন।

* * *

যাহারা গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে না, কথা বলিয়া তাহার অন্যথাচরণ করে না এবং অঙ্গীকার করিয়া তাহা রক্ষা করে, তাহারাই বিশ্বাসী [অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান]।

* * *

শত্রুকে যে ক্ষমা করিতে পারে ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন।

* * *

প্রতিবেশীর প্রতি আপনার বন্ধুর মত ব্যবহার করিবে ও আত্মীয়ের ন্যায় সেবা করিবে।

* * *

এক ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। হজরত মুহম্মদ সেই সত্যধর্ম্ম প্রদর্শক।

কি ও কেন

গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় কেন ?

৬৪০ পৃষ্ঠার পর

আমাদের শরীরের ভিতর ভৌতিক (physical) ও রাসায়নিক নানান্ রকম ব্যাপার সর্ব্বদাই চল্‌ছে। এই ব্যাপারগুলি ঠিকভাবে চল্‌তে হ'লে একটা বিশেষ তাপের প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের শরীরে যে তাপ বর্ত্তমান থাকে তা এই সব ভৌতিক ও রাসায়নিক ব্যাপারগুলি চলবার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত। কোনও আগন্তুক কারণে আমাদের শরীরের এই স্বাভাবিক তাপ যদি বেশী হ'য়ে যায়, তখন আমাদের গায়ের চামড়া বা ত্বকের লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়ে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হবার চেষ্টা করে—ফলে, আমাদের গা আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। এ'কেই আমরা সাধারণতঃ বলি ঘাম হওয়া।

আমাদের শরীরে অসংখ্য মাংসপেশী আছে তা তোমরা জান। এই মাংসপেশীগুলিই মস্তিষ্কের একটা বিশেষ স্থানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপকে বর্ত্তমান রাখে। এই বিশেষ স্থানটির নাম দেওয়া যাইতে পারে মস্তিষ্কের "উত্তাপ পরিচালক কেন্দ্র" বা ছোট করে "উত্তাপ কেন্দ্র"। যদি কোন কারণে বাইরে ঠাণ্ডা বেশী থাকে তবে ঠাণ্ডা হবার সাধারণ নিয়মানুসারে আমাদের শরীর থেকে খুব অনেকটা উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্তের তাপমাত্রা কমে যায়। এই শীতলতাপ্রাপ্ত রক্ত যখন মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে "উত্তাপ কেন্দ্রে" পৌঁছায় তখন সে অর্থাৎ মস্তিষ্ক সাড়া দিয়ে উঠে—"কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে।" আর মস্তিষ্কের দূতরূপী যে অসংখ্য স্নায়ুমণ্ডলী আছে তাদের দিয়ে সে মাংসপেশীদের আদেশ দিয়ে পাঠায় যে, "তোমরা আরও বেশী ক'রে উত্তাপ তৈরী কর"। এখন শরীরের কলকব্জা যদি সব ভাল অবস্থায় থাকে, তবে অল্পকালের মধ্যেই শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ফিরে আসে।

অন্যপক্ষে, বাইরে যদি খুব গরম থাকে, (যেমন আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে দেখ্‌তে পাওয়া যায়) তখনও আমাদের শরীরকে তার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়া আন্‌বার জন্যে মস্তিষ্কের তাপকেন্দ্রের কয়েকটা উপায় আছে। প্রথমতঃ সে আমাদের মাংসপেশীদের হুকুম দেয় যে, "তোমরা বেশী সক্রিয় হো'য়ো না—যথাসম্ভব চুপ ক'রে থাকবে।" তারাও প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বেশী নড়তে চড়তে চায় না।

সেই জন্যেই গ্রীষ্মকালে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম করতে ভেতর থেকেই অনিচ্ছা দেখা যায়। কাজে কাজেই, আমাদের শরীরের তাপও অকারণ বাড়তে পায় না। তাছাড়া গরমের সময় প্রাণিমাত্রই খুব বেশী বেশী বাতাস তাড়াতাড়ি ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে ছেড়ে দেয়। এতে ক'রেও রক্তের তাপ কমে যেতে সাহায্য পায়। কুকুর শ্রেণীর মধ্যে এই ব্যাপারটা খুবই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। একটু গরম পড়লেই তারা মস্ত বড় জিহ্বা বার ক'রে হাঁপাতে আরম্ভ করে। এই হাঁপানি হ'ল তাদের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখবার একটা আশ্চর্য্য উপায় মাত্র। এ ছাড়া

শরীরকে নিজে নিজেই ঠাণ্ডা রাখবার আর একটা অভিনব উপায় প্রাণীদের শরীরের মধ্যেই আছে। আমাদের ত্বকের নীচে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাণ্ড আছে। এদের নাম স্বেদগ্রন্থী বা sweat gl nd। তাদের কাজ হ'ল রক্ত থেকে জলীয় ভাগটাকে আলাদা ক'রে আমাদের চামড়ার নীচে জমা ক'রে দেওয়া। রক্তের তাপমাত্রা অধিক হলেই মস্তিষ্কের "তাপকেন্দ্র" এই স্বেদগ্রন্থীগুলিকে উত্তেজিত ক'রে দেয়—তখন এরা পুরোদমে নিজের কাজ করতে থাকে। আর আমরা বেদম ঘামতে আরম্ভ করি।

পাখীদের কিন্তু এই স্বেদগ্রন্থিগুলি নেই। সেই জন্য গরম বেশী পড়লে গরমের দেশের পাখীও যথাসম্ভব ঠাণ্ডা যায়গায় আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। তারাও তখন অন্য প্রাণীদের মত চুপচাপ থাকতে চায় আর বেশী বেশী নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপাবার চেষ্টা করে। এতেও সব অবস্থায় তাদের সুবিধা হয় না। তাই, প্রকৃতি তাদের জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তাদের ফুসফুসের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে আলাদা একটা বাতাসের ঘর আছে। এই ঘরের দেওয়াল, রক্ত গরম হ'য়ে উঠলেই ঘামতে আরম্ভ করে। তখন ফুসফুসের বাতাস এই ঘরের মধ্যে এসে এই ঘামকে বাষ্পে পরিণত ক'রে ভিতরটা ঠাণ্ডা করে দেয়।

খুব যখন গরম পড়ে তখন তোমাদের কি করা উচিত ?

১। অনাবশ্যক পরিশ্রম করে রক্তের তাপমাত্রা বাড়তে না দেওয়া উচিত।

২। অবাধ ভাবে ঘাম হবার জন্যে আমাদের ত্বকের ছিদ্রগুলি খুব পরিষ্কার রাখা উচিত।

৩। খুব আঁট-সাঁট বা এমন সব জামা-কাপড় বা পোষাক পরা উচিত নয় যাতে করে আমাদের শরীরের উত্তাপ বের হ'তে অসুবিধা হয়।

৪। সেই সব খাদ্য আহার করা উচিত, যাতে করে আমাদের রক্তের তাপমাত্রা কম থাকে।

জন্তু-জানোয়ারেরা চিন্তা করতে পারে কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে চিন্তা করা এই কথাটায় আমরা কি বুঝি, তাহা স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রকৃতির সম্পর্কে এসে আমাদের মন যে সাড়া দিয়ে ওঠে তার নাম "অনুভূতি"। এইরূপ একাধিক অনুভূতি নিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম "চিন্তা"। আমরা সাধারণতঃ অনুভূতি আর চিন্তার মধ্যে ভুল ক'রে বসি।

পরের দুঃখ দেখে আমাদের মনে একরকম ভাব হয়। এই ভাবটার নাম আমরা বলি, করুণা। করুণা একটা অনুভূতি। কিন্তু যখন আমি বলি "আমার মনে করুণার সঞ্চার হয়েছে," তখন তাকে আর অনুভূতি বলা চলে না, কারণ তখন "আমি" অনুভূতির সঙ্গে "করুণা" অনুভূতিকে এক ক'রে দেওয়া হ'ল। এখন তা হ'য়ে উঠল "চিন্তা"। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে এই অনুভূতি ব্যাপারটাই। প্রচরভাবে পাওয়া যায়। একাধিক অনুভূতিকে তারা যে এক ক'রে দিয়ে একটা চিন্তা তৈরী করেছে—এমন সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু তারা যে দুটো বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে কখনও চিন্তা ক'রতে পারে না, এমন নয়। কখনও কখনও, বিশেষ ক'রে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরা এমন সব কাজ ক'রে বসে, যার পিছনে তাদের চিন্তা আছে, এ না স্বীকার করলে চলে না। কুকুরের, ঘোড়ার বা বানরের সম্বন্ধে এমন অনেক গল্পই প্রসিদ্ধ আছে—যা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের সামান্য চিন্তা করবার শক্তি আছে। কিন্তু পাখীরাও যে কখনও কখনও চিন্তা করার দৃষ্টান্ত দেখায়, তা বড় অদ্ভুত। আমি উপকথার শুকপাখীর কথা বলছি না। উপকথার শুক ত মানুষের চেয়ে ঢের বেশী চিন্তা ক'রতে পারত। আমি যে গল্প তোমাদের বলছি, তা উপকথার নয়—সত্যিকারের। এটা একটা কাকের গল্প—এই কাকটা ৫ পর্য্যন্ত গুণতে শিখেছিল। কেউ তাকে শেখায়নি, সে আপনা-আপনিই শিখেছিল। কাকটা আমেরিকার একটা গীর্জ্জার ডোমে (dome) বাসা বেঁধেছিল। গীর্জ্জার রক্ষক যখনই গীর্জ্জায় ঢুকে কাকটাকে মারবার উদ্দেশ্যে ডোমে ওঠবার চেষ্টা ক'রত, তখন সে নিকটস্থ একটা গাছে গিয়ে বস্‌ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে লোকটা গীর্জ্জা থেকে বেরিয়ে না আস্‌ত, ততক্ষণ সে নিজের বাসায় আর যেত না। গীর্জ্জারক্ষক তখন বুদ্ধি করে একজন সাথী নিয়ে ঢুকে নিজে বেরিয়ে এল। কাক শুধু একজনকে বের হতে দেখে গাছেই বসে রইল। যখন দ্বিতীয়টিও বেরিয়ে এল, তখন উড়ে নিজের বাসায়

গেল। এমনি করে ৩।৪।৫ জন লোক পর্য্যন্ত নিয়ে গীর্জ্জা-রক্ষক তাকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কাক যতক্ষণ সব লোক না বেরিয়ে এল ততক্ষণ বাসায় গেল না। অবশেষে ছয়জন লোক একসঙ্গে গীর্জ্জায় ঢুকল, আর এক এক ক'রে বেরিয়ে আস্‌তে লাগল। কাক গাছে বসে কিন্তু গুণ্‌ছে। যখন ৫ জন লোক বেরিয়ে এল, তখন সে নির্ব্বিবাদে উড়ে গিয়ে বাসায় বসল। এবারে কিন্তু ষষ্ঠ লোকটিকে গুণ্‌তে পারেনি। এই কাকটা পশু-পক্ষীদের ভিতর চিন্তা করায় অনেক দূর এগিয়েছিল, বলতেই হবে।

চুল পাকে কেন ?

পাকা চুলের অর্থ সাদা হ'য়ে যাওয়া বা সাদা দেখানো। কোনো জিনিষের ওপর সূর্য্যের আলো প'ড়ে যদি তার সবটাই প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে আসে তবেই সেই জিনিষটা সাদা দেখায়। সমুদ্রের জল ত নীল, কিন্তু সেই জলই যখন ফেনা হ'য়ে দেখা দেয় তখন পরিষ্কার সাদা হ'য়ে যায়। বোতলের মধ্যে যখন সোডা ওয়াটার থাকে তখন তা জলের মত বর্ণ-হীন থাকে—কিন্তু কাচের গেলাসে ঢাললেই সেটা ফেনায় ফেনায় ভ'রে ওঠে ও কেমন সাদা দেখায়। তোমরা অনেকেই ত জলে সাবান গুলে, ফাঁপা কাঠির মুখে সেই জল নিয়ে বড় বড় বুদ্‌বুদ তৈরী করতে জান। কেমন চমৎকার চক্‌চকে সাদা বলের মত দেখতে হয়—না ? সাদা কেন হয় বলতে পার ? বুদ্‌বুদের আরশির মত পালিশ-করা দেওয়াল থেকে সব আলো প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে আসে ব'লে তাই সাদা দেখায়। অবশ্য বুদ্‌বুদের দেয়াল খুব পাতলা হ'লে নানান্ রং দেখতে পাওয়া যায়—সে অবশ্য অন্য কথা। এখন সমুদ্রের ফেনা বা সোডা ওয়াটারের ফেনার দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, তখন জল দিয়ে হাজার হাজার ছোট ছোট বুদ্‌বুদ তৈরী হয়েছে। এই বুদ্‌বুদগুলি চক্‌চকে দেয়ালে ধাক্কা লেগে আলোর সবটাই তোমাদের কাছে ফিরে আসছে। এই জন্যেই ফেনা সাদা দেখায়।

তোমরা লিলি বা রজনীগন্ধা ফুল অনেকেই দেখেছ ? কেমন চমৎকার সাদা সাদা পাপড়ি দিয়ে তৈরী এই ফুলগুলি ! এদের এই রকম সাদা হওয়ার মূলেও, অনেকটা সাদা হওয়ার যে কারণ, সেই কারণই বর্ত্তমান। এদের পাপড়িতে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মত পালিশ করা ঘর তৈয়ারী করা আছে। ফেনার বুদ্‌বুদ যেমন চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ অবশ্য তেমন পাওয়া যায় না—অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে তবেই ধরা পড়ে। তোমরা যদি এই পাপড়িগুলি জোর ক'রে টিপে এই ঘরগুলির দেয়াল ভেঙ্গে ফেল, তবে এর আলো ফিরিয়ে দেবার শক্তি কমে যায়। সেই জন্যই রজনীগন্ধার পাপড়ি টিপ্‌লেই বিবর্ণ হ'য়ে পড়ে। আমাদের চুলও যখন সাদা হবার উপক্রম করে, তখনও তার মধ্যে এমনই ছোট ছোট বাতাস ভর্ত্তি কুঠরী (cell) তৈরী হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় কুঠরীগুলির জায়গায় চুলের আসল যে রং সেটা বর্ত্তমান থাকে। সাদা হবার সময় এই রঞ্জক পদার্থের (pigment) কণাগুলি পূর্ব্বকথিত ছোট ছোট গ্যাস-ভরা কোষ (cell) গুলি দিয়ে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হতে থাকে। এই কোষগুলির দেওয়ালে আলোর সবটাই প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে আসাতে চুল সাদা দেখায়।

তাই মানুষের চুল যখন সাদা হ'তে আরম্ভ হয়, তখন তার অর্থ এই যে, প্রথম অবস্থায় যে চুল তার রঞ্জক পদার্থ (pigment) নিজের ভিতর নিয়ে উঠত এখন সে আর তা পাচ্ছে না। তার বদলে গ্যাস-ভরা কোষ নিয়ে তাকে উঠে আস্‌তে হচ্ছে। কখনও কখনও আবার এমনও দেখতে পাওয়া যায় যে, ফ্যাগোসাইট (phagocyte) বলে এক রকম য়্যামি-বার মত বিচরণশীল জীব চুলের গোড়া দিয়ে উঠে চুলের রঞ্জক পদার্থ নষ্ট ক'রে ফেলে। তোমরা কেউ দেখেছ কি না জানি না, কিন্তু কখনও কখনও এমন দেখতে পাওয়া যায় যে, কারুর কারুর এক রাত্রির মধ্যেই মাথার সব চুল সাদা হ'য়ে গেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য রঞ্জক পদার্থ (pigment) সবটা নষ্ট হতে সময় পায় না। ব্যাপার হয় এই যে, রঞ্জক পদার্থগুলির ওপর এই গ্যাস-ভর্ত্তি সেলগুলির একটা আবরণ এসে যায়। ফলে চুল সাদা দেখায়।





ভারতের স্থাপত্য

(প্রাচীন কাল)

শিল্পের কথা

'শিল্প-কলা' একথা বলিলেই যে কেবল ছবি আঁকা বুঝায়, তাহা নহে। তবে শিল্প-কলাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একটিকে 'চারু শিল্প' অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা এবং অপরটিকে 'কারুশিল্প'—যেমন কাঠের, পিতলের ও কাপড় প্রভৃতি নানা জিনিষের উপর কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখানো। আমরা তোমাদের কাছে প্রথমতঃ আমাদের দেশের স্থাপত্য অর্থাৎ ঘর-বাড়ী বা বাস্তু শিল্পের কথা বলিব।

কোন্ দেশ কিরূপ সভ্য ও উন্নত, আমরা তাহাদের ঘর-বাড়ী ও তাহাদের তৈয়ারী বিবিধ শিল্পকলার ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় পাই। গ্রীস্, মিশর, বাবিলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার খবর এই ভাবে তাহাদের শিল্প-কলার ভিতর দিয়াই আমরা পাইয়াছি। তাহার মধ্যে বাস্তু শিল্পের (স্থাপত্যের) নক্সাই হইল প্রধান পরিচয়। কেননা, প্রথমে নির্ম্মিত হয় ঘর, তারপর আসে আসবাব-পত্র, তারপর ছবি টাঙ্গাইয়া সেই ঘর-বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। সব ঘর-বাড়ীতেই যে সেকালের বা একালের মানুষেরা নানারূপ চিত্রের দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিয়া তোলে, তাহা নহে। যেমন তেমন ভাবে তৈয়ারী-করা যে-বাড়ীতে বাস করা হয়, সে-বাড়ীতে শিল্পের শ্রী স্পর্শ করিতে পারে না। তাই এইরূপ বাড়ীকে আর চারু বা কারু শিল্পের কোঠায় ফেলা যায় না।

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্ত্তি

সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি-প্রাচীন সভ্যদেশ, তাই বহু প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের দেশের লোকেরা তাহাদের নিজস্ব স্থাপত্য ইট, কাঠ, পাথরের কাজ, আজ পর্য্যন্ত নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। তাই ছয়শত বৎসর মুঘল-সাম্রাজ্যের ও দেড়শত বৎসর কাল ইংরাজ সরকারের অধীনেও ভারত-শিল্পকলার প্রাণ-শক্তি মরে নাই। জঙ্গলী কাফ্রীরা যেমন তেমন করিয়া বাসা বাঁধিয়া বাস করে কিন্তু সভ্য ভারতে যে জঙ্গলী ছিল না, তার পরিচয় সম্রাট্ অশোকের তৈয়ারী ইট-পাথরের ইমারত এবং তারও পূর্ব্বেকার

পাটলিপুত্রের (পাটনা) 'শতস্তম্ভের'—চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ হইতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লোকদের কথা জানিতে পারা যায়। স্পেনদেশের প্রাচীন গুহাবাসীদের আঁকা ছবি দেখিলে মনে হয় যে, সে খুব আদিযুগ হইতেই মানুষের মনে শিল্পানুরাগ জাগিয়া ছিল—কেবল তাহা বিকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া ছিল। সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই উহার পরিণতি লাভ হইতে আরম্ভ হইল। এখনো যে-সব দেশ তমসাবৃত হইয়া আছে, সভ্যতার বিস্তার এখনও যে-সব দেশে হয় নাই, এমন আফ্রিকার কাফ্রিদের মধ্যেও কারু শিল্পের অল্পবিস্তর কারিগরি দেখা যায়। কিন্তু বাস্তু শিল্পের প্রসার, দেশ সভ্যতার উন্নত স্তরে না গেলে কখনও উন্নতি লাভ করে না।



মোহেন্-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত বাঁধানো পুষ্করিণী ও বাটী

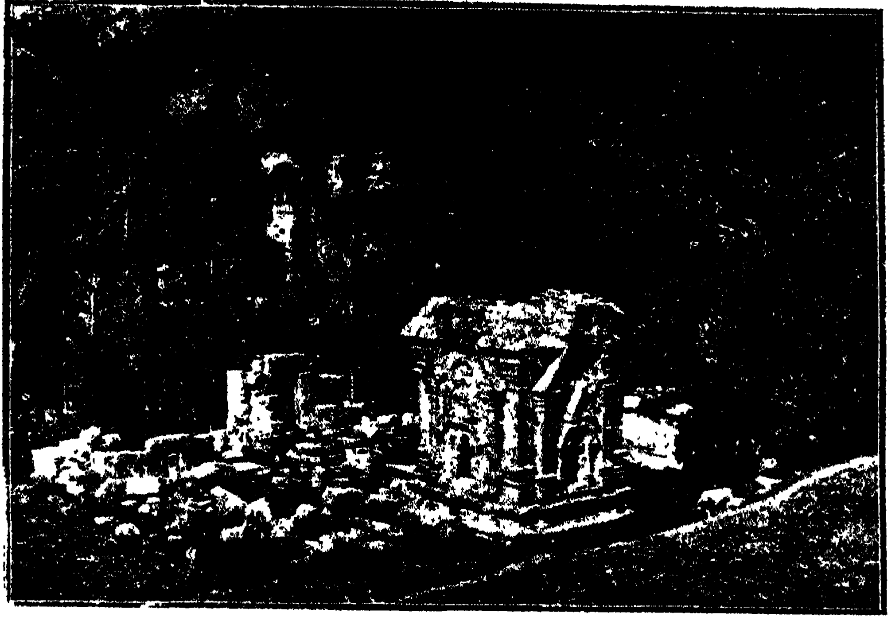
ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষে অশোকের পূর্ব্বে পাথর বা ইটের তৈয়ারী কিছুই ছিল না বলিয়া এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতা ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই যেন অশোকের বহু পূর্ব্বে তৈয়ারী মোহেন্-জো-দাড়োতে ও পাঞ্জাবের পঞ্চনদের তীরে ইট-পাথরের বাড়ী-ঘরের ভিত্তি প্রভৃতি অতি প্রাচীন শিল্পনিদর্শন সব জগতের লোকের চক্ষুর সম্মুখে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন—আর এই আবিষ্কারের জন্য আমাদের বাঙ্গলারই এক সুসন্তান, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ কৃতিত্ব ও দেশ-প্রীতি চিরকালের জন্য ইতিহাসের বুকে লিখিত থাকিবে। মোহেন্-জো-দাড়ো ও হারাপ্পার বিস্তৃত বিবরণ সার জন্ মার্শেলের প্রকাশিত প্রত্নতত্ত্বের বইয়েতে আছে; 'শিশু-ভারতী'তেও এবিষয়ে বিশদভাবে অনেক কথা বলা হইয়াছে।



স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

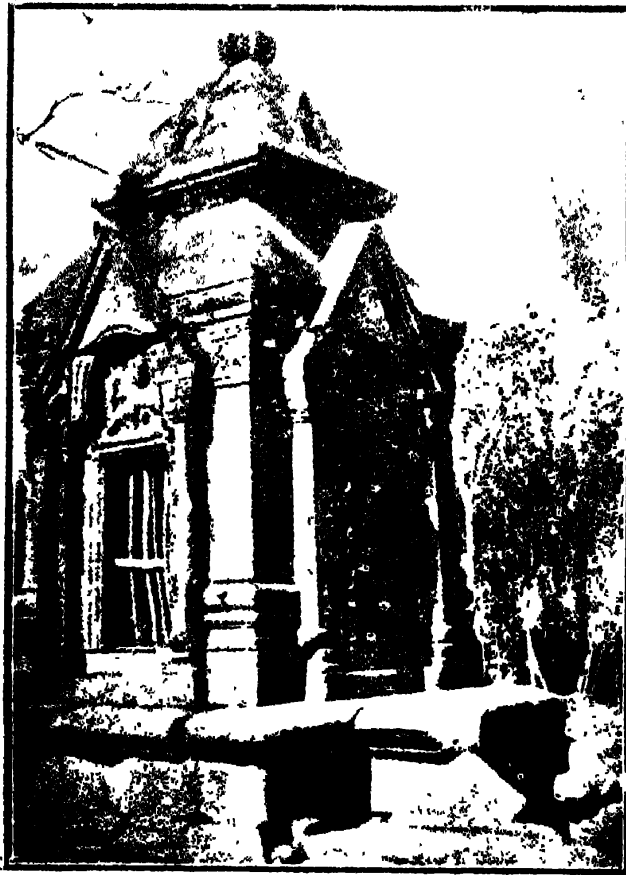
প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের দেশেও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মত গুহাবাসী

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিষয় জানা বিশেষ দরকার। এক এক যুগে স্থাপত্য এক একটি বিশেষ আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রধানতঃ তাহার দুইটি ধারা আমরা দেখিতে পাই। একটি হইতেছে প্রাচীন ভারতীয় (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের) স্থাপত্য এবং অপরটি মুঘল-যুগের স্থাপত্য-কলা। এ-সম্বন্ধে পরে



কাশ্মীর নারাস্থানের প্রাচীন গান্ধার ধরণের মন্দির

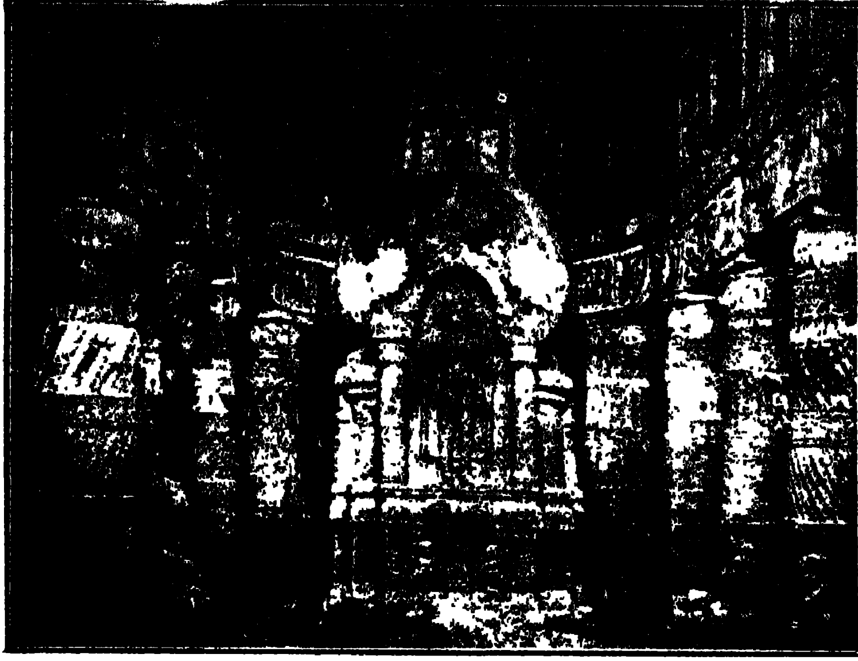
আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। গ্রীক্‌বীর আলেকসান্দের গ্রীস্ দেশ হইতে সদলবলে আসিয়া যখন কাশ্মীর ও উত্তর পাঞ্জাব জয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অনুচরদের মধ্যে যাঁহারা এই সব প্রদেশে (কাশ্মীর অঞ্চলে) স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গড়া কিছু স্থাপত্য ও শিল্পের পরিচয় তক্ষশিলার প্রাচীন ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রীক্ প্রভাব বা প্রেরণার বলেই ভারতের শিল্পপ্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া একদল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের অতি প্রাচীন কীর্ত্তি মোহেন্-জো দাড়োর আবিষ্কারের পর সে-কথা কেহ আর বলিবেন না—বলিলেও কেই-বা বিশ্বাস করিবে? এ-সম্বন্ধে তৃতীয় সংখ্যা শিশু-ভারতীতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু



কাশ্মীর পায়ারের প্রাচীন গান্ধার্য ধরণের মন্দির

পাঠক তৃতীয় সংখ্যার ১৮৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের ভারতীয় স্থাপত্যের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। তবে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতে স্থাপত্যকলায় সুশোভিত জনপদের অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, স্থাপত্যের বিষয়ে কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থাপত্য শিল্পের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়



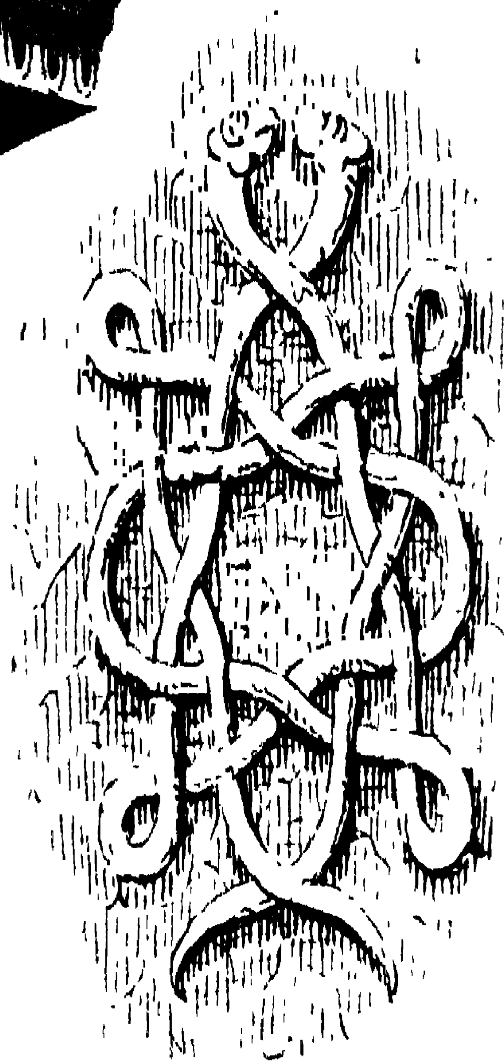
অজন্তার চৈত্যগুহার অভ্যন্তর



অজন্তা বিহার গুহার ভিতরকার অলিন্দ (বারান্দা)



পাহাড়ের গা কেটে তৈরী ইলোরার গুহা-মন্দির



ভারতীয় প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করিতে পারি।

১। বৌদ্ধ
- (১) উত্তর ভারত
- (২) দক্ষিণ ভারত
- (৩) সিংহলীয়
- (৪) ব্রহ্ম
- (৫) যবদ্বীপ, বালি, শ্যাম ও কম্বোজ
- (৬) নেপাল

২। জৈন

৩। উত্তর হিন্দু
- (১) উড়িষ্যা
- (২) বঙ্গীয়
- (৩) উত্তর ভারত

৪। তামিলি বা দ্রাবিড়

৫। কাশ্মীরী



যোগীমারা গুহা

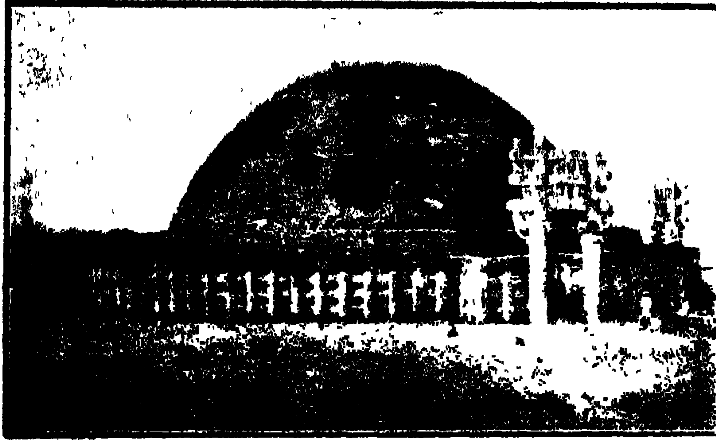
এখানে প্রত্যেক প্রকার স্থাপত্যের স্বতন্ত্র বর্ণনা সম্ভবপর নহে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধ সকলে এ-বিষয়ে ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নূতন আবিষ্কৃত চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের মোহেন-জো-দাড়োর প্রাচীন প্রাচীন স্থাপত্য চিহ্ন কীর্ত্তি ছাড়া প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন পাটলিপুত্রের (পাটনার) চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ এবং তাঁহার পৌত্র সম্রাট্ অশোকের আমলে রচিত বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলি এখনও বিরাজিত আছে। প্রাচীন যুগে ভারতে ইট্-কাঠের ঘর-বাড়ীই তৈয়ারী হইত। এই ইট এখনকার কালের সাধারণ ইটের দ্বিগুণ লম্বা বা চৌড়া (চওড়া)



ইলোরার কৈলাস গুহা মন্দিরের অলিন্দ

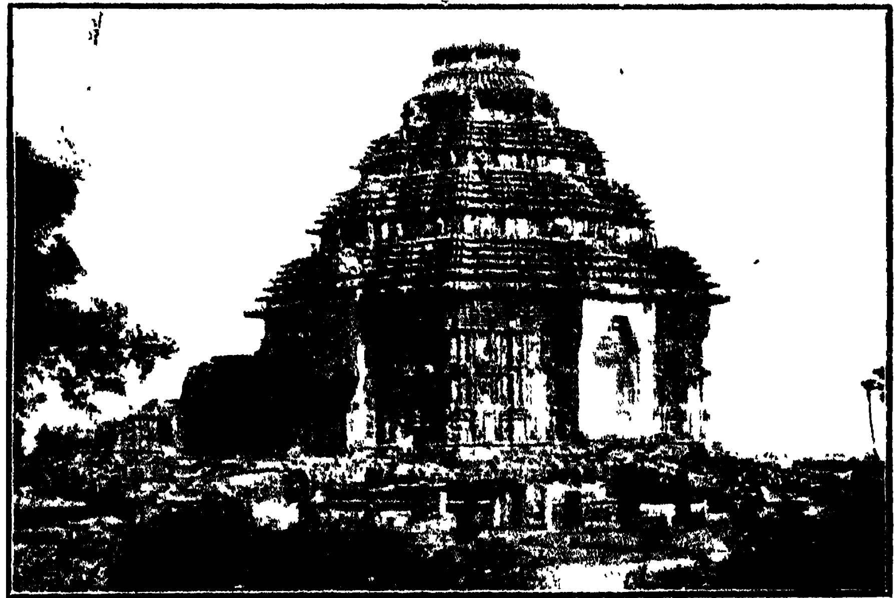
ছিল। ডাক্তার স্পুনার সাহেব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে খনন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের



সাঁচী স্তূপ

প্রাসাদটি মাটির নীচ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; তাহাতে ঐরূপ বড় ইট দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, পাটলিপুত্রের এই শতস্তম্ভ প্রাসাদটি সমসাময়িক কোনও পারস্য নৃপতির প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ মিল বা সামঞ্জস্য সব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে মিশরীয় (Egypt) শিল্পের ছায়া সন্ধান করিলেই বেশ ধরা পড়ে। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের স্তম্ভসমূহ উজ্জ্বল দর্পণের মত পালিস করা ছিল। এখন পর্য্যন্তও সে পালিস মলিন হয় নাই। ঠিক্ এই-ভাবে পালিস, গয়া জেলার অতি প্রাচীন বরাবর গুহার পাথরের দেয়ালে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ ৯০ ফুট মাটির নীচ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

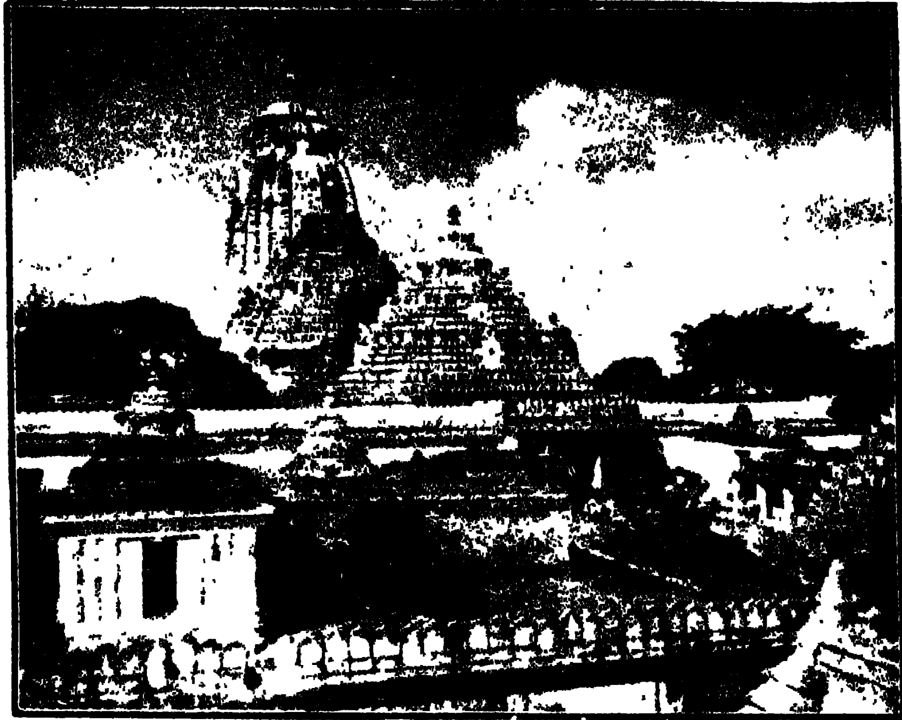
খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার অশোকের কীর্ত্তির মধ্যে সাঁচীর বিরাট ইষ্টক নির্ম্মিত বৌদ্ধ স্তূপ ও প্রস্তর-নির্ম্মিত রেলিং ও তোরণদ্বার চারটিতে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা বিষয় ও জাতকের গল্প খোদাই করিয়া অঙ্কিত আছে। স্তূপের



কণারকের মন্দির—উড়িষ্যা

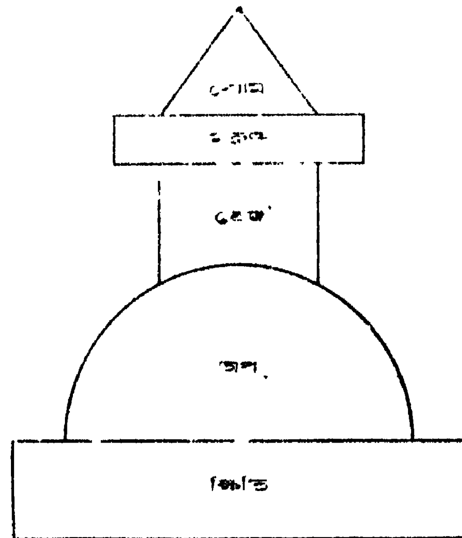
চারিপাশের বেষ্টনী বা রেলিংকে 'বেদিকা', রেলিংএর মাঝখানের পাথরগুলিকে "সূচ" আর স্তূপের পাশের রেলিঙের মধ্যে যে

মিছিল যাইবার পথ আছে, তাহাকে 'মেধী' বা 'মেধ' বলে। স্তূপটি অর্দ্ধ গোলাকার-ভাবে মাটি হইতে বাহির হইয়া থাকে। অনেকটা জলবুদ্বুদের মত আকারে। নির্ব্বাণের পর বুদ্ধের মত মহাপুরুষদের অস্থি এইরূপ আকাশের মত অর্দ্ধবৃত্তাকারে বা জলবুদ্বুদের মত আকারের আধারের নীচে রাখার প্রথা ভারতবর্ষে ঠিক কত কাল হইতে প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বৌদ্ধস্তূপ ছাড়া জৈন বা হিন্দুস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়না।

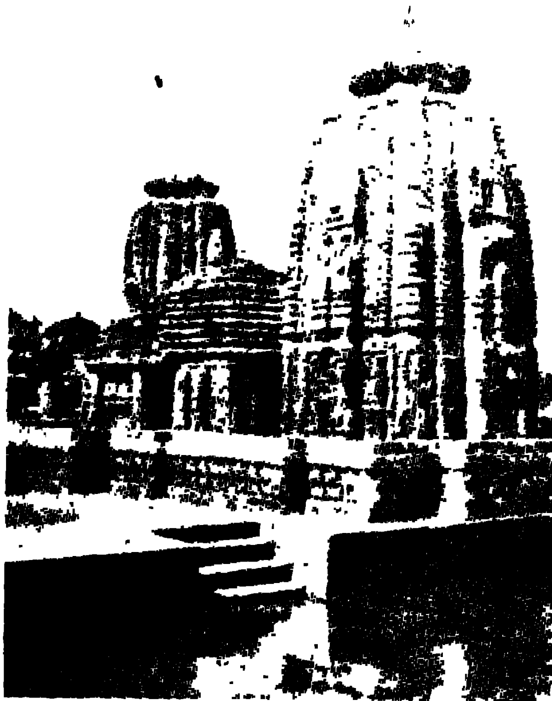


পুরীর মন্দির—উড়িষ্যা

অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে হিন্দুরা মৃতব্যক্তির অস্থি এইরূপ মাটির



স্তূপের মধ্যে রাখিতেন, কিন্তু সেগুলিকে স্থায়ী করার বিশেষ প্রয়োজন তাঁহারা



ভুবনেশ্বর মন্দির—উড়িষ্যা

বোধ করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে সবই অনিত্য-প্রতিপাদক, তাই বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বা



বরবুদরের মন্দির - যবদ্বীপ

তাঁহার পরবর্ত্তী দুই শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার স্থায়ী বৌদ্ধ-কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

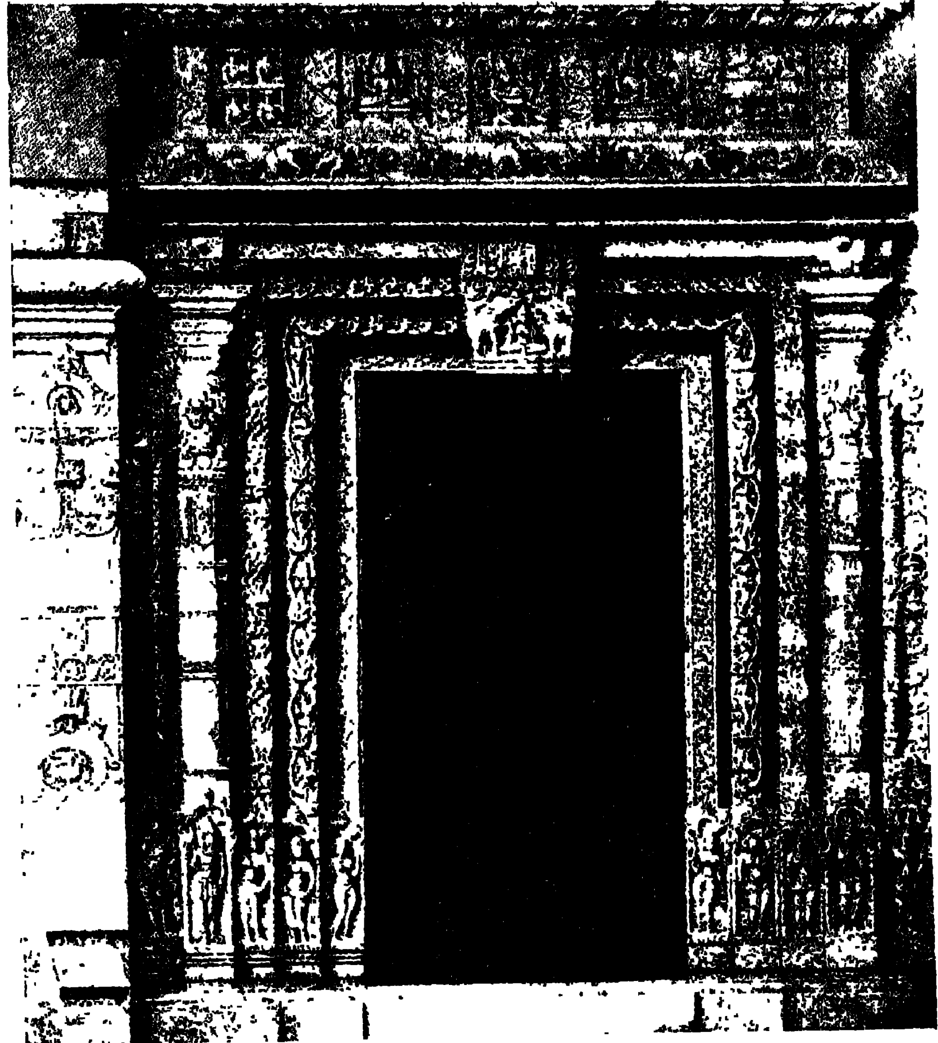
কলিঙ্গ-বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যখন জীব-হিংসা প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের দয়াধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে তিনি ভারতের নানাস্থানে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই সব স্তম্ভের উপর সেই সময়কার প্রচলিত অক্ষরে দয়াধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজাদের প্রতি অনুশাসনলিপি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময় ধর্ম্মাশোক পদব্রজে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী বন, বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি বুদ্ধদেবের চরণস্পর্শে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমে অশোক তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র (পাটনা) ছাড়িয়া গঙ্গা পার হইয়া মজঃফরপুর, চম্পারণ এবং বৈশালীতে আসেন। তাঁহার সেখানকার



কম্বোজের ঈশ্বরপুর মন্দির—কম্বোডিয়া

শুভাগমন-সূচক প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ

এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহমূর্ত্তি-ক্ষোদিত স্তম্ভ ও স্তূপগুলিতে তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণ-পথের পরিচয় এখনও নানা স্থানে দেখিতে পাই। কুশীনগরে—যেখানে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছিল, সেখানেও অশোকের শুভাগমন-সূচক অশ্বমূর্ত্তি-শোভিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের গায়ে তাঁহার সেখানে আসার খবর লেখা আছে। তারপরে তিনি কনকমুনির স্তূপের কাছে অপর একটি স্তম্ভ রচনা করান। কনকমুনি গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বুদ্ধ। অশোক রাজার এই বৌদ্ধ-তীর্থ পরিক্রমার ইতিহাস নেপাল হইতে শ্রাবস্তি স্তূপের সকল জায়গার স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে। তা ছাড়া তাঁহার অনেকগুলি ঘোষণালিপি গুহা বা স্তূপের সম্মুখে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী, এলাহাবাদ (প্রয়াগ), কার্লে গুহার সম্মুখে, সাঁচীতে, কেনরী গুহায় এইরূপ ঘোষণালিপি দেখা যায়। দিল্লীর লৌহনির্ম্মিত বিরাট 'লাট', এলাহাবাদের বিরাট স্তম্ভ সে-যুগে কি উপায়ে যে করা হইয়াছিল তাহা এখন বোঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। সম্রাট্ অশোক তাঁহার দয়াধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে সব 'লাট' বা স্তম্ভ ভারতবর্ষের নানাস্থানে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা যথাসম্ভব-রূপে দেওয়া গেল।



ধারওয়াড় জেলায় লাকুন্দির কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির—বোম্বে

১—দিল্লীর তোপ্‌রা স্তম্ভ—দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ফিরোজাবাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে অম্বালা প্রদেশের তোপ্‌রা হইতে ফিরোজ শাহ তোগলক এটিকে ফিরোজাবাদে আনেন।

২—দিল্লী মীরাট স্তম্ভ—মীরাট হইতে ফিরোজ শাহ তোগলক দিল্লীতে আনেন

৩—এলাহাবাদ স্তম্ভ—এলাহাবাদ প্রাচীন দুর্গে অবস্থিত।

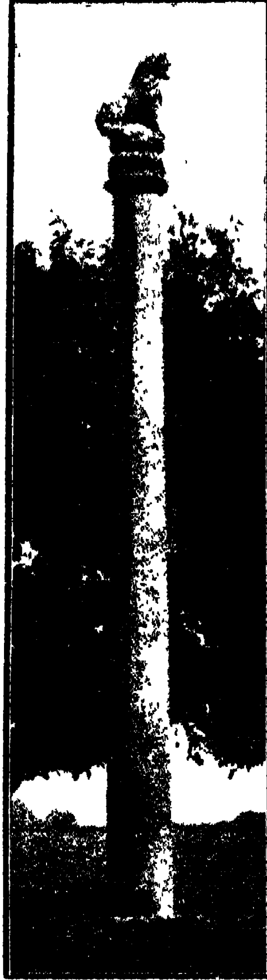
৪—লৌরিয় অরায়াজ স্তম্ভ—ভোটিয়ার পথে কেশরীর স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে আছে।

৫—নন্দনগড় স্তম্ভ—চাম্পারণ জেলার মধ্যে আছে।

৬—রামপুরওয়া স্তম্ভ—চম্পারণ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রাম-পুরওয়া গ্রামে আছে।



এলাহাবাদ স্তম্ভ



লৌরিয় স্তম্ভ

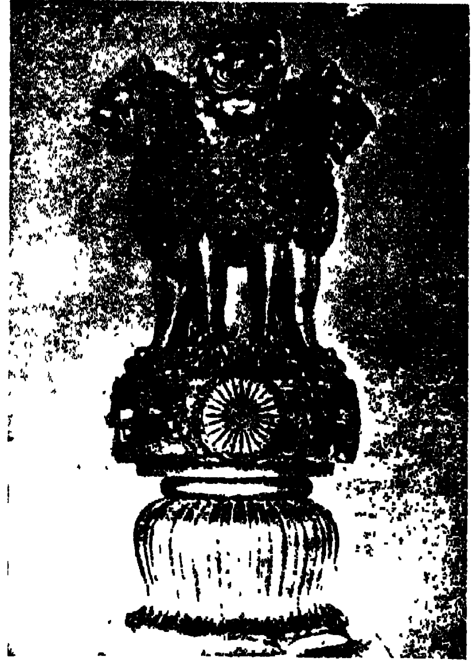
৭—সাঁচী স্তম্ভ—মধ্যভারতে রাজ্যে সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বার সম্মুখে।

৮—নীতালি স্তম্ভ—বস্তী প্রদেশে নীতালি গ্রামে আছে।

৯—রুসিন্তি স্তম্ভ—বস্তী প্রদেশের ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

১০—সারনাথ স্তম্ভ- সারনাথের যাদু-ঘরে রক্ষিত আছে।

অশোকের আমলের স্তম্ভের মত কানাড়া প্রদেশে জৈন-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় এগুলির গঠন একটু বেশী সূক্ষ্ম ধরণের।



সারনাথ স্তম্ভের সিংহচূড়া



পৃথিবীর ইতিহাস—ব্যাবিলনিয়া

(মধ্যযুগ ও নবীন সাম্রাজ্য)



হাম্মুরাবির বংশধরের পরে ব্যাবিলনিয়ার রাজশক্তি এক বিদেশী রাজবংশের হস্তগত হয়। এই রাজারা ছিলেন কাস্‌সি (কাস্‌সু)-জাতীয়। এমন কি, হাম্মুরাবির পুত্র সাম্‌সু ইলুনার (Samsu-Iluna)সময় হইতেই ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরে। দক্ষিণ পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থিত ভূখণ্ডে ইলুমা ইলু (Iluma-Ilu) নামে এক রাজা সাম্‌সু ইলুনাকে পরাজিত করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সাম্‌সু ইলুনার পুত্র আবেশু (Abeshu) তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং এই রাজবংশের এগারো জন রাজা দক্ষিণ-দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

আবেশুর পৌত্র আম্মি জাদুগার (Ammi-zaduga) রাজত্বের সময় ব্যাবিলনের প্রভাব এলামে বিস্তৃত হয়।

হিটাইটদের ব্যাবিলন অধিকার

আম্মি জাদুগা এলামরাজকে পরাজিত করেন, এবং এলাম করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। তবে ব্যাবিলনের দ্রুত পতন রোধ করা সম্ভব হয় নাই। সাম্‌সু ইলুনার সময় হইতেই কাস্‌সি জাতি বার বার ব্যাবিলন আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যাবিলন রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সাম্‌সু দিতানের (Samsu-ditana) সময় যখন উত্তর সিরিয়া এবং এসিয়া মাইনর হইতে হিটাইটেরা ব্যাবিলন আক্রমণ করে তখন তাহাদের প্রতিহত করা ব্যাবিলন রাজের শক্তিতে কুলাইল না। অতি সহজেই এই বিদেশী শত্রু রাজধানী ব্যাবিলন অধিকার করে, এবং এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মার্ডককে নিজেদের দেশে লইয়া যায় ১৯২৬ খৃঃ পূঃ)। বোধ হয় ইহার অল্পদিন পরে কাস্‌সিজাতি তাহাদের সর্দার গণ্ডাসের (Gandash) নেতৃত্বাধীনে ব্যাবিলন অধিকার করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই কাস্‌সিজাতি আর্য্য-বংশোদ্ভূত। তাহারা আসিয়া প্রথমে উত্তর ব্যাবিলনিয়ায়

কাস্‌সিজাতির ব্যাবিলনিয়া

রাজ্য স্থাপন করে। তবে অনেক-দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে তাহারা অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। সেখানে সমুদ্রকূলের রাজারা পূর্ব্বের মত স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতে থাকেন। প্রায় ১০০ বৎসর পরে (১৮শ শতাব্দীতে) কাস্‌সিবংশীয় রাজা সমগ্র ব্যাবিলনিয়ার উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন; সমুদ্রকূলের শেষ রাজা ইয়া-গ্যামিল (Ea-gamil) এলাম আক্রমণ করেন। তখন উলাম্ বুরিয়াস্ (Ulam Buriash) নামে এক কাস্‌সিসর্দার তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়া অধিকার করেন। কিছুদিন পরে দুইটি রাজ্য মিলিয়া এক অখণ্ড ব্যাবিলনিয়া রাজ্য গঠিত হয়।

যদিও কাস্‌সিজাতি সভ্যতার পরিমাপে ব্যাবিলনীয়-দের অনেক পিছনে পড়িয়াছিল তবু অনেকদিন পর্য্যন্ত

তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল। বিজিতের সভ্যতা তাহারা প্রথমে গ্রহণ করে নাই। আস্তে আস্তে ক্রমাগত সংমিশ্রণের ফলে অবশেষে এই বিদেশী বিজেতারা পুরাপুরিভাবে ব্যাবিলনীয়দের রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

কাস্‌সি রাজাদের সময় হইতেই ব্যাবিলনিয়ার সহিত অ্যাসিরিয়ার দীর্ঘকালস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

অ্যাসিরিয়ার স্বাধীনতা

হাম্মুরাবির সময় অ্যাসিরিয়া ছিল ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ কিন্তু কাস্‌সিজাতি যখন ব্যাবিলনিয়া অধিকার করে, তখন দক্ষিণ রাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সুবিধা লইয়া অ্যাসিরিয়া ব্যাবিলনের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হয়। খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্যাবিলন-রাজ কারা-ইন্দাসের সঙ্গে অসুররাজ অসুর বেল্‌নিশেশুর সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে দুই রাজ্যের মধ্যে সীমা নির্ণীত হয়।

মিশরে যখন তৃতীয় ও চতুর্থ অ্যামেনহোটেপ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ব্যাবিলনিয়া, মিতান্নি ও অ্যাসিরিয়ার রাজারা তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ব্যাবিলনের রাজকন্যাদিগকে ফ্যারাওর হারেমে পাঠান হইত। প্রতিদানে ফ্যারাওরা পাঠাইতেন সোনা। এই সময়ের অবস্থা মিশরে টেল্-এল্-আমার্ণায় (Tell-el-Amarna)প্রাপ্ত চিঠি-পত্রাদিতে জানিতে পারা যায়।

টেল্-এল্-আমার্ণায় প্রাপ্ত চিঠি-পত্রাদি

চতুর্থ অ্যামেনহোটেপের নিকট ব্যাবিলন-রাজ বুর্ণাবুরিয়াসের (Burnaburiash) পত্রে জানা যায় যে, অ্যাসিরিয়ার রাজা অসুর-উবাল্লিৎ ব্যাবিলনিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন এবং মিশররাজ তাঁহাকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিতেছিলেন। কাজেই, বুর্ণাবুরিয়াস্ ফ্যারাওর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতেছিলেন যে, তাঁহার এ কাজ ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ, অ্যাসিরিয়া ব্যাবিলনরাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য।

বুর্ণাবুরিয়াসের পুত্র কারা ইন্দাস (Kara-indash) অসুর উবাল্লিতের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র কাদাস্‌মান খার্বে (Kadashman Kharbe) রাজা হইলে অ্যাসিরিয়ার প্রভাব বিস্তার হয়।

অ্যাসিরিয়ার প্রভাব —অসুর উবাল্লিৎ

ইহাতে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কাদাস্‌মান্ খার্বে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান। বিদ্রোহীরা এক সাধারণ ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। অ্যাসিরিয়ারাজ অসুরউবাল্লিৎ এই সুযোগে ব্যাবিলনে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হন। তিনি হঠাৎ সৈন্য-সামন্ত লইয়া ব্যাবিলনে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁহার দৌহিত্র কুরিগল্‌জুকে রাজা করেন।

কুরিগল্‌জু কিন্তু অ্যাসিরিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিলেন না। মেসোপটেমিয়ার অধিকার লইয়া দুইরাজ্যের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কাজেই, অসুর উবাল্লিতের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কুরিগল্‌জুর সঙ্গে অ্যাসিরিয়ারাজ প্রথম আদাদ্ নিরারির যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে আদাদ্ নিরারি হারিয়া যান এবং কুরিগল্‌জু নিজের সুবিধামত দুই রাজ্যের সীমানা নির্ণয় করেন।

কুরিগল্‌জু

এদিকে এলামরাজ খুর্বাটিলা (Khurbatila) ব্যাবিলন আক্রমণ করেন। কুরিগল্‌জু তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করেন এবং এলাম আক্রমণ করিয়া রাজধানী সুসা অধিকার করেন।

অ্যাসিয়ারাজ প্রথম শালমানেসারের সময় মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণরূপে অ্যাসিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ব্যাবিলনের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাঁহার উত্তরাধিকারী টুকুল্‌টি নিনেব (অথবা, টুকুল্‌টি এন্নুটা) ব্যাবিলনরাজ ক্যাষ্টিলিয়াসকে (১২৪৯-১২৪২) পরাজিত ও বন্দী করিয়া অ্যাসিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং ব্যাবিলন অধিকার করিয়া নিজে ব্যাবিলনিয়ার রাজা হন।

টুকুল্‌টি নিনেবের ব্যাবিলন জয়

ব্যাবিলনের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হয়—এমন কি, মার্ডুকদেবের মূর্ত্তিটিও বাদ যায় নাই। টুকুল্‌টি নিনেব সাত বৎসর ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করেন। রাজ্যশাসনের জন্য তিনি এন্‌লিল্-নাদিন্-সুম নামে একজন অ্যাসিরীয়কে শাসনকর্ত্তা অথবা উপরাজ নিযুক্ত করেন। তাঁহার শাসনের সময় এলামরাজ কিদিনখুত্রুতাস্ (Kidin Khutrutssh) ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া দার-ইলু ও নিপ্‌পুর লুণ্ঠন করেন।

এলামরাজ কিদিন খুত্রুতাসের আক্রমণ

ইহার ফলে এন্‌লিল্-নাদিন-সুমকে সরাইয়া তাঁহার জায়গায় কাদাসমান খার্ব্বে নামক এক জন ব্যাবিলনীয়কে (কাস্‌সিজাতীয়) উপরাজ নিযুক্ত করা হয়। কাদাসমান খার্ব্বের পর উপরাজ হন আদাদ-সুম-ইদ্দীন। তাঁহার সময় কিদিন খুত্রুতাস্ পুনরায় ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করেন। এইবার তিনি আইসিন (Isin) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই সময়ে অ্যাসিরিয়ায় টুকুল্‌টি নিনেবের বিরুদ্ধে তাঁহার পুত্র অসুর-নাদিন-(অথবা নাসির) আপ্‌লি বিদ্রোহ করেন। ব্যাবিলনিয়ার আমীর ওমরাহগণও এই বিদ্রোহে যোগদান করে এবং সেই সুযোগে ব্যাবিলনিয়া অ্যাসিরিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হয়। তাহারা আদাদসুম-উস্বুরকে ব্যাবিলনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

আদাদ-সুম-উস্বুর

আদাদ-সুম- উস্বুর ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন (১২৪১-১২১১) খৃঃ পূঃ। ১২১১ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার সহিত অ্যাসিরিয়ারাজ বেল (এন্‌লিল)-কুদুর উস্বুরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ব্যাবিলনীয়েরা জয়লাভ করে; কিন্তু আদাদ্‌-সুম-উস্বুর ও বেল্‌-কুদুর উস্বুর উভয়েই প্রাণ হারান। আদাদের পুত্র দ্বিতীয় মেলিশিপাক (Melishipak II) ও তাঁহার পুত্র মার্ডুক-আপাল-ইদ্দীন (Marduk-apal-iddina) অবিলম্বে অ্যাসিরিয়া আক্রমণ করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেলিশিপাক অ্যাসিরিয়া অধিকার করিয়া মার্ডুক আপাল ইদ্দীনকে রাজা করেন। প্রায় ৩০ বৎসর অ্যাসিরিয়া ব্যাবিলনিয়ার অধীনে থাকে। অবশেষে ১১৮৩ খৃঃ পূর্ব্বে অসুরদান মার্ডুক-আপাল ইদ্দীনের অযোগ্য উত্তরাধিকারী জামামা-সুম-ইদ্দীনকে পরাজিত করিয়া অ্যাসিরিয়া স্বাধীন করেন।

দ্বিতীয় মেলিশিপাকের অ্যাসিরিয়া জয়

জামাম-সুম-ইদ্দীনের পরাজয়

ইহার অল্পদিন পরেই এলামরাজ সুত্রুক্‌ নানখুন্তি ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জামামা-সুম-ইদ্দীন প্রাণ হারান। এলামরাজ সিন্‌পার লুণ্ঠন করেন। জামামা-সুম-ইদ্দীনের পর এন্‌লিল নাদিন-আখি রাজা হন (১১৭৩-১১৬৯)। তিনিই কাস্‌সিবংশীয় শেষ রাজা।

কাস্‌সি রাজবংশের অবসানের কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যাবিলনিয়ার অন্তর্গত আইসিন্‌ (Isin) সহরে এক নূতন রাজবংশ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। এই বংশের রাজা নেবু কুদুর-উস্বুর অথবা নেবুক্যাড্রেজার শেষ কাস্‌সিরাজা এন্‌লিল-নাদিন্‌ আখিকে পরাজিত করিয়া সমগ্র ব্যাবিলনিয়ার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। দুর্ব্বল কাস্‌সিবংশীয় রাজাদের সময় এলামের রাজা সুত্রুক্‌ নান্‌খুন্তি ব্যাবিলন অধিকার করিয়া সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মার্ডুককে এলামে লইয়া গিয়াছিলেন। নেবুক্যাড্রেজের এই অপমানের প্রতিকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এলামের রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি মার্ডুকদেবকে ব্যাবিলন লইয়া আসিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।* নেবুক্যাড্রেজার শুধু ব্যাবিলনিয়ার রাজা ছিলেন না। মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিমদেশে (সিরিয়া-প্যালেষ্টাইনে) তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে অ্যাসিরিয়ার সঙ্গে তিনি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি যখন ঐ দেশ আক্রমণ করেন, তখন অ্যাসিরিয়া-রাজ অসুর-রিশ্‌-ঈশী তাঁহাকে পরাজিত করেন।

কাস্‌সিবংশের পতন, আইসিন্‌ রাজবংশ

নেবুক্যাড্রেজার

দিগ্বিজয়ী প্রথম টিগ্‌লাথ পিলেসার যখন অ্যাসিরিয়ার রাজা, তখন ব্যাবিলনরাজ মার্ডুক-নাদিন-আখি তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অ্যাসিরিয়া আক্রমণ করেন এবং একালাটির দেবতা আদদ (Adad) ও শালার (Shala) প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যান। এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে টিগ্‌লাথ পিলেসার ভুলিলেন না। পশ্চিমদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি উত্তর ব্যাবিলনিয়া অধিকার করেন। ব্যাবিলন সহর তাঁহার হস্তগত হয়, এবং নিজেকে সুমের ও আক্কাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র অসুর বেল্‌কলার রাজত্বের সময় ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে। অ্যাসিরিয়রাজ ব্যাবিলনরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন।

প্রথম টিগলাথ পিলেসারের ব্যাবিলন অধিকার

এই সময়ে ব্যাবিলনিয়ার ভাগ্যে ভীষণ দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। সুটু (Sutu) নামে এক আরামীয় সেমিটিক্‌ (Aramaean) জাতি আরব দেশ হইতে ঝড়ের মত আসিয়া সমগ্র ব্যাবিলন দেশ ছাইয়া ফেলে। তাহাদের অত্যাচারের ফলে সমগ্র দেশে একটা

আরামীয় সেমিটিকদের আগমন ও ব্যাবিলনিয়ার আভ্যন্তরিক গোলযোগ

* ঐতিহাসিক কিং (King) বলেন যে, এলামীয়েরা কিছুদিন ব্যাবিলন সহর অধিকার করিয়া থাকে। আইসিনের রাজা এনলিল-নাদিন্‌-আখি (Enlil-nadin-akhi) তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া ব্যাবিলন নিজের অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা নেবুক্যাড্রেজের (নেবুকাদ্‌নেজার) এলামীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভীষণ ভাবে পরাজিত করেন এবং পশ্চিম এলামের কাস্‌সিজাতিদের দমন করেন।

সম্রাসের সৃষ্টি হয়। ইহারা গ্রাম-নগর লুণ্ঠন করিয়া, বাড়ীঘর জ্বালাইয়া, মন্দির দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেশে ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করে। এই গোলযোগের সময় আইসিন রাজবংশের পতন হয় এবং পর পর তিনটি রাজবংশ অল্পকালের জন্য রাজত্ব করে। আইসিন রাজাদের ঠিক পরেই যে তিন জন রাজা ব্যাবিলনের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহারা আসেন পারস্যোপসাগরের উপকূল (Sea-Land) হইতে। তাঁহাদের পরে আর এক বংশের তিন জন রাজা ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করেন। বোধ হয় ইঁহারাও বিদেশী। ইঁহাদের পর আপ্‌লু-উসুর (Aa-aplu-usur) নামে একজন এলামদেশীয় লোক রাজা হন।

এলামীয়দের যে কাহারা তাড়ায়, তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে ইহার পর যে রাজবংশের কথা আমরা জানিতে পাই তাহা ক্যাল্‌ডীয় (Chaldaean) বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা কোন্ জাতীয় এবং কোথা হইতে আসিল, তাহারও সঠিক খবর আমাদের জানা নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, দক্ষিণের কোন দেশ হইতে আসিয়া তাহারা প্রথমে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত ভূভাগে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহারা নানাদলে বিভক্ত ছিল। এক এক দলের, এবং তাহাদের অধিকৃত দেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল— যথা বীট্ ইয়াকিন (Bit Iakin), বীট আদিনি (Bit-Adini), বীট-দাকুরি Bit-Dakuri), বীট-সাল্লি Bit Saalli প্রভৃতি। এই সব দল আস্তে আস্তে সমগ্র ব্যাবিলনিয়া ছাইয়া ফেলে। প্রত্যেক দলের অধিপতির চরম লক্ষ্য হইল ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার। এতদিন ব্যাবিলনিয়ার প্রভুত্ব লইয়া এলাম ও অ্যাসিরিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এখন হইতে ক্যালডীয়েরাও ঐ পদের প্রার্থী হইল।

ক্যালডীয় রাজবংশ

ব্যাবিলনে ক্যাল্‌ডীয় রাজবংশের প্রথম রাজা বোধ হয় নবু-মুকিন্-আপ্‌লি (Nabu-mukin-apli)। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস বড়ই অনিশ্চিত। তবে অ্যাসিরিয়ার ইতিহাসের সাহায্যে মোটামুটি একটা ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। তৃতীয় আদাদ নিরারির সময় ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন সামাস্ মুদাম্মিক (Shamash-mudammiq) তিনি আদাদ নিরারির সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অ্যাসিরিয়ারাজের সাহায্যে নবু-সুম্-ইস্কুন্ রাজা হন।

তৃতীয় অসুরনাসিরপালের সময় ব্যাবিলনরাজ নবু-আপ্‌লু-ইদ্দীনের (Nabu-aplu-iddina) সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার প্রভুত্ব লইয়া তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নবু-আপ্‌লু ইদ্দীন হারিয়া যান, এবং মেসোপটেমিয়া অ্যাসিরিয়ার দখলেই থাকে (খৃঃ পূঃ ৮৭৯)। নবু আপ্‌লু-ইদ্দীন ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন।

অ্যাসিরিয়ার প্রভুত্ব শালমানেসার

তাঁহার মৃত্যুর পর (খৃঃ পূঃ ৮৫৪) তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। পিতার ইচ্ছা অনুসারে মার্ডুক-সুম-ইদ্দীন পাইয়াছিলেন উত্তর ব্যাবিলনিয়া, আর মার্ডুক-বেল্-উসাতি পাইয়াছিলেন দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়া ও ক্যাল্‌ডীয়া। ব্যাবিলনরাজ মার্ডুক-সুম্ ইদ্দীন সুবিধা করিতে না পারায় অ্যাসিরিয়ারাজ তৃতীয় শালমানেসারের শরণাপন্ন হন। শালমানেসার মার্ডুক-বেল্ উসাতিকে হারাইয়া দেন এবং ব্যাবিলনিয়ার প্রধান প্রধান সহরগুলি অধিকার করিয়া নিজেকে ব্যাবিলনিয়ার রাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং মার্ডুক-সুম্-ইদ্দীন্ করদরাজাস্বরূপ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এমন কি, ক্যাল্‌ডীয়ার ক্ষুদ্র রাজারা পর্য্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

ষষ্ঠ সাম্সি আদাদ্ যখন অ্যাসিরিয়ার রাজা, তখন মার্ডুক-বালাৎসু-ইক্‌বি নামে একজন ক্যাল্‌ডীয় এলাম ও ক্যাল্‌ডীয় রাজাদের সাহায্যে ব্যাবিলনিয়ার রাজা হন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা বৌ-আখি-ইদ্দীনের (Ba'u-akhi-iddina) সঙ্গে অ্যাসিরিয়ারাজ চতুর্থ আদাদ নিরারির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বৌ-আখি-ইদ্দীন পরাজিত ও বন্দী হন। আদাদ নিরারি ব্যাবিলনে রাজাধিরাজ (Supreme Sovereign)-দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। প্রায় ৫০ বৎসর ব্যাবিলনিয়া অ্যাসিরিয়ার অধীন প্রদেশরূপে শাসিত হয়।

আদাদ নিরারি

আদাদ নিরারির মৃত্যুর পর অ্যাসিরিয়ার রাজশক্তির পতন আরম্ভ হয়। সেই সুযোগে ক্যাল্‌ডীয়েরা ব্যাবিলনে পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে দ্বিতীয় নবু-সুম-ইস্কুন রাজা হন। তাঁহার সময়ে ব্যাবিলনে আভ্যন্তরিক গোলমাল ঘটে। তাঁহার উত্তরাধিকারী নবনচ্ছারের (Nobonassar) সময়েও দেশের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। এই সময়ে অ্যাসিরিয়ার রাজা হন অদ্বিতীয় যোদ্ধা চতুর্থ টিগলাথ পিলেসার। তিনি ব্যাবিলনে অভিযান করেন এবং নবনচ্ছার তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন। টিগলাথ পিলেসার নিজেকে সুমের ও আক্কাদের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

চতুর্থ টিগলাথ পিলেসারের ব্যাবিলনিয়া জয়

নবনচ্ছারের মৃত্যুর পর ব্যাবিলনিয়ায় বিশেষ অরাজকতা উপস্থিত হয়। কাজেই, টিগ্‌লাথ পিলেসার রাজা উকিঞ্জিরকে (Ukinzir) সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বহস্তে রাজ্যরশ্মি গ্রহণ করেন। ব্যাবিলনের ইতিহাসে তিনি পুলু (Pulu) নামে পরিচিত। তাঁহার উত্তরাধিকারী পঞ্চম শালমানেসারও ব্যাবিলনিয়ার রাজা হন।

আ্যাসিরিয়ায় বিপ্লবের ফলে যখন সার্গন রাজা হন, সেই সুযোগে ক্যাল্‌ডীয় মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন (মার্ডুক হাবালাদ্দীন অথবা মেরোড়াক বালাদান) এলামরাজ খুম্‌বগাসের সাহায্যে ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়কার ইতিহাস অ্যাসিরিয়ার ইতিহাসেই বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে কেবলমাত্র প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হইবে। প্রথমে সার্গনের ব্যাবিলন অধিকারের চেষ্টা বিফল হয়। মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন ৭২১ হইতে ৭১০ পর্যন্ত এলামের আশ্রয়ে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। তারপর সার্গন আসিয়া তাঁহাকে ব্যাবিলনিয়া ও ক্যাল্‌ডীয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন এলামে আশ্রয় লন। সার্গনকে ব্যাবিলনের পুরোহিতেরা ত্রাণকর্তাস্বরূপ গ্রহণ করে, এবং তিনি নিজেকে "ব্যাবিলনের শাসনকর্তা" বলিয়া ঘোষণা করেন। ৭০৫ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত এইভাবেই চলে।

মার্ডুক আপ্‌লু ইদ্দীন। সার্গনের ব্যাবিলন অধিকার

সার্গনের ব্যাবিলন অধিকার।

সার্গনের মৃত্যুর পর সেন্নাকেরিবের রাজত্বের সময় প্রথম দুই বৎসর কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। তারপর ব্যাবিলনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং তাহার সুযোগে মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন পুনরায় এলামের সাহায্যে ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজত্ব করিতে সমর্থ হন নাই। এক বৎসরের মধ্যে সেন্নাকেরিব তাঁহাকে ব্যাবিলনিয়া হইতে তাড়াইয়া দিয়া বেল্‌ইবনি নামে এক ব্যক্তিকে ব্যাবিলনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্ডুক আবার এলামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেই সব গোলযোগের অবসান হয় নাই। সেন্নাকেরিব যখন প্যালেষ্টাইনের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকেন, সেই সুযোগে বেল্‌ ইবনি বাধ্য হইয়া এলাম ও মার্ডুক-আপ্‌লু ইদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়া অ্যাসিরিয়ারাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। সেন্নাকেরিব অবিলম্বে আসিয়া সমগ্র দেশ অধিকার করেন ও মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীনকে ক্যাল্‌ডীয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। প্রত্যাবর্তন করিবার সময় বেল্‌ ইবনিকে অ্যাসিরিয়ায় লইয়া যান। মার্ডুক অবশ্য আবার এলামে আশ্রয় লন। ব্যাবিলনে সেন্নাকেরিবের পুত্র অসুর-নাদিন-সুমকে রাজা করা হয় (৬৯৯-৬৯৪)।

সেন্নাকেরিব ও মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন

অসুর নাদিন-সুম

পাঁচ বৎসর পরে সেন্নাকেরিব আবার দক্ষিণ দেশে অভিযান করেন। এবার তিনি এলাম আক্রমণ করেন আশ্রিত ক্যাল্‌ডীয়দের শাস্তি বিধান করিতে। এই অবসরে এলামরাজ ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া অসুর নাদিন সুমকে বন্দী করিয়া এলামে লইয়া যান। নার্গল উসেজিব্‌ ব্যাবিলনের রাজা হন। সেন্নাকেরিব প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু যখন তিনি পুনরায় এলামে অভিযান করেন তখন ক্যাল্‌ডীয় মুসেজিব মার্ডুক এলামরাজের সহায়তায় ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। ৬৯১ খৃষ্টাব্দে সেন্নাকেরিব তাঁহাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। দুই বৎসর পরে এলামরাজ উম্মান মেনান্থ হঠাৎ সন্ন্যাস রোগ আক্রান্ত হওয়াতে মুসেজিব মার্ডুক এলামের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন এবং এই সুযোগে সেন্নাকেরিব ব্যাবিলন অধিকার করিয়া সহরটি ধ্বংস করেন। মুসেজিব মার্ডুককে বন্দী করিয়া অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হয়।

এলামের প্রভাব।

সেন্নাকেরিবের ব্যাবিলন ধ্বংস

সেন্নাকেরিবের মৃত্যুর পর এসারহ্যাড্ডন রাজা হইয়া ব্যাবিলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় ব্যাবিলনের রাজা হন তাঁহার এক পুত্র স্যামাস্‌-সুম-উকিন্‌। অ্যাসিরিয়ার রাজা হন আর এক পুত্র অসুরবানিপাল। অবশ্য ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ার অনুগত থাকে। কয়েক বৎসর পর স্যামাস্‌-সুম-উকিন্‌ বিদ্রোহ করেন এবং অ্যাসিরিয়ার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেন। অসুরবানিপাল কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ৬৪৭ হইতে ৬২৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত তিনি অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করেন।

এসারহ্যাড্ডন

অসুরবানিপাল

নবীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য

অসুরবানিপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিরিয়ার রাজশক্তির দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। শকদের আক্রমণে

সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইতে থাকে। এই অবসরে ৬২৫ পূঃ খৃঃ নবপোলাস্সার (Nabopolassar) নামে একজন ক্যাল্‌ডীয় নিজেকে ব্যাবিলনের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন তবে প্রথমে তাঁহার ক্ষমতা ব্যাবিলন ও বোরসিপ্পার (Borsippa) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য ব্যাবিলনীর সহর অ্যাসিরিয়ার অধীনেই ছিল। অসুরবানিপালের পরবর্ত্তী রাজারা ছিল অক্ষম ও অপদার্থ। তাহা ছাড়া এক নূতন শত্রু অ্যাসিরিয়ার দ্বারগোড়ায় হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা ইতিহাসে মীদ্ (Medes) নামে খ্যাত। নবপোলাস্সার ইহাদের সহিত যোগ দেন। তাঁহার পুত্রের সঙ্গে মীদ্‌রাজকন্যার বিবাহ হয়। ৬০৬ খৃঃ পূর্ব্বে নিনেভের পতনের পর অ্যাসিরিয়া সাম্রাজ্য মীদ্‌রা ও ব্যাবিলনরাজ ভাগাভাগি করিয়া লন। ইতিমধ্যে অ্যাসিরিয়ার পশ্চিমপ্রদেশগুলি মিশররাজ নেকো অধিকার করিয়াছেন। নবপোলাস্সার পুত্র নেবুক্যাড্রেজারকে (নেবুক্যাডনেজার) ঐ প্রদেশগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পাঠান। ৬০৪ খৃঃ পূর্ব্বে কার্কেমিশের নিকট দুই দলে যুদ্ধ হয়। নেকো পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন। নেবুক্যাড্রেজার সিরিয়া প্যালেষ্টাইন ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই সময়ে নবপোলাস্সারের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

নবপোলাস্সার

অ্যাসিরিয়ার পতন

পশ্চিম বিজয়

কার্কেমিশের

এদিকে প্যালেষ্টাইনে জুডা (Judah) যদিও প্রথমে ব্যাবিলন সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করে এবং কর দিতে প্রতিশ্রুত হয় কিন্তু কিছুদিন পরে স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করে। ইহার ফলে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নেবুক্যাড্রেজার তাহা সহজেই দমন করিয়া জেরুজালেম অধিকার করেন।

জেরুজালেম অধিকার

নেবুক্যাড্রেজার যে শুধু বড় যোদ্ধা ছিলেন, তাহা নহে। শান্তিকার্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। পুরাতন মন্দির ও রাজপ্রাসাদগুলির তিনি সংস্কার করেন। অনেক নূতন মন্দির ও প্রাসাদ তিনি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পিতার প্রাসাদটির তিনি অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন; এবং ইহার খিলান দেওয়া ভিত্তি এত উঁচু করেন যে, সেকালে লোকে ইহাকে শূন্যোদ্যান (Hanging Garden) বলিত। পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য্যের মধ্যে ইহা একটি। ব্যাবিলনের বিখ্যাত এসাগিলা মন্দির ও বোরসিপ্পার এজিদা মন্দির তিনি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার প্রাসাদ ও নিন্‌মাখের মন্দিরের মধ্যে তিনি বিখ্যাত ইস্তার গেট্ (Ishtar Gate) স্থাপন করেন।

নেবুক্যাড্রেজারের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁহার পুত্র আমেল মার্ড়ুক (Amel Marduk)। তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও পাপাশয়। মোটে দুই বৎসর রাজত্বের পর তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হত্যা করা হয়। তাঁহার স্থলে রাজা হন তাঁহার ভগিনীপতি নাগল সার-উস্সুর অথবা নেরিগ্লিসার (Neriglissar)। তিনি পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার পরে তাঁহার নাবালক পুত্র লাবাসি মার্ড়ুককে রাজা করা হয়। কিন্তু নয় মাস পরে তাঁহাকে সরাইয়া ব্যাবিলনের পুরোহিতেরা নবনীদাস (Nabonidas) নামে একজন ব্যাবিলনীয়কে সিংহাসনে বসায় (৫৫৫ পূঃ খৃঃ)।

নবনীদাস মোটেই রাজা হওবার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অনেক মন্দির ও প্রাসাদ তিনি সংস্কার করেন। তাহাদের লুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। নানাস্থানের ধ্বংসাবশেষ তিনি খনন করেন, দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করিবার জন্য। এদিকে প্রথমে মীদেরা ও পরে পারসীকেরা একে একে তাঁহার সাম্রাজ্যের নানা অংশ কাড়িয়া লইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারসীকদের রাজা মীদ্‌দিগকে হারাইয়া মীদ্ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। লিডিয়ার রাজা ক্রীশাস্‌কে (Crœsus) হারাইয়া তাঁহার রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার পর আসিল ব্যাবিলনের পালা। ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্বে তিনি আসিরিয়ার শাসনকর্ত্তা গোব্রিয়াস্‌কে ব্যাবিলন বিজয়ে পাঠান। তাঁহাকে বাধা দিতে নবনীদাস পুত্র বেল্‌শাজারকে (Belshazzar) পাঠান আর দেশের যেখানে যত দেবমূর্ত্তি ছিল সব ব্যাবিলনে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন—আশা, তাঁহাদের দয়ায় রক্ষা পাইবেন। কিন্তু এত করিয়াও কিছু হইল না। ওপিসের যুদ্ধ বেল্‌শাজার হারিয়া যান। এইবার বিনা বাধায় গোব্রিয়াস্ ব্যাবিলন অধিকার করেন। পর বৎসর সাইরাস স্বয়ং ব্যাবিলনে আগমন করেন এবং এখানকার পুরোহিতেরা তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করে। তাঁহার প্রথম কাজ হইল বিভিন্ন মন্দিরের দেবমূর্ত্তিগুলিকে যথাস্থানে প্রেরণ করা। এইখানে স্বাধীন ব্যাবিলনিয়ার ইতিহাস শেষ হইল। ব্যাবিলনিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ব্যাবিলনিয়ার পতন

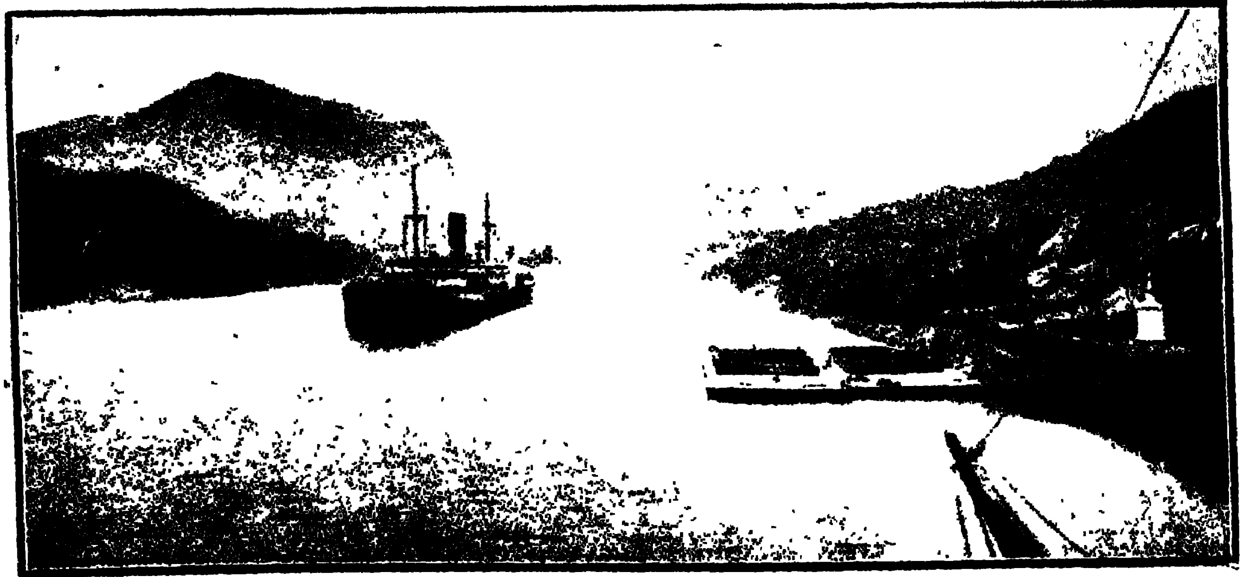
পৃথিবীর ছয়টি বিখ্যাত খাল



সুয়েজ খাল—লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে



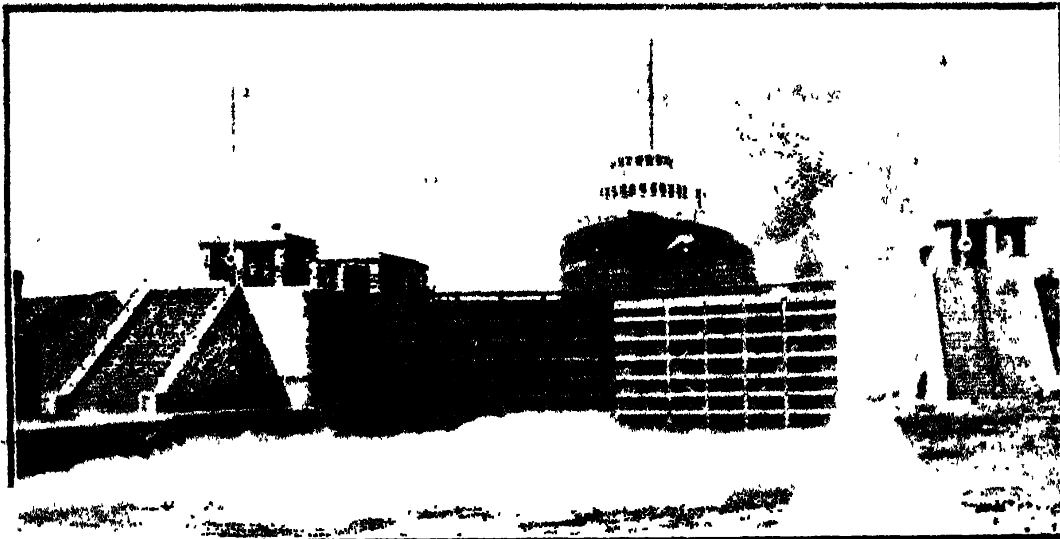
কিল খাল—উত্তর সাগরের সহিত বল্টিক সাগরকে সংযুক্ত করিয়াছে



পানামা খাল



হল্যাণ্ডের খাল



মিচিগানের খাল



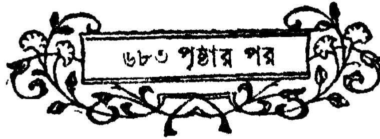




চীনের বিখ্যাত খাল—তীরে কাশিং নামক স্থানের তিনটি বিখ্যাত প্যাগোডা



জীমূতবাহন


৬৮৩ পৃষ্ঠার পর

হিমালয় প্রদেশে বিদ্যাধর নামে এক জাতি ছিল। তাহারা সঙ্গীত-বিদ্যায় ও নৃত্যকলায় বিশেষ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত। এই গণের এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম জীমূতকেতু। জীমূতবাহন তাঁহার একমাত্র পুত্র। জীমূতবাহন বড় হইলে, জীমূতকেতু পুত্রকে সিংহাসন দিয়া বনগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জীমূতবাহনও মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার দিয়া পিতা ও মাতার সেবা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

জীমূতবাহন পিতা ও মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় মনে করিতেন। কিসে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, কিসে তাঁহারা শান্তি পান, জীমূতবাহনের সর্ব্বদা এই চিন্তাই ছিল। এই জন্য তিনি সতত পিতা ও মাতার কাছেই থাকিতেন। কিন্তু জীমূতবাহনের বন্ধু আত্রেয়ীর ইহা ভাল লাগিত না। সে মনে করিত, রাজকুমার বিষয়-সুখে মত্ত হইয়া থাকিবেন, সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদে কাল কাটাইবেন, তাহা না হইয়া অনবরত পিতামাতার সেবায় রত থাকিলে জীবনের সুখ কি হইল! এই জন্য আত্রেয়ী জীমূতবাহনকে নানারকম পরামর্শ দিত। কিন্তু তাহা রাজকুমারের কানে ঢুকিলেও প্রাণে সাড়া দিত না।

একদিন জীমূতকেতু, পুত্র জীমূতবাহনকে বলিলেন, বৎস! অনেক দিন হইতে এই প্রদেশে আমরা রহিয়াছি; কাজেই এখানে আর তেমন যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, ফুলফল ইত্যাদি পাওয়া যায় না। উদ্ভিধান, কন্দমূল প্রায়ই শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতএব এখান হইতে মলয় পর্ব্বতে গিয়া আমাদের থাকিবার উপযুক্ত কোনো স্থান খুঁজিয়া বাহির কর। পিতার এই কথা শুনিয়া জীমূতবাহন বন্ধু আত্রেয়ীকে সঙ্গে লইয়া মলয় পর্ব্বতের দিকে চলিয়া গেলেন।

কিছু দূর যাইতেই তাঁহারা একটি অতি সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। জীমূতবাহন এইরূপ রমণীয় প্রদেশে তাঁহাদের থাকিবার মত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দুই বন্ধুতে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। এই সময়ে জীমূতবাহন বীণার মধুর ঝঙ্কারের সহিত নারীকণ্ঠের এক সুললিত সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। সঙ্গীতের শব্দ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা দুই বন্ধুতে এক দেব-মন্দিরের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, এক নারী ভাবে বিভোর হইয়া বীণার সুরের সহিত নিজের সুর মিলাইয়া দেবতার স্তবগান করিতেছেন। নিকটে এক দাসী দাঁড়াইয়া আছে।

জীমূতবাহন বলিলেন, বন্ধু, এই অবস্থায় ঐ নারীর নিকটবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। যেহেতু আমরা এখন তথায় পৌঁছিলে তাঁহার দেব-বন্দনায় ব্যাঘাত হইতে পারে। আত্রেয়ীর ইহা ভাল লাগিল না। তথাপি বন্ধুর কথায় সম্মত হইয়া উভয়ে এক তমাল বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেব-দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জীমূতবাহন সহসা শুনিতে পাইলেন, দাসী বলিয়া উঠিল, রাজকুমারী! এই পাষাণী দেবীর সম্মুখে বীণা

বাজাইয়া স্তব গান করায় লাভ কি? এত দিন এত পূজা করিলেন, এত বীণা বাজাইলেন, এত স্তবগান করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরা দেবী প্রসন্না হইলেন না! নির্জ্জীব পাষাণ দেবতার প্রাণ আছে কি? এই বলিয়া দাসী জরাকুমারীর হাত হইতে বীণা কাড়িয়া লইল।



এক নারী দেবতার স্তবগান করিতেছেন

রাজকুমারী বলিলেন, চতুরিকা, ভগবতী গৌরীর নিন্দা করিয়ো না। গত রাত্রে দেবী আমায় স্বপ্নে বর দিয়াছেন যে, বিদ্যাধর-রাজ জীমূতবাহন তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।

চতুরিকার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে আত্রেয়ী বন্ধুর হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজকুমারি, এই লউন, আপনার দেবীর-দেওয়া 'বর'।

রাজকুমারী মলয়বতী আঁখির কোণে একবার জীমূতবাহনকে দেখিয়া লইলেন। লজ্জা আসিয়া তাঁহার চক্ষুপল্লব চাপিয়া ধরিল। তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, চতুরিকা, চল, আমরা এখান হইতে অন্য কোথাও যাই। চতুরিকা রাজকুমারীর এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। অপূর্ব্ব এক আনন্দে তাহার মুখখানিতে হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল।

এই মলয় পর্ব্বতের রাজা বিশ্বাবসু পিতামাতার সেবাপরায়ণ জীমূতবাহনের সুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহার সহিত আপনার কন্যা মলয়বতীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। একদিন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছেন, সহসা কন্যার বিবাহের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি পুত্র মিত্রাবসুকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস, মলয়বতীর বিবাহের ত আর দেরী করা চলে না। বিদ্যাধরের রাজা জীমূতকেতু তাঁহার স্ত্রীর সহিত তপস্যা করিবার জন্য এই মলয় পর্ব্বতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র জীমূতবাহনও তাঁহাদের সহিত এখানে আসিয়াছেন। জীমূতবাহন সুরূপ সুন্দর যুবাপুরুষ—তারপর এতবড় বিদ্যাধর-রাজের পুত্র সে; পরোপকার তার জীবনের ব্রত—সকলের উপর, শক্তিশালী যুদ্ধনিপুণ বীর। আমার মনে হয়, এই জীমূতবাহন আমার মলয়বতীর উপযুক্ত বর। অতএব তুমি একবার বিদ্যাধর-রাজ জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া আমার এই প্রস্তাব তাঁহাকে জানাও। মিত্রাবসু সানন্দে পিতার কথা স্বীকার করিলেন।

মলয়বতী যেদিন জীমূতবাহনকে দেখিয়াছেন, সেই দিন হইতে অনবরত জীমূতবাহনের চিন্তা করেন। শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বদাই জীমূতবাহনের সুন্দর মুখচ্ছবি মনে পড়ে। বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় মলয়বতী তাঁহার দাসী চতুরিকাকে বলিলেন, চতুরিকা, চন্দন-লতাকুঞ্জে যে চন্দ্রমণি শিলা আছে, চল, আজ সেইখানে বসিয়া তোমার সঙ্গে মনের কথা বলিব। দাসী খুসি হইয়া রাজকন্যার সহিত চন্দন-লতাকুঞ্জে উপস্থিত হইল এবং উভয়েই সেই শিলার উপর বসিল। মলয়বতী চতুরিকাকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। দাসী হাসিতে হাসিতে বলিল, রাজকন্যা, ইহার জন্য ভাবিয়ো না। দেবীর বরে তোমার সহিত তোমার বাঞ্ছিতের শীঘ্রই মিলন হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে আত্রেয়ীর সহিত গল্প করিতে করিতে জীমূতবাহন সেই চন্দন-লতাকুঞ্জের দিকে আসিতেছেন দেখিয়া চতুরিকা সখী মলয়বতীর সহিত অশোক-বাটিকার দিকে চলিয়া গেল।

দুই বন্ধু লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রমণি শিলার উপর বসিলেন। জীমূতবাহন বলিলেন, বন্ধু গতরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, এই চন্দন-লতাকুঞ্জে এই চন্দ্রমণি

শিলার উপরে এক দেবী বসিয়া আছেন। তিনি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ দিতেছেন ও কাঁদিতেছেন। বন্ধু, বলিব কি, আমি আমার অন্তরের পটে যেন তাঁহাকে এখনো দেখিতে পাইতেছি। এই বলিয়া জীমূতবাহন নানাবর্ণের গেরু মাটি দিয়া সেই চন্দ্রমণি শিলার উপরে এক নারী-চিত্র অঙ্কিত করিলেন।

আত্রেয়ী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, দেবী-মন্দিরে তুমি যে-দেবীকে দেখিয়াছিলে, তাঁহার মুখভাব ও বেশ-বিন্যাসের সহিত তোমার আঁকা এই চিত্রের যে আশ্চর্য্যরূপ মিল রহিয়াছে, বন্ধু! এই বলিয়া আত্রেয়ী হাসিতে হাসিতে জীমূতবাহনের মুখের দিকে চাহিল। জীমূতবাহনও আত্রেয়ীর দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মিত্রাবসু পিতার আদেশে মলয়বতীর সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য জীমূতবাহনের অন্বেষণে সেইদিকে আসিতে লাগিলেন। মিত্রাবসুকে দেখিয়া আত্রেয়ী কদলীপত্র দিয়া সেই পাথরে আঁকা ছবিখানি ঢাকিয়া ফেলিল।

মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে যথোচিত সমাদর করিয়া বলিলেন, আমার পিতা বিশ্বাবসু সিদ্ধরাজ বংশের প্রাণস্বরূপ তাঁহার কন্যা মলয়বতীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আমার পিতার এই বাসনা পূর্ণ করুন।

আত্রেয়ী মিত্রাবসুকে বলিল, এ সম্বন্ধ অতিশয় গৌরবের, কিন্তু সখার সম্মতি কি শোভন হইবে? আপনি ইঁহার পিতামাতার নিকট এই প্রস্তাব করুন, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এই শ্লাঘ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন। এই কথা শুনিয়া মিত্রাবসু যথোচিত অভিবাদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুই বন্ধুতে নানা কথা হইল। পূর্ব্বরাত্রির দেখা স্বপ্নের সহিত আজ্‌কার এই ব্যাপারের আশ্চর্য্য মিলনে বিধাতার শুভ সঙ্কেত অনুভব করিয়া দুই বন্ধু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নানা কৌতুককর গল্প করিতে করিতে লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুরিকা সখী মলয়বতীর সহিত বাহির হইয়া চন্দ্রমণি শিলার উপর কলাপাতায়-ঢাকা সেই ছবি দেখিতে লাগিল। মলয়বতী শিলাতলে আপনারই ছবি দেখিয়া লজ্জিত ও প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে এক দাসী আসিয়া রাজকুমারীকে বলিল, মহারাজ আপনাকে শীঘ্র প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজকুমারী রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই রাত্রিতেই মহাসমারোহে মলয়বতীর সহিত জীমূতবাহনের বিবাহ হইয়া গেল।

৩

একদিন জীমূতবাহন, মিত্রাবসুর সহিত সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন; সমুদ্রে জোয়ার আসিবার সময় হইয়াছে। সমুদ্রতীরে যেখানে জোয়ারের সময় জল আসে, সে-পথ ছাড়িয়া দিয়া পর্ব্বতশিখরের নিকটস্থ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে বলিলেন, দেখ, শরতের শ্বেত মেঘে মলয় পর্ব্বতের চূড়া হিমগিরির শোভা ধারণ করিয়াছে!

মিত্রাবসু বলিলেন, ইহা মলয় পর্ব্বতের চূড়া নহে —ইহা নাগগণের অস্থিরাশি।

ইহা শুনিয়া জীমূতবাহন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এককালে এত নাগের মৃত্যু হইল কিরূপে?

মিত্রাবসু বলিলেন, কোনো সময়ে গরুড় কুপিত হইয়া সমস্ত সর্পকে নাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাতে নাগরাজ বাসুকী এই নিয়ম করেন যে, গরুড়ের খাদ্যের জন্য প্রতিদিন এক নাগ, নাগলোক হইতে সমুদ্রতটে যাইবে। সেই দিন হইতে প্রতিদিন এক একটি নাগ এখানে আসে ও গরুড় সেই নাগটিকে খাইয়া ফেলে। সর্পগণের সেই অস্থিরাশি পুঞ্জিত হইয়া পর্ব্বতের মত দেখাইতেছে।

এই কথা শুনিয়া নাগগণের দুঃখে জীমূতবাহন অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন এবং কিরূপে নাগকুলের এই বিপদ দূর করা যায়, তাহার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সুনন্দ আসিয়া মিত্রাবসুকে প্রাসাদে ফিরিবার জন্য রাজার আদেশ জানাইল। মিত্রাবসু, জীমূতবাহনকে লইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু জীমূতবাহন বলিলেন, আমি সমুদ্রতটে একটু বেড়াইয়া এখনি রাজপ্রাসাদে ফিরিব। এই কথা শুনিয়া মিত্রাবসু সুনন্দের সহিত চলিয়া আসিলেন।

জীমূতবাহন সমুদ্রের তটে আসিয়া শুনিতে পাইলেন কে যেন আর্ত্তস্বরে বলিতেছে—হা পুত্র শঙ্খচূড়! আমি আজ তোমার এই দশা কেমন করিয়া দেখিব? ইহা শুনিয়া জীমূতবাহন চকিত হইয়া উঠিলেন। ঐ শব্দ কোনো নারী কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে অনুমান করিয়া তিনি ঐ শব্দের অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। জীমূতবাহন একটু অগ্রসর হইয়া দেখি-

লেন, অদূরে লোহিত বস্ত্র হস্তে লইয়া এক রাজপুরুষ আর তাহার নিকটে এক যুবা ও তাহার বৃদ্ধা মাতা দাঁড়াইয়া আছে। রাজপুরুষ বলিতেছে, শঙ্খচূড়, গরুড়ের ভক্ষ্যার্থ বধ্যশিলায় যাইবার জন্য নাগরাজ বাসুকি আজ তোমায় আদেশ করিয়াছেন—এই লও তোমার বধ্য বেশ!

শঙ্খচূড় সেই লোহিত বস্ত্র রাজপুরুষের হাত হইতে লইয়া বলিল, মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য হইল। নাগরাজকে বলিবেন আমি এখনি বধ্যবেশ পরিধান করিয়া বধ্যশিলায় শয়ন করিব।

রাজপুরুষ চলিয়া গেলে শঙ্খচূড় মাতাকে নানারূপে আশ্বাস দিতে লাগিল। কিন্তু পুত্রশোক-সম্ভাবনায় মাতার হৃদয়ে আশ্বাস স্থান পাইল না, বৃদ্ধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই শোকদৃশ্য দেখিয়া জীমূতবাহনের প্রাণ কাতর হইয়া উঠিল। তিনি শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার দিকে যাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে বৃদ্ধার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে আকুল হইয়া বলিতে লাগিল, বাছা, নাগরাজ বাসুকি যখন তোমাকে আজ গরুড়ের খাদ্যরূপে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তখন এই পৃথিবীতে এমন শক্তি-শালী কে আছে, যে তোমায় বাঁচাইবে!

—আমি বাঁচাইব বৃদ্ধা—বলিতে বলিতে জীমূতবাহন তথায় পৌঁছিলেন, এবং বলিলেন, আমি বিদ্যাধরপুত্র, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব। বৃদ্ধা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের নিকট সেই বধ্যচিহ্ন লোহিত বস্ত্র দুইখানি প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধা বলিল, এ কি কথা বলিতেছ, পুত্র! আমার পুত্রের পরিবর্ত্তে তুমি আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাহিতেছ! কে তুমি মহাপুরুষ?

শঙ্খচূড় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। তাহার নিজের তুচ্ছ প্রাণ বাঁচাইতে এত বড় একটা প্রাণ নষ্ট হইবে ভাবিয়া শঙ্খচূড় বধ্য-চিহ্ন সেই রক্ত বস্ত্র দুইখানি দিতে অসম্মত হইল।

জীমূতবাহন বলিলেন, শঙ্খচূড়, কেন বৃথা কাতর হইতেছ? আমি পরোপকারের জন্যই এইরূপ মহৎ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছি। এইরূপ সুযোগ সচরাচর ঘটে না। এ বিষয়ে তুমি আমাকে বাধা দিও না। তুমি স্বচ্ছন্দচিত্তে মাতার সহিত ঘরে ফিরিয়া যাও এবং ঐ বধ্যচিহ্ন বস্ত্র দুইখানি আমায় প্রদান কর।

শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের কোন কথায় ভুলিল না। এদিকে গরুড়ের আসিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া সে মাতাকে সঙ্গে লইয়া গোকর্ণেশ্বর দেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গেল।

বিদ্যাধর বংশের নিয়ম এই যে, বিবাহের পর দশ রাত্রি পর্য্যন্ত জামাতা ও বধূ লোহিত বস্ত্র পরিয়া থাকেন। এইজন্য মহারাণী প্রতিদিন বর ও কন্যার জন্য লোহিত বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন। রাজা মিত্রাবসুর কর্ম্মচারী বসুভদ্র এই সময়ে দুইখানি লোহিত বস্ত্র আনিয়া জীমূতবাহনকে প্রদান করিল। জীমূতবাহনের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন মলয়বতীর সহিত বিবাহ আজ তাঁহার সার্থক হইল। জীমূতবাহন পুলকিত হইয়া মহারাণীর প্রদত্ত বস্ত্র দুইখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ভদ্র, মহারাণীকে আমার প্রণাম জানাইবেন। তাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ আমাকে আজ জয়ী করিবে। এই বলিয়া জীমূতবাহন সমুচিত আদর করিয়া বসুভদ্রকে বিদায় দিলেন। বসুভদ্র চলিয়া গেলে জীমূতবাহন লোহিত বস্ত্র দুইখানি পরিধান করিয়া সেই বধ্য-শিলার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন।



গরুড় তাহার মস্তকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিল

বধ্যবেশধারী ব্যক্তি শিলাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ক্ষুধিত গরুড় দ্রুতপক্ষে আসিয়া তাহার মস্তকে চঞ্চুর আঘাত করিল। রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ব্যক্তি একটু কাতর শব্দও করিল না, দেখিয়া গরুড় বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়ে সহসা বধ্যের উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং স্বর্গে নানারূপ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গরুড়ের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

জীমূতবাহন ভাবিতে লাগিলেন, শঙ্খচূড়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার জীবন আজ সার্থক হইল। গরুড়ও জীমূতবাহনকে দেখিয়া মনে করিল, এই ব্যক্তিই নাগগণের রক্ষাকর্ত্তা শ্রেষ্ঠনাগ। মনে হইতেছে আমার সর্প ভক্ষণের অভিলাষ এই ব্যক্তিই পূর্ণ করিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া গরুড় তাহার নখ দিয়া বধ্যকে তুলিয়া লইয়া মলয় পর্ব্বতের শিখরে চলিয়া গেল।

সূর্য্য প্রায় অস্ত হয়। তথাপি জীমূতবাহন সমুদ্র-তট হইতে ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া, মহারাজ বিশ্বাবসু অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং সুনন্দকে বলিলেন, দেখ সুনন্দ! আমি শুনিয়াছি, গরুড় যে স্থানে বসিয়া নাগ ভক্ষণ করে, জীমূতবাহন সেই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন। তুমি একটু জানিয়া আইস ত, জীমূতবাহন ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না!

সুনন্দ জীমূতকেতুর নিকট গিয়া জীমূতবাহনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। জীমূতকেতু বলিলেন, কুমারের সংবাদ ত আমরা জানি না।

সহসা মলয়বতীর দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা জননী আকুল বেদনায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই জীমূতবাহনের কোনো বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখে খানিকটা মাংসের সহিত এক শিরোমণি আকাশ হইতে পড়িল। জীমূত-বাহনের মাতা পুত্রের শিরোমণি চিনিতে পারিলেন ও হাহাকার করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে শঙ্খচূড় নাগ কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিকেই আসিতেছিল। জীমূতকেতু শঙ্খচূড়কে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাগরাজ বাসুকি আজ তাহাকে গরুড়ের ভক্ষ্য-রূপে বধ্যশিলায় যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। মাতার করুণ ক্রন্দনে তথায় এক মহানুভব বিদ্যাধর পুত্র আসিয়া মাতাকে অভয় দিল। এই সময়ে আমরা গোকর্ণেশ্বর দেবতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে গমন করি। ইতিমধ্যে ঐ বিদ্যাধর-পুত্র আমাকে রক্ষা করিবার জন্য বধ্যবেশে সজ্জিত হইয়া বধ্যশিলায় শয়ন করিয়াছিলেন এবং গরুড় আসিয়া বধ্যশিলার উপরে তাঁহার ভক্ষ্য রহিয়াছে মনে করিয়া নখ দ্বারা ঐ বিদ্যাধরের বক্ষ বিদীর্ণ করেন ও তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য এই দিকেই উড়িয়া গিয়াছেন; আমি রক্তধারা অনুসরণ করিয়া দৌড়িতেছি—যদি কোনো-রূপে গরুড়ের ভক্ষ্যস্থানে পৌছিয়া উক্ত মহানুভব বিদ্যাধরের প্রাণরক্ষা করিতে পারি।



মাতা পুত্রের শিরোমণি চিনিতে পারিলেন

জীমূতকেতু বুঝিলেন, সেই মহাপ্রাণ বিদ্যাধর আর কেহ নহে, সে আমার বংশের দুলাল, নয়নের মণি জীমূতবাহন। এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার রোদনে তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুত্রবধু মলয়বতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মলয় পর্ব্বতে আজ দুঃখের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।



শঙ্খচূড় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, আমি কি অধম! হতভাগ্য আমার জীবনের বিনিময়ে এত বড় একটা অনর্থ ঘটিয়া গেল। একটি জীবনের জন্য তিনটি মহামূল্য প্রাণ যাইতে বসিয়াছে! এইরূপ অনুশোচনা করিয়া শঙ্খচূড় বলিল, দেখুন বিদ্যাধর-রাজ! গরুড় যে বিদ্যাধরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তিনি জীমূতবাহন না হইয়া অন্য বিদ্যাধরও হইতে পারেন। অতএব যাহা জানা নাই তাহার জন্য শোক না করিয়া এই রক্তধারা অনুসরণ করিয়া দেখাই যাক্ না, গরুড় কোথায় সেই বিদ্যাধরকে ভক্ষণ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছে।

এদিকে গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া মলয় পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়াছে। গরুড় ভাবিতেছে—এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনো দেখি নাই। এত দিন এত নাগ ভক্ষণ করিয়াছি কিন্তু এমন ধৈর্য্যশীল ত আর কাহাকেও দেখি নাই। আমার চঞ্চুর প্রহারে হিমালয়ের উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত ভগ্ন হইয়া যায় কিন্তু ইহার মস্তকে চঞ্চু প্রহার করিয়া বুঝিয়াছি, ইহা ইন্দ্রদেবের বজ্র অপেক্ষাও সুকঠিন। দেহে রক্ত-মাংসের আস্বাদও অন্যরূপ, তবে কি এ নাগ নহে—পরোপকার ব্রতধারী কোনো মহাপুরুষ। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গরুড় আহারে বিরত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি মহাপুরুষ?

জীমূতবাহন অতি ধীর স্বরে বলিলেন, মহাশয়, আমার স্নায়ুশিরায় এখনও রক্ত বহমান রহিয়াছে, দেহে এখনও অপর্য্যাপ্ত মাংস রহিয়াছে—তবে আপনি ভোজনে বিরত হইলেন কেন?

গরুড় ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, হে মহাপ্রাণ আমার উত্তরোত্তর বিস্ময় বাড়িতেছে; আমি জানিতে চাই, তুমি কে?

গরুড়ের এই কথা শুনিয়া জীমূতবাহন বলিলেন, আমি যখন বধ্যবেশে বধ্যশিলায় পড়িয়াছিলাম, তখন আপনার জানা উচিত, আমি আপনার ভক্ষ্য। ইহা ভিন্ন আজ আমার আর অন্য কোনো পরিচয় নাই।

গরুড় বলিল, তোমার পরিচয় আমার এখনি জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে হয়, তুমি কোনো মহাপুরুষ। নাগবংশের উদ্ধারের জন্য এইরূপে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছ। নাগের এত ধৈর্য্য আমি কখনও দেখি নাই।

—নিশ্চয়ই দেব! এ ব্যক্তি অতি পরার্থপর মহাপুরুষ। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ইনি এইরূপ দুষ্কর কাজ করিয়াছেন। আমি শঙ্খচূড় নাগ। নাগরাজের আদেশে এই দেখুন বধ্যবস্ত্র পরিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এখনো ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমাকে ভক্ষণ করুন। এই কথা বলিতে বলিতে শঙ্খচূড় তথায় উপস্থিত হইল।

গরুড় বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল। উভয়ের নিকটেই বধ্যচিহ্ন। তবে নাগ কে? এইরূপ ভাবিয়া বলিল, আমি জানি না, তোমাদের মধ্যে কে আজ আমার ভক্ষ্য!

এই সময় শঙ্খচূড় বলিল, আমিই নাগ! এই দেখুন আমার খোলস, এই দেখুন আমার দ্বি-জিহ্বা, এই দেখুন আমার ফণা। যিনি বধ্যবেশে আপনার পদতলে পড়িয়া আছেন, তাঁহার গায়ে কি খোলস দেখিতে পাইতেছেন? ইনি বিদ্যাধর-রাজ জীমূত-কেতুর পুত্র মহাপ্রাণ জীমূতবাহন।

শঙ্খচূড়ের এই কথায় গরুড়ের চৈতন্য হইল। গরুড় ভাবিতে লাগিল—সত্যই ত, এই একটা সাধারণ চিহ্ন না দেখিয়া শুধু বধ্যচিহ্ন দেখিয়াই আমি এতবড় একটা মহাপ্রাণ বধ করিলাম। হায়! হায়! এ আমি কি করিলাম!

এই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ জীমূতকেতু, তাঁহার পত্নী ও কুসুমকোমলা মলয়বতী তথায় উপস্থিত হইলেন।

জীমূতবাহন পিতা, মাতা ও পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া শঙ্খচূড়কে ধীরস্বরে বলিলেন, বন্ধু, রক্তবর্ণ উত্তরীয় খানি দিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দাও। নচেৎ আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখিয়া ইঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

এই শোকদৃশ্য দেখিয়া গরুড় মর্ম্মাহত হইল। তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। আকুল নেত্রে এই শোকদৃশ্য দেখিতেদেখিতে অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল—আর বলিতে লাগিল, ভ্রমবশে আজ যে মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে করিব?

গরুড়ের এই কথা শুনিয়া জীমূতবাহন ধীরে ধীরে বলিলেন, সত্যই ত, জীব-হিংসা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি জানি না, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর বাহন ও পরম বৈষ্ণব হইয়া এ আপনি কি করিয়া থাকেন! নাগকুলের সহিত শত্রুতা হয়ত আপনার আছে কিন্তু জানেন না কি, শাস্তি দিয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া যায় না। শত্রুতার প্রতিশোধ ক্ষমা। ক্ষমা দ্বারাই শত্রু মিত্র হইয়া থাকে।



মুমূর্ষু জীমূতবাহনের কথায় গরুড়ের জ্ঞাননেত্র খুলিয়া গেল। তাই ত বিদ্যাধর-রাজের পুত্র এ কি নূতন কথা শুনাইল! যিনি এত বড় কথা বলিতে পারেন, তিনি ত সামান্য পুরুষ নন। পদতলে পতিত বিদ্যাধর-পুত্র অবশ্যই কোনো মহাপুরুষ হইবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া গরুড় অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। গরুড় চিন্তা করিতে লাগিল, পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে এতবড় একটা মহাপ্রাণ অসময়ে চলিয়া যাইবে, আর তাহার কারণ হইব আমি, ইহা ত হইতেই পারে না; আমি যেরূপে পারি ইহার জীবনরক্ষা করিব। কিন্তু আমার চঞ্চু প্রহারে জীমূতবাহন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, আমার এখানে ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিবে, ততক্ষণ ইহার প্রাণ হয় ত না থাকিতে পারে। কিরূপে জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিতে পারি, এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া গরুড় মঙ্গলময় বিধাতার উপর জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষার ভার দিয়া অমৃত আনয়নের জন্য স্বর্গের দিকে উড়িয়া গেল। যাইবার সময় গরুড় সকলকে আশ্বাস দিয়া গেল, আমি শীঘ্রই অমৃত লইয়া ফিরিয়া আসিব। আপনারা কিছুমাত্র ভীত হইবেন না।



ইন্দ্রদেব···অমৃত বর্ষণ করিলেন

গরুড় স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রদেবের নিকট তাঁহার প্রাণের আবেগ জানাইল। ইহার মধ্যেই স্বর্গে এই অবদানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রদেব গরুড়ের অনুরোধে আকাশে প্রকাশমান হইয়া অমৃত বর্ষণ করিলেন। অমৃতের স্পর্শে জীমূতবাহন সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার সর্ব্বদেহ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল।

হঠাৎ স্বর্ণাভায় দিক আলোকিত করিয়া গরুড় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, জীমূতবাহন নিরাময় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গরুড় অতিশয় সুখী হইলেন, তাঁহার দুইচক্ষু দিয়া আনন্দের অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

এতক্ষণ শঙ্খচূড় কোন কথা বলে নাই। সে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই স্বর্গদৃশ্য দেখিতেছিল। এইবার সে অগ্রসর হইয়া জীমূতবাহনের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, দেব, তোমার অপার্থিব করুণায় নাগবংশ বাঁচিয়া গেল। কিন্তু যতদিন ঐ অস্থিরাশি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন নাগবংশের ও তৎসহ মহাত্মা গরুড়ের এই কলঙ্ককাহিনী যে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া মঙ্গলময় বিধাতার নিকট অনুযোগ করিতে থাকিবে।

শঙ্খচূড়ের এই কথার রহস্য গরুড় বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রদেবের নিকট অমৃত-বর্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুবিন্দু ধারে অমৃতবর্ষণ হইতে লাগিল। সেই অমৃত বারিবর্ষণে অস্থিশেষ সর্পগণ দেহ ধারণ করিয়া বেগে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া গরুড়ের প্রাণ অপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। জগতে পরার্থপরতার জয় হইল।

এই গল্পটি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন-লিখিত নাগানন্দ পুস্তক হইতে সংকলিত হইয়াছে।



দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

ভারতবর্ষ

[ভারতবর্ষ, জাপান, গ্রীস, ইটালী, পর্ত্তুগাল, জার্ম্মেনী, সার্বিয়া ও মণ্টিনেগ্রো এই কয়টি দেশের জাতীয় সঙ্গীত এখানে দেওয়া গেল। জাপান, গ্রীস, ইটালি, পর্ত্তুগাল ও জার্ম্মেনীর জাতীয় সঙ্গীত কবি শ্রীকালিদাস রায় বি. এ. কবিশেখর কর্ত্তৃক অনূদিত। সার্বিয়ার জাতীর সঙ্গীতটির অনুবাদ করিয়াছেন স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ। মণ্টিনেগ্রোর জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদ স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কৃত।]



স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি!
ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি,
সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল
গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণি!
জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল
করিয়া স্পর্শ!
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি!
ভারতবর্ষ!"

সদাস্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-
শীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-
আনন দীপ্ত;

উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে, তপন
তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে
জলদ-মন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল
করিয়া স্পর্শ ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনী ! জগজ্জননি !
ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট ; সাগর-ঊর্মি
ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু
যমুনা গঙ্গা,
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর
ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ
নিখিল বিশ্বে !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল
করিয়া স্পর্শ ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি !
ভারতবর্ষ !"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি
অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িবে পিক-কলরবে, চুম্বে তোমার
চরণপ্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয়-
সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুম-গন্ধ
করিছে সৃষ্টি ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল
করিয়া স্পর্শ ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি !
ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার
অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার
বিতর মুক্তি ;
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা
কত না হর্ষ ;
—জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি !
ভারতবর্ষ !

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল
করিয়া স্পর্শ ;
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি !
ভারতবর্ষ !"

গ্রীস

শাণিত উজ্জল তীক্ষ্ণধারের
দুর্জ্জয় তরবারি,
তা দেখে তোমায় চিনিতে না রয় বাকী।
দৃষ্টি তোমার খর জ্বালাময়
ব্যোমলোকসঞ্চারী—
বিদ্যুৎসম, কেমনে রাখিবে ঢাকি ?



বিশ্ববিজয়ী বীরেরা শায়িত
ধরণীর তলে যথা,
উত্থিত তুমি সেথা কঙ্কাল ভেদি';
চির শৌর্য্যের মূর্ত্তি স্বাগত
নমি তোমা, স্বাধীনতা!
যুগে যুগে রচি তোমার জন্য বেদী।

অজ্ঞাত বাসে নীরবে গোপনে
লজ্জায় ম্রিয়মাণ,
রহ ব্যথাহত সুদিন প্রতীক্ষায়,
একদিন আসে বীর সেবকের
আশাভরা আহ্বান,
হয় পুন তব আলোকে উদয় তায়।

করেছিলে হায় সেই প্রতীক্ষা,
কত রাত কত দিন—
মগ্ন রহিয়া গভীর স্তব্ধতায়,
ভয়মর্দ্দিত চিরলাঞ্ছিত
চকিত তিমির-লীন
গোলামির ঘুমে অসাড় হইয়া হায়!

স্বপ্ন দেখিতে অতীত যুগের
গৌরব-মহিমার।
সম্বল ছিল তাই সান্ত্বনা তরে,
প্রাচীন গ্রীসের বীর অবদান
স্মরি হায় বার বার
বর্ণিতে তাই অশ্রুর অক্ষরে।

শুধু প্রতীক্ষা আশায় আশায়
আসিবে অকস্মাৎ
মুক্তির ডাক কবে কোন্ শুভ খনে
বন্দিদশায় সন্ধ্যাপ্রভাতে
করিছে অশ্রুপাত
নিরাশায় কভু হাতে হাত ঘর্ষণে।

'অন্ধকারায় বন্দিদশায়
কতকাল র'ব আর,
বলি বার বার জানায়েছ বেদনায়,
শুধু শৃঙ্খল-ঝনঝনি আর
কোলাহল হাহাকার,
উত্তরে তুমি শুনিয়াছ হায় হায়।

ঊর্দ্ধে পাঠায়ে অশ্রুপ্লাবিত
কাতর দৃষ্টি ক্ষীণ,
জানায়েছ তাঁরে আবেদন সকরুণ,
তোমার জীর্ণ কন্থার পরে
ঝরিয়াছে কতদিন
ফোঁটায় ফোঁটায় গ্রীসের বুকের খুন।
—কেনোটাস

জাপান

যত দিনে এই বালুকার কণা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রতিহত,
মেঘে-ঘেরা উঁচু শৈলচূড়ায়
নাহি হয় পরিণত,



যত দিনে এই শিশিরের কণা
সোনালী ফুলের পরে
ক্রমে বেড়ে বেড়ে বিরাট হ্রদের
আয়তন নাহি ধরে,

ততদিন ধরি মোদের রাজার
হোক জয়-জয়কার,
হর্ষের পরে নূতন হর্ষ
জমুক জীবনে তাঁর।



জার্ম্মেনী

বজ্র গর্জ্জে বিদারে ব্যোমের বক্ষ
হুঙ্কারি উঠে খর তরঙ্গ
ঝনঝনে অসি লক্ষ ;
অবাধ রাইন ধারা—
তাহার স্বাধীন গৌরব এবে
রক্ষা করিবে কা'রা ?



শঙ্কা কিসের ? বিশ্বাস কর
হে মোর
সন্তান তব গরিমারক্ষী
আশ্বাস লভ তুমি।
প্রতি সন্তান নির্ভীকপ্রাণ
অটল সত্যব্রত,
তোমার রাইন ধারার পাহারা—
দিবে তারা অবিরত।

শুনেছে বজ্রবাণী,
পুত্রেরা তব নেত্রে তাদের
বিজলির চমকানি।
বক্ষে তাদের বিরাজে দীপ্ত
স্বদেশ-সেবার ব্রত,
সিন্ধুর' পরে চির অতন্দ্র
পাহারায় র'বে রত।

অবাধ রাইন নদী
স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত
তব বুকে নিরবধি।
অনিমেষ চোখে বীরগণ চায়
তোমা পানে প্রেমভরে
অমোঘ শপথ করে তারা তব
গরিমা রক্ষা তরে।

স্বাধীন রাইন ধারা
আমরা থাকিতে তব স্বাধীনতা
হরণ করিবে কা'রা ?
যতদিন র'বে শিরায় শিরায়
বীরের শোণিত, আর
যতদিন হাতে রহিবে শকতি
ধরিবারে হাতিয়ার,
জেনে রেখ তুমি একটিও বাহু
যতদিন র'বে দেশে
করিবে না তব তট কলুষিত
কোন' দুষ্‌মন এসে।

প্রতি তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত
শোন এই বীরবাণী,
পত পত রবে রণকেতু দেয়
প্রতি বীরে হাতছানি।
স্বাধীন রাইন নদী
আমরা তোমার প্রহরী রক্ষী
চিরকাল নিরবধি।

—নেকেন বার্জার

পর্ত্তুগাল

জয়তু পর্ত্তুগাল,
তোল তোল পুন প্রাচীন গর্ব্বে
গরিমাদীপ্ত ভাল।
সন্তান তব সিন্ধুলহরে
বিজয়োদ্ধত বীর,
অমর গরিমা বন্দিছে তোমা
সাহসোন্নত শির।
জয়তু পর্ত্তুগাল
শোন কোন্ বাণী আসিছে ভেদিয়া
স্মৃতির স্বপ্নজাল ?
তব মৃত বীর কৃতী পুত্রেরা
করে আশ্বাস দান,
পরিচালনার বাণী শোন অই,
কর জয়-অভিযান।
(কোরাস্) ধর ধর হাতিয়ার
স্থলে জলে রণে সম বিক্রমে,
কিসের শঙ্কা আর ?
ধর হাতিয়ার, খোল তলোয়ার,
দেশের মুক্তি চাই,
কামানের মুখে তেজে-ভরা বুকে
শৌর্য্যের গান গাই।
উড়াও তোমার অজেয় কেতন
আলো করি আশমানে
শোন, ইউরোপ গর্জ্জিয়া কয়
সারা দুনিয়ার কানে।
স্বাধীন পর্ত্তুগাল
পরাজয়-লাজে কখনো করেনি
কলুষিত তার ভাল।
চুম্বন করে সিন্ধু তোমার
সুন্দর উপকূল,
স্নেহ-তরঙ্গে দোলায় তোমারে
জননীর সমতুল।
তব ধরাবেষ্টিত পাণি
দিয়াছে জগতে নব নব দেশ—
অতুল বিভব আনি।

(কোরাস্) ধর ধর হাতিয়ার
স্থলে জলে রণে সম বিক্রমে,
কিসের শঙ্কা আর ?
ধর হাতিয়ার, খোল তলোয়ার
দেশের মুক্তি চাই
কামানের মুখে তেজে ভরা বুকে
শৌর্য্যের গাথা গাই।



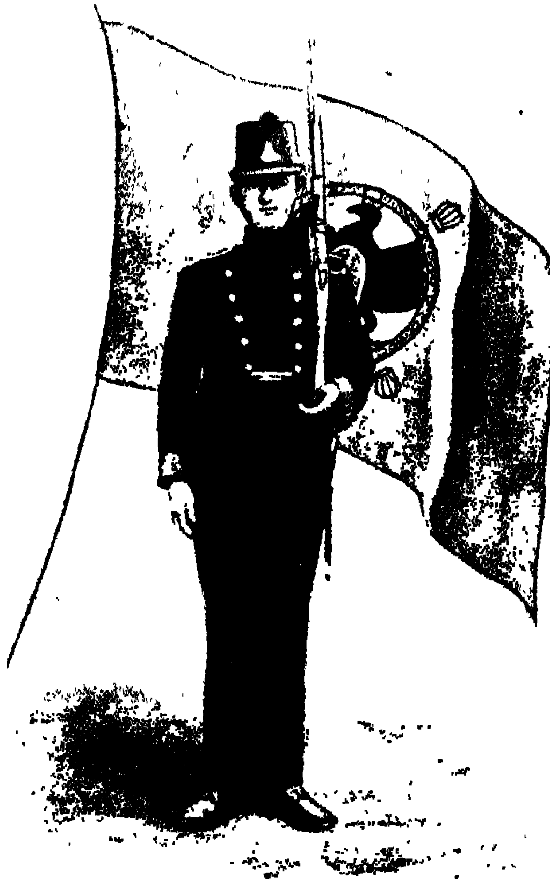
গাও তপনের জয়
তাঁর অনাময়ী পরশনে তব
ভবিষ্য তেজোময়।
বাহির হইতে বিপ্লব আসে
আক্রমণের বেশে,
প্রতিহত হোক, নূতন জীবন
সূচনা করিয়া দেশে।

উষার অরুণ কিরণের ধারা
নবজীবনের তীরে,
জননীর স্নেহ-চুম্বন সম
ঝরুক তোমার শিরে।
অনুপ্রাণিত হোক তায় নব
সাহসে দেশের লোক,
নির্ম্মম ক্রূর শকতির যত
আঘাত ব্যর্থ হোক।

(কোরাস্) ধর ধর হাতিয়ার
স্থলে জলে রণে সম বিক্রমে
কিসের শঙ্কা আর ?
ধর হাতিয়ার, খোল তলোয়ার,
দেশের মুক্তি চাই,
কামানের মুখে তেজে-ভরা বুকে
শৌর্য্যেরি গাথা গাই।
—মেণ্ডোনকা

ইটালি

সমাধি-শায়িত মৃত বীর যত গর্জ্জিয়া উঠে ঐ
গর্জ্জিয়া উঠে শহীদের দল—কই তরবারি কই ?



নিদ্রিত অসিগুলি
জেগে উঠে তায় রুদ্র জ্বালায়
ঝন ঝন্ নাদ তুলি'।
শিরে তাঁহাদের জ্যোতির বলয়
উজ্জ্বল তেজে ভায়,
বাজে ইটালির বিজয় মন্ত্র
অঙ্কিত কলিজায়।

এস এস যত বীর।
এস নির্ভীক্ সাথের পথিক
গৌরবে উঁচু শির।
উড়াও কেতনমালা—
ছড়াও বহ্নিজ্বালা
চালাও কৃপাণ বাজাও বিষাণ
শত্রু করিব জয়,
এসএস নির্ভয় !
ইটালি মাতার অমোঘ নিদেশ—
অন্য কাহারো নয়।
চালাও খড়্গ বল,
জ্বালাও সমরানল,
বহ্নি-ঝলকে অসির ফলকে
যাক্ অরি রসাতল।
—মার্কেন্‌টিনি

সার্বিয়া



সবে মিলে উঠে পড়ো,
এক সাথে হও জড়ো,
একাগ্র অন্তর,
চলে গেছে অন্ধ রাত্রি,
এলো আলোকের যাত্রী,
অরুণ কিরণে দীপ্ত স্তব্ধ দিগন্তর।

ডাকে স্বাধীনতা, "মা" যে অবনতা,
রক্ত পতাকা ওড়ে, তুমি কি থাকিবে পড়ে' ?
পীড়ন যে করিছে তোমারে,
ধরো' তুমি ধারাল কৃপাণ,
সহায় হবেন ভগবান।

চল হে সমরে, ভয় কি, কে মরে,
দম' দুঃশাসনে,
দেশ যে তোমারে চায়,
যথা তাপ আনো ছায়,
যুগে যুগে বসো সবে স্বর্ণ-সিংহাসনে।

দেশের আহ্বান, হও আগুয়ান,
জয়শ্রী বরণ করে, অভয় মন্ত্র বরে,
রণ-ক্ষেত্রে যাত্রী হও সবে,
এ সমর মহোৎসবে,
সারথি স্বয়ং ভগবান, বরাভয়, হও আগুয়ান ॥

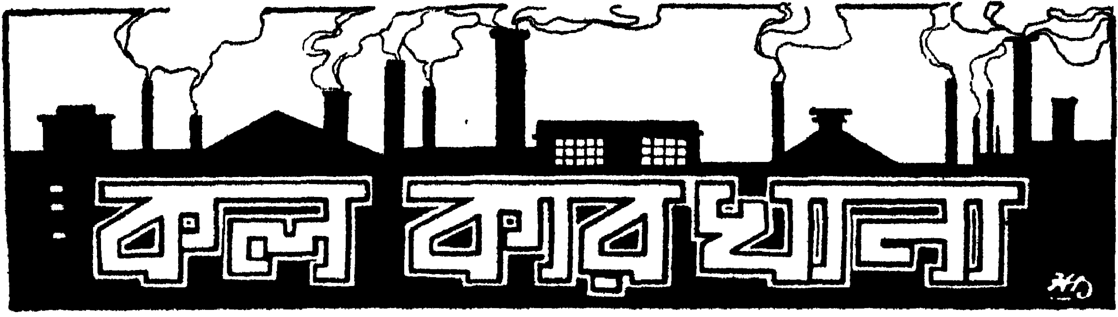
মন্টিনেগ্রো

"দেশের পরে কিসের মায়া ?"
সুধায় কেও ? বল্ গে ওরে,—
বাঁধা যে মন দেশের সনে
গানের প্রাণের লক্ষ ডোরে।

টানে আমার রক্ত টানে
মুক্ত হাওয়ার মুক্তি পানে,
দুঃখ সুখের তীব্র মধুর
মৌন স্মৃতি টান্‌ছে মোরে।
চোখ-জুড়ানো আকাশ পাথার,-
পাহাড় সে কাতারে কাতার,—
সাঁতার দিয়ে হৃদয় ফেরে
তারেই ঘিরে জনম ভ'রে।
এই খানে যে সোনার আলো,
বাইরে খালি আঁধার কালো,
হেথাই চলে জীবন-ধারা
আপন বেগে আপন জোরে।
ফুলের গন্ধ প্রেমের স্মৃতি
সোনার স্বপন পুণ্য গীতি
স্নিগ্ধ ছায়া মায়ের মায়া
দেশের মায়ার মূর্ত্তি ধরে।

—রাজা নিকোলাস্

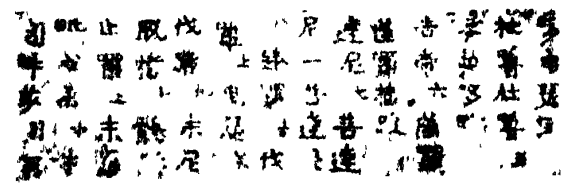




ছাপাখানার কথা

আজ হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বালক-বালিকারা আজকালকার মত এমন সুন্দর বই দেখিতেও পাইত না। কিন্তু সেই সময়ে পড়িবার জন্য বই পাওয়া যাইত না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেই সময়ে অতি সামান্যই পুস্তক পাওয়া যাইত এবং প্রত্যেক বালকের জন্য পুস্তক-প্রাপ্তি, হংসীর স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করার মত একরূপ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময়ে হাতে বই লেখা হইত এবং কয়েক মাসের পরিশ্রমে একখানি বই লেখা হইত। এই জন্য সকলের পড়িবার উপযুক্ত বই পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। রাজা-মহারাজ অথবা বড় বড় ধনীর বাড়ীতে দুই চারিখানি বই পাওয়া যাইত। বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতগণের বাড়ীতেও এইরূপ হাতের লেখা বই থাকিত। কিন্তু জনসাধারণের বাড়ীতে পুস্তক পাওয়া একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারই ছিল। ফকীরের ঝোলায় মোহর হয় ত পাওয়া যাইত, গরীবের ঘরে হয় ত মতির মালার সন্ধান মিলিত, কিন্তু জনসাধারণের বাড়ীতে কোনো বই পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপারের মতই গণ্য হইত।

বহুদিন হইতেই লোকের মনে জাগিতেছিল, হাতের লেখা বই কিরকমে অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে অথবা অন্য কোনো উপায়ে এই কাজটি অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে পারা যায়। এজন্য অনেকে অনেক চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কেহ পোড়া মাটীর উপর অক্ষর খুদিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কেহ বা কাঠের উপর অক্ষর খুদিয়া তাহার একটা ছাপ লইয়া কাজ চালাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেই এজন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, কাঠের উপরে অক্ষর খুদিয়া ছাপিবার প্রথা প্রথমে চীনদেশের অধিবাসীরাই আবিষ্কার করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই মুদ্রণ প্রথার আবিষ্কার হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, চীনদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই এইরূপে ছাপিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। বাস্তবিক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক এই মহোপকারী প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এইরূপে ছাপিবার প্রথা বহুদিন পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা এক কাঠের টুকরায় মন্ত্র (Charm), প্রার্থনা ও সূত্র ছাপিয়া



চীনাভাষায় ছাপার প্রথম নমুনা

নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অত্যন্ত সুলভ উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জাপানীদের গাথায় লিখিত আছে যে, ৭৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ লক্ষ মন্ত্র ছাপা হইয়াছিল। কাগজের লম্বা বা চতুষ্কোণ টুকরায় কালো বা লাল অক্ষরে ছাপা এইরূপ বহু মন্ত্র এখনো পাওয়া যায়। ইহার একখানি লণ্ডনের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই মন্ত্রে চীনা ভাষার প্রায় একশত অক্ষর ছাপা আছে। এখানে এইরূপে ছাপা এক মন্ত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। এই মন্ত্র তুর্কিস্তানের কিচিকহিসার নামক স্থানে

পাওয়া গিয়াছিল। এখন তাহা লণ্ডনের যাদুঘরে রহিয়াছে।

তুর্কিস্তানের একটি বৌদ্ধ-গুহায় কাষ্ঠফলকে ছাপা ১৬ ফিট লম্বা এইরূপ একটা কাগজের বাণ্ডিল একটা চোঙ্গার মধ্যে চীনা ভাষায় হীরক-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল এবং ইহার উপরে বুদ্ধদেবের ছবিও ছাপা আছে।

ফেঙ্গ-টাও নামক এক চীনা-সর্দার মুদ্রণকলার বহুল সর্বসাধারণের গোচরীভূত করেন। ইঁহার জীবিতকালেই চীনের গাথা সকল প্রথমতঃ কাঠের ছাঁচে ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপে ছাপিবার কৌশলের বহুল প্রচার হইয়া-গিয়াছিল এবং ঐ সময়ের মুদ্রিত সুঙ্গ গাথা সকলের মুদ্রণ এখনও পর্যন্ত মুদ্রণশিল্পের দৃষ্টিতে অতি সুন্দর বলিয়া অনুমিত হয়।

কাঠের ছাঁচে ছাপার ইহাই প্রাথমিক ইতিহাস। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশে পৃথক পৃথক অক্ষরের জন্য পৃথক পৃথক ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া ছাপিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে এই সকল ছাঁচ মাটির তৈয়ারী করা হইত। তাহার পরে কাঠের তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। কাঠেরও এইরূপ ছাঁচ প্রস্তুত হইত। এইরূপ নূতন প্রক্রিয়াতেও অনেক বই ছাপা হইয়াছিল। সেই সময়ে নূতন আবিষ্কার প্রক্রিয়ার দ্বারা ছাপার কাজ চলিলেও পুরাতন কাঠের ছাঁচে ছাপার বহুল প্রচলন ছিল। কেন না, চীনের অক্ষর ছাপার জন্য এই কাঠের ছাঁচই বিশেষ উপযুক্ত ছিল। ইহা একদিকে যেমন সরল ছিল, অপর দিকে ছাপাও পরিষ্কার হইত। ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস এইরূপ :—তোমরা জার্মেনী দেশের নাম অবশ্যই শুনিয়াছ। কয়েক বর্ষ পূর্বে এই দেশের রাজা কাইসর মহাসমরের আয়োজন করিয়া সমস্ত সভ্যজগৎকে ওতপ্রোত করিয়াছিলেন। পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই দেশে এক শিল্পী বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল গুটেনবার্গ। এই শিল্পীর শিল্পশালায় ছোট ছোট মণিমুক্তা, হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান জহরৎ কাটার কাজ হইত। হীরা, পান্না, মরকত প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন কাটিয়া সুন্দররূপে গঠন করিতে এই শিল্পী গুটেনবার্গ বড়ই নিপুণ ছিলেন। বড় বড় আমীর-ওমরাহগণের নিকটে এই শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা হইত। এই জন্য তিনি সাধারণের নিকট অতিশয় যশস্বী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

একদিন গুটেনবার্গ তাঁহার শিল্পশালায় বসিয়া আছেন, বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রতিদিনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; গুরু পরিশ্রমে তাঁহার দেহ-মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; একটু বিশ্রাম করিয়া ক্লান্ত দেহ-মন সবল করিয়া লইবার ইচ্ছায় তাঁহার তাস খেলিবার ইচ্ছা হইল। বাণ্ডিল খুলিয়া তাস বাহির করিবার সময় তাঁহার নিজের হাতে এক জোড়া তাস প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হইল। এইরূপ ইচ্ছা হইবা মাত্র তিনি কাঠের একটি ছোট টুকরা তুলিয়া



ছাপাখানার প্রথম আবিষ্কারক গুটেনবার্গ

লইয়া তাহার উপরে কয়েকটা রেখা টানিয়া দিলেন এবং ঐ রেখা বাদ দিয়া বাকি অংশের কাঠ কাটিয়া ফেলিলেন এবং উহাতে কালি লাগাইয়া কাগজের উপর বসাইয়া দিলেন। একটু পরে ঐ কাঠের টুকরা উঠাইয়া দেখিলেন যে, কাগজের উপর রেখা-চিহ্ন পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা

অত্যন্ত হাল্‌কা রকমের হইয়াছে।

এই প্রকারে কাঠের ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া তিনি কয়েক জোড়া তাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং আপনার বন্ধু-বান্ধবকে দিয়াছিলেন। কয়েক জোড়া তাস ছাপার পর গুটেনবার্গ দেখিলেন যে, ছাপিতে ছাপিতে কাঠ ঘসিয়া যাওয়ায় ছাপা আর পূর্ব্বের মত হইতেছে না। এইজন্য তিনি কয়েক প্রকার কাঠে ছাঁচ তৈয়ারী করিলেন। পরিশেষে আপেল গাছের কাঠই এই কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং তিনি এই কাঠ দিয়াই ছাঁচ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এইবার তিনি এক কাঠের উপরে এক চিত্র আঁকিলেন এবং তাহার নীচে এক কবিতাও লিখিলেন। তারপর শব্দের মধ্যস্থ কাঠ কাটিয়া তার উপর



গুটেনবার্গের প্রতিদ্বন্দ্বী লরেন্স জন্‌সন্ কাউষ্টার

কালি লাগাইয়া দিয়া তাহা একখানি কাগজের উপর বসাইয়া দিলেন। এইবার কালি পাতলা ছিল বলিয়া ছবির রেখা এবং শব্দের অক্ষরগুলি ছড়াইয়া গিয়াছিল। এই কারণে তিনি গাঢ় কালি তৈয়ারি করিবার জন্য কাজলের তেল মিলাইয়া ছাপিবার উপযুক্ত নূতন কালি প্রস্তুত করিলেন। এই কালি ছাঁচের উপর লাগাইয়া ছাপার অক্ষরগুলিও পরিষ্কার হইল এবং চিত্রও সুন্দর হইল। এই প্রকারে ছাঁচের দ্বারা ছাপায় সময় অতি কম লাগিল এবং এক সময়ে অনেক-গুলি বই ছাপা হওয়ায় মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইল।

এই সময়ে হার্লেম নগরের এক ওলন্দাজ বণিকও কাঠের ছাঁচে ছাপার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম লরেন্স্ জন্‌সন্ কাউষ্টার ছিল। তিনি সাবান, মোমবাতি, তেল, বার্নিশ আদি বিক্রয় করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার একটি ছোট অতিথিশালাও ছিল। ডাচ্‌দের ইচ্ছা ছিল তাহা-দের দেশবাসী কাউষ্টার এই অনুপম শিল্পকলার আবিষ্কারক বলিয়া গৌরব প্রাপ্ত হন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এইজন্য বিশেষ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আন্দোলনের সময়ে ডাচরা মুদ্রণ-শিল্পের আবিষ্কর্ত্তা প্রমাণ করিবার জন্য ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কাউষ্টারের এক মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করে। কিন্তু পরিশেষে গুটেনবার্গই এই আবিষ্কারের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কেননা গুটেনবার্গই প্রথমে পৃথক পৃথক অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহা মিলিত করিয়া ছাপিবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। গুটেনবার্গ তাঁহার দুই বন্ধুর সহায়তায় কাঠের পৃথক পৃথক ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া কয়েক মাসের পরিশ্রমে ৬০ পৃষ্ঠার একখানি বই ছাপেন। ইহার পরে তিনি বাইবেল ছাপিবার মানস করেন। একদিন তিনি যখন একটি কাঠের ছাঁচ তৈয়ারী করিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে ছুরিখানি পড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত ছাঁচটি খারাপ হইয়া গেল। এই ঘটনায় তিনি কাঠের পৃথক্ পৃথক অক্ষর তৈয়ারি করিয়া ছাপিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ছাপিবার সময় কালি লাগিয়া ঐ অক্ষর খারাপ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া কাঠের ছাঁচে ছাপার বদলে কোনো ধাতুর সাহায্যে ছাপা যাইতে পারে কি না, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যদি অক্ষরের পৃথক্ পৃথক্ ছাঁচ নির্ম্মাণ করা যায় এবং সেই ছাঁচে

অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ছাপা যায়, তবে ছাপার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এক একটি অক্ষর যদি পৃথক পৃথক তৈয়ারি হয়, তাহা হইলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে সামান্য দুই-চারটি অক্ষরই খারাপ হইবে। কাজেই, খারাপ অক্ষরগুলি বদলাইয়া দিয়া আবার ছাপা চলিতে পারিবে। ইহাতে একটি অক্ষর অনেকবার কাজে লাগানো যাইতে পারিবে। ইহার পর তাঁহার এক সহচর তাঁহার মতানুযায়ী ছাপার কাজ সম্পন্ন করেন।

প্রথমে তিনি কাঠের কয়েকটি লম্বা টুকরার মাথায় উকা দিয়া ঘষিয়া এক একটি অক্ষর প্রস্তুত করেন এবং তাহা গলিত রাঙে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া লন। ছাঁচ তৈয়ারি হইবার পর তাহাতে গলিত সীসা ভরিয়া দিয়া বড় শীঘ্র ও সহজে সেইরূপ শত শত অক্ষর প্রস্তুত করিয়া লইলেন। ধাতুর অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ছাপিবার কাজ প্রথমে ষ্ট্রাসবার্গে হয়। তারপর পাঁচ বৎসরের অবিশ্রাম চেষ্টার ও অপূর্ব ধৈর্যের ফলে গুটেনবার্গ বাইবেলের প্রথম সংস্করণ ছাপা শেষ করেন।



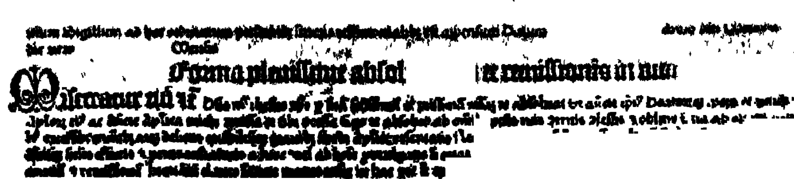
কাঠের ছাঁচে ছাপা বইএর এক পৃষ্ঠা

১৪৪০ ও ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এইরূপে এক একটি আলাদা অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ছাপার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। গুটেনবার্গ ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ছাপাখানা ষ্ট্রাসবার্গ হইতে মেঞ্জ (Mainz) নামক স্থানে লইয়া যান। সর্বপ্রথমে মেঞ্জ হইতে পোপ নিকোলা পঞ্চমের এক আজ্ঞাপত্র ছাপা হয়। এই আজ্ঞাপত্র ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। এই আজ্ঞাপত্র মুদ্রিত হইবার পূর্বে ইহার অনেক প্রতিলিপি হাতে লেখা হইয়াছিল। কেননা, এই আজ্ঞাপত্র ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধে চাঁদাদাতাদের জন্য দেওয়া হইয়াছিল এবং পোপ বলিয়াছিলেন যে, যাহারা এই যুদ্ধের জন্য সাহায্য দান করিবে তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

fratribȝ suis. Sichimitis q̄ȝ qđ operati erant retributū est: et venit super eos maledictō ioathan filij ierobaal. X
Post abimelech surrexit dux ī israhel thola filius phua patrui abimelech vir de isachar qui habitauit ī samir mōtis ephraim: et iudicauit israhel viginti et tribȝ ānis: mortuusq; est ac sepultus in samir. Huic successit iair galaadites qui iudicauit israhel

প্রথম বাইবেল ছাপার পৃষ্ঠা।

গুটেনবার্গ এই আজ্ঞাপত্র তাঁহার মেঞ্জস্থিত ছাপাখানায় মুদ্রিত করেন। তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্যান্য আবিষ্কারকগণের মত তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল না। এই জন্য এই আবিষ্কার দ্বারা তাঁহার তেমন আর্থিক লাভ হয় নাই। সুতরাং তিনি বিষম অর্থসঙ্কটে পড়িয়া পরিশেষে মেঞ্জের পাদ্রীর নিকট হইতে পেন্‌সন্ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ



ছাপাখানায় আলাদা আলাদা অক্ষরে ছাপার প্রথম নমুনা

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ছাপাখানা হইতে বাইবেল ছাপা শেষ হয়। এই বাইবেল ছাপার কাজে জন্ ফাউষ্ট এবং পিটার শোফার তাঁহার সাহায্য করেন। এই বাইবেলের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৪২ লাইন আছে। এইজন্য ইহাকে ৪২ পংক্তির বাইবেলও বলে।

এইরূপে ছাপার কৌশল মেঞ্জ হইতে সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ৭৫ বৎসরের মধ্যেই ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। কিন্তু এই ছাপার কাজের প্রথম অবস্থা হইতে প্রায় ৮০ বৎসর পর্যান্ত কাঠের ছাঁচেই পুস্তক ছাপা হইতেছিল। ইহার কারণ এই ছিল যে, ঐ সময়ে অক্ষর প্রস্তুত করিবার জন্য যে ধাতুর ব্যবহার হইত তাহাকে এখনকার মত শক্ত করিবার উপায় লোকে জানিত না। এই জন্য অক্ষরগুলি শীঘ্রই ঘষিয়া যাইত এবং বড় বড় অক্ষরে এখনো এইরূপ অক্ষরে কোনো বইয়ের একাধিক সংস্করণ ছাপা অসম্ভব হইত। যদি কোনো বইয়ের চাহিদা অধিক হইত তাহা হইলে পুনরায় অক্ষর তৈয়ারি করিয়া ছাপিতে হইত। ইহাতে খরচও পড়িত বেশী এবং

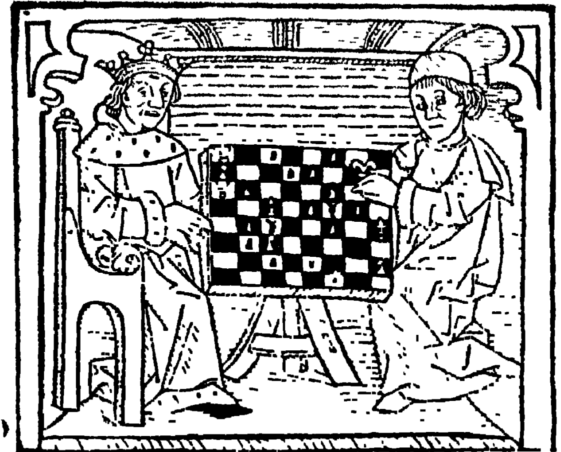


ক্যাক্সটনের ছাপাখানা

সময়ও লাগিত অনেক। কাঠের ছাঁচে অক্ষর কাটা কঠিন কাজ হইলেও এবং ইহাতে সময় বেশী লাগিলেও ইহাতে এক সুবিধা ছিল যে, একবার ছাঁচ তৈয়ারি হইলে তাহাতে অনেক বার ছাপার কাজ চলিত।

সর্ব্বপ্রথমে উইলিয়ম ক্যাক্সটন (William Caxton) ইংলণ্ডে এই মুদ্রণ-শিল্পের প্রচার করেন। ক্যাক্সটন লণ্ডনের এক ব্যবসায়ীর দোকানে কাজ করিতেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স্ নগরে গিয়া বাস করেন এবং সেখানকার লোল্যাণ্ড (Lowland) কাউন্সিলের গভর্ণরের পদে নিযুক্ত হন। যখন তিনি গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত মুদ্রণ-কলার তথ্য অবগত হইলেন, তখন তিনি কোলন্ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে তিনি এই মুদ্রণ-কলা শিক্ষা করেন এবং পরে তথা হইতে আসিয়া ব্রাসেল্‌স্ নগরে আপনার এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া সেখানে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ট্রয়ের ইতিহাস মুদ্রিত করেন। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনার দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ঐ বৎসরেই ওয়েষ্টমিনষ্টারে আপনার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। ট্রয়ের ইতিহাস ইংরাজী ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

ইংলণ্ডে আসিয়া ক্যাক্সটন ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ আর্ল রিভার্সের দ্বারা ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত Dictes অথবা 'বুদ্ধিমানের বচন' ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি সতরঞ্চ খেলা (Game & Play of Chess) প্রকাশিত করেন। এখন পর্য্যন্ত ক্যাক্সটন যতগুলি বই



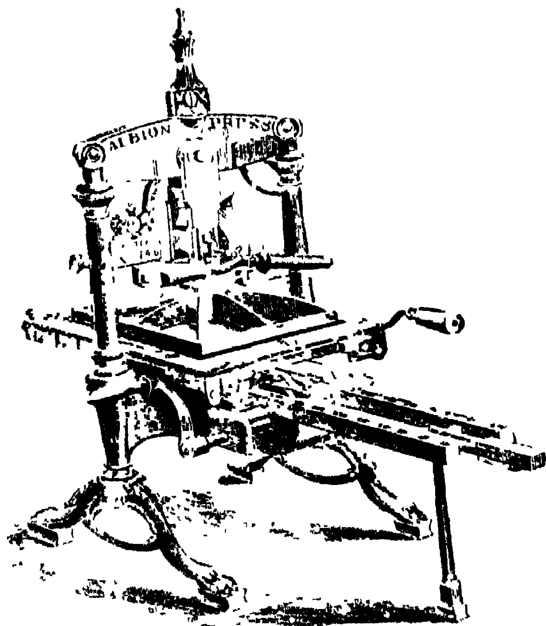
প্রথম সতরঞ্চ খেলার ঘর

প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ছবি দেওয়া ছিল না। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠের তক্তার উপর ছবি খুদিয়া তাহা আপনার পুস্তকে ছাপিতে আরম্ভ করেন।

এই প্রকারে মুদ্রণ-শিল্পের আবিষ্কার হইলে নূতন নূতন সুন্দর অক্ষর ঢালাই সম্বন্ধেও উন্নতি হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উইলিয়ম ক্যাস্‌লন্ ও জন বেস্কর উইল নামক

দুইজন প্রসিদ্ধ অক্ষর-শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন। কাস্‌লন্ যে সকল অক্ষর প্রস্তুত করেন, তাহা সকলের আদরণীয় হইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মিত অক্ষর ডচ্ অক্ষরের অনুরূপ হইলেও তাহা অপেক্ষা সুন্দর ছিল। তাঁহার নির্ম্মিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়াই লোকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কেননা, সেই অক্ষর ইংরাজ লেখকগণের মধ্যে যাহাদের হাতের লেখা সুন্দর হইত, তাঁহাদের অক্ষরের মত সুদৃশ্য ছিল। বেস্কর উইল যে অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত ইউরোপে সমাদৃত হইয়াছিল। কেননা, ঐ অক্ষর ঐ সময়ে সকল অক্ষর হইতে সুন্দর রোমান অক্ষরের অনুরূপ ছিল।

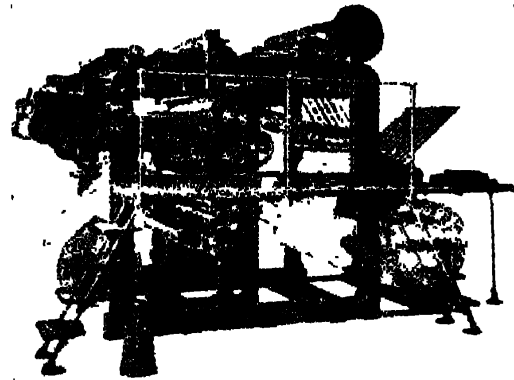
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম মরিস (William Marris) অক্সফোর্ডের নিকট টেমস নদীর তীরে কামস্‌কোট ম্যানার হাউস (Kelmscott Manor House) নামক স্থানে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং নূতন নূতন রকমের চারি প্রকার অক্ষর তৈয়ার করেন। এইরূপে নূতন নূতন অক্ষর নির্ম্মিত হইয়া এই মুদ্রণকলার বিশেষরূপে



এলবিয়ন হ্যাণ্ড প্রেস

ইহার পরে বাষ্পীয় যুগের আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাতে অক্ষরের কোনো বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। গুটেনবার্গের সময়ে যেরূপ ছাপার কল নির্ম্মিত হইত, প্রায় সেই প্রকার হস্ত-চালিত ছাপাখানা আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চার্লস ষ্ট্যান্‌হোপ লৌহনির্ম্মিত ছাপার কল প্রস্তুত করিলেন। এই নমুনার 'এলবিয়ন প্রেস' আজও ব্যবহৃত হইতেছে; ইহাই আজকালকার অতি সুন্দর হস্তচালিত ছাপার কল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নিকল্‌সন সাহেব বাষ্পের শক্তিতে ছাপাখানা চালাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি আপনার মনোমত কল প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে ফ্রেড্রিক কুনিগ নামক এক জার্ম্মাণশিল্পী দুইটি নূতন মেশিন প্রস্তুত করেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বাষ্পের শক্তিতে চালিত, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র "টাইম্‌স" ছাপাখানায় এই দুইটি মেশিন সংস্থাপিত করেন। এই মেশিনে ঘণ্টায় ১১০০ খানা কাগজ ছাপা হইতে লাগিল। প্রথমে কুনিগের মেশিনে কাগজের এক পৃষ্ঠাই ছাপা হইত, কিন্তু ইহার পরে মুদ্রণ-শিল্পে আরো অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং যন্ত্র-শিল্পেও অনেক উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ছাপাখানার অনুগ্রহে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে। ফলতঃ ছাপাখানার প্রসাদে জগতে জ্ঞানবিস্তারের পক্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক সহরে এখন ছাপাখানা দেখা যাইতেছে ও সেখানে নানাপ্রকার সংবাদ-পত্র, পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণের জ্ঞানবিস্তারের পক্ষে অত্যন্ত সুগম হইয়াছে।

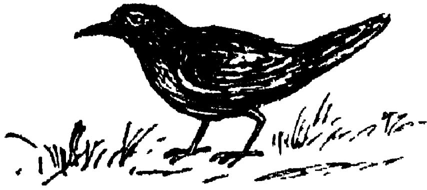


বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কারে ইহার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত ছাপার বড় বড় মেশিনের দ্বারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়া জ্ঞান-বিস্তার বিষয়ে অপূর্ব্ব সুযোগ ও অভিনব পন্থা আনিয়া দিয়াছে।



পাখীর ছড়া



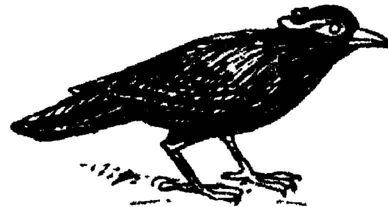
টুনটুনি জাল বুনি
পাতা-ঢাকা আড়ালে
বসে থাকে ; উড়ে যায়
হাতখানি বাড়ালে।



ঠোঁট লাল টিয়া পাখী
ফাঁকি দেয় কাকে ?
ঘাড় নেড়ে ডাক ছেড়ে
ফেটে পড়ে জাঁকে।

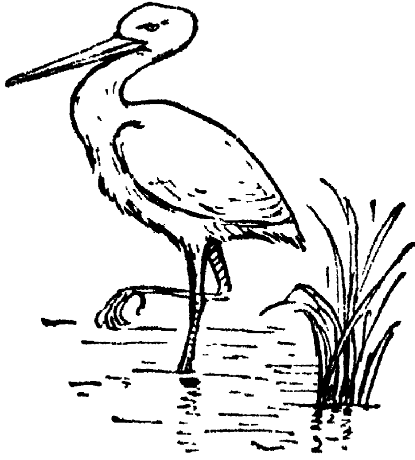


বুল-বুল ঝুঁটি নাড়ে
আড়ে আড়ে চায়,
লেজ নেড়ে শিস্ দিয়ে
কি যে গান গায় !



কাজ্‌লা রঙে হলুদে ঝালর
চোখের'পরে দোলে ;
সয় না কথা ময়না কারো—
বায়না দে রে বোলে !

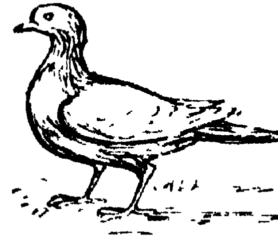
পাখীর ছড়া



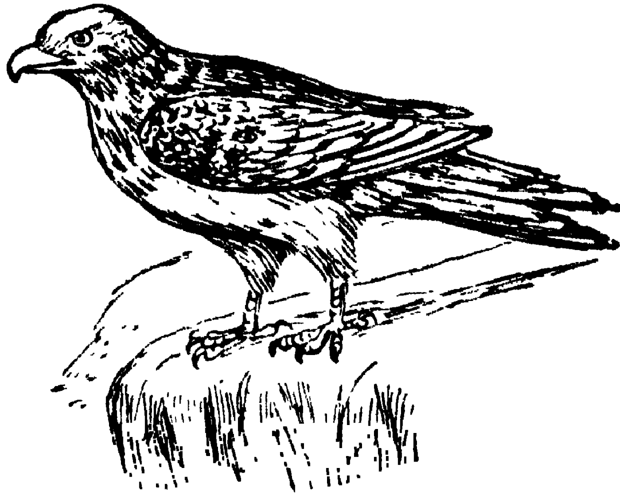


দিনকানা প্যাচা দেখ
কোটরেতে বসে,
ঢাকা মুখে বাঁকা ঠোঁটে
কার মন তোষে ?

জলে বসে বক মামা
দেড় ঠ্যাং তুলে
হঠযোগে ধরে মাছ
এক চোখ খুলে ।



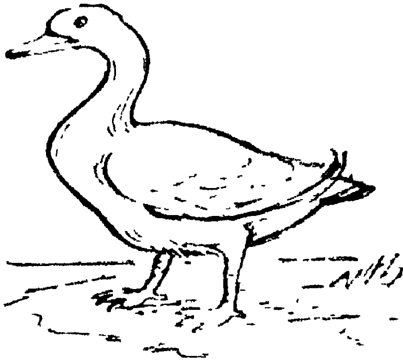
উপবনে ঘুঘু ডাকে
বসে আম গাছে,
ঝিমঝিমে রোদ তার
ডালে ডালে নাচে



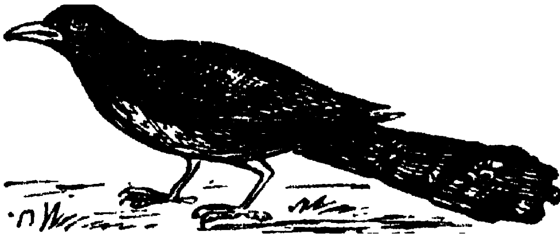


চিল সে তো দিল্ খুলে
আকাশেতে ওড়ে,
চোখ তবু মাটিপানে
ভাগাড়েতে ঘোরে ।

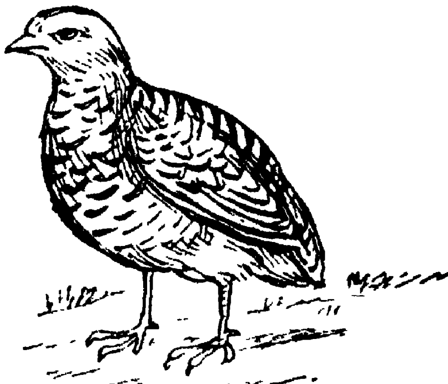
চুক চাক ডাক ছাড়ে
ছাতারে সে খেড়ে
থাকিতে সে পারেনাক'
সোরগোল ছেড়ে ।



হাঁস চলে দলে দলে
সোজা চলে খালে,
দিন শেষে উড়ে যায়
শেষ করে পালা!



কুহু ডাকে কোকিলের
ভরে যায় মাঠ,
বক চলে জল নিতে
সেরে সব পাঠ।



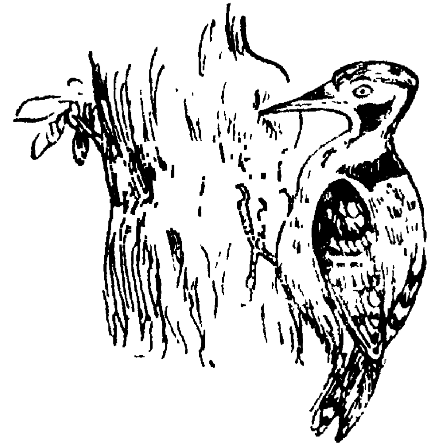
তিতির ঝোপের আড়ে
ভয়ে ভয়ে ফেরে,
জাল ফেলে পাড়ে কেহ
ফেলে ফাঁদে পেড়ে!



"বউ কথা কও" ডাকে পাখী
বধূ না দেন সাড়া,
বউ ডাক ছাড়ে তত
লাজে যে হ'ন সারা!



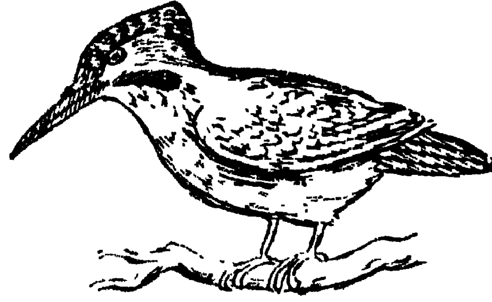
চড়াই পড়াই করে
কিঁচু ডালে বসে,
ছটফটে ভাব তার;
গান গায় ব'সে।



ঠুক ঠাক কাঠ ঠোকে
কাঠ-ঠোকা পাখী
করে সে আপন কাজ
সেজে গুজে থাকি!

পাখীর ছড়া





কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে
গালে হাত দিয়ে,
চোখ মুদে ভাবে বসে
"থাকি কিবা নিয়ে"

মাছরাঙা রঙে সেজে
জল ছুঁয়ে ওড়ে,
ঝপ দেখে মাছ যদি
কাছে তার ঘোরে !







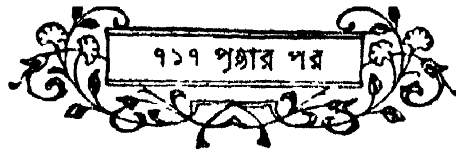
ফিন্ ফিনে কালো রঙে
ধিন্ ধিনা নেচে,
ফিঙে চলে ফন্দীতে
দ্বারে দ্বারে যেচে "

সবুজ সোনার ডানা মেলে
বর্ষা দিনে ভিজে ভিজে
ময়ূর নাচে অবহেলে
ঢেউ তুলিয়ে প্রাণে কি যে।





চৈতন্যদেব


৭১৭ পৃষ্ঠার পর

ফাল্গুন পূর্ণিমা। চন্দ্রকে রাহু সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা ঠিক অমাবস্যার মত দেখাইতেছে। ঘোর কালো রঙে সমস্ত জগৎ যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নদীয়ার দক্ষিণে গঙ্গার উপর সেই কালো ছায়া পড়িয়াছে। হাজার হাজার লোকের ভিড়। সকলেই ছুটিতেছে গঙ্গার দিকে; চন্দ্রগ্রহণের পর গঙ্গাস্নান করিলে পাপ-তাপ দূরে যায়—শত ব্রাহ্মণ ভোজনে, ভূমি দানে যে পুণ্য না হয়, চন্দ্রগ্রহণের পর গঙ্গাস্নানের সেই শুভ ফল।

নদীয়ার উপরে আঁধার, চারিদিকে আঁধার, গঙ্গার ঢেউয়েও আঁধার—সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী আঁধার। এই সময়ে সহসা শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ একদিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের সোনার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল—যেন কেহ পাতলা একখানি সোনার পাত দিয়া আকাশ মুড়িয়া ফেলিল। সেই আলো স্বর্গে মর্ত্তে গঙ্গাজলে সোনার জুঁই ফুলের মত যেন দেবকন্যারা মুঠা মুঠা ছড়াইয়া দিলেন। চারিদিকে শঙ্খধ্বনিতে যে বিপুল শব্দ হইল, তাহা আকাশ-পাতাল পূর্ণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে চন্দ্র স্বপ্রকাশ হইলেন। কোন্ বিধাতা তিমির আবরণ ভেদ করিয়া এমন সুন্দর সোনার গোলক আকাশের পূর্ব্বদিকটায় মেয়েদের কপালের সিন্দুরের টিপের ন্যায় পরাইয়া দিলেন। যখন চন্দ্রদেব মুক্ত হইলেন, তখন চারিদিকে হরিবোল শব্দে জগৎ পূর্ণ হইয়া গেল। এই হরিবোল শব্দ বড় মধুর শুনাইল। নদীয়ার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্ত দিক ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে সেই স্বর উত্থিত হইয়া নারদের বীণার মত, শিবের ডমরুর মত, বিশ্ববাসী সকলকে স্তব্ধ ও মুগ্ধ করিল।

চন্দ্র আকাশে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। সেই হরিবোল শব্দ শুনিতে শুনিতে, সেই শাঁখের শব্দের শুভলগ্নে, শুভক্ষণে নদীয়াতে ব্রাহ্মণকুলে একটি দেবশিশু জন্ম লইলেন। তাঁহাকে নদীয়াবাসীরা আদর করিয়া কত নাম দিয়াছেন,—সে আদরের অন্ত নাই,—সে নামের অফুরন্ত তালিকা হইতে কয়টি বলিব। কেহ নাম রাখিলেন নদেরচাঁদ, কেহ বলিলেন গোরাচাঁদ, কেহ বলিলেন নিমাইচাঁদ, আবার কেহ রাখিলেন গৌরাঙ্গচাঁদ। চাঁদের ছড়াছড়ি। তাঁহার জন্মে নদীয়া সার্থক হইল, এই জন্য পুরবাসীরা নিজের নাম রাখিলেন 'নদেবাসী'—নগরবাসী।

১৪০৭ শকে ১২ই ফাল্গুন রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় চৈতন্যের জন্ম হয়। বাঙ্গালা দেশে কোটি লোক জন্মিতেছে, মরিতেছে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-বালকের মত এপর্য্যন্ত একটি ছেলেও এদেশে জন্মেন নাই। লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস, এই বালক স্বয়ং ভগবান। কেন একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালককে শত শত লোক ভগবান বলিয়া মানিয়া লইল? তাঁহার কি ক্ষমতা ছিল যে উড়িষ্যার

মহাসম্রাট্ প্রতাপরুদ্র তাঁহার পা ছুঁইবার লোভে দীন-হীন বেশে উপস্থিত হইতেন? —সেই সময়ের সকলের চাইতে পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, ভারতী গোঁসাই প্রভৃতি জগদ্গুরু তাঁহার নিকট শিষ্যের ন্যায় করজোড়ে স্তব পাঠ করিতেন? কি গুণে জগাই-মাধাইএর মত দুর্দ্দণ্ড পাষণ্ড, ভীলপন্থ নরোজীর ন্যায় দস্যু, বারমুখী ও ইন্দিরা দেবীর ন্যায় দুষ্টা স্ত্রীলোক এই ব্রাহ্মণ ছেলেটির পদধূলি মাথায় লইয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছিল। এতবড় সৌভাগ্য বাঙ্গলাদেশের যে, বাঙ্গলার আঙ্গিনায় স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁহারই প্রতিনিধি একজন আসিয়া আমাদিগের মাথায় অসীম গৌরবের কিরীট পরাইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয়ের অনন্ত মহিমা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিরাট্ নীলিমা, কিন্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরবের বিষয় এই যে, নদেরচাঁদের বেশে তিনি এদেশে আসিয়া আমাদের পল্লীতে পল্লীতে, হাটে-মাঠে-বাটে, দীনহীনের মধ্যে দীনহীন বেশে, কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের বেশে বেড়াইয়াছিলেন,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কর্ণে অমৃতের মত হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কি বড় বড় কামান অস্ত্রশস্ত্র, জলযান, ব্যোমযান ছিল? কিছু নয়, কিছু নয়! তাঁহার কি মন্ত্রতন্ত্র জানা ছিল, যাহাতে লোকে মুহূর্ত্তে তাঁহার বশীভূত হইত? কিছু নয়, কিছু নয়! তবে তিনি জগৎ বশ করিলেন কিরূপে? তাঁহার মুখের কথার লোভে, রূপ-সনাতনের মত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীরা পথের ধূলা গায়ে মাখিয়া সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কাঙ্গাল হইয়াছেন কেন? কলসীর কাণা মারিয়া দস্যুরা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া অনুতাপে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে কেন? স্বয়ং কাজী দারুণ রোষের অর্দ্ধব্যক্ত ভ্রূকুটি থামাইয়া ফৌজ বিদায় করিয়া নিজে নিকটে আসিয়া আদরে আলিঙ্গন ভিক্ষা করিয়াছিলেন কেন? কি গুণে? কি বলে অঘটন ঘটাইয়া এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার এই সকল অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ ছিল ক্ষীণ, তাঁহার মূর্ত্তি ছিল নারীজন-কোমল—না খাইয়া তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিলেন, তাঁহার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না, তবু কি গুণে তিনি জগৎ বশ করিয়াছিলেন? সে কেবল দুটি অক্ষরের বলে। সে দুটি অক্ষরের কথা সকলেই ভালরূপে জানে—

"সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরি-নাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥"

চৈতন্যদেব তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। ইঁহার পিতৃকুলের উপাধি ছিল মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজার অত্যাচারে যাজপুর হইতে একেবারে দীর্ঘ প্রস্থান করিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুকর মিশ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম উপেন্দ্র ও জগন্নাথ মিশ্র। এই জগন্নাথ মিশ্রই চৈতন্যদেবের পিতা। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পাঠ সমাপ্ত করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতামহ মধুকর মিশ্রের সহিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নামক আর একটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন। এই নীলাম্বরের কন্যা শচীদেবীকে জগন্নাথ মিশ্র বিবাহ করেন এবং নবদ্বীপেই ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করেন। গঙ্গার উপকূলে নদীয়ার দক্ষিণ প্রান্তে জগন্নাথ মিশ্রের পাঁচখানি সুন্দর খোড়ো ঘর ছিল। এই স্থানে শচীদেবীর আটটি কন্যা জন্মে। তাহারা সকলেই অপোগণ্ড অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চৈতন্যদেবের একটি বড় ভাই ছিল। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ ছিলেন পিতামাতার স্নেহের দুলাল। দেখিতেও ছিলেন যেমন সুশ্রী, তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী। অধ্যয়নের দিকে তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। তিনি একবার যাহা পড়িতেন তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এই বালক শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বেদান্তাদি পাঠ করিয়া ষোল বৎসর বয়সেই খুব বিচক্ষণতা দেখাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা ঠিক হইয়া গেল। এদিকে যখন শুভ ব্যাপারের বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছিল, তখন ষোল বৎসর বয়স্ক বালক বিশ্বরূপ পলাইয়া গঙ্গা পার হইয়া গেলেন। তদবধি কেহ তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। এইরূপ শোনা যায়—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শঙ্করাণ্যপুরী' উপাধি লইয়া তপস্যার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চ বৎসরের শিশু বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। পাছে লেখাপড়া শিখিয়া এই পুত্রটিও ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়। কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িয়া পাঁচ-বৎসরের শিশু একটি দস্যিতে পরিণত হইল, কাহারো কলাবাগানে পাকাকলা চুরি করা, গঙ্গাস্নান করিতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যাইতেন তাঁহাদের চাদর ও কাপড় জলে ভিজাইয়া লুকাইয়া রাখা, কোন কোন ব্রাহ্মণ চোখ বুজিয়া ধ্যান-ধারণা করিবার সময় তাঁহাদের

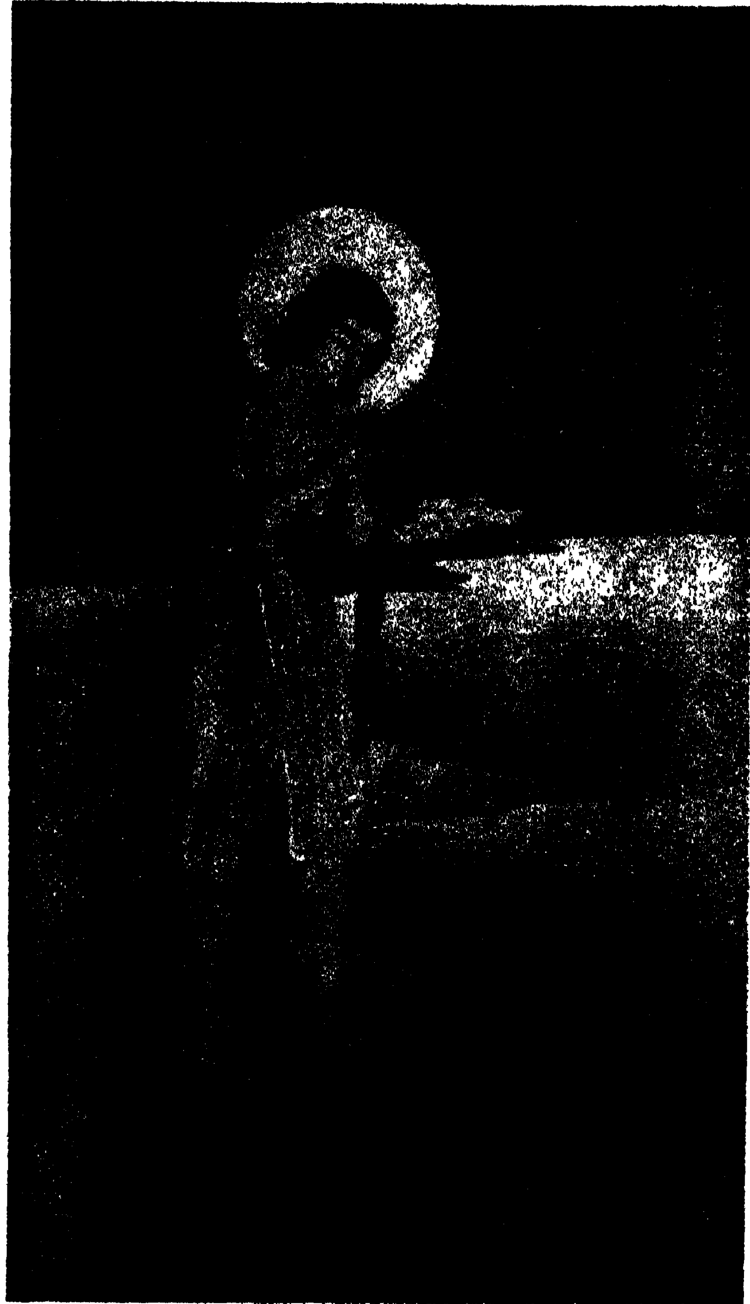
শিবলিঙ্গ চুরি করিয়া লওয়া, গঙ্গাস্নানার্থিনী বালিকাদের এলোচুলে ওকড়ার বীচি নিক্ষেপ করা এবং কোন্ কোন্‌টিকে 'বিবাহ করিব' এই ভয় দেখানো—ইত্যাদিরূপ তৎকৃৎ নানা অত্যাচার পাড়াপড়শীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। ..

প্রতিবেশীদের অনুরোধ উপরোধে বাধ্য হইয়া জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে টোলে পাঠাইলেন। বিষ্ণুদাস সুদর্শন ও গঙ্গাদাস এই তিন পণ্ডিতের টোলে নিমাই পাঠ করেন ও অতি অল্প বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া নবদ্বীপের সুধীসমাজে পরিচিত হন। বাসুদেব দত্ত নামক এক অর্থশালী ব্যক্তির বাটীতে সতের বৎসর বয়সে তিনি টোল স্থাপন করেন। এই টোলে তিনি ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী প্রস্তুত করেন। এই টিপ্পনীখানির নাম 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী'। ইহা সেই সময়ে বঙ্গদেশের সমস্ত টোলের ছাত্রেরা পড়িত। পাঠশেষে বিশ্বম্ভরের উপাধি হইয়াছিল—'বিদ্যাসাগর', তিনি আর একটি উপাধিও পাইয়াছিলেন। কেশব কাশ্মীরী নামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক 'যুদ্ধং দেহিং' বলিয়া তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। চৈতন্যদেব তর্কযুদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিতেন; সুতরাং বুড়া অধ্যাপকেরা কেশব কাশ্মীরীকে ইঁহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন পণ্ডিত অজাতশ্মশ্রু বালকের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত সেই দিনে একত্র হইয়া চৈতন্যদেবের উপাধি দিলেন—'বাদীসিংহ'। সুতরাং চৈতন্যদেবের গৃহস্থাশ্রমের পূরা নাম—শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র, বিদ্যাসাগর, বাদীসিংহ। বঙ্গদেশের প্রাণের গোরার এই নামটি কিছু অদ্ভুত শুনায় না কি?



বিশ্বম্ভর ব্রাহ্মণের পূজার ফুল লইয়া পলাইতেছেন

এই সময়ে চৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে চৈতন্য লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চৈতন্যদেব পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই সময় লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুতে তিনি যে আঘাত পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত চরিত্র



শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ

ও মনের ভাব বদলাইয়া গেল। সেই হাস্যপরিহাস নিরত চঞ্চল ও উৎসাহী যুবকের চিত্তে একটা অকালগাম্ভীর্য্য দেখা দিল। তিনি মাতার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিবার জন্য গয়ায় গমন করিলেন। পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন হইল। ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যদেব ধর্ম্মের কথা ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং তাহা লইয়া প্রিয় বয়স্য গদাধরকে কতই না বিদ্রূপ করিতেন। ঈশ্বরপুরীর গভীর ভক্তিমূলক শ্লোকগুলি হইতে ব্যাকরণের ভুল বাহির করিতেন। কিন্তু এবার ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে ঘন ঘন অশ্রু পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের পায়ে পড়িয়া তিনি কোমলপ্রাণা নারীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং যখন কুমারহট্ট ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানের মাটি কোঁচায় বাঁধিয়া লইলেন এবং বলিলেন—'এই মাটি আমার নিকট স্বর্গ হইতে পবিত্র এবং প্রাণ হইতে প্রিয়।'—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র বারিবিন্দু পতিত হইতে লাগিল এবং তিনি ধ্যানীর মত উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইহার পর গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শন। সে এক অপূর্ব্ব কথা। চারিদিক হইতে শত শত পুষ্পমালা পাদপদ্মের উপর পড়িতেছে। কত পট্টবস্ত্র, কত অলঙ্কার যাত্রীরা সেই পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছে। পাণ্ডারা মন্ত্র পড়িয়া বলিতেছে—'এই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা বলিরাজার দর্প চূর্ণ হইয়াছে—এই পাদপদ্ম তাঁহার মস্তক শোভা করিয়াছে। যোগীঋষিরা এই পাদপদ্মের আভাস পাইয়া কৃতার্থ হন। হে বিশ্ববাসী, তোমাদের দুঃখের সান্ত্বনা আর কোথাও নাই—শুধু এইখানে। দর্শন কর, ভব-বন্ধন মোচন হইয়া যাইবে'। এই স্তব পাঠ শুনিতে শুনিতে লহরে লহরে চৈতন্যের অশ্রু কপোলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পাদপদ্মে নিবেদিত শত শত ফুলমালা হইতেও সেই অশ্রুর মালা পবিত্র পাণ্ডারা দেখিল, এক দেবতুল্য আকৃতি পরম-সুদর্শন যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পাদপদ্মের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তদবস্থায় সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বাসাবাড়ীতে লইয়া আসিল চৈতন্য হওয়ার পরে তিনি বলিলেন—'তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি আমার প্রাণনাথকে দেখিয়াছি। আমি বৃন্দাবন চলিলাম। আমি আর ঘরে ফিরিব না।' বহু চেষ্টায় তাঁহারা তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। তখন শচীদেবী তাঁহার প্রিয় পুত্রকে যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল! সেই আমলকী দ্বারা পরিষ্কৃত সুদীর্ঘ কেশরাজী কোথায় গিয়াছে—তাহা জটায় পরিণত! গলা হইতে হরিনামের মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে! অতি সুদর্শন কৃষ্ণকেলি ধুতিতে সে কোঁচা নাই—ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহা কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাহ্নিক তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে শালগ্রাম পূজা পান না—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দিবারাত্র 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতেছেন: ঘরের এককোণায় বসিয়া আবেগভরে চক্ষুর জল ফেলিতেছেন। শত ডাকেও উত্তর নাই। কখনও কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া—'কে এল', 'কে এল' বলিয়া দু'হাত প্রসারণপূর্ব্বক পাগলের ন্যায় কাঁদিতেছেন এবং প্রিয় বন্ধু গদাধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন—আমি দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি শুনিবে? গদাধর সাগ্রহে শুনিতে চাহিত। কিন্তু চৈতন্যের আর বাকস্ফূর্ত্তি হইত না। কাঁদিতে কাঁদিতে গদাধরের কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। সকলে বলিল—'শচী, তোমার ছেলে পাগল হইয়াছে।' একটিমাত্র ছেলে—স্বামিপুত্রহীনার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিত। এদিকে ইহার পূর্ব্বেই শচীদেবী চৈতন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার আর এক বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিলে হয়ত ছেলের মতিগতি ফিরিতে পারে, এইজন্য শচীদেবী তাঁহাকে পুত্রের পাশে বসাইয়া রাখিতেন।

"—আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন॥"

সকলেই যখন ঠিক করিল যে, চৈতন্যদেব পাগল হইয়াছেন। তখন শচীদেবী উপায়ান্তর না পাইয়া কবিরাজ ডাকিলেন। কবিরাজ আসিয়া শিবাদি ঘৃত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। শচী শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইনি প্রবীণ ও নবদ্বীপের মধ্যে অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। চৈতন্য ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীবাস ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই ঘণ্টা পরে তিনি বাহির হইলে শচীদেবী দেখিলেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু জলে টলমল করিতেছে। শ্রীবাস শচীদেবীকে বলিলেন—'কাহাকে তোমরা পাগল

বলিয়াছ? 'আজ যাঁহাকে দেখিলাম, সে-রূপ জগতে আর কেহ দেখে নাই। এ যে শুক, প্রহ্লাদ হইতেও বড়! ইঁহার পাদপদ্মের অরুণরাগে নদীয়া পুরী আজ ধন্য হইল। তোমার ঘরে কে আসিয়াছেন জান? তুমি জান না, অন্ধ প্রতিবেশীরা জানে না, কিন্তু জগৎ শীঘ্রই তাহা জানিবে। ইঁহার উপরে কোন অত্যাচার করিও না।' কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাস চলিয়া গেলেন। তারপর হইতে শ্রীবাসের প্রশস্ত আঙ্গিনায় রোজ রোজ সায়াহ্নে খোল বাজিয়া উঠিত। যে দিগ্বিজয়ী মনোহরশাহী কীর্ত্তনে বাঙ্গলা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই কীর্ত্তনের জন্মস্থান শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। সারারাত্রি খোল-করতাল বাজিতেছে। ২৫।৩০ জন অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া চৈতন্যদেব সেই আঙ্গিনায় নাচিতেছেন। তাঁহার গানে ও নর্ত্তনে ধরা টলমল করিতেছে। অশ্রুনেত্রে ভক্তগণ সমস্ত ভুলিয়া চৈতন্য-মুখপদ্মশোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। রাত্রি কি ভাবে প্রভাত হইত তাহা তাহারা জানিত না; অরুণোদয় দেখিয়া তাহারা বলিয়া উঠিত—'এত শীঘ্র রাত্রি পোহাইয়া গেল।' এই ভাবোন্মত্তের দল ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, এবং যেদিন কাজী নদীয়ার চাঁদকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, সেদিন চৈতন্য শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন।



হরিসংকীর্ত্তনে ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেব

সে কি অপূর্ব্ব অভিযান! নদীয়া সেদিন বৈকুণ্ঠ। লক্ষ লক্ষ হস্তে মশাল, শত শত মৃদঙ্গ সহস্র সহস্র করতাল! যেদিকে হেলিয়া দুলিয়া চৈতন্য নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিনাম গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেন, সেই দিকে পুরমহিলারা ভিড় করিয়া মশাল লইয়া তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিবার জন্য দাঁড়াইতে লাগিলেন। কাজী ও তাঁহার সে অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরপুরী মাঝে মাঝে আসিতেন। শচীদেবীর ভয় হইত। একদিন শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্য মায়ের হাত ধরিয়া সান্ত্বনা দিলেন। মৃদু স্বরে শচীদেবী বলিলেন—'তুমি কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা' বলিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বাবা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর—তুমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশিবে না।

অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন এই সংকীর্ত্তনের প্রধান নেতা। শচীদেবী বলিলেন—'কে উঁহাকে অদ্বৈত বলে। উনি দৈত্য। আমার চাঁদের মত এক ছেলেকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ঘরের একমাত্র সাঁঝের শলতেছেলেটিকে ধরিয়াছেন। ইহাকেও বাহির না করিয়া ছাড়িবেন না।

কিন্তু চৈতন্যকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের সর্ব্ব-

প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের যেমন ছিল বিদ্যা, তেমন ছিল দর্প ও অহংকার। তাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের তর্কযুক্তি লইয়া বিচার করিয়া বলিলেন—"কোন শাস্ত্রে এ রকম লেখে না যে, জয়ঢাক বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভগবানের নাম লইতে হইবে। এই ছোঁড়া কাহাকে ডাকে ? আমরাই তো ভগবান—সোহহং। এইরূপ উপদ্রব করিয়া এই লোকগুলি আমাদের রাত্রে ঘুমাইতে দিবে না। গৌড়ের সম্রাটের নিকট লিখিয়া মিছিল বন্ধ করিতে হইবে।" তাঁহারা চৈতন্যকে প্রহার করিবেন এমন ভয়ও দেখাইলেন। চৈতন্য ভাবিলেন—'গৃহীর মুখে ইহারা হরিনাম শুনিবে না। আমি সন্ন্যাসী হইব এবং দুয়ারে দুয়ারে তাঁহার নাম গাহিব। যে আমাকে প্রহার করিতে আসিয়াছে তাহার নিকট নাম ভিক্ষা চাহিব।"

চৈতন্য মাতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। মাতা যখন অনুমতি দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন চৈতন্যদেব বলিলেন—'মা, তুমি সেই দেশের মেয়ে—যেখানে কৌশল্যা রামকে বনবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এদেশ ধর্মশীলা ত্যাগশীলা নারীর দেশ। তুমি পুত্রস্নেহের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত সত্য দৃষ্টি ভুলিয়া যাইবে ?" শচীদেবী অতীব ধর্মশীলা ছিলেন। পুত্রের এই উদ্বোধনে তাঁহার উন্নত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিদায় দিলেন; কিন্তু শোকে দ্বাদশ দিন উপবাসী রহিলেন।

সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যে সকল অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া দ্রাবিড়,তৈলঙ্গ, তামিল, কর্ণাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ঘরে ঘরে যে-ভাবে নাম বিতরণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাঁহার অনুচর গোবিন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোথায়



"প্রিয় হরিনাম খুসিব বিদেশে দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে।
নিজে পায়ে ধরি ভজাইব, হরি, হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে

টুণ্টিরাম তীর্থ, কোথায় সন্তাবাই, লক্ষ্মীবাই, বারমুখী দুষ্টা নারী, কোথায় পন্থ, ভীল পন্থ ও নরোজী প্রভৃতি দস্যু! এই সমস্ত পাপনিরত নর-নারীকে তিনি সেই মন্ত্রে বশীভূত করিয়াছিলেন—যে মন্ত্রে ওঝারা কালসর্পকে বশীভূত করে। তিনি অনেক স্থলেই কোন বক্তৃতা করেন নাই। তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিতেন, তাহা লোকেরা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিত। তিনি যেদিকে চাহিয়া হরিনাম করিতেন, সেইদিকে হরির রূপ ঝলমল করিয়া উঠিত। সকলে তাহা দেখিতে পাইত। পদ্মের সুরভিত বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতে হয় না। চন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্না বুঝাইবার জন্যও কোন বাগ্মীর প্রয়োজন হয় না—নদীয়ার সোনার মানুষটি ছিলেন সেইরূপ। তিনি নিজের মুখে ভগবানের রূপ যে-ভাবে আঁকিয়া দেখাইতেন, সে রূপ আর কেহ দেখেন নাই।

১৪৫৫ শকে শুক্লপক্ষীয় আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন পুরীধামে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার শেষ হয়। তিনি কিঞ্চিদধিক ৪৮ বৎসর কাল জগতে লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলার কথা জগৎ কোন কালেও বিস্মৃত হইবে না।

চৈতন্যদেবের বাণী

জাতি, কুল, ধন ও ক্রিয়া এ সকল কিছুই নহে। প্রেম ব্যতীত ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

* * *

অস্পৃশ্য বলিয়া কিছু বা কেহ নাই। মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ নাই। মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের অংশ।

* * *

ভক্তি ও বিশ্বাস দুর্লভ বস্তু। কোটি কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে একজন জ্ঞানী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। জ্ঞানিগণের মধ্যে ভক্তের সংখ্যা আরও কম। যাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস আছে তিনিই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভক্তি মুক্তির পথ।

* * *

আমি ভাল হই, আর মন্দ হই, পাপী হই, বা পুণ্যবান্ হই তাহাতে কি? যিনি জগৎস্রষ্টা, তাঁহার কাছে সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার দয়া ও স্নেহের পাত্র।

* * *

মানুষ বাহিরের শান্তি শান্তি করিয়া ব্যাকুল হয়, কিন্তু সে জানে না যে, শান্তি তাহার অন্তর মধ্যেই বাস করিতেছে। যেখানে সংযম, যেখানে ত্যাগ, যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, সেখানেই শান্তি বাস করে।

* * *

ক্রোধ দমন মহত্তের প্রকৃত লক্ষণ। পাপীকে আলিঙ্গন করিতে পারার মধ্যে হৃদয়ের মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

* * *

পৃথিবীর ধন মান, পদগৌরব, ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে যতদিন বাস করিবে ততদিন ভক্তি, সেবা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও শিক্ষার দ্বারা জীবনকে মণির ন্যায় উজ্জ্বল করিবে।

* * *

সে আমাকে মারিয়াছে—অপমান করিয়াছে, সেই জন্যই কি তাঁহাকে ভালবাসিব না?—ভালবাসার কাছে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ ভেদ নাই।

'মেরেছ কলসীর কাণা, তা বলে কি প্রেম দিব না?'

ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত জীবের স্বতন্ত্র শক্তি নাই তিনি যাহা করান বা বলান, জীব তাহাই অনুসরণ করে।

কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার হয়। শব্দ ব্রহ্ম। অক্ষয় অমর শব্দ-ব্রহ্ম কীর্ত্তনে প্রচারিত তাঁহার নাম আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়, তাহা শুনিয়া কোটি কোটি জীব মুক্তিলাভ করে।

মানুষ মানুষের ভাই। সেখানে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা আসিবে কেন?

ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে তৃণাধম মনে করিবেন—বৃক্ষের ন্যায় দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা আচরণ করিবেন। কাটিলেও বৃক্ষ যেমন নীরবে সহ্য করে এবং শুকাইয়া গেলেও কাহারও নিকট এক গণ্ডূষ জল চাহে না, বরং বৃষ্টি-বাত্যা সহিয়াও আপন ছায়া দানে আপনাকে রক্ষা করে, এইরূপ নিরভিমানী হওয়াই সাধকের কর্ত্তব্য।

* * *

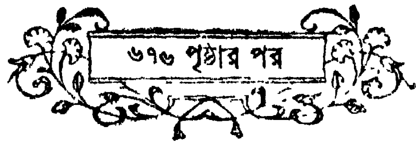
ধন, জন, কবিত্বশক্তি এ-সকল কিছুই কামনা করিও না। কামনা ব্যতীত যে ভক্তি, তাহাই হইতেছে অহৈতুকী ভক্তি।

* * *

ঈশ্বরের নাম শুনিলেই যাঁহার হৃদয়ে আনন্দ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।



আফগানিস্থান



আফগানিস্থান এশিয়ার মধ্যে একটি ছোট দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদের দিক দিয়া … দ লণ্ডনে এক … রাজদূত থাকি…

আফগানিস্থান বড় … পার্ক … প্রধান প্রদে… জন্যই ইহার এত খ্যাতি। 'আফগান' … আফগা… আমরা এখন যে দেশকে বুঝি, আগে ঠিক তাহাকে … ভূম অঞ্চ… আদিম … বুঝাইত না। অষ্ট … … ১৯৩ … …দের … … ৭ কম

…১৮ খৃষ্টাব্দে কাশিয়ার … কাশিয়ার পতনের …গে ইংরাজ ও রুশ … আফগানিস্থানের … পর সমান স্বার্থ ছি… রুশিয়ার ও এশিয়ার … ওী দেশরূপে অবস্থানের জন্য রুশিয়ার পক্ষে … য প্রাচ্য নিজেদের অন্তর্গতরূপে থাকায়, রুশিয়া আফগানিস্থানকে হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইংরাজ আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা রাখিবার চেষ্টা বরাবরই করিয়াছেন: কেননা, বিদেশী আক্রমণকারীদের আফগানিস্থানের খাইবার গিরিপথ ব্যতীত অন্য দিক দিয়া আসিবার পথ কোথায়? চারিদিক ঘিরিয়া দুর্গম পর্বত, সেই পর্বতের মধ্য দিয়া পথ। কাজেই, খাইবার গিরিপথ পৃথিবীর মধ্যে একটি দুর্গম গিরিপথ বলিয়া পরিচিত।

পূর্বে আফগানিস্থানের রাজা বা আমীর আফগানিস্থানের সর্বময় … ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এ… ব্যবস্থাপক সভারও সৃষ্টি হয়, দেশের লোকদের রাজ্যশাসন ব্যাপারে অনেকটা অধিকার জন্মে। রাজা মন্ত্রণা-সভার সভাপতিরূপে কাজ করিতেন। ১৯২২



…শ্তুতে পারসিক ভাষার শব্দ বেশীর ভাগ ব্যবহার হয়। ইহাদের পুস্তকাদি আরবী হরফে লেখা। দেশের সর্বত্রই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক শিক্ষা আফগানিস্থানে বাধ্যতামূলক—উচ্চ শিক্ষাও সেইরূপ। রাজধানী কাবুলে বর্তমানে দুইটি কলেজ ও একটি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলেজ রহিয়াছে।

আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলের লোক সংখ্যা ১৫০,০০০। কান্দাহারের (Kandahar) লোক সংখ্যা আনুমানিক ৪০,০০০ হিরাটের ১২০,০০০। মোট আফগানিস্থানের লোকসংখ্যা হইবে প্রায় আশী লক্ষ (৮,০০০,০০০), পরিমাণ-ফল দুইলক্ষ পঁয়তাল্লিশ (২৪৫,০০০) হাজার বর্গ মাইল।



ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমাচিহ্ন

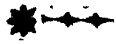
আফগানিস্থানের ভূ-ভাগ বিভিন্ন রকমের। কোথাও বরফে ঢাকা উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী কোথাও মালভূমি, কোথাও আঁকাবাঁকা পাহাড়িয়া নদীর তীরে তীরে দুর্গম অধিত্যকা প্রদেশ। আবার কোন কোন উপত্যকাভূমি বেশ সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে দেশটা অনুর্ব্বর ও শিলাকীর্ণ পার্ব্বত্য-ভূমিতে পরিপূর্ণ।



খাইবার রেলপথের সুরঙ্গ

জলবায়ু—উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে অতিশয় শীতল আর নিম্নভাগে অত্যন্ত গরম। অধিত্যকা প্রদেশে নানাজাতীয় ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানকার প্রধান ফসল হইতেছে গম, যব, ধান, ভুট্টা, তামাক, ইক্ষু ও তুলা

আফগানিস্থানের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এক সময়ে—বৈদিক কালে এদেশের গোয়াল নদীর তীরে বৈদিক ঋষিরা বাস করিতেন—যজ্ঞ করিতেন এবং স্তব ও স্তোত্র রচনা করিতেন। আর্য্য ঋষিরা তখৎ-সুলেমান পর্ব্বতউপত্যকায় বাস করিয়াছিলেন, এমন কথা আজকাল অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরাই বলিয়া থাকেন। সে সময়ে বোচ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), বাহলীক (বল্খ), গান্ধার, (পেশোয়ার) এসব অঞ্চলে ঋষিরা বাস করিতেন। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণকালেও আফগানিস্থান, সিস্তান ও বেলুচিস্তানে আর্য্যসভ্যতা বিদ্যমান ছিল। মৌর্য্য রাজারা যখন মগধে রাজত্ব করিতেন, তখন হিরাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তার লাভ করে। কাবুল নগরে



আমীর হাবিবুল্লা



সিনওয়ারী যোদ্ধা



আফগান পরিবার

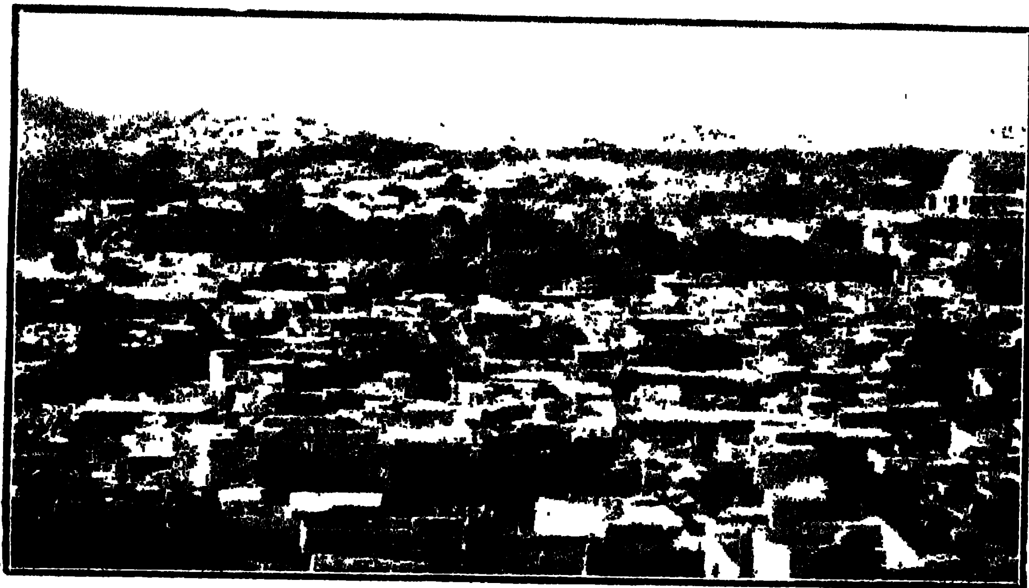


গিলজাই যোদ্ধা

সীমান্ত প্রদেশের এই সকল অধিবাসী অত্যন্ত সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ। ইহাদের দেশপ্রীতি অতীব প্রশংসনীয়। ইহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে পারে।



বাচ্চা ই-সাকো



কাবুল সহর

হিন্দু জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আফগানিস্থানে বৌদ্ধ ও জরথুস্ত্র মতের বহু লোক বাস করিত। কাবুলের আশে-পাশে এখনও বৌদ্ধসভ্যতার বহু নিদর্শন আছে। আফগানিস্থানের উত্তরে বামিয়ান্ নামক পর্ব্বতের গায়ে অনেকগুলি বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। সেকালে কাবুল নদীকে বলিত 'কুভা'। কুরুম উপত্যকা—ক্রমু, 'গোমল'—গোমতী পেশোয়ার পুরুষপুর বা পুষাপুর, গান্ধার এই সব নানা দেশ ও নদনদী ছিল।



আমীর দোস্ত মুহম্মদ

প্রাচীনকাল হইতে আলেকসান্দারের সময় পর্য্যন্ত আফগানিস্থান নানা বিদেশীয় জাতি



সা স্থজা

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা আফগানিস্থান জয় করে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত উহাদের অধিকারে থাকে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মুহম্মদ নামে একজন ক্ষমতাশালী আফগান সর্দ্দার আফগানিস্থানের আমীর হন। কাবুলের আমীর সা স্থজা পলায়ন করিয়া ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-রাজশক্তি কাবুল আক্রমণ করিয়া সা স্থজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।



আমীর শের আলী

দুই বৎসর পরে একদল আফগান বিদ্রোহ করিয়া কয়েকজন ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করে। পর-বৎসর ইংরাজ কাবুল ছাড়িয়া আসেন। এসময়ে ভারতবর্ষ হইতে নূতন সৈন্যদল আসিয়া আবার কাবুল আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। সা স্থজা হত্যাকারীদের হাতে প্রাণ হারাইলে আবার দোস্ত মুহম্মদ কাবুলের আমীর হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে শের আলী আমীর হইলেন এবং কিছুদিন ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়া পরে বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে আবার ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করে, আমীর তুর্কীস্থানে পলাইয়া গেলেন। ইয়াকুব খাঁ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া আমীর হইলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমানুল্লা কাবুলের আমীর হইলেন। আমানুল্লা ইউরোপীয়দের আদর্শে দেশমধ্যে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশের লোকেরা তাহা ভালভাবে দেখিল না,



সীমান্ত প্রদেশের মোমন্দ



সীমান্তের একজন মালিক



আফগান সৈন্যদল

কাজেই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সিংহাসন ছাড়িতে হইল। আমানুল্লা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিলে পর তাঁহার ভ্রাতা ইনায়েতউল্লা আমীর হইলেন। ইনায়েতউল্লা দেশের সঙ্কট সময়ে ভাল করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিলেন না। এই সুযোগে বাচ্চা-ই-সাকো নামে একজন বিদ্রোহী ইনায়েতউল্লাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া হবিবুল্লা গাজী নাম লইয়া কাবুলের সিংহাসনে বসিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আবার এক



ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লা খাঁ

বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। আমানুল্লার ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি নাদির খাঁ কাবুলে আসিলেন এবং বিদ্রোহ দমন করিলেন। দেশের লোকেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। নাদীর খাঁ আমীর হইলেন। দেশে শান্তি আসিল। হবিবুল্লা বিদ্রোহের জন্য ধরা পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। নাদির খাঁ কাবুলের শাসন, শিক্ষা, রেলপথ, ব্যবসায় বাণিজ্য সব দিকে উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের দুইটি পথ দিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য হইয়া আসিতেছে—একটি খাইবার পাসের পথে, অন্যটি হিরাট, মারব (Merve) হইয়া তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়া। বাণিজ্যদ্রব্যাদি ঘোড়া ও উটের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

আফগানিস্থান পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বিভক্ত। আফগানিস্থানের নানা



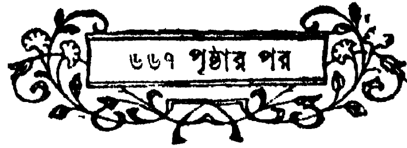
বর্ত্তমান আমীর নাদির খাঁ (যৌবনে)

বংশের লোকেরা নানা বিভিন্ন উপত্যকায় বাস করে। গিলজাই আফগান, ইউসুফজাই আফগান, হাজারা আফগান, দুরানী আফগান, মোমন্দ আফগান—এইরূপ নানাবংশের আফগান আছে। ইহারা সাহসী, অক্লান্তকর্ম্মী এবং দেশপ্রেমিক। আফগানেরা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী।

এদেশের পুরুষ ও নারী দেখিতে সুশ্রী, সবল এবং সাহসী। ইহারা নানাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করে।



সরীসৃপের যুগ


৬৬৭ পৃষ্ঠার পর

সেকালের মাঝে যে সরীসৃপেরা ছিল কথা নয়। কিন্তু সেই সে-সব সরীসৃপ ছিল তাহারা আকারে তেমন বড় ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের যেমন বংশ লোপ পাইতে লাগিল, উহাদের আকার-প্রকারেও তেমনি নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিল। এই যে পরিবর্তন, তাহা যে দু'দশ বৎসরে হয় নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল সে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।



ডাইনোসোর

সেই প্রাচীন সরীসৃপদের কালে যদি তুমি কোন গভীর বনের ভিতর দিয়া বেড়াইতে যাইতে, তাহা হইলে সকলের আগে তোমার চোখে পড়িত বড় বড় পায়ের দাগ। সেই পায়ের দাগ ধরিয়া যদি পথ চলিতে সুরু করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, ডিনোসোর বা ডাইনোসোর (Dinosour) পথ দিয়া

ডাইনোসোর কথাটি গ্রীক Deinos অর্থ ভয়ানক (terrible), আর সোর অর্থ সরীসৃপ। এক কথায় ভয়ানক সরীসৃপ। আর সে-বড় বড় পায়ের চিহ্ন ব্রন্টোসোর (Brontosaur) নামক ঐ জাতীয় প্রাণীর। সরীসৃপ ব্রন্টোসোরের শরীরের পরিমাপটা এইবার শোন।

ব্রোন্টোসোর

ইহাদের শরীর লম্বায় হইত প্রায় ৮০ ফিট, ওজনে প্রায় সাড়ে পাঁচশ মণ। আকার হইলেই যে, তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবটা ভয়ঙ্কর হইবে, এমন কথা কিন্তু সত্য নয়। পেছনের পা দু'টোর উপর ভর করিয়া ইহারা অনায়াসে বনের সকলের চেয়ে উঁচু গাছের ডালের পাতা খাইতে পারিত বটে, কিন্তু কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করিবার শক্তি ইহাদের বড় একটা ছিল না। লম্বা গলা এবং ছোট একটি মাথার ভিতরে যে বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি বলিয়া কিছু ছিল, সে কথা জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন না। অনেক ছোট ছোট চালাক জন্তুরাও ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে কোনরূপ ভয় করিত না। এইভাবে ইহাদের সহিত তুলনায় অনেক ছোট ছোট প্রাণীর হাতেও ইহাদের প্রাণ দিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ, ইহারা জলজ উদ্ভিদ্ খাইতেই বেশী ভালবাসিত। অনেক জলাভূমির নীচে মাটির ভিতর হইতেই এই জাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

এই জাতীয় আর একটি বৃহদাকার জীব ছিল— তাহাদের নাম আটলান্টোসোর (Atlantosaur)।

আটলান্টোসোর

ইহারা আমেরিকা অঞ্চলেই বেশীর ভাগ বাস করিত। ইহাদের দেহের পরিমাণও প্রায় আশী ফিট দীর্ঘ ছিল। শরীর লম্বা



তিনটি শিং-ওয়ালা ডাইনোসোর

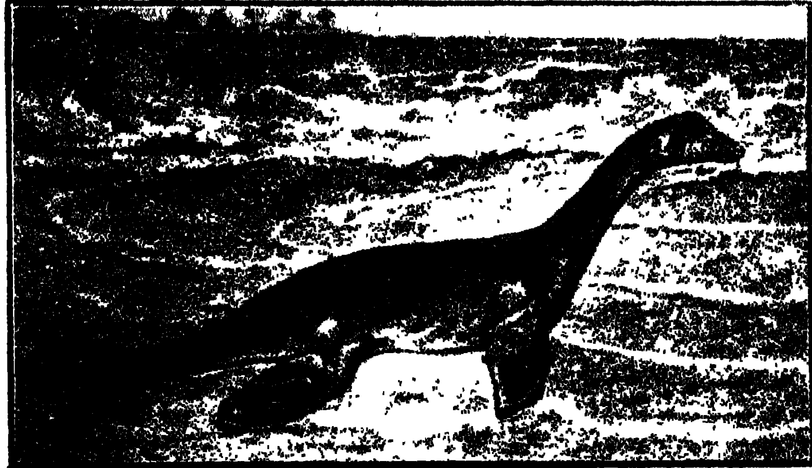
হইলে কি হইবে? তাহার ছোট মাথাটিতে মগজ বলিয়া কোন জিনিষ ছিল কিনা সন্দেহ, শরীরের তুলনায় ইহাদের মগজ বাড়ে নাই। ডিনোসোর জাতীয় অন্য কোন প্রাণী আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও যদি এই বৃহদাকার আটলান্টোসোরকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইহারা আত্মরক্ষা করিতে পর্যন্ত পারিত না। ঈশ্বর ইহাদিগকে আকারে অতি বৃহৎ করিলেও ছোট ছোট প্রাণীদের দয়ার উপর তাহাদিগের জীবনটা রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এই সব সরীসৃপজাতীয় প্রাণীরা নিরীহ ছিল বলিয়া সে-কালের অপরাপর সরীসৃপেরাও যে নিরীহ ছিল, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে নানাজাতীয় সরীসৃপ ছিল। এক জাতীয় ডিনোসোরেরা মাংসাশী ছিল। তাহাদের বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, বড় বড় মাথা, চতুরতা এবং দ্রুতগমনে দক্ষতার জন্য, অন্যান্য প্রাণীরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলিত। ইহাদের কাহারো কাহারো মাথার উপর আবার লম্বা এবং সরু বা তীক্ষ্ণ শিং থাকিত। লম্বায় ইহারা ২০ ফিট্ পরিমাণ হইত এবং খাড়া হইলে ১২ ফিট্ উচ্চ হইত। পেছনের পা দু'খানার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলে ইহাদের ভীষণাকার মূর্তি দেখিয়া অন্যান্য জীবজন্তুরা ভয় পাইত। সেকালে এক প্রকারের



উড্ডীয়মান সরীসৃপ

সরীসৃপ ছিল তাহারা উড়িতে পারিত। উড়িতে পারিত বলিয়া ইহাদিগকে পাখী বলিয়া ভুল করিও



লিসিওসোর

উড্ডীয়মান সরীসৃপ

না। তোমরা বাদুর দেখিয়াছ, ইহাদিগকে বৃহদাকারের বাদুর বলিলেই ভাল বুঝিতে পারিবে।

ষ্টিগোসোর বলিয়া আর এক প্রকারের প্রাণী ছিল; তাহাদের আকার ছিল অতি অদ্ভুত রকমের। ইহাদের গায়ে একটা কঠিন আবরণী ছিল। চারটি ছিল ষ্টিগোসোরের পা। সামনের পা দু'টির চেয়ে

পেছনের পা দু'টি ছিল বেশী লম্বা। ইহাদের শরীরের চামড়া বড় বড় কঠিন হাড়ের আবরণী দিয়া ঢাকা থাকিলেও বিরাট শরীর লইয়া ইহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। মাথার দিকে হাড়ের আবরণী এবং লেজের দিকের হাড়ের আবরণী অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। কিন্তু পিঠের উপরের ঐ আবরণী ছিল খুব বড় বড়। ইংল্যাণ্ডের সুইনডোন্ (Swindon) অঞ্চলে এ-জাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল অনেক পাওয়া গিয়াছে।

ষ্টেগোসোর

সেকালের সমুদ্রের মধ্যে যে সকল সরীসৃপ বাস করিত তাহাদের মধ্যে ইক্‌থিওসোর Ichthyo-saur) এবং লম্বা গলাওলা প্লিসিওসোরি (Plesio-sauri) নাম করা যাইতে পারে। সেকালে যদি তুমি একখানা ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্রে যাইতে, তাহা হইলে ইহারা নৌকাখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া অতি সহজেই তোমার প্রাণনাশ করিতে পারিত।

ইক্‌থিওসোর

ইক্‌থিওসোর আকারে বড় কম ছিল না। ইহারা দৈর্ঘ্যে হইত প্রায় ৪০ ফিট লম্বা। অতি বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, বড় বড় চক্ষু দেখিলে কাহার না ভয় হইত। ইহারা সাঁতার দিতে পারিত। ইক্‌থিওসোর প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সরীসৃপজাতীয় প্রাণী; ইহাদিগকে মাছ বলিয়া ভুল করিও না যেন। আচ্ছা, এই সব প্রাণীরা কত দিন পূর্ব্বে বাঁচিয়া ছিল বল ত? সে অতি সত্যিকালের কথা—১০০,০০০,০০০ হইতে ২০০,০০০,০০০ বৎসর আগে। ইংল্যাণ্ড যখন সমুদ্রের জলের অতল তলে ডুবিয়া ছিল তখন এই সকল প্রাণী আনন্দে সমুদ্রের বুকে বিচরণ করিত।



ইক্‌থিওসোর

সেকালের গ্লিপটোডন নামেও এক অদ্ভুত জাতীয় প্রাণী ছিল।



গ্লিপটোডন

ইক্‌থিওসোরদের চেয়ে প্লিসিওসোরি আকারে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু চওড়ায় ছিল অনেকখানি বড়। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর

দেক প্রদেশে এ-সকল প্রাণীর কঙ্কাল-চিহ্ন পাওয়া যায়। গ্রেট্ ব্রিটেনের ওয়ারউইক্সায়ারের অন্তর্গত (Harbury) নামক স্থানে ইক্‌থিওসোর এবং লিসিওসোরির কঙ্কাল মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কলোরাডো (Colorado) নামক স্থানে সে-কালের সরীসৃপ-জাতীয় বৃহদাকার প্রাণীদের অনেক কঙ্কালচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। টাঙ্গনিকা অঞ্চলেও ডিনোসোর-জাতীয় অনেক প্রাণীর প্রস্তরে পরিণত কঙ্কাল-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সেখানে এক-খানি চল্লিশ ফিট্ লম্বা গলার হাড় পাওয়া গিয়াছে। ঐ হাড় হইতেই অনুমান করিতে পারি, ডিনোসোরজাতীয় যে প্রাণীর গলার হাড়ই এতবড় লম্বা, তাহার সারা শরীরটার পরিমাণ কত বড় ছিল। মধ্য-এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের মাটির নীচ হইতে ডিনোসোর-জাতীয় প্রাণীর প্রস্তরে পরিণত ২৫টি ডিম পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন দেশ হইতে ডিনোসোর-জাতীয় প্রাণীর ডিম পাওয়া যায় নাই। এই ডিমগুলির বয়স প্রায় দশ লক্ষ বৎসর।



ডাইনোসোরের পাথরে পরিণত ডিম

ভারতবর্ষেরও কোন কোন স্থানে নানাজাতীয় সরীসৃপের কঙ্কাল-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সি, এ, ম্যাট্‌লি নামে একজন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জব্বলপুরের কাছাকাছি বড় সিমলা নামক পাহাড়ে ডিনোসোর বা ডাইনো-সোর জাতীয় অতিকায় সরীসৃপের অস্থি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ছোট সিমলা নামক পাহাড়ে খুঁড়িতে যাইয়া ভূতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সি, এ, ম্যাট্‌লি ও তাঁহার সঙ্গী ভারতীয় ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এস-সি. (লণ্ডন) এ, আর, সি, এস কয়েকটি অতিকায় সরীসৃপের অস্থি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি জঙ্ঘার হাড় লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি পায়ের দুইটি হাড় লম্বায় ২ ফুট ৮ ইঞ্চি করিয়া, সামনের পায়ের উপরের দিকের হাড় লম্বায় ৩ ফুট, একটি পাঁজরের হাড় ২০ ইঞ্চি। এই জন্তুটির আকার ছিল প্রায় ত্রিশ হাত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে জানোয়ারের হাড় পাওয়া গিয়াছিল, সেইটির আকার ছিল প্রায় চল্লিশ হাত। বর্ত্তমান সময়ে যে জানোয়ারের অস্থি পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে টাইটানোসরাস্। এই জন্তুর আকৃতি অনেকটা গোসাপের মত ছিল।

নানাদিকের অবস্থা ও পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সরীসৃপ যুগেই পাখীর জন্ম হইয়াছিল। অনেকে বলেন, পাখীর জন্মকাল তাহারও অনেক আগে।

পাখীর জন্ম

সেকালে পাখী ও সরীসৃপের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। বর্ত্তমান কালে পাখীর মাথা ও লেজের সহিত সরীসৃপদের ঐক্য নাই। সে-কালের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সরীসৃপেরা এইভাবে একটির পর একটি প্রায় সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়াই তাহারা প্রাণ হারাইয়াছে।



ভ্রমণ ও আবিষ্কার

[মানুষ তাহার প্রথম সৃষ্টির পর হইতেই অজ্ঞাতের সন্ধানে ব্যস্ত। যাহা কিছু তাহার চক্ষের বা জ্ঞানের অগোচর, তাহাই সে চায় দর্শনের দ্বারা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিতে। মহাসিন্ধু-ঘেরা অজ্ঞাত স্থলভূমির কোথায় কোন্ অজানা দেশ আছে, সমুদ্রের অতল তলে কোন্ মহাদেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, কোথায় উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফের দেশ, কোথায় আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে লুপ্তনগরী, হিমালয়ের গৌরীশঙ্করের চূড়ায় প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা চলিতেছে, এশিয়ার গভীর গহন জঙ্গলে কোন্ কোন্ হিংস্র জন্তু আছে, কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় লোকের বাস, কোথায় কোন্ নূতন জগৎ - এ সমুদয় জানিবার জন্য মানুষ আবহমান কাল হইতেই চেষ্টা করিতেছে। আমরা কিন্তু সব সংবাদ জানি না। যাহা আমরা জানিতে পারি নাই—জানিবার উপায়ও নাই, তাহা মহামানবগণ নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া, নূতন নূতন দেশও প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য ও অজ্ঞাতের তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন এবং তাহাদের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহাদের সেই বিস্ময়কর ভ্রমণ ও আবিষ্কার-কাহিনী প্রকাশ করিব।]

মার্কো পোলো

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিসের রাজপথে একদিন ছোট একটি দলকে দেখা গেল। তিনজন মাত্র লোক। তিনজনের দুইজন বৃদ্ধ, ভ্রমণ-ক্লান্ত, তৃতীয় জনেরই বয়স একচল্লিশ বৎসর কিন্তু দেহ তখনও দীর্ঘ এবং ঋজু।

ভেনিসের অধিবাসীরা কেহই তাঁহাদের চিনিতে পারে নাই। না পারার জন্য তাহাদের দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, এই তিনজন লোক—নিকোলো পোলো (Nicolo Polo), মাফেও পোলো (MaffeoPolo) ও মার্কো পোলো (Marco Polo) প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মাতৃভূমি ভেনিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তারপর এই তাঁহাদের পুনরাগমন।

আপনার প্রিয় স্বজনেরাও তাঁহাদের চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মধ্য এশিয়ার বর্ব্বর মানুষদের হাতে পোলোরা হয় ত বহুদিন প্রাণ হারাইয়াছে। কাজেই, পোলোরা তিনজন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইলেন ও অবশেষে আপনাদের আহৃত অমূল্য ধন-রত্ন, মণি, মুক্তা, চুণি, হীরা ইত্যাদি দেখাইলেন, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কিছুদিন ধরিয়া কেবল পোলোদের ও তাঁহাদের অদ্ভুত ভ্রমণের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্পই চলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য, এক রকম নাকি জিনিষ আছে, যাহা খনি হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া পরে তাহা জ্বালাইতে হয়। এক রকম জানোয়ার আছে তাহাদের কপালের উপর একটা শিং আছে। সাপের নাকি পা আর থাবা হয়। পোলোরা এতদিন পর্য্যন্ত যাহা ইউরোপবাসীরা জানিত না, এমন বহু জিনিষের কথা বলিয়াছিলেন,



কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, গণ্ডার ইত্যাদির কথা কেই-বা আগে জানিত? এশিয়ার পার্ব্বত্য ভেড়ার নাম ওভিস্ পোলি (Ovis Poli)। ইহার নাম প্রথম আবিষ্কর্ত্তা পোলোদের নাম অনুসারেই হইয়াছে।

ইহার তিন বৎসর পরে জেনোয়াবাসীদের সঙ্গে জলযুদ্ধে মার্কো পোলো বন্দী হন। তাঁহার বন্দী অবস্থায় লোকেরা তাঁহার নিকট ভ্রমণের গল্প শুনিতে আসিতেন। বার বার করিয়া একই গল্প বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া মার্কো পোলো



পোলোদের দেশত্যাগ

একখানি বই লিখিবেন স্থির করিলেন। আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে মার্কো পোলোর স্থান বোধ হয় কলম্বাসেরই নীচে, এবং এই খ্যাতি তাঁহার বন্দী অবস্থায় রচিত অমূল্য ভ্রমণকাহিনীর উপরেই সংস্থাপিত। বন্দী না হইলে বোধ হয় এই অপূর্ব্ব কাহিনী রচিতই হইত না। এখন এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা এতকাল কি করিতেছিলেন, তাহাই বলা যাক্।

১২৬৩ খৃঃ অব্দে উত্তর চীনের সম্রাট চেঙ্গিস্ খাঁর পৌত্র কুব্লা খাঁর (Kubla Khan) নিকট যে লোকজন প্রেরণ করা হয়, নিকোলা পোলো ও মাফেও পোলো তাহার মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় যথাসময়ে পৌছেন। পরে পুনরায় কুব্লা খাঁ চীনদেশে একশত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য, পোপের নিকট অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন।

১২৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহারা পুনরায় চীন অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পোপ একশত প্রচারক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ হইত। এবার



মার্কো পোলো

(একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে)

নিকোলো পোলো ও তাঁহার ভ্রাতা মাফেও পোলোর আর একজন সঙ্গী ছিল। নিকোলোর সপ্তদশবর্ষীয় পুত্র মার্কোপোলো। ক্রমাগত চারি বৎসর ধরিয়া আর্ম্মেনিয়া, পারস্য, আফগানিস্থান মধ্য এশিয়ার মালভূমি, তুর্কিস্থান, গোবি মরুভূমি ইত্যাদি পার হইয়া, পোলোত্রয় কিংহান (King-han) পর্ব্বতে অবস্থিত কুব্লা খাঁর গ্রীষ্মযাপনের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কুব্লা খাঁ বহুদিন

পরে পরিচিতদের দেখিয়া খুব খুসী হইলেন ও খুব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। মার্কো পোলো সহজেই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কুবলা খাঁ মার্কোকে তাঁহার সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া যাহা কিছু নূতন জিনিষ দেখিবেন তাহার তথ্য সংগ্রহ করিতে অনুমতি দিলেন। পরে মার্কোর কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোচিন ও ভারতবর্ষেও তথ্য সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করেন।



কুবলা খাঁর দরবারে মার্কো পোলো

সতেরো বৎসর ধরিয়া মার্কো এই সব কার্য্য করিতে করিতে বহুবিধ জ্ঞান লাভ করেন। চীনদেশের বিবিধ পশুপক্ষী, খনিজ পদার্থ, গ্রীষ্ম-প্রাসাদ, আশ্চর্য্য শীতপ্রাসাদ ইত্যাদি ও চীনের সহরসমূহের কথা তিনি পরে তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এতদিন দূর প্রবাসে কাটাইয়া পোলোত্রয় অবশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সম্রাটের নিকট নিজ দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলেন। সম্রাট প্রথমে রাজী ছিলেন না। কিন্তু এসময়ে পারস্যরাজের সহিত বিবাহের জন্য একজন রাজকন্যাকে প্রেরণ করার প্রয়োজন হয়। পারস্যে যাইতে হইলে জলপথে যাইতে হইবে। আর পোলোরা নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; কাজেই পোলোত্রয়ের সঙ্গে রাজকন্যাকে তাঁহার ভাবী-পতির নিকট পাঠান হইল।

দামী উপঢৌকন, নানাবিধ উপহার ও রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, সম্রাটকে এই আশ্বাস দিয়া, পোলো তিন জন চীনদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পারস্যে পৌঁছিয়া দেখেন, রাজা মৃত। নূতন রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজকন্যা, ও উপঢৌকন ইত্যাদি নূতন রাজাকে দিয়া-পোলোরা পুনরায় দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পারস্য, আর্মেনিয়া পার হইয়া তাঁহারা ভেনিস অভিমুখে চলিলেন।

মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী অমূল্য। ইহার কারণ, বর্ণনা অত্যন্ত সহজ, সরল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য। কয়লার যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত ঠিক্। আমা-

দের নিকট কয়লা নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষ কিন্তু পোলোর কাছে ইহা সম্পূর্ণ অদ্ভুত, নূতন জিনিষ ছিল। কয়লার সম্বন্ধে মার্কো পোলো লিখিয়াছেন, "ক্যাথওয়ে প্রদেশে (Cathway) এক রকম কালো পাথর পাওয়া যায়—যাহাকে জ্বালানী কাঠের ন্যায় আগুনে পোড়ান হয়। প্রথম বারে আগুন দেওয়া মাত্র এই পাথর জ্বলে না কিন্তু জ্বলিলে ইহার তাপ অতি ভীষণ।"

মার্কো পোলোর লিখিত অনেক গল্প অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ, মার্কো পোলো হয়ত নিজের চোখে তাহা দেখেন নাই—অন্যদের মুখে শুনিয়াছেন।

মার্কো পোলো কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভেনিসে আসেন, তখন তাঁহার ডাক-নাম হইয়াছিল The man of million's, কারণ, তিনি কোন কিছু বলিতে হইলেই মিলিয়ন কথাটি ব্যবহার করিতেন।

অনেক লোক বহুদিন পর্যন্ত মার্কোকে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় অনেকে তাঁহাকে পুস্তকে লিপিবদ্ধ বিষয়ের অনেকাংশ মিথ্যা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলে মুমূর্ষু মার্কো দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেনঃ না, কখনই না—আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকই বরং লিখিতে পারি নাই।

মার্কো পোলোকে বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। বন্দী অবস্থায় তিনি যে ভ্রমণ-কাহিনী মুখে আবৃত্তি করিতেন, তাহা প্রথমে ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়, পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়।

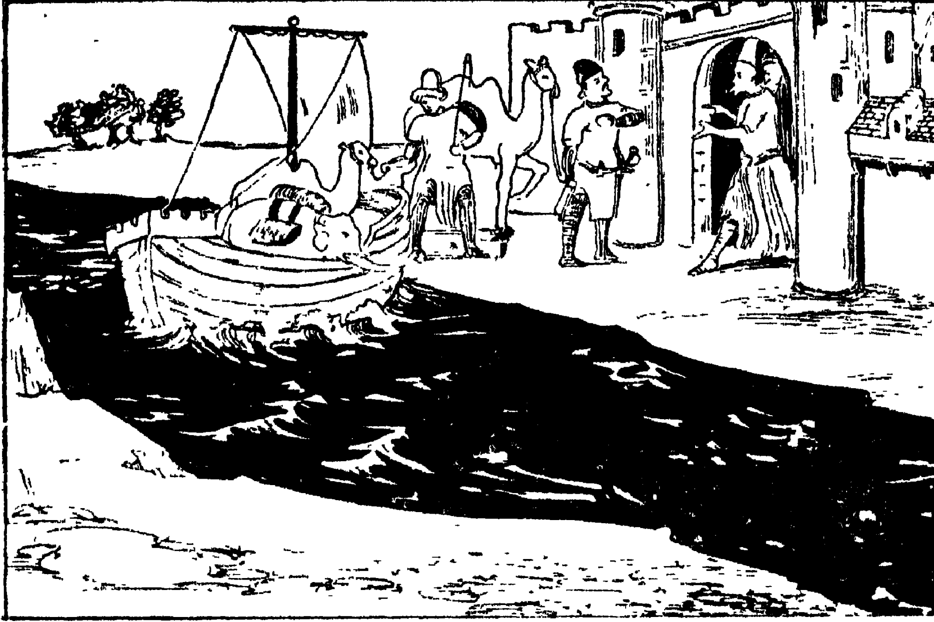
মার্কো পোলোর নিজমুখে বর্ণিত ভ্রমণ-কাহিনী

আমি যে ভ্রমণকারী হইয়াছি, সে কেবল আমার বাবা নিকোলো পোলো ও কাকা মাফেও পোলোর জন্য। ১২৫৪ খৃঃ আমার জন্মের বৎসর আমার বাবা ও কাকা গুজব শুনিতে পান যে, ক্যাথে প্রদেশের ধন-সমৃদ্ধির তুলনা নাই। এই খবর শুনিয়াই আমার বাবা ও কাকা নূতন দেশ দেখিবার জন্য ও ধনলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন ও শীঘ্রই যাত্রা করেন। তাঁহারা সেখান হইতে নানা দ্রব্য লইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে যান ও পরে বোখারা যান। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের চীন-সম্রাট কুবলা খাঁর দরবারে লইয়া পরিচয় করাইয়া দেন। চীন-সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পেকিং যাইতে তাঁহাদের পূর্ণ এক বৎসর লাগিয়াছিল। সম্রাট তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। কুবলা খাঁ মাফেও পোলো ও নিকোলো পোলোর নিকট তাঁহাদের দেশের কথা, ধর্ম্মের কথা খুব আগ্রহের সহিত জানিতে চান। ইহার কয়েক বৎসর পরে সম্রাট আমার বাবা ও কাকাকে পোপের নিকট হইতে একশত জন বিজ্ঞ প্রচারক আনিবার জন্য দেশে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা যখন ভেনিসে আসেন তখন আমার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। এই



মার্কো পোলো তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বলিতেছেন

সময় পোপ হঠাৎ মারা যান। কাজেই, চীন-সম্রাটের নিকট যাত্রা করিতে দেরী হইয়া গেল। তাঁহাদের দ্বিতীয় যাত্রায় আমাকে সঙ্গে লওয়া



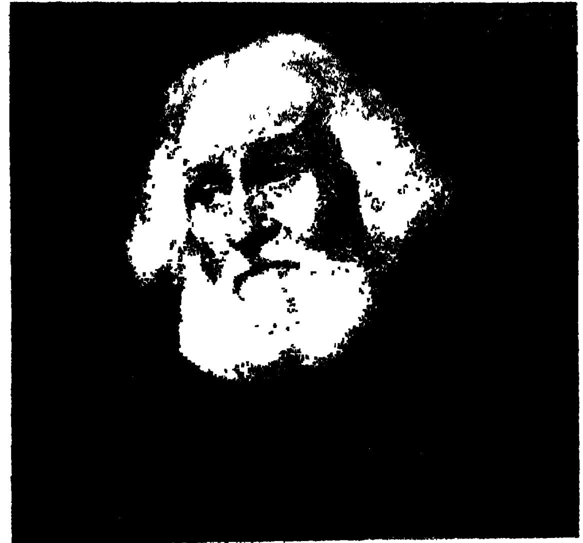
ওর্মাজ নগরে মার্কো পোলোর অবতরণ

হ’ল। আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

আমাদিগকে আর্মেনিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। নানা কারণে চীন-সম্রাটের দরবারে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় সাড়ে তিন বৎসর দেরী হইয়া গেল। কিরমানের পাথরের খনি, অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া, প্রকাণ্ড বড় দুধের মত সাদা ষাঁড়, আশ্চর্য্য নূতন পাখী, দামী পাথর, লোকজনের অদ্ভুত আচার-ব্যবহার, আরও অনেক আশ্চর্য্য নূতন জিনিষ আমরা পথে দেখিয়াছিলাম।

চীন-সম্রাট কুব্‌লা খাঁকে আমরা খুব ভালবাসিতাম। তাঁহার সভায় আমরা প্রায় সতেরো বৎসর কাল কাটাইয়া আসিয়াছি। আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে, সম্রাট আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সম্রাট দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। দৈর্ঘ্য মাঝারী, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল ও চক্ষু কৃষ্ণ ছিল। তিনি আমাকে অনেক জায়গায় পাঠাইতেন। রাজধানী পেকিং আশ্চর্য্য সুন্দর নগর ছিল। রাস্তাগুলি চমৎকার চওড়া ও সোজা ছিল। সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বাগান ইত্যাদি থাকাতে সহরটিকে আরও সুন্দর দেখাইত।

পেকিংএর অপেক্ষাও সুন্দর ছিল হাং-চু নগরী। আমার মনে হয়, পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর সহর আর নাই। ভেনিসের মত সহরটির চারিদিকে জল। কাজেই, ইহাতে প্রায় বারো হাজার পাথরের সেতু ছিল। আর সেতুগুলি এত বড় যে, তাহাদের নীচ দিয়া অনায়াসে একটি জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিত। বণিকেরা এত ধনী যে, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। এদেশের মেয়েরা আশ্চর্য্য সুন্দরী। এদেশের লোকেরা সব পুতুল পূজা করিত। কাগজের টাকার প্রচলন এ-দেশেও আছে। এ-দেশের লোকেরা কুকুর ও অন্যান্য অনেক জানোয়ারের মাংস খায়। সহরটিতে সাধারণের জন্য চারি হাজার স্নানাগার আছে। এমন আর কোনও সহরেই দেখি নাই।



মার্কো পোলো (টিটান অঙ্কিত চিত্র হইতে)

সম্রাট কুব্‌লা খাঁর সভায় আমরা বড়ই সুখে ছিলাম। কুব্‌লা খাঁ প্রায়ই বিরাট ভোজ দিতেন। তাহাতে

প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নিমন্ত্রিত হইত। সম্রাটকে তাঁহার আমীর-ওমরাহরা নিজেরা পরিবেশন করিতেন। পরিবেশন করিবার সময় পাছে নিঃশ্বাস খাবারের উপর পড়ে সেইজন্য তাঁহারা তোয়ালে দ্বারা মুখ ঢাকিয়া লইতেন। সম্রাটের যে বিরাট পরিমাণ উপঢৌকন আসিত, তাহা বলিতেছি শোন। পাঁচহাজার উট, এক লক্ষ সুন্দর ঘোড়া, সোনারুপার কাপড়ে মোড়া পাঁচ হাজার হাতী, ইহা তিনি এক এক বার পাইতেন। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলিতেছি, শোন। একটা প্রকাণ্ড সিংহ সম্রাটের সম্মুখে এমন বিনীতভাবে বসিয়া থাকিত—যাহাতে মনে হইত যে, সে সম্রাটকে

জাপান দেশেও আমি গিয়াছি। এদেশে এক রকম লোক আছে—যাহাদের গায়ের রং পীত, ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। এদের একজন রাজা আছেন ও এদেশবাসীরা পুতুল পূজা করে। সম্রাট্ কুব্‌লা খাঁ একবার ইহাদের রাজ্য আক্রমণ করেন ও এদেশের অনেক সোনা নিজের প্রাসাদে লইয়া যান। সম্রাটের আদেশে আমি তিব্বত ও সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া—ক্যান্টন হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু চীনদেশই আমার সব-চাইতে ভাল লাগিয়াছে।

এতকাল চীনে থাকিয়া, আমার ও আমার বাবা, কাকা সকলেরই বাড়ী ফিরিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুব্‌লা খাঁর আমাদের অত



মার্কো পোলোর ভ্রমণ-পথ এই মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে

শীঘ্র ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এসময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। এসময় পারস্যের এক রাজা কুব্‌লা খাঁর পরিবারের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। ঠিক হইল, আমরা রাজকন্যাকে পৌঁছাইয়া দিব। কারণ আর কেহই পথ জানিত না। অনেক দিন যাত্রায় কাটিয়া গেল। পারস্যে পৌঁছিয়া জানিলাম, রাজা মৃত। রাজকন্যাকে বর্তমান রাজার সঙ্গে বিবাহের জন্য রাখিয়া আমরা দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

চীন-সম্রাটের রাজ্যের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশ। সম্রাটের দূতেরা রাজ্যের সব খবর আনিয়া দিত। সম্রাট্ রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর রাখিতেন। যদি কোন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইত, তাহা হইলে সে বৎসর প্রজাদের কোন রাজকর দিতে হইত না।

চীনে আমি একরকম আশ্চর্য্য কালো পাথর দেখিয়াছি—যাহা জ্বালানী কাঠের মত ব্যবহৃত হয়। তুঁত গাছের উপর অনেক গুটি পোকা দেখিয়াছি। এই জন্যই চীনদেশ রেশমের জন্য বিখ্যাত।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আমরা স্বদেশ ভেনিসে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কেহই আমাদের চিনিতে পারিল না। চব্বিশ বৎসর আগে যে পোলোরা দেশ ছাড়িয়া কোন্ অজানা বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, আমরা যে তাহারাই—একথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিল না। অবশেষে আমি একটা ফন্দী করিলাম।

দিয়া খানিকটা কাটিয়া ফেলিতেই বৃষ্টির মত দামী হীরা, চুনি, পান্না ইত্যাদি পড়িতে লাগিল তখন তাহাদের আশ্চর্যের আর সীমা রহিল না। আমাদের গল্প শুনিয়া তাহারা ত আরও অবাক্। তখন আমার খুব আনন্দ হইতেছিল।

আমার কাহিনী হয়ত কোনদিন লেখাই হইত না। কিন্তু এক আশ্চর্য কারণে তাহা ঘটিয়া গেল।



পুরানো পোষাক কাটি… [illegible]

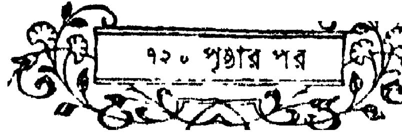
সকলকে এক বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করিলাম। আহারের সময় আমরা তিনজন ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের জামা পরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই দামী জামা চাকরদের বিলাইয়া দিলাম ও অন্য রকম দামী ভেলভেটের পোষাক পরিয়া আসিলাম। চীনদেশের দরবারের দামী পোষাক দেখিয়া আমাদের অভ্যাগতেরা বেশ খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। তখন আমি তিনটি পুরানো পোষাক লইয়া আসিলাম ও সেই পোষাক ছুরি

আমি যখন বন্দী অবস্থায় কারাগারে ছিলাম, তখন আমার একজন সঙ্গী বন্দী ছিল—তাহার নাম পিসান রাস্টিসিয়ানো (Pisan Rusticiano)। আমি তাহাকে যাহা বলিতাম, সে তাহা লিখিয়া রাখিত। এখন আমি এই কথা বলিয়া শেষ করিতেছি যে, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলি নাই।

পরবর্তী কালের বিখ্যাত আবিষ্কারক কলম্বাস মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

কি ও কেন

পুরানো বাড়ী বা প্রাচীন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল জীর্ণ হয়ে যায় কেন



তোমরা অনেকে পুরানো পুরানো বাড়ী বা প্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছ যে, তাদের দেওয়াল সাধারণতঃ শক্ত পাথর দিয়ে তৈরী থাকে। পাথর ত আর মাটির মত নরম জিনিষ নয় যে, ঝড়, জল বা রোদ এই সব সহ্য করতে পারবে না; বরং দেখা যায় যে, লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে পাথরের পাহাড় ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো পরিবর্তন নেই। এই সব লক্ষ্য ক'রে রাজারা পাহাড় কেটে পাথর এনে বাড়ী ঘর তৈরী ক'রে ভাবলে, এবার তাদেরও আবাস ঐ পাহাড়ের মতই অমর হবে। কিন্তু ২০০ বছর যেতে না যেতেই প্রাসাদের দেওয়াল ক্ষয় হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল—৫০০ বছর যেতে না যেতে মন্দিরের কোনো চিহ্নই রইল না।

প্রকৃতি যে সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বংসের কাজে অগ্রসর হন, তাদের মধ্যে প্রধান যারা, তাদের আকার এত ক্ষুদ্র যে, চোখে দেখা অসম্ভব। তাদের দেখতে পেতে হ'লে অণুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হয়। তাও আবার সকলকে অণুবীক্ষণ দিয়েও যে দেখা যায় তা নয়। এদের নাম microbes বা জীবাণু। উদ্ভিদ বা প্রাণীদের প্রায় সব রোগের মূলে আছে এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব জীবাণু। তোমরা হয়ত খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে যদি আমি বলি যে, পাথর পুরানো হ'লে তা থেকে ছাল ছেড়ে আসা বা গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাওয়া—এদেরও মূলে ঐ রকম একজাতীয় জীবাণুই বর্তমান। কেমন ক'রে তারা এই পাথরকেও ধ্বংস ক'রে ফেলে সেই কথাই বলছি।

জীবাণুরা সাধারণতঃ জৈব পদার্থকেই (organic substances) নিজেদের বিচরণ-ভূমি ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে, অজৈব (inorganic) জিনিষের দিকে তারা বড় একটা দৃষ্টি দেয় না। কিন্তু কয়েকটা এমন অদ্ভুত জীবাণু আছে যারা অজৈব (inorganic) পদার্থকেই পছন্দ করে বেশী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ammoniaকে ভেঙে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস তৈরী করে। কেউ বা অন্যান্য গন্ধকের যৌগিক (sulphur compounds) থেকে গন্ধক বার ক'রে নেয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈরী করে। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে nitrifving bacteria, sulphur bacteria, iron bacteria ইত্যাদি। এক কথায় এদের বলা হয় হেট্রোট্রোফিক (hietrotrophic bacteria) জীবাণু। এই সব জীবাণু আকাশে, মাটিতে জলের মধ্যেও নানারকমে পরিবর্তন ক'রে থাকে। মাটিতে যে সোরা (nitre) দেখতে পাওয়া যায় তারও মূলে এদেরই জাতভাই বর্তমান। পাথরকেও ধ্বংস করতে এদেরই অন্য গোষ্ঠী ভার নিয়েছে।

পাথরের উপকরণের মধ্যে নানান্ রকমের জিনিষ থাকে। তার মধ্যে শিলাকণ (silicon) মূলক পদার্থই প্রধান। মধ্যে মধ্যে সামান্য জৈব পদার্থ (organic substances), নেত্রজান (nitrogen) ও গন্ধক মূলক পদার্থও বর্তমান থাকে। জীবাণুগুলি এই সব পদার্থের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কার্বনিক য়্যাসিড, নাইট্রিক য়্যাসিড, গন্ধকদ্রাবক ইত্যাদি তৈরী করে। এতে পাথরের

শরীরও যে স্থানে স্থানে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি ? তাছাড়া এই দ্রাবকগুলি পাথরের মূল অংশে লেগে নানারকমের সালফেট (sulphate), নাইট্রেট (nitrate) ইত্যাদি তৈরী করে। পুরানো পাথরের গায়ে সাদা সাদা চূণের মত দাগ লেগে থাকতে দেখতে পাওয়া যায় বা চটা উঠে গেলে ভেতরে সাদা ছালের মত দেখা যায়, তা এই সব নাইট্রেট বা সালফেট ছাড়া আর কিছুই নয়। পাথরের শরীরের মধ্যে এত অত্যাচার হ'লে সে আর কতদিন টিঁকে থাকবে, ভাবতো। দিনে দিনে তার চটা উঠে গিয়ে ক্রমে ক্রমে সে নিশ্চিহ্ন হবার পথে অগ্রসর হয়। এই হ'ল তার ধ্বংস-পথের ইতিহাস।

নদী এঁকে বেঁকে চলে কেন ?

পৃথিবীর একটি গুণ আছে—সে এর পিঠের উপর যা-কিছু আছে সকলকে নিজের কেন্দ্রের দিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ ক'রে রাখে। যদি এর উপরের কোনো বস্তু অন্য কারুর সাহায্য নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়, যে মুহূর্ত্তে সুবিধা পায় পৃথিবী আবার তাকে টেনে নিজের কাছে ক'রে নেয়। মনে কর, সমুদ্রে জল আছে। এই জল যদি আকাশের সূর্য্যের কাছ থেকে উত্তাপের সাহায্য নিয়ে বাষ্প হ'য়ে দুষ্টু ছেলের মত বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, পৃথিবী কি সত্যি সত্যি তাকে পালাতে দেয় নাকি ? ছেলের প্রতি তার মায়ের আকর্ষণের দৃষ্টি যেমন প্রতিনিয়ত সচেতন থাকে, পৃথিবীর আকর্ষণও জলকণাগুলির উপর সদা-সর্ব্বদাই তেমনি বর্ত্তমান থাকে। তাই সে নানান্ উপায়ে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বর্ষার বৃষ্টির আকারে, পাহাড়ের উপর বরফ আকারে নিজের কাছে সস্তব টেনে নেয়। নদী যে চলে তার মূলে পৃথিবীর এই আকর্ষণ রয়েছে। নদীর প্রত্যেক জলকণাকে পৃথিবী টানছে, আর তারাও গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আসছে।

এখন কথা ওঠে সোজা গড়ালেই পারে—এঁকে বেঁকে যায় কেন ? এটা অবশ্য নির্ভর করে যেখান দিয়ে নদী বয়ে যায় সেই জায়গার সমতার উপর। যদি দেশকে-দেশ শুধু একদিকেই গড়ানে হয়, কোথাও একটুও উঁচু-নীচু না থাকে, তবে নদীও সোজাই যেতে পারে। কিন্তু একেবারে সমতল জায়গা ত আর কোথাও নেই। উঁচু নীচু ত সর্ব্বত্রই আছে—কোথায়ও বা অল্প, কোথায়ও বা বেশী। তাই নদী তার চলার জন্যে সেই পথই বেছে নেয়, যে-পথে সে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সব থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। অর্থাৎ সে যে জমিটা সব থেকে ঢালু সেই দিকেই অনবরত নিজের গতির মোড় ফেরাতে থাকে। কাজে কাজেই, তার চলার পথটাও আঁকা বাঁকা হয়ে ওঠে।

তোমরা কখনও যদি উড়ো জাহাজে চড়ে খুব উঁচুতে উঠে পৃথিবীর দিকে চাইতে চেষ্টা করো, তবে তোমাদের নীচে খুব বিস্তীর্ণ স্থান চোখে পড়বে—অর্থাৎ পৃথিবীর পিঠের অনেকটা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। মাটিতে দাঁড়িয়ে কিংবা খুব উঁচু বাড়ী বা মিনারের ওপরে উঠলে যতটা জায়গা চতুর্দ্দিকে দেখা যায় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী পরিসর স্থান তোমরা দেখতে পাবে। নদী যে কি রকম এঁকে বেঁকে চলে এই অবস্থায় খুব ভাল ক'রে বোঝা যায়। এ এমনই একটা নতুন ও অভিনব দৃশ্য যে, একবার দেখলে তা চোর হয় সারাজীবন মনে থাকবে।

পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হ'লে আগুন দেখা যায় কেন ?

জড় জগতে কোনো জিনিষের ধ্বংস হয় না, যা হয় তার নাম রূপান্তর। তুমি যাকে ধ্বংস বল, তা শুধু তোমার কাছ থেকে তার অন্তর্দ্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টিও সেই ভাবে তোমার কাছে তার আবির্ভাব। একটি পাত্র ভ'রে খানিকটা জল রেখে দিলে কয়েক দিন পরে তার এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। তা ব'লে কি বলতে হবে যে, জলটার ধ্বংস হয়েছে। জলটা বাতাসের সঙ্গে মিশে আমাদের কাছ থেকে অন্তর্দ্ধান করল মাত্র—তার প্রতি কণাটি কিন্তু যেমন ছিল তেমনই রইল। সৃষ্টির বেলাতেও আবার সেই ব্যাপার। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য উপকরণ দরকার। যে পরিমাণের উপকরণ, সৃষ্টিও ঠিক সেই পরিমাণের—একটুকুও কম বা বেশী হয় না।

একটা পাথর অন্য একটা পাথরের প্রতি বেগে ধাবিত হয়ে তার গায়ে আঘাত করল, আর হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেল। ফলে হ'ল এই যে, যে এনার্জ্জী (energy) পাথরটার গতিবেগের মধ্যে নিহিত ছিল, গতিটা হঠাৎ থেমে যাওয়াতে, ধ্বংস হতে পারে না বলে, তা পাথর দুটির মিলিত স্থানের কণাগুলির (molecules) মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে সেগুলিকে ভয়ঙ্কর

উত্তেজিত ক'রে দিল। কোনো কোনোটি কণা (molecule) আঘাতটাকে সর্ব্বপ্রথমে মাথা পেতে নিয়েছিল সেই কণাগুলো যেগুলো হয়ত আবার উত্তেজনার আধিক্যে জ্বলে উঠে, ছিটকে বেরিয়ে গেল। এই প্রজ্বলিত কণাগুলির ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াটাই পাথরে পাথরে আঘাত লাগলে যে আগুন সৃষ্টি হতে দেখায়। দুটো পাথরের পরস্পর আঘাত লাগবার স্থানটা যদি আঘাতের অব্যবহিত পরেই স্পর্শ কর তবে সেখানকার কণাগুলি যে উত্তেজিত হয়েছে তা তাদের উত্তপ্ত অবস্থা থেকে স্পষ্টই ধরা পড়বে।

নদীর উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত শব্দ শোনা যায় কেমন ক'রে ?

শব্দ যে বাতাসের তরঙ্গ মাত্র, তা এখন আর তোমাদের কাছে নতুন কথা নয়। (শিশু-ভারতী ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)। শব্দ হলেই বাতাসের কণাগুলো নাচতে থাকে, আর এই নাচন বাতাসের স্তরে স্তরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দূরত্ব যত বেশী হতে থাকে, নাচের বেগও ততই কমে আসে, এবং সেই জন্যেই দূরে গেলে শব্দের জোরও কমতে থাকে। কোনো কৌশলে যদি এমন করা যায় যে, শব্দটা ছড়িয়ে না পড়ে, শুধু একদিকেই যায়, যেমন চোঙের মধ্যে কথা বললে হয় আর কি, তখন সেদিকের বাতাসের কণাগুলোর নাচনও অত তাড়াতাড়ি আর কমে না, আর শব্দও অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে। জলের উপর শব্দ করলে জলের বিস্তৃত সমতল শব্দটাকে কেবল প্রতিফলিত বা প্রতিধ্বনিত ক'রে চোঙের উপায়ে শব্দকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখে, সেই উপায়েই তাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়।

এখানে আর একটা কথা আছে। যেখানে অনেক শব্দ বা গোলমাল, সেখানেও, এই গোলমালের জন্য, দূরের শব্দ কানে স্পষ্ট হয়ে পৌঁছায় না। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে যে ছোট শব্দ আমাদের কানে মোটেই পড়ে না, গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই গুলোই কেমন স্পষ্ট আর জোরালো হয়ে ওঠে, তা তোমরা সকলেই বোধ হয় অল্প-বিস্তর লক্ষ্য ক'রেছ। নদীর জলের মধ্যে কেমন একটা চমৎকার নীরবতা সর্ব্বদাই বিরাজ করে। নদীর উপরকার বাতাসের কণাগুলো সেই জন্যেই নিশ্চিন্ত ভাবে বড় একটা নড়ে না। ফলে হয় কি, কোনো শব্দ হলে কণাগুলোর মধ্যে যে নাচনটা আরম্ভ হয়, তার কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারা যায়। নিশ্চিন্ত ভাবে বাতাসের কণাগুলো বিক্ষিপ্ত না হওয়ার দরুণ, নাচনের বেগ বড় একটা কমে বা হারিয়ে যায় না।

দিনের বেলায় নক্ষত্র কোথায় যায় ?

দিনের বেলাতেও নক্ষত্র আকাশেই থাকে — কোথাও চলে যায় না। আমরা শুধু তাদের দেখতে পাই না— এই যা। দিনে সূর্য্যের আলোর তেজ এত বেশী বর্তমান থাকে যে, সে-তেজের সামনে নক্ষত্র নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু যদি কখনও সূর্য্য আবৃত হ'য়ে তার উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়—পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় যা হয় মনে কর—তখন নক্ষত্রেরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় আকাশে অনেক নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রহণের সময় ছাড়াও নক্ষত্র দেখা সম্ভব। যদি কোনো খুব গভীর কূপের মধ্যে নেমে যাও, (কেবল গভীর হ'লে চলবে না, অন্ততঃ ৭০০।৮০০ ফুট গভীর হওয়া চাই) আর তখন যদি আকাশের দিকে চাও, তখন আকাশে নক্ষত্র দেখতে পাবে। সূর্য্যের আলোক অত নীচুতে পৌঁছতে হ'লে তার উজ্জ্বলতা অনেক ক'মে যায়—কাজেই, মাথার উপরকার আকাশে তখন নক্ষত্র বেরিয়ে আসে। আসল কথা, সূর্য্যকে সরাও—নক্ষত্রের আবির্ভাবের জন্যে তখন আর অপেক্ষা করতে হবে না।



গান

গুণকেলী—নবপঞ্চতাল

জননি, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ॥
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে ;
তনুমনধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে ॥

স্বরলিপি

II সা র্সনা । র্সা -া র্সনা দা -ণদা দপা পমা মগা গা ঋা গা মা
জ ন০ নি ০ তো০ মা ০ ০ র০ ক০ রু০ – ণ, চ র ণ

৫ ॥ ১ ২ ৩
। ম্যা -া -ঋা সা I সা ঋা । মা মা মা মা । মা পা ণদা দপা ।
খা ০ ০ নি হে রি নু, আ জি এ অ রু ণ০ কি০

৪
। পা পা -পা -জ্ঞা । -পা ঋা -া সা II
র ণ ০ ০ ০ রূ ০ পে

১´
II {মা পা | ণদা -া না র্সা | -া র্সা র্সা র্সা | র্সনা দা না র্সা
জ ন নি০ তো মা ০ র, ম র ণ০ হ র ণ
৫ ১´ ২ ৩
| ঋর্া -া র্সা -া} I র্গা র্গা ঋর্া র্গা ঋর্া র্সা র্সা না -দা -না
বা ০ নী ০ নী র ব, গ গ নে ভ রি ০ ০

| দা পা পা পা | -জ্ঞা -পা ঋা সা II
উ ঠে চু পে ০ ০ চু পে
১´ ১
II {সা সা | সা ণদা ণদা ণদা | ণদা দা দা দা | পা মা পা -দা |
তো মা রে, ন০ মি০ চে০ স০ ক ল, হৃ ব ন মা ০
৫ ১ ২ ৩
| -া র্সা -া া I সা না | দা না দা পা | দা পা মা পা |
০ ঝে ০ ০ তো মা রে, ন মি চে স ক ল, জী
৪ ৫ ১´ ২
| মা গা গা -া -ঋা সা -া -া} I {মা পা | ণদা ণদা না র্সা |
ব ন, কা ০ ০ জে ০ ০ ত নু ম০ ন০ ধ ন
৪ ৫ ১
সা র্সা র্সা র্সা | র্সা সা ঋা -া | -া স -া -া} র্গা -া |
ক রি নি বে দ ন, আ ০ ০ জি ০ ০
২ ৩ ৪
-ঋা র্গা ঋা র্সা সা না -দা না | দা পা পা -জ্ঞা পা ঋা -া II II
ক্তি পা ব ন তো মা ০ ০ র, পূ জা ০ র, ধূ ০ পে



উদ্ভিদের শরীর

কোষ

১৮০ পৃষ্ঠার পর

এতদিন নানাভাবে ক্রমে ক্রমে কত কথাই জানিতে পারিয়াছ। এই যে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া কত তৃণ, কত গুল্ম, কত সুবৃহৎ বৃক্ষ তাহাদের শ্যামল শোভা বিস্তার করিতেছে—ইহাদের সকলেরই যে আমাদের মত প্রাণ আছে, জীবনী-শক্তি আছে, তাহা তোমরা জান। ইহারা আমাদের প্রত্যহ উপহার দেয় কত সুমিষ্ট ফল, কত রঙ্গীন ফুল, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় আরও কত কি। ইহারা আমাদের মৌন মুকবন্ধু—গৃহের বাহিরে থাকিয়া ইহারা আমাদের কতরূপে সাহায্য করিতেছে! ইহাদের সম্বন্ধে জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ইহারা কেমন করিয়া দেহ গঠন করে, কেমন করিয়া অঙ্কুর হইতে বাড়িয়া উঠে, কেমন করিয়া ফুল, ফল ইত্যাদি উৎপন্ন করে—এই সব প্রশ্ন স্বভাবতই তোমাদের মনে উদয় হয়। তাই ইহাদের দেহগঠন সম্বন্ধে এবার তোমাদিগকে দুই একটি কথা বলিব।

তোমরা ঘড়ি দেখিয়া আশ্চর্য্য হও, ইঞ্জিন দেখিয়া চমৎকৃত হও। ঘড়ি কেমন করিয়া সময় বলিয়া দেয়, ইঞ্জিন কেমন করিয়া রেলগাড়ী টানে, ইহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত হও। কিন্তু প্রাণীর জীবন-লীলা, জীবদেহের কার্য্যকারিতা ইহাদের চেয়েও অধিক আশ্চর্য্যজনক। ঘড়ি ও ইঞ্জিন চালিত হয় মানুষের সাহায্যে। মানুষের সাহায্য ব্যতীত ইহারা কার্য্যক্ষম হইতে পারিবে না। কিন্তু যে সৃষ্টি-কৌশল মানুষের এবং সমগ্র জীব-জগতের জীবন-ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করে, তাহা কি সত্যই অপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য নহে?

উদ্ভিদ-দেহের গঠন সম্বন্ধে তোমাদের সকলেরই একটা সাধারণ জ্ঞান আছে। তাহা এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষেরই গুঁড়ি আছে, ডাল-পালা আছে, সবুজ পাতা আছে এবং মাটির নীচে শিকড় আছে; হয় ত সময়বিশেষে ফুল এবং ফলও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন অঙ্গ কিসের দ্বারা এবং কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তোমরা জান? এইরূপ প্রশ্ন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তোমরা তাহাকে কি উত্তর দিবে তাহাই বলিতেছি। তোমরা যে গৃহে বাস করিতেছ, তাহা তৈয়ারী করিতে হয়ত দেখিয়াছ এবং জান যে, ইহার প্রত্যেক দেওয়াল ইটের উপর ইট সাজাইয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জীব এবং উদ্ভিদের দেহও এইরূপ ছোট ছোট অংশ দ্বারা গঠিত। এই অংশের নাম কোষ। আমাদের শরীর, জীব-জন্তুর শরীর, গাছ-পালার শরীর এইরূপ বহু কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। তোমরা প্রত্যহ কত প্রাণী, কত উদ্ভিদ্ দেখিতে পাও অর্থাৎ প্রত্যহ বহু লক্ষ কোষের বিচিত্র সমাবেশ বিচিত্রতর রূপ লইয়া তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে কিন্তু কোষই হইতেছে জীবদেহের পুনর্গঠনের মূল।

উদ্ভিদের শরীর

পূর্ব্বে পৃথিবী তোমাদের মতই বয়সে ছোট ছিল। পৃথিবীর সেই শৈশবাবস্থায় যখন প্রথম জীবনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখন প্রথমে এক-কোষ প্রাণীরই আবির্ভাব হয়; ইহারাই জীব-জগতের আদিম অধিবাসী। তাহার পর বহুকাল ধরিয়া বহু কোষ মিলিয়া মিশিয়া সমবেত হইয়া নব নব জীব ও উদ্ভিদ-দেহ সৃষ্টি করিল। এই দিক দিয়া সমগ্র জীব-জগৎকে এককোষ ও বহুকোষ (multi-cellular) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বহুকোষ জীবের দেহকে লক্ষ লক্ষ এককোষ জীবের উপনিবেশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটি উপনিবেশ বা সমাজের প্রত্যেক নর নারীরই যেমন অবাধ স্বাধীনতা থাকে না, সমষ্টির মঙ্গলের জন্য সকলকে যেমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া লইতে হয়, তেমনি বহুকোষ-দেহরূপী উপনিবেশে সমবেত হইয়া সমস্ত কোষই তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং যেমন একটি উপনিবেশ বা সমাজের সকলেই এক কাজ করে না—কেহ কৃষিকার্য্য করে, কেহ ব্যবসায়, কেহ বা অন্য কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে—তেমনি দেহের প্রত্যেক কোষ-সমষ্টির জন্য পৃথক পৃথক কার্য্য নিরূপিত আছে—যেমন পাকস্থলীর কোষগুলি খাদ্য পরিপাক করে, ফুসফুসের কোষগুলি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কাজে লাগে। এইভাবে প্রত্যেক কোষই জীবদেহকে সজীব করিয়া রাখিবার জন্য, কার্য্যক্ষম করিয়া রাখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। তাই দেহের আভ্যন্তরিক কোষগুলির জীবনী-শক্তিই প্রত্যেক বহুকোষ জীবের জীবনী-শক্তি। যেমন ধর, দেওয়াল—যে ইটগুলি একত্র করিয়া দেওয়ালটিকে তৈয়ার করা হইয়াছে সেই ইটগুলির গুণের উপরেই দেওয়ালটির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ইটগুলি ভাল হইলে দেওয়ালটিও শক্ত হইবে এবং বহুদিন দাঁড়াইয়া থাকিবে; ইটগুলি খারাপ হইলে দেওয়ালটিও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এইরূপ দেহ যে কোষগুলির দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে সেই কোষগুলির একত্রীভূত জীবনীশক্তিই প্রত্যেক বহুকোষ জীবের জীবনীশক্তি। তাই জীবসম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত জিজ্ঞাসা, সেগুলি সমস্তই প্রকারান্তরে কোষ-সম্বন্ধী জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়। জীববিদ্যায় ইহাই হইল কোষের প্রাধান্যের কারণ। এখন কোষ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি।

কোষের আয়তন অতিশয় ক্ষুদ্র। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কোষ নানা আকারের হইয়া থাকে। যথা লম্বা, গোল চতুষ্কোণ এইরূপ। প্রত্যেক কোষ জীব-পঙ্কের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। উদ্ভিদ কোষের একটি বহিরাবরণ বা কোষাবরণ থাকে, কিন্তু প্রাণীর কোষে (animal cell) ইহা সচরাচর থাকে না। এই আবরণের ভিতর যে জীব-পঙ্ক (Protoplasm) আছে, তাহাকে কোষ-পঙ্কও বলা হয়। জীব-পঙ্ক কোষের ভিতরকার সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে কিংবা তাহার মধ্যে ফাঁক বা রন্ধ্র দেখা যাইতে পারে। কোষ-পঙ্কে কোষের একটি প্রধান অংশ নাভি থাকে এবং ইহার মধ্যে জালের আকারে এক পদার্থ থাকে, যাহা অতি সহজে রঙীন হইয়া যায় বলিয়া উহাকে ক্রোমাটিন (Chromatin) বলে।

ইতিমধ্যে হয়ত নানা প্রশ্ন তোমাদের মনে উপস্থিত হইয়াছে। কোষ-পঙ্কের সহিত নাভির সম্বন্ধ কি প্রকারের? উহারা পরস্পর কিরূপে সংযুক্ত? উহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই কোষ-পঙ্কের সহিত নাভির ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। নাভিই কোষের প্রধান অঙ্গ। ইহাই কোষের সকল রকম কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। নাভি ব্যতিরেকে কোষ বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। একটি এককোষ জীবাণুকে যদি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়, তাহা হইলে সেই অংশগুলিই বাঁচিয়া উঠিবে এবং যে খণ্ডগুলিতে নাভির অংশ আছে সেইগুলিই পূর্ণ-আয়তন লাভ করিতে পারিবে, আহারে বিহারে, চলা-ফেরায় সর্ব্বত্রই কোষকে নাভির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। যেমন গৃহের প্রত্যেকেই গৃহস্বামীর কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিয়া থাকে।

এইবার কোষের মূল কথা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, এই যে কোষ—যাহাকে লইয়া সমস্ত জীবজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? এইখানে তোমাদিগকে জীবজগতের একটি গভীর রহস্যের কথা বলিতেছি। তাহা এই যে, একটি জীবিত কোষ হইতে আর একটি কোষের আবির্ভাব হয়, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়েই তাহা হয় না। জীববিজ্ঞানের এই স্থির সিদ্ধান্তটাকে কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না। কোষ হইতেই যেমন কোষের উৎপত্তি, জীব হইতেই তেমনি জীবের জন্ম। প্রত্যহ কত প্রাণী কত উদ্ভিদ





জন্মিতেছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই প্রত্যহ নব নব প্রাণী এবং উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব হইতেছে।

তোমরা বলিবে, না হয় মানিয়া লইলাম যে কোষ হইতেই কোষের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা হয় কেমন করিয়া? ইহার উত্তর শোন। একটি পুরানো কোষ হইতে একটি নূতন কোষের জন্ম হয়! একটি কোষ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেই যে-স্থানে পূর্ব্বে একটি কোষ-বিভাগ (Cell-division) সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটিকে সরল (direct) এবং অন্যটিকে অসরল (indirect) বিভাগ বলা যাইতে পারে।

প্রথমে সরল বিভাগের কথা বলি। তোমরা অনেকেই রবারের বল লইয়া খেলা কর। বেশ, এইরূপ একটি বল লও এবং উহাকে দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে রাখ। এইবার আঙ্গুল দুইটিকে মিলাইবার চেষ্টা কর। দেখিবে যে, বলটি আঙ্গুলের দুইদিকে গোল হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। এখন যদি কোন উপায়ে এই দুইটি গোলাকারকে পৃথক্ করিতে পার, তাহা হইলে পূর্ব্বের একটি বল দুইটি বলে পরিণত হইবে। সরল বিভাগের সময় কোষও এইরূপে মাঝখান হইতে চিরিয়া দুইটিতে পরিণত হয়। কোষের জীবনে নাভির প্রাধান্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং কোষ-বিভাগের সময় কোষগ্রন্থি হইতে নবজাত দুইটি কোষে সমানভাবে বিভাজিত হইয়া পড়ে।

এইবার অসরল বিভাগের কথা বলা যাক্। কোষের জীবনে নাভির প্রাধান্যের কথা তোমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। এই প্রাধান্যের জন্যই কোষ-বিভাগের সমস্ত জটিল সমস্যাই নাভি এবং কোষগ্রন্থিজাত পদার্থ লইয়া। অসরল কোষ-বিভাগের প্রধান সমস্যা হইতেছে—নাভির বিভাগ এবং নাভিই ইহার কেন্দ্রস্থান। মনে কর, একটি কোষের অসরল বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে এবং তোমরা তাহা দেখিতেছ। তোমরা যাহা দেখিতে পাইবে, তাহা এইরূপ :—প্রথমেই নাভির আয়তন কিঞ্চিৎ বাড়িয়া উঠিল। নাভির মধ্যে জালের ন্যায় যে পদার্থ আছে, উহা গুটাইয়া ক্রমে সূতার মতন হইয়া গেল। এই সূতা পরে কতকগুলি ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হইল। এই টুকরাগুলির নাম কি জান? ইহাদের ক্রোমোজোম্ (chromosome) মনে কর এইরূপ আটটি টুকরা বা ক্রোমোজোম তুমি দেখিতে পাইলে। নাভির মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার আবরণ অন্তর্হিত হইল। নাভির প্রসঙ্গ এইখানে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করিয়া কোষ-পঙ্কের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহাই বলি। নাভি আবরণহীন হইলে উহার পার্শ্বস্থিত কোষ-পঙ্কে কতকগুলি অতি মিহি এবং হাল্‌কা তন্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই তন্তুগুলি কোষ-পঙ্কে কেমন ভাবে থাকে? লাটিম তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ—উহা উপরের দিকে প্রশস্ত এবং নীচের দিকে সরু হয়। আচ্ছা, দুইটি লাটিম লইয়া এমনভাবে রাখ যে, প্রশস্ত ভাগ দুইটি মিলিয়া থাকে, সরু ভাগ দুইটি বিপরীত দিকে থাকে। ইহা করিলে এমন একটি আকারের সৃষ্টি হইল, যাহা দুই বিপরীত দিকে সরু এবং মধ্যস্থানে প্রশস্ত—অনেকটা পিপার আকার যেমন হয়। তন্তুগুলিও কোষ-পঙ্কে এইরূপ একটি পিপার মত আকারের সৃষ্টি করে। তোমাদের মনে আছে যে, ইতিপূর্ব্বে আটটি ক্রোমোজোম্ দেখিয়াছিলে। এখন সেগুলি পিপার মাঝখানে আসিয়া জড় হইল। ইহার পর দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেক ক্রোমোজোম লম্বালম্বি-ভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আটটি ক্রোমোজোম ষোলটি ক্রোমোজোমে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রোমোজোমের দুইটি ভাগ পিপার দুই প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তথায় তাহারা কুণ্ডলীকৃত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া দুইটি নূতন নাভির সৃষ্টি করিল। ইতিমধ্যে পিপার মাঝখানে নূতন আবরণে আবির্ভূত হইয়া কোষবিভাগ সমাপ্ত করিল।

এখন তোমাদের কাছে তাহাদের পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি। মনে কর, এই কোষ হইতে যত কোষের উৎপত্তি হইল, উহাদের সকলের বিভাগ তুমি ক্রমান্বয়ে দেখিয়া চলিয়াছ। তুমি দেখিবে যে, বিভাগের সময় কোন কোষেই আটটির বেশী ক্রোমোজোম দৃষ্ট হইতেছে না। এইরূপে নানা জীব-দেহের কোষ-বিভাগ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, বিভিন্ন জীবের কোষে ক্রোমোজোমের একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থাকে—যেমন মানুষের কোষে আট-চল্লিশটি ক্রোমোজোম আছে। ক্রোমোজোমের সংখ্যা জীবজগতের প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরি-বর্ত্তনীয় (constant for every species)। ক্রোমোজোমের কাজ কি, জান? পূর্ব্বপুরুষের গুণাগুণ আমরা এই ক্রোমোজোম হইতে উত্তরা-ধিকার সূত্রে পাইয়া থাকি।

পৃথিবীতে কার্য্য অনুসারে, কৃষ্টি অনুসারে স্থান ও কাল অনুসারে মানুষে মানুষে শারীরিক ও প্রকৃতিগত যেমন পার্থক্য দেখা যায় তেমনি কোষও বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই রূপান্তর বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক কিংবা দুই প্রকারেরই হইতে পারে— বাহ্যিক রূপান্তরে কোষের আয়তন বৃদ্ধি এবং উহার বহিরাবরণের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় এবং আভ্যন্তরিক রূপান্তরে জীব-পঙ্কের পরিবর্ত্তন ঘটে।

কোষের আয়তন যদি চারিদিকে সমানভাবে হয় তাহা হইলে উহার আকৃতি পূর্ব্বেকার মতই থাকে কিন্তু উহা যদি কোন বিশেষ বিশেষ ঘটে তাহা হইলে উহার আকৃতি পরিবর্ত্তন হয়। যেমন দুই বিপরীত দিকে বাড়িয়া উঠিলে কোষের আকার লম্বা হইবে কিংবা অনেক দিকে বাড়িতে থাকিলে উহা ক্রমে তারার আকার ধারণ করিবে।

কোষাবরণ নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা:- উহা সর্ব্বস্থানে সমভাবে পুরু কিংবা মাত্র কয়েক স্থানে পুরু হইতে পারে। অনেক বাহ্যিক পদার্থ— যেমন বালি, পাথর ইত্যাদি—কোষাবরণের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহাকে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত করে। এইরূপ রূপান্তর বহু রাসায়নিক পদার্থ দ্বারাও ঘটে। এখানে সে সকলের কথা আর উল্লেখ করিলাম না কোন কোন কোষের আবরণে পাথরের দানা বড় হইয়া ক্রমে কোষের ভিতর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

শৈশবাবস্থায় কোষ জীবন-পঙ্ক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু কোষপঙ্কে ফাঁক বা রন্ধ্র আবির্ভূত হয়। বিলক এক প্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে —ইহাকে বিলক রস নাম দেওয়া হইয়াছে। প্লাসটিড (Plastid) নামক আর এক পদার্থ কোষপঙ্কে পাওয়া যায়। গাছের যে সব স্থানে সূর্য্যালোক পঁহুছিতে পারে না তথাকার কোষের প্লাসটিড বর্ণহীন হয়। কিন্তু যে সব অংশ আলোকে উন্মুক্ত, তথায় প্রায় সমস্ত কোষের প্লাসটীডই বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে—বিশেষতঃ সবুজ রঙে। গাছ-পালার সবুজ রং বা পত্রহরিৎ (chlorophyll) আলোকিত কোষের প্লাসটিডে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের খাদ্যাহরণের সহিত পত্রহরিৎ অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। উদ্ভিদের খাদ্যসম্বন্ধে আলোচনার সময় তোমরা ইহা জানিতে পারিবে। সময় সময় পত্রহরিতের সবুজ রং অন্যান্য রং দ্বারা ঢাকিয়া যায়- যেমন অনেক রঙীন পাতায়। তোমরা ঝরা পাতায় হল্দে রং দেখিয়া থাকিবে। ইহারা কেন এমন ধারা হয় জান? ইহাদের পত্রহরিৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া হলুদ বর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্লাসটিডে অন্যান্য রংও—বিশেষতঃ লাল এবং হল্দে রং ও বর্ত্তমান থাকে—যেমন তোমরা দেখিতে পাও অনেক ফুলের অপূর্ব্ব বর্ণ সমাবেশ।

কোষের মধ্যে প্রায় খাদ্যদ্রব্য জমিয়া থাকিতে দেখা যায়—যেমন ষ্টার্চ বা শ্বেতসার। ইহা কোষ পঙ্কে সাধারণতঃ গুঁড়া অবস্থায় থাকে কিন্তু প্লাসটিডে ইহা দানা বাঁধিয়া জমা হয়। খেলিতে গিয়া বা অন্য প্রকারে তোমাদের সামান্য আঘাত লাগিলে তোমরা সে স্থানে টিন্‌চার আইওডিন্ লাগাইয়া থাক। আলুও তোমরা নিত্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাক। সুতরাং ও দুইটা জিনিসের সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বেশ, এক কাজ কর। একটা আলু দুই খণ্ড করিয়া কাট এবং কাটা জায়গায় অল্প পরিমাণে একটু আইওডিন্ লাগাইয়া দাও—দেখিবে যে যে স্থানে আইওডিন্ লাগাইয়াছ উহা গাঢ় নীল বর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্বেতসার আছে কি না, তাহা এইরূপে আইওডিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও কোষপঙ্কে বর্ত্তমান থাকে। যথা তেল চর্ব্বি (Oils, fats) ইত্যাদি। অন্যান্য নানা পদার্থের দানাও (crystals) কোষের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে জীবপঙ্ক জিনিষটা কি? ইহার প্রকৃতি কি? শুধু তোমরাই নও, পৃথিবীর বহু পণ্ডিত, বহু জ্ঞানী এ-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন। কত বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাও কঠিন। কিন্তু ইহা যে কি, ইহার গঠন কিরূপ, তাহা এখনও অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। শুধু ইহাই মাত্র জানা গিয়াছে যে, ইহা কারবন (Carbon) বা অঙ্গারক, নেত্রজন (Nitrogen) অক্‌জন (Oxygen) আর্দ্রজন (Hydrogen ভাস্করস (Phos-Phorus) ইত্যাদি পদার্থে অতি জটিল ভাবে রচিত। সে যাহাই হউক জীবনের সহিত জীবপঙ্ক এতই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে, ইহাদের মধ্যে কোন সীমা রেখা টানা যায় না।

এইবার তোমাদের কাছে উদ্ভিদ শরীরের কোষের কথা বলিলাম, পরে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও আকৃতি ইত্যাদির বিষয় বলিব।



যন্ত্র-বিজ্ঞান

[পৃথিবীর বুকে যে শিক্ষা ও সভ্যতা আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। মানুষ দিন দিন যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া নানা দিক দিয়া আপনার সুখ ও সৌভাগ্যের পথ খুঁজিয়া পাইল। এই ভাবেই অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ, এই ভাবেই রেলগাড়ী, ষ্টীমার, জাহাজ, এই ভাবেই ব্যোমযান ও হাওয়াই জাহাজ, তারবার্ত্তা, তার বিহীন বার্ত্তা—এ সকল সে আবিষ্কার করিয়া একদিন যাহা অসম্ভব ছিল, তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা হয়ত খবরের কাগজে পড়িয়াছ যে, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা Everest-এর উচ্চতা ২৯০০২ ফুট। কিন্তু এখনও কেহ গৌরীশঙ্করের চূড়ায় চড়িতে পারে নাই এবং যখন উহার উচ্চতা মাপা হয়, তখন কেহ উহার ১০০ মাইলের মধ্যেও যাইতে পারে নাই। কি করিয়া নিখুঁত-ভাবে এত দূরে থাকিয়াও উক্ত শৃঙ্গের উচ্চতা মাপা যায়, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকে খুবই অজ্ঞ। এই প্রবন্ধে দূরস্থ জিনিষের উচ্চতা মাপিবার কৌশল কি করিয়া ক্রমে ক্রমে মানুষ উদ্ভাবন করিল, গল্পচ্ছলে তাহা বলা হইয়াছে।]

উচ্চতা-মাপক যন্ত্র

কোনও দেশে অতি বিচক্ষণ ও সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ একজন রাজা ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের মত তিনি অসার আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহার মন্ত্রীও তাঁহারই মত অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। সুবিধা পাইলেই রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত কাজ নিজেদের চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মাঝে মাঝে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া প্রজারা তাঁহার শাসন সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে, তাহার খোঁজ-খবর লইতেন।

অন্যান্য রাজাদের যেমন হইয়া থাকে, এই রাজারও নানাশ্রেণীর ভৃত্য ছিল এবং তাহারা নিজ নিজ কাজের অনুযায়ী নানারূপ বেতন পাইত। প্রধান মন্ত্রী সকলের চেয়ে বেশী বেতন পাইতেন। তাঁহার নীচে বড় বড় কর্ম্মচারীরা ৫০০ হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। সাধারণ কর্ম্মচারীরা ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইত এবং সাধারণ ভৃত্যেরা—যাহারা ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা এবং ফরমাইস খাটা ইত্যাদি কাজ করিত, তাহারা দশ হইতে বিশ টাকা পর্য্যন্ত মাসে বেতন পাইত।

একদিন রাজা মন্ত্রীর সহিত ছদ্মবেশে চাকরদের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছেন,

এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাহারা খুব জটলা করিয়া রাজার কাজের আলোচনা করিতেছে। একজন বলিতেছে—দেখ ভাই-সকল, মহারাজের কি ঘোর অবিচার!



মহারাজের কি ঘোর অবিচার

আমাদিগকে সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, আর মহারাজা আমাদিগকে বেতন দেন মাত্র দশ হইতে পনের। আর কেরাণীবাবুরা শুধু চেয়ারে বসিয়া কলম চালান, তাঁহারা আমাদের পাঁচ ছয়-গুণ বেতন পান, আর বড় বড় কর্ম্মচারীরা ত কিছুই করেন না। মন্ত্রী মহাশয় শুধু মহারাজের সাথে গল্প করেন এবং হুকুম জারী করেন; আর তিনি যে কত হাজার টাকা বেতন পান, তাহা কেহ গণিয়া বলিতে পারে না।

রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই এই সমস্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তখন চাকরদের কিছু না বলিয়া পর দিন দরবারে তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকলে আসিলে পর মন্ত্রী বলিলেন—তোমরা



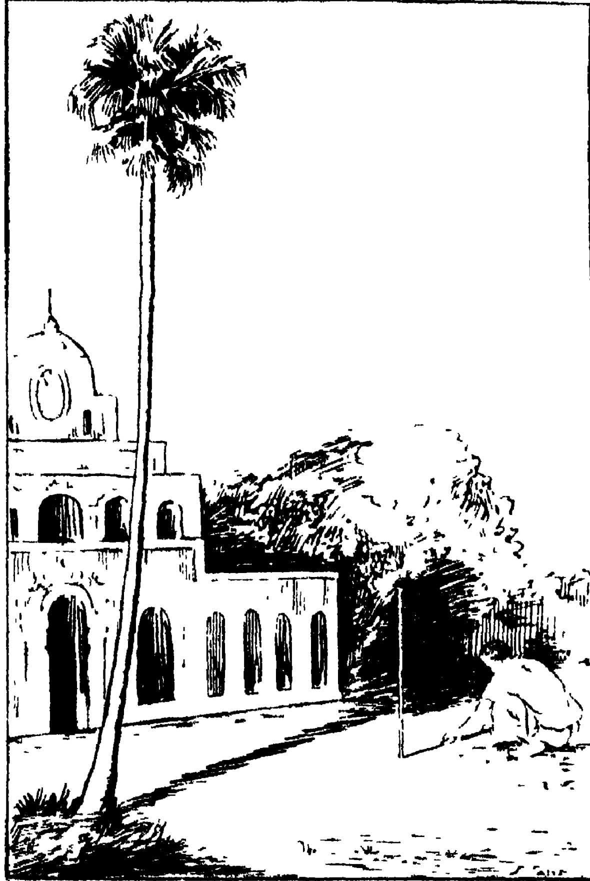
ঐ গাছটি কত উঁচু তাহা বাহির কর

কাল রাত্রে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছিলে যে, তোমরা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম কর ও মহারাজ তোমাদের তেমন বেতন দেন না। সেইজন্য মহারাজ তোমাদের দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই-হেতু তোমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি সমস্যা উত্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে তাহা সমাধান করিতে দিয়াছেন। তাহা এই—রাজবাটীর সম্মুখে অতিশয় পুরাতন এবং উচ্চ তালগাছটি কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে হইবে। ইহার জন্য তোমাদিগকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল।

ইহা শুনিয়া চাকরদের মধ্যে মহা ভয় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কি করিয়া তাল গাছের উচ্চতা মাপা যাইতে পারে। একজন বলিল—একটি খুব বড় মই তৈয়ারী করিয়া গাছের মাথায় চড়ি। তারপর সেই-খান হইতে সূতা ফেলিয়া তালগাছ কত উচু, তাহা বাহির করিতে পারিব। কিন্তু রাজবাড়ীর সূত্রধর বলিল যে, অতবড় মই তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। তখন অন্য একজন ভৃত্য বলিল—আচ্ছা, এস আমরা ঐ তালগাছের সমান উচু একটি মাটির দেওয়াল তৈয়ারী করি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, এই রকম দেওয়াল প্রস্তুত করিতে অনেক বৎসর লাগিবে এবং অনেক হাজার টাকা লাগিবে। আর একজন বলিল—আমাদের মধ্যে কেহ কোমরে সূতা বাঁধিয়া তালগাছের উপরে উঠুক্ এবং সূতা কত লম্বা, তাহা মাপিয়া দেখিলেই তাল-গাছের উচ্চতা বাহির করা যাইবে। কিন্তু এমন উচু তালগাছে চড়িতে পারে এমন কোন লোক পাওয়া গেল না। সুতরাং তাল গাছ না কাটিয়া কিরূপে তাহার উচ্চতা বাহির করিতে পারা যাইবে, চাকরেরা তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। তখন তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন দিন কাটিয়া গেলে মহারাজ তাহা-দিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভয়ে ভয়ে তাহারা দরবারে উপস্থিত হইল। তখন প্রধান মন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কি তালগাছের উচ্চতা নিরূপণ করিতে পারিলে? চাকরেরা ভয়ে ভয়ে বলিল—না মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তালগাছের উচ্চতা বাহির করিতে পারিলাম না। তখন মন্ত্রী মহাশয় একজন সাধারণ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এই তালগাছটি কত উচু, না কাটিয়া তাহা বলিয়া দিতে পার? সে খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—এই কাজ দুই রকমে হইতে পারে যদি একজন খুব ভাল তীরন্দাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ তালগাছের মাথা লক্ষ্য করিয়া একটি তীর ছুড়িতে হইবে। তীরের নীচের দিকে একটি শক্ত সূতা বাঁধা থাকিবে। তীরন্দাজ যদি ঠিক গাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সূতা লম্বভাবে মাটি পর্য্যন্ত পেঁৗছিবে, এবং তখন ঐ সূতা মাপিলেই গাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করা যাইবে। কিন্তু সকলে বলিল, তালগাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, এমন সুদক্ষ তীরন্দাজ পাওয়া মুস্কিল। তখন কর্ম্মচারী বলিল—যদি শক্ত সূতা দিয়া একটি ঘুড়ী উড়ান যায়, এবং চেষ্টা করিয়া উক্ত ঘুড়ীকে গাছের মাথায় আট্‌কান যায়, তাহা হইলে সূতার দৈর্ঘ্য হইতে তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। মন্ত্রী বলিলেন, তুমি ঘুড়ী গাছের মাথায় আট্‌কাইতে পার? কর্ম্মচারী বলিল, না হুজুর, কিন্তু যাহারা খুব ভাল ঘুড়ী উড়ায়, বোধ হয় তাহারা পারিবে। মন্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আছে কি না। তিনি তখন একজন বড় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন; আপনি কোন সহজ উপায়ে এই তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারেন কি? কর্ম্মচারী বলিলেন, নিশ্চয়ই পারি, আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কত উঁচু, তাহা মাপিয়া দিতেছি। তিনি তখন বাহিরে যাইয়া একটি প্রায় আট হাত লম্বা কাটি সোজাভাবে (লম্ব-ভাবে) মাটিতে পুতিলেন এবং একটি মাপ-কাটি লইয়া কাটির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিলেন। দেখা গেল, ছায়া দৈর্ঘ্যে ছয় হাত এবং তখনই তালগাছের গোড়া হইতে সূতা ধরিয়া উহার ছায়া কত বড়, তাহা মাপিলেন।

উহার দৈর্ঘ্য হইল ১২০ হাত। তখন তিনি হিসাব কষিলেন—ছয় হাত ছায়া যার, তার দৈর্ঘ্য যদি হয় আট হাত, তবে ১২০ হাত ছায়া যার, তার দৈর্ঘ্য কত হইবে—৬:৮::১২০ : ক, ক $= \frac{১২০\times৮}{৬} =$ ১৬০ হাত। এই সমস্ত করিতে প্রায় পনের মিনিট সময় লাগিল। তখন তিনি আসিয়া বলিলেন, গাছের উচ্চতা ১৬০ হাত এবং যে প্রণালীতে



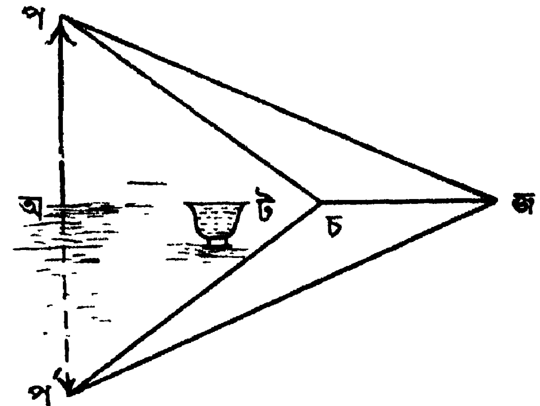
ছায়া মাপিতে লাগিল

উহা বাহির করিয়াছেন তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ও মন্ত্রী ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল। *

তখন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রী, আপনি ইহা অপেক্ষা সহজে তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিয়া দিতে পারেন কি? মন্ত্রী বলিলেন, Sextant (কোণমান) যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষণিকের মধ্যেই গাছের বা যে-কোনে জিনিষের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। আমি এই যন্ত্রের কথা অবগত আছি কিন্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত নই; আপনার জরীপ বিভাগের কর্ম্মচারীরা অতি সহজেই এই কার্য্য করিতে পারে।

রাজা তখন জরীপ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইলেন, এবং তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই Sextant দিয়া গাছের উচ্চতা ঠিক মাপিয়া বাহির করিলেন।

সেই দিন হইতে, রাজবাড়ীর ভৃত্যদের মধ্যে আর কাহারও কোন অসন্তোষের ভাব রহিল না। তাহারা নিজেদের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিল।



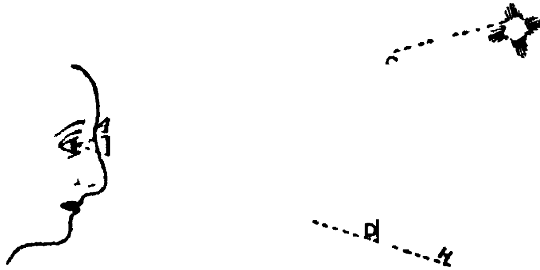
Sextant বা কোণমাপক যন্ত্র জরীপের কাজে ও সমুদ্রে সূর্য্য বা নক্ষত্রের অবস্থান নিরূপণ করিতে খুবই ব্যবহার হয়। এই যন্ত্র দ্বারা কি করিয়া দূরের জিনিষের উচ্চতা মাপা যায়; তাহা উপরের চিত্রে বোঝান যাইতেছে। মনে কর 'অপ' একটি উচ্চ

* কথিত আছে যে, একবার মিশরের এক রাজা তাঁহার সভার জ্ঞানী লোকদিগকে বিখ্যাত পিরামিডের উচ্চতা মাপিতে দেন। তখন গ্রীসের সপ্তজ্ঞানীর প্রধান জ্ঞানী মিলেটাস নগরবাসী থেলস্ (Thales of Miletus) এই উপায়ে পিরামিডের ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া উহার উচ্চতা নিরূপণ করেন।

গম্বুজ, এবং 'অপ' জলপাত্রে পতিত উহার ছায়া। দর্শক 'চ' বিন্দুতে আছে। তাহার সামনে একটি জলপূর্ণ পাত্র আছে, তাহাতে সে গম্বুজের ছায়া দেখিতে পাইতেছে। 'চ' বিন্দুতে সে কোণমান যন্ত্র দিয়া 'পচর্প' কোণ এবং পরে খানিকদূর পশ্চাতে যাইয়া 'জ' বিন্দুতে দাঁড়াইয়া 'পজর্প' কোণ নিরূপণ করিল। এখন 'চজ'র দৈর্ঘ্য এবং ∠ পচজ ও ∠ পজচ কোণ জানা আছে। সহজেই ত্রিকোণামিতির সাহায্যে 'অপ' রেখার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা যায়।

Sextant যন্ত্রের বর্ণনা যে কোন প্রাকৃতিক দর্শনের পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Sextant সাধারণতঃ স্থলে ব্যবহার হয় না, সমুদ্রে সূর্য্য বা তাহার উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থলে যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার নাম Thedolite।

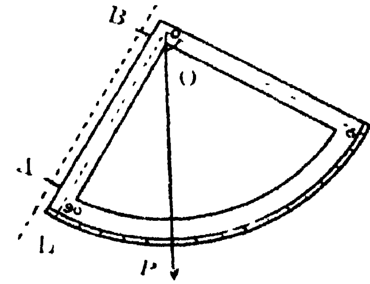
Sextant বা Thedolite যন্ত্র একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই। উহা আবিষ্কৃত হইতে বহুশত বৎসর লাগিয়াছে। প্রথমকার কোণ মাপার যন্ত্র আরবদেশীয় পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেন। তাহার ছবি উপরে দেওয়া গেল। এ ছবি বুঝিতে বোধ হয় বিশেষ গোল হইবে না, কারণ ইহা ঠিক উপরের চিত্রের প্রণালী অবলম্বনে নির্ম্মিত। ক্ষিতিজ রেখাটি একটি কাষ্ঠ বা পিত্তলনির্ম্মিত দণ্ড এবং আর একটি দণ্ডকে লম্বভাবে সরান যাইতে পারে। মনে



কোণমাপক (Balestilha) যন্ত্র—(আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত)

সূর্য্যের উন্নতি মাপিতে হইবে। দ্রষ্টা সামনে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া ক্রমান্বয়ে সরাইতে থাকে এবং দেখিতে থাকে কখন AG রেখার অভিমুখে চাহিলে সূর্য্য ও চক্ষু ঠিক এক লাইনে পড়ে। যদি যন্ত্র ঠিক ভাবে ধরা হয় তাহা হইলে এই অবস্থানে সূর্য্যের জলমধ্যস্থ ছায়া ও দ্রষ্টার চক্ষু AD রেখার সহিত এক লাইনে থাকিবে। তখন কোণ মাপিয়া তাহার অর্দ্ধেক করিলেই সূর্য্যের দূরত্ব নিরূপিত হইল। প্রথমে যখন পর্ত্তুগাল দেশের নাবিকেরা আটলান্টিক মহাসাগরে নৌচালনা করেন তখন তাঁহারা সূর্য্য ও তারকার উচ্চতা মাপিবার জন্য এইরূপ যন্ত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন।

উচ্চতা মাপিতে আর একপ্রকার যন্ত্রও পর্টুগীজগণ ব্যবহার করেন। উহা নিম্নের চিত্রে দেখান গেল। এই যন্ত্রই পরে Sextant-এ পরিণত হইয়াছে।



এই যন্ত্র বৃত্তের এক চতুর্থাংশ, এবং ইহার পরিধি ডিগ্রি ও মিনিটে বিভক্ত। দ্রষ্টা AB রেখাতে সূর্য্যের (S) দিকে দৃষ্টি করে। একটি ওলনদড়ী OP লম্বভাবে ঝোলান দড়ি। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে LOP কোণ সূর্য্যের উন্নতির সমান।